প্রথম বাংলা সংস্করণ
—১৩৫৭

ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের বেহালা শাখার
আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত হইল

প্রকাশক
শিবনাথ ব্যানার্জী
স্টার পাবলিকেশনস্
২০ শীলপাড়া রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৮

প্রচ্ছদ—অমর সরকার

মুদ্রক
শ্রীমিহির কুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২ ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৪

শ্রীঅরুণ চন্দ্র মজুমদার
আভা প্রেস
৬বি, গুড়িপাড়া রোড
কলিকাতা-১৫

কয়েকটি কথা

মুন্শী প্রেমচন্দ সাহিত্য জগতে একটি সুপরিচিত নাম। যদিও হিন্দী ও উর্দু সাহিত্য রসিকেরা যেমন প্রত্যক্ষভাবে প্রেমচন্দকে আপন করে পেয়েছেন অন্যান্যদের সে সুযোগ হয়নি। বাঙালী তাঁকে পেয়েছে অনুবাদের আংশিকতার মধ্য দিয়ে। অনুবাদে মূলের রস সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না, তার আভাস পাওয়া যায় মাত্র। তবু তারই মধ্যে প্রেমচন্দ যে বাঙালী পাঠকদের মনে একটি স্থায়ী আসন লাভ করেছেন সে কেবল তাঁর অসামান্য রচনার গুণে। মানব জীবনের যে চিরন্তন রূপ তাঁর কলমে ফুটে উঠেছে তার আবেদন সার্বজনীন। 'গোদান' তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

প্রেমচন্দ যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তখন হিন্দী ও উর্দু সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য গল্প-উপন্যাস বিরল। যাদুবিদ্যা, ভোজবাজি আর রূপকথার অলৌকিক অবাস্তব মরুমায়ায় প্রেমচন্দ নিয়ে এলেন প্রতিদিনের শত তুচ্ছের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া মানুষের অতুচ্ছ জীবন গাথা। দুঃখের টানাপোড়েনে বোনা মাটি আর মাটিমাখা মানুষের বর্ণবিরল জীবন নিয়ে লেখা 'গোদান'ই সম্ভবত ভারতীয় কৃষক জীবনের আদিকাব্য। ভারতীয় কৃষক জীবনের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে এমন হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস ইতিপূর্বে লেখা হয়নি। যারা শুধুই দিলে পেলে না কিছুই, এই উপন্যাসের নায়ক হরিমাহাতো ও তার স্ত্রী ধনিয়া সেই বঞ্চিত রিক্ত সর্বহারা মানুষদের প্রতিনিধি। উপন্যাসটির বিশাল ক্যানভাসে উত্তর প্রদেশের নাগরিক ও গ্রাম্যজীবন দুইই রঙে রেখায় যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'গোদান' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। জীবনের শেষ পর্বে এসে প্রেমচন্দ দু বছর ধরে এই উপন্যাসটি রচনা করেন। পড়তে পড়তে মনে হয়, তিনি যেন ভারতীয় কৃষকের জীবনের শরিক হয়ে তার সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। 'গোদান' প্রকাশের পরেই এই অসাধারণ গ্রন্থটির জন্যে চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। পাঠকরা স্তম্ভিত হয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন প্রতিদিন যাঁদের তাঁরা দূর থেকে দেখেন তাঁদের জীবনের করুণ পরিণাম।

'গোদান' শুধু হিন্দী সাহিত্য জগতে নয়, অনুবাদের মধ্য দিয়ে স্বদেশে এবং বিদেশে সর্বত্র জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলা ভাষাতেও গোদানের প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। তারপর দীর্ঘদিন ধরে প্রেমচন্দের অন্যান্য বহু গল্প ও উপন্যাসের একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হলেও 'গোদানে'র অনুবাদ আর হয়নি। সম্ভবতঃ অনুবাদের মাধ্যমে মূল গ্রন্থের রস সঞ্চারিত হবে না এই আশঙ্কাতেই 'গোদানে'র পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করা হয়নি। অনুবাদের

১

বলদ দুটোকে জাবনা দিয়ে হরিরাম ধনিয়াকে ডেকে বললে, "গোবরকে আখ রুইতে পাঠিয়ে দিস বৌ, আমার ফিরতে কত বেলা হবে কে জানে। আমার লাঠিটাও এনে দে।"

ধনিয়া ঘুঁটে দিয়ে আসছিল। দুহাত গোবরে ভর্তি। বলে উঠলো, "একটু সরবৎ খেয়ে যাও না, এত তাড়া কিসের?"

হরির বলিরেখা ভরা মুখে বিরক্তির ভাঁজ পড়লো, "তোর সরবতের নিকুচি করেচে। আমি কোথায় ভেবে মরচি দেরী হচ্চে বলে। বাবু চান-পুজো করতে উঠে গেলে ক' ঘণ্টা বসে থাকতে হবে তার ঠিক আচে।"

"তাই তো বলচি গো, মুখে একটু কিছু দে তবে যাও। আর একদিন যদি নাই যাও কি এমন ক্ষেতি হবে। এই তো পরশুদিনা গেছিলে।"

"তুই যা বুজিস না তাতে কতা কইতে আসিস কেন বল্‌তো? আমার লাঠিটা এনে দিয়ে যা করচিস তাই করগে যা। এইরকম মিলেজুলে থাকি বলেই না এখনো টিঁকে আচি। নইলে কি দশা হতো ভেবে দেকিচিস। গাঁয়ে এত লোক আছে কিন্তু কার জমি বেদখল হয়নি কি নীলেমে চড়েনি সেটা বল্‌। যখন ওঁদের পায়ের তলায় পড়েই থাকতে হবে তখন পায়ে তেল দেওয়াই তো ভাল।"

ধনিয়ার এত বাস্তববুদ্ধি নেই। সে ভাবে আমরা জমিদারের ক্ষেত চাষি, খাজনা দিই—ফুরিয়ে গেল। খোশামোদ করে তাদের পা চাটতে যাবো কিসের জন্য। যদিও নিজের বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ বিশ বছর ধরে সে দেখেছে হাজার চেষ্টা করে, খেয়ে না খেয়ে এমনকি দাঁতে দড়ি দিয়ে উপোষ করলেও জমিদারের খাজনা কোনবার উসুল হয় না। তবু সে হার মানতে চায় না আর এই নিয়ে তাদের স্বামীস্ত্রীতে প্রায়ই ঝগড়া লেগে থাকে। তাদের ছটি সন্তানের মধ্যে বেঁচে আছে মোটে তিনটি। বড়ো ছেলে গোবরের বয়স বছর ষোলো—আর দুই মেয়ে সোনা আর রূপা। সোনার বয়স বারো আর রূপা সবে আটে পড়লো। বাকি তিনটি ছেলে শৈশবেই বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। ধনিয়ার এখনও মনে হয় একটু ওষুধ-বিষুধ পড়লেই ওরা বাঁচতো। কিন্তু সে এক আধলার ওষুধও কিনতে পারেনি। তার নিজের বয়সই বা কতো? সবে ছত্রিশ। এরই মধ্যে মাথার চুল পেকেছে, বয়সের মাকড়সা সারা মুখে জাল বুনে দিয়ে গেছে। দেহে যৌবনের চিহ্ন নেই: সেই পাকা গমের মতো সুন্দর সোনালি রঙ শ্যাওলার মতো কালো হয়ে উঠেছে। চোখেও আজকাল কম দেখে। সবই এই পোড়া পেটের চিন্তায়। জীবনে কোনদিন সুখের মুখ দেখতে পেলো না। এই চিরস্থায়ী দুর্দশা তাকে যেন মানসম্মান সম্পর্কেও উদাসীন করে তুলেছে। যে সংসারে পোড়া পটের জ্বালা মেটাবার

জন্যে রুটিও জোটে না তার জন্যে আবার এত খোশামোদ কিসের। এই পরিস্থিতি ধনিয়াকে মাঝে মাঝে বিদ্রোহী করে তোলে—আবার হরির দু চারটে ধমক-ধামক খেয়ে সে বাস্তব জগতে ফিরে আসে। আজও পরাস্ত হয়ে সে ঘর থেকে লাঠি মেরজাই জুতো পাগড়ী আর তামাকের কৌটো এনে হরির সামনে ফেলে দিলে।

হরি চোখ পাকিয়ে ধনিয়ার দিকে চেয়ে বললে, "আমি কি শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি যে একেবারে পাঁচ রকম পোষাক এনে হাজির করলি? শ্বশুরবাড়িতে তো একটা জোয়ান শালীশালাজও নেই যে সেখানে সাজ দেখাতে যাবো।"

হরির গাঢ় কালো চোপসানো মুখে এবার একটু হাসির আভাস দেখে ধনিয়া লজ্জা পেয়ে বলে, "আহা কী আমার কন্দর্পকান্তি রে! যে শালী-শালাজ ওঁকে দেখেই একেবারে ঢলে পড়বে।"

হরি ছেঁড়া মেরজাইটাকে সাবধানে পাট করে খাটিয়ার ওপর রাখতে রাখতে বলল, "তুই আমায় কি ভাবিস বল্ তো, আমি বুড়ো হয়ে গেচি, এখনো চাল্লিশ পেরোয়নি তা জানিস। কথায় বলে, "মর্দ ষাঠে পর পাঠে"।*

"যাও যাও আরশীতে একবার মুখখান দেখে এসো। তোমার মতো পুরুষ মানুষ 'যাঠে পর পাঠে' হয় না। দুধ ঘি কোনদিন চোকে দেকলে না —উনি আবার পালোয়ান! তোমার দশা দেখে আমিই তিন সন্ধ্যে ভেবে মরচি। ভগমান জানেন বুড়ো বয়সে না জানি কি করবে, কার দোরে ভিক্ষে মাগবো কে জানে?"

হরির মুখের ক্ষণিক সরসতা যেন রূঢ় ভবিষ্যতের প্রখর তাপে ঝলসে গেল। লাঠিটা হাতে নিয়ে শুধু বলে, "ষাঠ পর্যন্ত আর পোঁছুতে হবে না রে ধনিয়া। তার আগেই ওপারে চলে যাবো।"

ধনিয়া তিরস্কারের সুরে বলল, "হয়েচে হয়েচে থামো। অলুক্ষুণে কতা-গুলো আর শোনাতে হবে না। আমার হয়েচে মরণ, তোমাকে ভালো কথা কওয়াও ঝকমারি।"

হরি কাঁধের ওপর লাঠিটা তুলে বেরিয়ে গেলে ধনিয়া অনেকক্ষণ তার গমনপথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। হরির হতাশ কণ্ঠস্বর ধনিয়ার চোট খাওয়া বুকে ভয়ের কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিল। সে যে তার সিঁথির সিঁদুর-টুকুকে ভরসা করেই বিপদের অথৈ সাগর পাড়ি দিতে বেরিয়েছে। হরির অসঙ্গত কথাগুলো রূঢ় সত্য হয়ে যেন তার হাত থেকে সেই শেষ সম্বল তৃণগুচ্ছটিকেই কেড়ে নিতে চাইছে। আসলে প্রত্যেকটা কথাই নির্মমভাবে সত্য আর সত্য বলেই তাকে এতখানি বিন্ধ করতে পারলো। কানাকে কানা বললে কানার যত দুঃখ হয় কোন চক্ষুষ্মান তা কি বুঝতে পারে?

হরি জোর কদমে হাঁটছিল। পায়ে-চলা আলপথের দুধারে নবোদ্গত আখের চারার ওপর দিয়ে যেন সবুজের ঢেউ খেলছে। হরি সেদিকে চেয়ে

* মর্দ ষাঠে পর পাঠে=পুরুষ মানুষ ষাঠ বছরেও জোয়ান থাকে

মনে মনে চিন্তা করে—'ভগমানের দয়ায় এবার যদি ঠিক সময়ে বর্ষা হয় আর আনাজপাতির দাম একটু সুবিধেমতো কমে তাহলে আবার একটি গরু কিনবো। তবে হ্যাঁ, কিনলে দিশী গরু কিনবো না, দিশী গরু না দেয় দুধ, না তার বাচ্চা কোন কাজে লাগে। বড়োজোর কলুর ঘানি টানে। নাঃ পছিয়া* গরুই কিনবো। খুব যত্ন আত্তি করবো। কিছু না কিছু না করেও চার পাঁচ সের দুধ হবে। গোবরটা দুধের জন্যে হাপিত্যেস করে মরে—আর এই বয়সে না খাবে তো খাবে কখন? এক বছর দুধ খেলেই হাট্টাকাট্টা জোয়ান হয়ে উঠবে একেবারে। বাছাগুলো হেলে গরু হবে এক একটার দাম দুশোর কম হবে না। আর গরুই তো গেরস্ত সংসারের শোভা। রোজ ভোরে উঠে গোমাতার দর্শন হলে তো হয়েই গেল। কে জানে কবে এই সাধটুকু মিটবে; কবে আসবে সেই দিন!'

প্রত্যেক গৃহস্থ চাষীর মতো হরির মনেও বহুদিন ধরে একটা দুধেল গরু পোষার আকাঙ্ক্ষা বাসা বেঁধেছিল। এটাই ছিল তার একমাত্র সাধ, তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো স্বপ্ন! ব্যাঙ্কের সুদ পাওয়া, জমি কেনা কিংবা পাকা-বাড়ি তোলার মতো বিশাল আকাঙ্খা তার ছোট্ট বুকে কি করেই বা স্থান পাবে?

সকালবেলা মোলায়েম গোলাপী আভাটুকু মুছে দিয়ে জ্যৈষ্ঠের সূর্য আমবাগানের মাথা ছাড়িয়ে সারা আকাশে রুপোলী রঙ ছড়াতে শুরু করলো। হাওয়া ক্রমেই গরম হয়ে উঠছে। দুপাশের ক্ষেতে যে সব চাষী কাজ করছিল তারা হরিকে দেখে "রাম রাম ভাই" বলে সম্ভাষণ জানালে, কেউ-বা হুঁকো বাড়িয়ে দিয়ে তাকে এক ছিলিম তামাক খেয়ে যেতে অনুরোধ জানালে। কিন্তু হরির অত সময় কোথায়? তবে এই ব্যবহার তার শুকনো মুখে একটা গর্বের ভাব ফুটিয়ে তোলে। ভাবে, 'জমিদারের সঙ্গে তার দহরম মহরম আছে বলেই না এত খাতির। নইলে তাকে কেই বা পুঁছতো? যে চাষীর মাত্র পাঁচ বিঘে জমি সম্বল তার আবার মানমর্যাদা! তিনটে চারটে হালওয়ালা মাহাতোরাও যে তাকে ডেকে খাতির করছে বা তার সামনে মাথা নোয়াচ্ছে এ কি কম কথা!'

আলপথ ছেড়ে হরি এবার একটা খানামতো নাবাল জমিতে এসে পোঁছোয়। বর্ষার জলে ডুবে যায় বলে এই নীচু জায়গায় জ্যৈষ্ঠ মাসেও একটি শ্যামল তৃণাস্তরণ বিছোনো রয়েছে। এই জমিটা আসলে গোচারণ-ভূমি। আশপাশের সব গ্রামের গরু এখানে চরতে আসে। জায়গাটার হাওয়াও একটু ভিজে ভিজে, নরম স্নিগ্ধ। হরি বড়ো বড়ো দু-তিনটে নিঃশ্বাস নিয়ে ভাবলে একটু বসে যাই। সারাদিন তাকে ধুলোবালি খেয়ে মরতে হবে। এই জমিটার ওপর অনেকেরই লোভ আছে। অনেক সম্পন্ন চাষী তো বহু টাকা সেলামী দিয়ে জমিদারের কাছ থেকে জমিটা বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু রায়সাহেব সাফ বলে দিয়েছেন, 'অবোলা জানোয়ারদের চরবার

* পছিয়া=পশ্চিমী

জন্যে এ জমি পুরুষাণুক্রমে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যত টাকাই দেওয়া হোক না কেন এ জমি প্রজাবিলি হবে না'। ঈশ্বর রায়সাহেবের মঙ্গল করুন। অন্য কোন স্বার্থপর লোভী জমিদার হলে বলতো, 'তোমাদের গরু মোষ ভাগাড়ে যাক, আমার কি। আমি টাকা পাচ্ছি ছাড়বো কেন?' রায়সাহেব বংশের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেন। আর যে জমিদার প্রজাদের দেখে না সে কি মানুষ?

হঠাৎ হরির চোখে পড়লো ভোলা তার গরুগুলোকে নিয়ে এদিকেই আসছে। ভোলা এই গ্রামেরই পূবদিকে গয়লাপাড়ায় থাকে। দুধ-মাখনের ব্যবসা করে আবার কখনো সখনো ভালো দাম পেলে চাষীদের কাছে গরু বলদও বিক্রী করে। গরুগুলোকে দেখে হরির সুপ্ত মনোবাসনা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। যদি ঐ সামনের গরুটা ভোলা তাকে বিক্রী করতো। ওঃ কি যে হতো তাহলে! টাকাটা সময় মতো অল্পে অল্পে শোধ করে দিলেই চলবে। সে জানে ঘরে টাকা নেই, জমিদারের খাজনা শোধ হয়নি, মহাজন বিশ্বেশ্বর সাহুর দেনা বাকী। সেই দেনার ওপরে টাকায় আনা হিসেবে সুদ বাড়ছে। কিন্তু চরম দারিদ্র্যের মধ্যে একরকম অদূরদর্শী নির্লজ্জতা থাকে সেটা হাজার তাগাদা গালিগালাজ এমনকি মারধোর করলেও ভয় পায় না। এইরকম একটা নির্লজ্জ অপরিণামদর্শিতা হরিকে যেন উৎসাহ জোগালো। বছরের পর বছর ধরে যে স্বপ্নসাধ আর মনকে আন্দোলিত করেছে সে-ই আজ তাকে বিচলিত করে তুললো। সে দেঁতো হাসি হেসে গায়ে পড়ে ভোলার সঙ্গে আলাপ করে, "রাম রাম ভোলাভাই, খপরটপর সব ভালো তো? শুনলুম এবার মেলা থেকে নাকি নতুন গরু এনেচো।"

ভোলা হরির মনের কথা আঁচ করতে পেরে একটু রুক্ষ সুরে বলে, "হ্যাঁ দুটো বকনা আর দুটো গরু এনেচি। আগের গরুগুলো সব শুকিয়ে গেচে। রোজের খদ্দেরকে দুধ না দিলে চলবে কি করে?"

হরি সামনের গরুটার গলায় হাত বুলিয়ে বলল, "খুব দুধেল গাই মনে হচ্ছে। কতোয় নিলে গো?"

ভোলা হামবড়াই ভাব দেখায়, "এবারের বাজার বড়ো চড়া গো মাহাতো। গরুটার জন্যে আশী টাকা দিতে হয়েছে। আমার তো পেরাণটা বেরিয়ে গেচে —এই কচি বাছুর দুটোর জন্যেও তিরিশটা করে টাকা গুণে দিতে হয়েচে। তবু কিনা খদ্দেররা টাকায় আট সের দুধ চায়।"

"তা তোমার কলজের জোর আছে ভাই, আর নিয়েও তো এসেচো একেবারে সেরা মাল। এখেনে পাঁচ দশটা গাঁয়ে কারুর কাছে এমন একটা গরু খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

ভোলার বাহাদুরি দেখাবার নেশা বেড়ে ওঠে, "রায়সাহেব এই গরুটার জন্যে তো একশো টাকা দিতে চেয়েছিলেন, আমি দিলুম না। ভগমানের ইচ্ছে হলে একটা বিয়েনেই একশো টাকা পেয়ে যাবো।"

"তাতে আর সন্দেহ আচে রে ভাই। মালিক কি আর খেয়ে নেবে? নজরানা দিলে নিতে পারে অবশ্য। তবে হ্যাঁ, তোমাদের কল্‌জের জোর আচে। ভাগ্যের ভরসায় আঁজলা আঁজলা টাকা গুণে দিতে পারো।

খালি মনে হচ্ছে এটির দিকে চেয়ে থাকি। তুমিই ধন্য ভাই, দিনরাত গোমাতার সেবা করচো, আমাদের পোড়া কপালে তো একটু গোবরও জোটে না। গেরস্তের ঘরে একটাও গরু না থাকে তবে লজ্জার কতা—এই আমার কথাই ধরো না কেন—কত বছর হয়ে গেলো একটু দুধের মুখ দেখতে পাই না। পরিবার কত বলে, ভোলাভাইকে বলো না কেন? কি করবো। বলি দেখা হলে বলবোখন। তোমার স্বভাবের ভারি সুখ্যাত করে গো। বলে এমন পুরুষ মানুষ আজকাল দেখাই যায় না. কতা বলবে চোখটি নুইয়ে, কখনো মাথা তুলে কতা বলতে দেখিনি।"

প্রশংসার পেয়ালা পান করে ভোলার নেশা যেন জমে এলো, "দ্যাখে যে পরের মেয়ে-বৌকে ঘরের মেয়ে-বৌয়ের মতো মানইজ্জত দেয় সেই তো পুরুষ মানুষ। সে বজ্জাত মেয়েদের দিকে কুনজর দেয় তাকে তো গুলি মেরে দেওয়া উচিত।"

"এতো তুমি একটা লাখ টাকা দামের কথা বললে ভাই। সুজন মানুষ পরের আব্‌রুকে ঘরের আব্‌রু মনে করে। ঠিক কথা।"

"মানুষটা মরে গেলে যেমন তার পরিবার অনাথ হয়ে যায় তেমনি দেখবে পরিবার মরলেও পুরুষমানুষের হাত পা সব ভেঙে যায়। আমার তো ঘর সংসার সব উজোড় হয়ে গেল রে মাহাতো ভাই। এক ঘটি জল এগিয়ে দেবারও কেউ নেই।"

গত বছর লু লেগে ভোলার বৌ মারা গিয়েছে। হরি জানতো সে কথা কিন্তু পঞ্চাশ বছরের রুক্ষ কর্কশ ভোলার মনটি যে এত স্নিগ্ধ এত কোমল তা জানতো না। একটি নারীর কামনায় ভোলার আর্ত চোখ সজল হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে হরির ব্যবহারিক কৃষকবুদ্ধি সজাগ হয়ে উঠে তাকে একটা সহজ পথ দেখিয়ে দেয়।

"বলি সেকেলে বচনগুলো তো আর মিছে নয় রে ভাই, সেই বলে না 'বিন্ ঘরণী ঘর ভুত কা ডেরা।* তোমার হয়েচে তাই, পরিবার নেই তাই ঘরে ভূতের রাজত্বি। তা তুমি একটা বে করে ফেলো না কেন?"

"তাকে তাকে আছি মাহাতো ভাই, কাউকে এত তাড়াতাড়ি পটাতে পারচি না। আমি পঞ্চাশ একশো টাকা খরচ করতেও রাজী। এখন সবই ভগমানের ইচ্ছে।"

"এবার থেকে আমিও তাকে তাকে থাকবোখন। ভগমানের ইচ্ছে হলে তোমার নতুন সংসার গড়তে দেরি হবে না।"

* বিন্ ঘরনী ঘর ভূতকা ডেরা=স্ত্রীহীন সংসার ভূতের রাজত্ব

"ব্যস তাতেই উদ্ধার হয়ে যাবো রে ভাই! ঘরে খাবার জিনিষ ভগমান অঢেল দিয়েছেন। রোজ আধমন দুধ হয়। কিন্তু কোন্ কাজে লাগে?"

"আমার শ্বশুরবাড়ির দেশে একটি মেয়ে আচে। তিন চার বছর হলো তার স্বামী তাকে ছেড়ে কলকাতা চলে গেচে। বেচারী পেষাকোটার কাজ* করে পেট চালায়। ছেলেপুলে নেই, দেখতে শুনতেও ভালো—ব্যস সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ভেবে নাও।"

ভোলার খড়ি ফোটা কুঁচকোনো চামড়ায় যেন জেল্লা এসে গেল। আশায় কত সুধা! বলে, "এখন তো তুমিই আমার ভরসা মাহাতো; কাজ থেকে একটু ছুটি পাও তো একদিন চলো দেখে আসি।"

"আমি সব ঠিকঠাক করে তোমায় বলবোখন। বেশি তাড়াহুড়ো করলে কাজ কেঁচে যায়।"

"যখন তোমার ইচ্ছে হবে তখনি যাবো। তাড়া কিসের? মনে হচ্ছে ঐ ছিট্‌ছিট্ মিশেল রঙের গরুটা তোমার বড্ড মনে ধরেচে। নেযাও তাহলে।"

"এ গরু কেনা আমার ক্ষ্যামতায় কুলোবে না দাদা, আমি তোমার লোকসান করতে চাই না—বন্ধুদের গলা টিপে ধরে তার ক্ষেতি করা আমার স্বভাব নয়। আমার এতো দিন যেমন কেটেছে—বাকীগুলোও তেমনি কাটবে।"

"তুমি এমন করে কথা বলো হরি যেন আমি তোমার পর। তুমি গরু নিয়ে যাও; দাম যা খুশি দিও। যেমন আমার ঘরে আচে তেমনি নাহয় তোমার ঘরেই থাকবে। আশী টাকায় কিনেছিলুম. তুমি আশী টাকাই দিও, হলো তো!"

"কিন্তু আমার কাছে নগদ টাকা নেই দাদা, ভেবে দ্যাখো।"

"আরে তোমার কাছে নগদ চাইচে কে ভাই?"

হরির বুকের ছাতি দু হাত বেড়ে গেল। আশী টাকায় এ গরু খুব সস্তাই বলতে হবে। এমন সুন্দর গড়ন-পেটন, দুবেলা ছ-সাত সের দুধ দেবে। আর কী শান্ত! একটা বাচ্চা ছেলেও দুধ দুইতে পারবে। এর এক একটা বাচ্ছা শ-শ টাকায় বিক্রী হবে। দোরে বাঁধা থাকলে কী সুন্দর দেখাবে! তার মাথায় ওপর এখনও চারশো টাকার দেনা। কিন্তু ধার করা টাকাকে হরির মতো মানুষেরা পড়ে পাওয়া টাকা মনে করে। আর ভোলার বিয়েটা যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে দু এক বছর ভোলা কোন কথাই বলবে না। আর বিয়ে যদি নাই হয়, তাতেই বা হরির ক্ষতি কি? বড়ো জোর, ভোলা বারবার তাগাদা দেবে, রেগে যাবে, গালমন্দ করবে। তাতে হরির বড়ো একটা লজ্জা নেই কারণ এইরকম ব্যবহার পেতেই সে অভ্যস্থ। কৃষকজীবনে এ তো সাধারণ কথা। সে তার বিবেকের সম্মতি অনুসারেই যেন ভোলার সঙ্গে প্রতারণা করছে। এমনকি দেনাপাওনার ব্যাপারেও লেখাপড়া হোক আর নাই হোক, তার কাছে দুই-ই সমান। তার কৃষকমন খরা কিংবা বন্যা দেখে

* পেষাকোটার কাজ=জাঁতা পেষা ও ধান কোটার কাজ

ভীত হয়। ঈশ্বরের রুদ্র রূপ সব সময় তার মনে থাকে কিন্তু এই যে একটু ছলনা, এটা তার নীতি অনুসারে কোন ছলনাই নয়। আর এইরকম ছলনা বা কৌশল সে তো রাত দিন করছে। ঘরে দু চার টাকা থাকলেও মহাজনের সামনে গিয়ে দিব্যি গাল্‌ছে 'ঘরে একটা আধলাও নেই' বলে। শন একটু ভিজিয়ে কিংবা কাপাস তুলোর মধ্যে কিছু বীজ ভরে দিয়ে ভারি করে বিক্রী কারও তার নীতির পরিপন্থী নয়। আর এখানে তো শুধু স্বার্থ নেই—একটু মজার ব্যাপারও রয়ে গেছে। বিয়ে পাগলা বুড়ো চিরকালই হাস্যাস্পদ জীব আর এইরকম একটা বুড়োকে যদি কিছু ঠকিয়ে নেওয়া যায় তাতে দোষ কি ?

ভোলা গরুর দাঁড়টা হরির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, "নে যাও মাহাতো, বিয়োবার পর থেকেই যখন ছ সাত সের করে দুধ দেবে তখন আমার কথা মনে কোরো। আচ্ছা চলো, আমিই তোমার বাড়িতে পেঁছে দে আসি। তোমাকে অচেনা দেখে হয়তা রাস্তায় জ্বালাবে। এখন তোমায় সত্যি কথাই বলি, বাবু নব্বুই টাকা দিচ্ছিলেন কিন্তু ওখানে গরুর কদর কে বুঝবে ? আমার কাছ থেকে নিয়ে হয়তো আবার হাকিম-হুকুমকে দিয়ে দেবেন। হাকিমদের গরুর সঙ্গে সম্পর্ক তো কত। ওঁরা শুধু রক্ত চুষতে জানেন। যতক্ষণ দুধ দেবে, রাখবে তারপর আবার কাকে বেচে দেবে। কার পাল্লায় পড়বে কে জানে ? টাকাটাই তো সব নয় রে ভাই, নিজের ধম্মও তো আছে। তোমার ঘরে আরামে থাকবে। তুমি খেয়েদেয়ে শুয়ে থাকবে আর গরু না খেয়ে মরবে—সেটা তো হবে না। তুমি তার সেবা করবে, যত্ন আত্তি করবে তবে তো গোমাতা তোমায় আশীর্বাদ করবে। তোমায় কি বলবো ভাই, ঘরে একটুও ভূষি নেই। টাকা সব বাজারে আটকে রয়েছে। ভেবেছিলুম মহাজনের কাছ থেকে কিছু ধার নিয়ে ভুষি কিনবো। তা মহাজনের আগের দেনাই শুধতে পারিনি, তাই হাঁকিয়ে দিলে। এখন এতগুলো জানোয়ারকে কি খাওয়াই এই ভেবেই মরছি। একটু একটু খাওয়ালেও তো রোজ মনখানেক ভূষি লাগবে। এখন ভগমানই ভরসা।"

হরি সহানুভূতির সুরে বলল, "তুমি আমায় আগে বলনি কেন ? আমি তো এক গাড়ি ভুষি বেচে দিলুম।"

ভোলা কপাল চাপড়ায়, "বলিনি রে ভাই, পরের কাছে নিজের দুঃখের কান্না কেঁদে কি হবে বলে। হাসবে সবাই দেবে না কেউ। শুকনো গরু-গুলোকে নিয়ে দুঃখু নেই, ঘাসপাতা খাইয়ে যে করে হোক বাঁচিয়ে রাখবো কিন্তু দুধেল গাইগুলোকে তো ভুষি না দিলে চলবে না। পার তো, ভুষির জন্যে দশ-বিশ টাকা দাও।"

কৃষকেরা খুব স্বার্থপর হয়, সন্দেহ নেই। তার গাঁট থেকে ঘুষের পয়সা বার করা খুবই শক্ত। দরাদরিতেও তারা খুব চোকস, সুদের এককেটা পাই ছেড়ে দেবার জন্যে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মহাজনের পায়ে ধরে খোশামোদ

করবে; যতক্ষণ মনে সন্দেহ থাকবে কারুর কথা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু তার সম্পূর্ণ জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির চিরস্থায়ী সহযোগ রয়েছে। গাছে ফল হয়, লোকে খায়; ক্ষেতে শস্য হয়, সংসারের কাজে লাগে; গরুর দুধ হয়, সে দুধ সে নিজে খায় না অন্য লোকে পান করে; মেঘ জল দেয়, সারা পৃথিবী তৃপ্ত হয়। এই বাতাবরণে কুৎসিত স্বার্থপরতার স্থান কই? হরি একজন কৃষক, সে কখনো পরের ঘরপোড়া আগুনে নিজের হাত সেঁকতে শেখেনি।

ভোলার বিপদের কথা শুনে তার মন বদলে গেল। গরুর দড়িটা ভোলার হাতে ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "টাকা আমার কাচেও নেই দাদা। তবে ভুষি কিছু বেঁচেচে। সেটা না হয় তোমাকেই দেবোখন। চলো এখনই নে যাও। সামান্য ভুষির জন্যে তুমি এমন গরুটা বেচবে আর আমি তাই নোব। আমার হাত খসে পড়বে না?"

ভোলা আর্দ্র কণ্ঠে বলল, 'তোমার হেলে গরু দুটো কি ভুষি না খেয়ে মরবে? তোমার কাচেই বা কি এমন কাঁড়ি কাঁড়ি ভুষি আচে, শুনি?'

"না রে দাদা, এবার ভুষিটা বেশিই হয়েচে।"

"আমি তোমাকে না হক ভুষির কথা বলতে গেলুম।"

"তুমি যদি না বলতে আর পরে যদি জানতুম তাহলে আরো রাগ হতো। মনে হতো তুমি আমায় পর মনে করো। অবরে সবরে দরকার পড়লে ভাই যদি ভাইকে না দেখে তাহলে কাজ চলবে কি করে?"

"মোদ্দা এখন গরুটা তো নে যাও।"

"এখন নয় দাদা পরে এক সময় নেব।"

"তাহলে ভুষির দাম দুধ থেকে কাটিয়ে নাও।"

হরি দুঃখিত স্বরে বলল, "দাম কড়ির কথা উঠছে কেন দাদা, আমি তোমার বাড়ি একবেলা দুমুঠো খেলে তুমি কি আমার কাছে দাম চাইবে?"

"কিন্তু তোমার হেলে গরুগুলো তো না খেয়ে মরবে, না কি?"

"ভগমান যা হোক একটা উপায় করবেন। সামনে আষাঢ় মাস, কড়্বী* বুনে নোবখন্।"

"এই গরুটা তোমারই রইল, যেদিন ইচ্ছে এসে নে যেও।"

"এক ভাইয়ের হেলে গরু নীলেমে চড়লে আরেক ভাই যদি তা কেনে, তার যেমন পাপ হয়, তোমার গরু নিলে আমারো সেই পাপ হবে।"

হরি যদি কৌশলী হতো তাহলে সে খুশী মনে গরু নিয়ে বাড়ির পথ ধরতো। ভোলা যখন নগদ দাম চাইছে না তখন বোঝাই যাচ্ছে সে ভুষির জন্যে গরু বিক্রী করছে না, বরং তার আরও একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। কিন্তু শুকনো পাতার খসখস শব্দে ঘোড়া যেমন অকারণে ভড়কে যায়, মার খেলেও

* কড়্বী=এক ধরণের পশুখাদ্য, ঘাসজাতীয়

এগোয় না। হরিরও সেই দশা হলো। কারু আপৎকালীন বিপদে দাঁও মারা পাপ, একথা জন্মজন্মান্তর ধরে তার হাড়ে-মাসে জড়িয়ে আছে।

ভোলা গদ্‌গদ কণ্ঠে বলে, "তাহলে কাউকে ভুষির জন্যে পাঠাবো তো?"

হরি জবাব দেয়, "এখন আমি রায়সাহেবের বাড়িতে যাচ্ছি। ওখান থেকে ঘণ্টাখানেক পরে ফিরবো। তখন কাউকে পাঠিও।"

ভোলার চোখ ছলছল করে ওঠে, "তুমি আজ আমাকে উদ্ধার করলে হরি-ভাই। আমি আজ বুঝলুম সংসারে আমি একা নই। আমারও সুহৃদ আছে।" এক মুহূর্ত পরে বলে, "ওই কথাটা ভুলো না যেন।"

হরি এগোয়। তার মন প্রসন্ন, এক বিচিত্র স্ফূর্তিতে মন ভরে উঠছে। কি আর হবে! পাঁচ দশমন ভুষি চলে যাবে। বেচারাকে বিপদে পড়ে নিজের গরু বেচতে হবে না। যখন আমার একটু সুবিধে হবে, গরু খুলে নিয়ে চলে আসবো। ভগমানের দয়ায়, আমি যদি কোন বিয়ের যুগ্যি মেয়ের খোঁজ পেয়ে যাই, তাহলে তো কতাই নেই।"

সে পেছন ফিরে একবার দেখে, মিশোল রঙের গরুটি গরিবিনীর মতো মৃদুমন্দ গতিতে লেজ দিয়ে মাছি তাড়িয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে চলে যাচ্ছে। যেন বাঁদীদের মাঝে রাণী চলেছেন। ওঃ কবে সেই শুভদিন আসবে, যখন এই কামধেনু তার দোরে বাঁধা থাকবে। কবে আসবে সে দিন!

২

সেমারি আর বেলারি অবধ প্রান্তের* দুটি গ্রাম—জেলার নাম বলার দরকার নেই। হরি বেলারিতে বাস করে আর রায়সাহেব অমরপাল সিং সেমারিতে। দুটি গ্রামের দূরত্ব মাত্র পাঁচ মাইল। কিছুদিন আগে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে রায়সাহেব বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্যপদ ত্যাগ করে জেলে গিয়েছিলেন। তখন থেকেই তিনি নিজের এলাকার প্রজা-দের কাছ থেকে অপরিসীম শ্রদ্ধাভক্তি পাচ্ছেন। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, তাঁর এলাকায় প্রজাদের সঙ্গে বিশেষ সদয় ব্যবহার করা হয় কিংবা তাদের জরিমানা ও বেগার দেওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি কিছু শিথিল করা হয়েছে। কিন্তু এসব ব্যাপারের যা কিছু বদনাম তার সবটাই আমলাদের ঘাড়ে চাপতো। রায়সাহেবের কীর্তিতে কোন কলঙ্ক লাগতো না। তিনিও তো প্রশাসনিক ব্যবস্থার অসহায় দাসমাত্র। জমিদারীর কাজকর্ম চিরকাল যে ধারায় চলে এসেছে সেইভাবেই চলতে থাকবে। তাই জমিদারীর আয় ও প্রতাপ কিছু-মাত্র হ্রাস পায়নি উপরন্তু তাঁর যশোবৃদ্ধি হয়েছিল। তিনি যে প্রজাদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলেন তাই বা কম কী? সিংহের কাজই হলো শিকার করা, সে যদি তর্জনগর্জন না করে মিষ্টি কথা বলতে পারতো তাহলে ঘরে

* অবধপ্রান্ত=অযোধ্যা প্রদেশ

বসেই মনোমত শিকার পেতে পারতো—শিকারের খোঁজে বনে জঙ্গলে ঘুরে মরতো হতো না।

রায়সাহেব স্বদেশী করলেও হাকিম ও অফিসারদের সঙ্গে তাঁর খুব দহরম-মহরম। তাঁদের জন্যে উপহারের 'ডালি' আর তাঁদের দপ্তরের কর্ম-চারীদের জন্যে দস্তুরি যথাসময়ে পেঁাছে যেত। রায়সাহেব নিজে সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রেমিক, নাটকের উৎসাহী সমঝদার; সুবক্তা, সুলেখক এবং উঁচু দরের নিশানাবাজ। প্রায় দশ বছর আগে তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন তবে তিনি আর বিয়ে করেননি। নিঃসঙ্গ জীবনটা হেসে খেলেই কাটিয়ে দিচ্ছেন।

হরি সদরে পেঁাছে দেখলে জ্যৈষ্ঠের দশহরা উপলক্ষ্যে 'ধনুষ যজ্ঞ' উৎসবের একটু বড়ো রকম আয়োজন হচ্ছে। কোথাও রঙ্গমঞ্চ বাঁধা হচ্ছে, কোথাও মণ্ডপ, কোথাও অতিথিদের থাকবার ঘর কোথাও-বা মেলার দোকানপাট বসবার জন্যে সাময়িক দোকান। চড়া রোদ তবু রায়সাহেব নিজেও কাজে লেগে গেছেন। পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারসূত্রে রায়সাহেব তাঁর রামভক্তিও কিছু পরিমাণে পেয়েছিলেন। আর এই 'ধনুষযজ্ঞ'কে নাটকের রূপ দিয়ে বিশিষ্ট নাগরিকদের মনোরঞ্জনের উপযুক্ত করে তুলেছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁর অনেক বন্ধুবান্ধব, হাকিম, বড়ো বড়ো অফিসার সবাই নিমন্ত্রিত হতেন। আর দু-তিনদিন ধরে ঐ এলাকায় উৎসবের আমেজ লেগে থাকতো। রায়সাহেবের বিশাল পরিবার। দুবেলা প্রায় দেড়শো সর্দার* একত্রে খেতে বসেন। কয়েক-জন কাকা, ডজনখানেক খুড়তুতো ভাই, কয়েকজন নিজের ভাই ও জনাবিশেক বিভিন্ন সম্পর্কের ভাই। এক কাকাসাহেব রাধার উপাসক, তিনি বরাবর বৃন্দাবনে থাকেন আর মাঝে মাঝে ভক্তিরসের কবিতা লিখে ছাপিয়ে নিজের বন্ধুবান্ধবদের উপহার দেন। আর এক কাকা পরম রামভক্ত, তিনি আবার ফারসী ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ করছেন। সকলেরি ভাগ্য জমিদারীর সঙ্গে বাঁধা বলে কাজকর্ম করার প্রয়োজন হয় না।

হরি মণ্ডপে দাঁড়িয়ে ভাবছিল কি করে নিজের আগমন সংবাদ রায়সাহেবকে জানাবে। এমন সময় রায়সাহেব নিজেই সেদিকে এসে হরিকে দেখে বলে উঠলেন, "আরে? হরি তুই এসে গিয়েছিস। আমি তো তোকেই ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম। দ্যাখ, এবার তোকে জনকরাজার মালী সাজতে হবে। বুঝেছিস তো, ঠিক যখন মা জানকী মন্দিরে পুজো করতে যাবেন সেই সময় তুই ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি। আর তোর সামনে দিয়ে যাবার সময় জানকীকে সেটা উপহার দিবি। ভুলে যাস না। আর দ্যাখ, সব প্রজাদের তাগাদা দিয়ে বলে দিবি সবাই যেন কাছারিতে পুণ্যাহের সময় আসে। আমার বাড়িতে চল্, তোর সঙ্গে আরো কিছু কথা আছে।"

রায়সাহেবকে অনুসরণ করে হরি তাঁর বাড়িতে পেঁাছলো। সেখানে

* সর্দার=সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি

একটা বড়ো গাছের ঘন ছায়ায় রায়সাহেব একটি চেয়ারে বসে হরিকে সামনের মাটিতে বসতে ইঙ্গিত করে বললেন, "আমি কি বললাম বুঝেছিস তো। গোমস্তা তো যা করবার করবেই কিন্তু একজন প্রজা অন্য একজন প্রজার কথা মন দিয়ে শুনবে, গোমস্তার কথা শুনবে না। আমাদের এই পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই বিশ হাজার টাকার বন্দোবস্ত করতে হবে। কি করে কি হবে বুঝতে পারছি না। তুই ভাবছিস, আমার মতো একটা তুচ্ছ প্রাণীর কাছে মালিক দুঃখের কাঁদুনি গাইছে কেন? কিন্তু নিজের মনের কথা কাকে বলি? কেন জানিনা, তোর ওপর একটা বিশ্বাস এসে গেছে। মনে হয়, তুই অন্ততঃ আমার কথা শুনে আড়ালে হাসবি না। আর যদি হাসিসও তবে তোর হাসি আমি সইতে পারবো। কিন্তু যারা আমার সমান পর্যায়ের মানুষ তাদের হাসি আমি সইতে পারবো না। ওরা হাসবে না কেন বল্? ওদের দুঃখদুর্দশা কিংবা বিপদ আপদে আমিও তো প্রাণ খুলে হাসি আর হাততালি দিই। আসল কথা হচ্ছে, সম্পদ আর সহানুভূতি পরস্পরের চিরশত্রু। আমিও দান করি, ধর্মকর্ম করি কিন্তু কেন করি জানিস? শুধু আমার সমগোত্রের লোকেদের অপমান করার জন্যে। আমাদের এই দান ধর্ম সবই হলো নির্ভেজাল বিশুদ্ধ অহংকার। আমাদের মধ্যে কারুর সম্পত্তির ওপর যদি ডিক্রী জারি হয়, নীলাম হয়ে যায়, কেউ বকেয়া খাজনা দিতে না পেরে জেলে যায় কিংবা কারুর জোয়ান ছেলে যদি মরে যায় কি বিধবা ছেলের বৌ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, বাড়িতে আগুন লাগে. কেউ যদি বেশ্যাবাড়ি গিয়ে বোকা বনে সম্পত্তি উড়িয়ে দেয় কিংবা নিজের প্রজাদের হাতে মার খায় তখন আমার মতো তার সব পাতানো ভায়েরা বগল বাজিয়ে দাঁত বার করে এমন হাসবে যে দেখে মনে হবে তারা পৃথিবীর সব সম্পত্তি হাতে পেয়ে গেছে। আর যখন আমাদের দুজনের দেখা হবে তখনকার ভাব-ভালোবাসা দেখে মনে হবে আমার গা থেকে ঘাম বেরোলে বুঝি তার গা থেকে রক্ত বেরিয়ে আসবে। অন্য লোকের কথা ছাড়. আমার এই যে সব খুড়তুতো. পিসতুতো, মাসতুতো, মামতো ভায়েরা, যারা আমার ঘাড়ে বসে খাচ্ছে, মজা মারছে. জুয়া খেলছে, মদ খাচ্ছে আরো নানারকম বদমাইসি করছে—ওরাও হিংসের জ্বালায় মরছে। আজ যদি মরি তো কাল ঘিয়ের পিদীম জ্বালাবে। আমার দুঃখের দুঃখী কেউ নয় রে! ওদের চোখে আমার দুঃখী হবার অধিকারও নেই। আমি কাঁদলে ওরা হেসে উড়িয়ে দেয়। আমার অসুখ হলে আমি সুখে থাকি। আমি যদি বিয়ে করে ঘরে ঝগড়ঝাঁটি বাড়াতে না চাই, সেটা আমার নীচ স্বার্থপরতা, যদি আরেকটা বিয়ে করি, সেটা হবে বিলাসিতা। যদি মদ না খাই বলবে লোকটা কৃপণ, খেলে বলবে প্রজার রক্ত খাচ্ছে। আয়েসী না হলে বলবে বেরসিক আর আয়েসী হলে তো কথাই নেই। ওদের ইচ্ছে আমি অন্ধ হয়ে যাই আর ওরা সব কিছু লুটে পুটে নেয়। আর আমি সব কিছু দেখেও না দেখার ভাণ করি। সব জেনেও গাধা বনে থাকি।"

দম নেবার জন্যে রায়সাহেবের বাক্যস্রোতে একটু ভাঁটা পড়লো। দুটো পানের খিলি এক সঙ্গে মুখের মধ্যে ফেলে তিনি হরির মনোভাব আঁচ করবার চেষ্টা করলেন।

হরি সাহস করে বলে ফেলে, "আমি তো জানতুম আমাদের মতো লোকের ঘরেই এসব ব্যাপার হয়। এখন দেখছি বড়োঘরেও কিছু কম হয় না।"

রায়সাহেব মুখভরা পান নিয়েই বলতে শুরু করলেন, "তুই আমাদের বড়োমানুষ বলে মনে করিস। আরে বলে না, "নাম বড়ে দর্শন থোড়ে"* আমাদের হচ্ছে তাই। গরীবদের শত্রুতা স্বার্থের জন্যে কিংবা পেটের জন্যে। আমার মতে এই ধরণের শত্রুতা ক্ষমার যোগ্য। আমার মুখের গ্রাস কেউ যদি কেড়ে খায় তাহলে তার গলায় আঙুল দিয়ে সেই রুটি বের করাই আমার ধর্ম। সেক্ষেত্রে আমি যদি ছেড়ে দিই তাহলেই দেবতা বনে যাই। বড়োলোকদের শত্রুতা শুধু আমোদের জন্যে। আমরা এত বড়ো হয়ে গেছি যে আমাদের নীচতা-কুটিলতার মধ্যেও স্বার্থের গন্ধ নেই, আছে পরম সুখ! পরের কান্না দেখে আমাদের হাসি পায়। একে তুই সামান্য জিনিষ ভাবিস না। যখন এত বড়ো সংসার, তখন কেউ না কেউ তো অসুখে পড়বেই। আর বড়োলোকদের রোগও বড়ো বড়ো হয়। সে আবার বড়োমানুষ কি, যার সামান্য অসুখ করে। যদি মামুলী জ্বরও আসে, তো আমাদের সারাদিন ধরে ওষুধ খাওয়ানো হয়। ছোট্ট ফুসকুড়ি বেরোলেও ধরে নেওয়া হয় সেটা সাংঘাতিক বিষাক্ত। তারপর ছোট-বড়ো সার্জেনকে টেলিগ্রাম করে ডেকে পাঠানো হয়, সবচেয়ে বড়ো হাকিমকে আনবার জন্যে দিল্লীতে লোক ছোটে, আর কবিরাজকে ডাকতে কলকাতায়। ওদিকে দেবালয়ে চণ্ডীপাঠ হয় আর জ্যোতির্যাচার্য ঠিকুজি বিচার করে। তান্ত্রিকও নানারকম ক্রিয়াকর্মে যোগ দেয়। যেন রাজাসাহেবকে যমের হাত থেকে বাঁচাবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এই সব ডাক্তার-বদিও তাকে তাকে থাকে কখন কার একটু মাথা ধরবে আর তাদের বাড়িতে সোনাবৃষ্টি হবে। এই টাকা তোর আর তোর ভাইদের মতো গরীব প্রজাদের ঘাড় ভেঙেই উসুল করা হয়। আমার তো অবাক লাগে, মনে হয় তোদের তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস আমাদের কেন ভস্ম করে দেয় না। কিন্তু না, অবাক হবার কিছু নেই। ভস্ম করতে তো সময় লাগে না, তাতে যন্ত্রণাও কম। তোদের ঐ নীরব হাহাকার জ্বালাময় তরঙ্গের মতো আমাদের তিল তিল করে পুড়িয়ে মারে; আর সেই মানসিক যন্ত্রণা ভুলে থাকার জন্যে আমরা পুলিশ, হাকিম, আদালত, উকিল ইত্যাদির শরণ নিই আর রূপসী যুবতীর মতো তারা আমাদের নিয়ে খেলা করে। সকলে ভাবে, আমরা খুব সুখী। আমাদের কাছে তালুক, মুলুক, গাড়ি, ঘোড়া, চাকর-বাকর, টাকা, বেশ্যা—কি নেই? কিন্তু যার আত্মশক্তি নেই, আত্মাভিমান নেই সে আর যাই হোক মানুষ নয়। যে শত্রুর ভয়ে রাতে ঘুমোতে পারে না,

* নাম বড়ে দর্শন থোড়ে=নামেই বড়ো দেবার বেলা কিছুই নন

যার দুঃখে সকলে হাসে, যে মরলে কাঁদবার কেউ নেই, যে স্বার্থের জন্যে পরের পায়ে মাথা বিকিয়ে দেয়, ভোগবিলাস আর নেশার দাস হয়ে গরীব প্রজার রক্ত চোষে তাকে সুখী বলি না। সংসারে সেই সবচেয়ে হতভাগা। সাহেব শিকার করতে কি অন্য কাজে এলে আমরা তাঁর ল্যাজ ধরে ধরে ঘুরি, তাঁর ভ্রূকুটি দেখলে প্রাণ শুকিয়ে যায়। তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্যে আমরা কি না করি? কিন্তু সে পাঁচালী শোনাতে বসলে তোর হয়তো বিশ্বাস হবে না। ভেট আর ঘুষ তো সামান্য ব্যাপার, আমরা সেলাম করতেও প্রস্তুত। পরের ধনে পোদ্দারী করার অভ্যেস আমাদের পঙ্গু করে দিয়েছে। নিজেদের পৌরুষের ওপরও ভরসা নেই। শুধু অফিসারদের সামনে ল্যাজ নেড়ে নেড়ে তাদের করুণা, কুড়িয়ে আর তাদের সাহায্যে নিজের প্রজাদের ভয় দেখানোতেই আমাদের উদ্যম শেষ হয়। মোসাহেবদের খোশামোদ আমাদের এত মেজাজী করে তুলেছে যে ভদ্রতা, বিনয় আর সেবা করার ইচ্ছেও লোপ পেয়েছে। আমি তো মাঝে মাঝে ভাবি সরকার যদি আমাদের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করে আমাদের রুজি-রোজগারের জন্যে পরিশ্রম করতে বাধ্য করে তবে আমাদের খুব উপকার হয়। আর সরকারও তো আমাদের রক্ষা করবে না কারণ আমাদের দিয়ে তার কোন স্বার্থসিদ্ধি হবে না। ভাবে মনে হচ্ছে, খুব শীগ্গির জমিদারী প্রথার আয়ু শেষ হয়ে আসছে। আমি সেই দিনটিকে স্বাগত জানাবার জন্যে বসে আছি। ঈশ্বর করুন সে দিনটি যেন শীগ্গির আসে। সেদিন আমাদের উদ্ধার হবে। আমরা তো পরিস্থিতির শিকারমাত্র। এই পরিস্থিতি আমাদের সর্বনাশ করছে। যতক্ষণ এই সম্পত্তি আমাদের পায়ে বেড়ি হয়ে আছে, এই অভিশাপ মাথায় জমে আছে ততক্ষণ আমরা মানুষের মতো মানুষ হতে পারবো না।"

রায়সাহেব আবার পানের বাটা খুলে দুটো খিলি একসঙ্গে মুখে পুরে ফেললেন। ফের কিছু বলবার জন্যে মুখ খুলতে যাবেন এমন সময় এক চাপরাশী এসে জানালো, "হুজুর, বেগারেরা কাজ করতে চাইছে না, বলচে খেতে না পেলে কাজ করবো না। আমরা ধমকধামক দিয়েছিলুম তাই কাজ ছেড়ে বসে আচে।"

রায়সাহেবের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। চোখ পাকিয়ে বললেন, "চলো, আমি বজ্জাতগুলোকে শায়েস্তা করছি। যখন খেতে দেওয়ার রেওয়াজই নেই তখন এই নতুন কথা কেন? রোজ এক আনা হিসেবে মজুরী পাবার কথা, চিরকাল যা পেয়ে আসছে। আর যে করেই হোক এই মজুরীতেই ওদের কাজ করতে হবে।"

আবার হরির দিকে তাকিয়ে বললেন, "হরি, তুই এখন যা, নিজের ব্যবস্থাটা করে ফ্যাল্‌গে। হ্যাঁ আর তোকে যা বললাম মনে রাখিস। তোদের গাঁ থেকে কম করেও পাঁচশো টাকা আশা করি।"

রায়সাহেব তেড়ে ফুঁড়ে জ্বলতে জ্বলতে বেরিয়ে গেলেন। হরি ভাবলে,

এই লোকটা পাঁচ মিনিট আগে নীতিধর্মের কত কথাই না আওড়ালো, অথচ দ্যাখো স্বার্থে ঘা লাগতেই আগুন হয়ে উঠলো।

সূর্য তখন মাথার ওপর। হরি নিজের লাঠিটা তুলে নিয়ে ঘরের দিকে রওনা হয়। তার মনে তখন একটাই চিন্তা, পুণ্যাহের টাকা কী করে জোগাড় হবে।

৩

হরি নিজের গ্রামের কাছে এসে দেখলে গোবর তখনও আখ রুইছে আর তার দুই মেয়ে দাদাকে সাহায্য করছে। লু বইছে। এখানে ওখানে ধুলোর ঘূর্ণি, পায়ের নীচে মাটি জ্বলছে। হাওয়ায় আগুনের হল্কা। এরা সবাই এখনও মাঠে কেন? কাজের জন্যে প্রাণ দেবার বাজি লাগিয়েছে নাকি? হরি মাঠের দিকে চেয়ে হাঁক পাড়ে,

"গোবর ঘরে আয়। দিনভোর কাজ করবি নাকি? বেলা গড়িয়ে এলো যে, আন্দাজ পাচ্ছিস নে।"

হরিকে দেখে তিনজনেই কোদাল নিয়ে তার সঙ্গে ফিরতে লাগলো। গোবর কালোকোলো একহারা লম্বা কিন্তু তার এসব কাজ ভালো লাগে না। তাই সব সময় তার মুখে প্রসন্নতার পরিবর্তে একটা অসন্তোষের ভাব ছেয়ে থাকে। কাজের মধ্যে ডুবে থেকে সে দেখাতে চাইছিল খিদেতেষ্টার বালাই তার নেই। বড়ো মেয়ে সোনার চিকন কালো সুঠাম দেহ; প্রাণচঞ্চল মুখে লজ্জাশীলা কিশোরীর আভাস। পরণের গাঢ় লাল শাড়িটা হাঁটু অব্দি গুটিয়ে আঁটসাঁট করে পরার জন্যে তাকে বয়সের তুলনায় একটু ভারিক্কী দেখাচ্ছে। ছোট মেয়ে রূপার রঙ ময়লা, মাথার চুল জট বেঁধে পাখির বাসা হয়ে আছে। পরণে শুধু একটি ছেঁড়া কানি। যেমনি একগুঁয়ে তেমনি ছিঁচকাঁদুনে। সে হরির সঙ্গে যেতে যেতে বলে, "বাবা দ্যাখো, আমি একটা ঢেলাও আস্ত রাখিনি। দিদি বলছিল গাছের তলায় বস্‌গে যা। ঢেলাগুলো না ভাঙলে মাটি সমান হবে কি করে বলো।"

হরি তাকে আদর কবে কোলে তুলে নেয়, "খুব ভালো করিচিস মা, চল্ বাড়ি চল্।"

বিদ্রোহের ভাবটা চেপে গোবর বলে, "আচ্ছা, তুমি নিত্যি বাবুকে খোশামোদ করতে যাও কেন বলো তো? খাজনা বাকী পড়লে প্যায়দা এসে গালমন্দ করে; ব্যাগার দিতেই হয়; নজর-নজরানা সব তো আমাদের ঘাড় ধরে আদায় করে। তবু শুদুমুদু সেলাম ঠুকতে যাও কেন?"

হরিও ঠিক এ কথাই ভাবছিল কিন্তু ছেলের রোখচড়ানো ভাবটাকে সামলানো দরকার। তাই বলে, "সেলাম করতে না গেলে থাকবো কোতায়? ভগমান যখন গোলাম করেই পাঠিয়েচেন তখন আর উপায় কি? এই যে দোরের সামনে একটা চালা তুলেচি, কেউ কিছু বলেনি; সে হচ্ছে ওই

সেলাম ঠোকার ফল। ওদিকে ঘুরে দোরের সামনে একটা খুঁটি পুঁতেছিল বলে গোমস্তা এসে দু টাকা ঘুষ নিয়ে গেল। সাধে করি, পুকুরের ধার থেকে আমরা কত মাটি কেটে এনেচি, গোমস্তা কিছু বলেনি। অন্য কেউ করলে ঠিক নজর পড়তে। নিজের কাজ হাসিল করবার জন্যেই সেলাম ঠুকতে যাই। নয়তো আমায় ভূতেও ভর করেনি আর তাতে স্বর্গসুখও পাইনে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কখনো দেখা হয়, কখনো ভাগিয়ে দেন ফুরসৎ নেই বলে।"

গোবর কটাক্ষ করে, "বড়োমানুষদের কথায় হ্যাঁ হ্যাঁ করে সায় দেয়ার মধ্যেও একটু সুখ আচে বৈকি। নইলে লোকে মেম্বারীর জন্যে ছুটোছুটি করবে কেন?"

"সংসারের ভার যখন নিজের মাথায় পড়বে তখন বুজবি বাবা, আজ যা পারিস বলে নে। আগে আমিও এসব ভাবতুম। এখন সার বুজেচি আমা-দের মাথা ওঁদের পায়ের তলায় বিকিয়ে আচে, তেজ দেখিয়ে বাঁচবো সে আশাও নেই।"

বাপের ওপর কিছুটা ঝাল ঝেড়ে গোবর শান্ত হয়ে হাঁটতে থাকে। সোনা দেখলে রূপা বাপের কোলে চড়েই চলেছে. তার একটু হিংসে হলো। ধমক দিয়ে বলল, "হেঁটে যেতে পারচিস না, পা ভেঙে গেছে নাকি?"

রূপা বাপের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, "নাব্‌বো না যা, বাবা, দিদি রোজ আমাকে জ্বালায়। বলে তুই রূপো আমি সোনা, তুমি আমার অন্য একটা নাম দাও।"

হরি কপট ক্রোধে বলে, "তুই ওকে জ্বালাস কেন রে সোনিয়া? সোনা তো শুধু দেখবার জিনিষ, আসল কাজ তো হয় রূপো দিয়ে। রূপো না থাকলে টাকা হতো কি করে বল্ তো।"

সোনা আত্মপক্ষ সমর্থন করে, "সোনা না থাকলে গয়না হবে কি করে? নথ কোত্থেকে আসবে? কি দে কণ্ঠী হবে?"

গোবরও মজা পায়। সে রূপাকে বলে "সোনা তো শুকনো পাতার মতো হলদে, রূপো সুজ্জ্যির মতো চকচকে।"

সোনা বলল, "বিয়ে শাদীতে লোকে হলদে কাপড়ই পরে, সাদা কাপড় কেউ পরে না।"

রূপা পরাস্ত হলো। সোনার যুক্তির সামনে গোবর বা হরির যুক্তিও টিঁকলো না। তার ক্ষুব্ধ চোখের দিকে চেয়ে হরি আর একটা নতুন যুক্তি খাড়া করে, "সোনা তো বড়লোকদের জন্যে। আমাদের মতো গরীবের কাচে রূপোই ভালো। দ্যাখ না, যবকে বলে রাজা আর গমকে বলে চামার। কেন বলে? বলে বড়োমানুষেরা গম খায় আর আমরা যব খাই বলে।"

সোনার কাছে এ কথার জবাব ছিল না। সে পরাস্ত হয়ে বলে, "তোমরা

সকলে মিলে আমার পেছনে লেগেচো—নয়তো র‍ুপিয়াকে আজ কাঁদিয়ে ছাড়তুম।"

র‍ুপো আঙুল মটকে বলে, "এ রাম সোনা চামার; এ রাম সোনা চামার।" বিজয় গর্বে বাপের কোল থেকে নেমে র‍ুপো লাফাতে লাফাতে চললো, "র‍ুপো রাজা সোনা চামার, র‍ুপো রাজা সোনা চামার।"

ধনিয়া দরজায় দাঁড়িয়ে পথ দেখছিল। ওদের দেখে র‍ুষ্ট হয়ে বলে, "আজ এত বেলা করলি কেন গোবর? কাজের জন্যে কেউ পেরাণ দেয় নাকি?" তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে গরম হয়ে বলে, "তুমিও চাকরি সেরেই মাঠে চলে গেলে? ক্ষেত কি পালিয়ে যাচ্ছিল?"

দরজার কাছেই কুঁয়ো। হরি আর গোবর এক এক কলসী জল মাথায় ঢেলে র‍ুপাকে চান করিয়ে খেতে বসলো। যবের র‍ুটি কিন্তু গমের মতোই সাদা আর মোলায়েম তার সঙ্গে কাঁচা আম দেওয়া অড়র ডাল। র‍ুপা বাপের থালাতেই খেতে বসেছে। সোনা সেদিকে হিংস‍ুটে চোখে চেয়ে মনে মনে বলে, "বা-রে আদ‍ুরি।"

ধনিয়া বলে, "বাব‍ুদের সঙ্গে কি কতাবাত্তা হলো গো।" হরি একঘটি জল খেয়ে বলে, "এই আদায় উস‍ুলের কতা, আর কি। আমরা ভাবি বড়ো-মান‍ুষেরা খ‍ুব স‍ুখে আচে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, ওঁরা আমাদের চেয়েও দ‍ুঃখী। আমরা শ‍ুধ‍ু নিজের পেটের চিন্তেয় মরি, ওঁদের হাজার রকম চিন্তা করতে হয়।"

রায়সাহেব আর কি কি বলেছিলেন তার কিছ‍ুই হরির মনে ছিল না শ‍ুধ‍ু তার সারাংশট‍ুকু তার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। গোবর ব্যঙ্গ করে বলল, "তাহলে উনি ওঁর জমিদারীটা আমাদের দিয়ে দ্যান না কেন? আমরা আমাদের ক্ষেত হাল গর‍ু কোদাল সব দিতে রাজী আচি। বদল করবে? এ সব বজ্জাতি। মিটমিটে শয়তান সব। যার এত দ‍ুঃখ‍ু সে ডজনখানেক হাওয়াগাড়ি রাখে না, দালানকোঠা বানায় না, হাল‍ুয়া-প‍ুরি খায় না আর রঙ তামাসাও দেখে না। মজা মেরে রাজস‍ুখ ভোগ করচেন আর দ‍ুঃখ‍ু পাচ্চেন।"

হরি তেড়ে ওঠে, "তোর সঙ্গে তর্ক করবে কে বাবা। বলি জমি জায়দাদ কেউ ছেড়েচে যে বাব‍ু ছাড়বেন। আর আমরাই বা ক্ষেত চষে কি পাই? এক আনার মজ‍ুরিও তো পোষায় না। দশ টাকা মাস মাইনের মজ‍ুরেও আমাদের চেয়ে ভালো খায়-পরে। কিন্তু আমরা চাষ ছাড়তে পারি না। চাষ ছাড়লেই বা করবো কি? চাকরি পাবো কোতায়? আর মান ইজ্জতের কথাও তো আচে। ক্ষেতের কাজে যত মান চাকরিতে তা নেই। ঠিক সেইরকম হাল হলো গে জমিদারদের। ওঁদেরও হাজার রকম আধিব্যাধি লেগে আচে, হাকিমকে জিনিষ দাও, তার খোশামোদ করো। আমলাদের খ‍ুশি করো, সময় মতো খাজনা দিতে না পারলে হয় ফাটকে যাবে নয় জমিদারী নীলেম

হবে। আমাদের তো কেউ হাজতে পাঠাতে পারে না, দু চারটে ধমক-ধামক দিয়েই ছেড়ে দেয়।"

গোবর প্রতিবাদ করে, "এসব শুধু কতার কতা। আমরা একদানার জন্যে হাপিত্যেস করে মরি। পরণে একখানা গোটা কাপড় নেই, মাথার ঘাম পায়ে ফেলি তবু দিন চলে না। আর ওঁরা গদি মসনদের ওপর বসে মজা লুটচেন। একশো গণ্ডা চাকরবাকর, হাজারটা লোক হুকুম তামিল করচে। টাকা হয়তো জমে না কিন্তু সবরকম সুখ ভোগ করে তো। ধন নিয়ে মনুষ্য আবার কি করে?"

"তাহলে তুই বলচিস আমরা আর ওঁরা সমান।"

"ভগমান তো সকলকে সমানই করেচেন।"

"না রে বাপু। ছোট বড়ো ভগমানেরই ছিষ্টি। অনেক তপিস্যে করলে তবে বড়োমানুষ হওয়া যায়। ওঁরা আগের জন্মে যেমন কাজ করেচেন তেমন ফল পাচ্চেন। আমরা কিচ্ছু করিনি ভোগ করবো কোত্থেকে?"

"এসব তোমার মনগড়া কতা। ভগমান সবাইকে সমান করেই পাঠিয়েচেন। এখানে যার হাতে লাঠি আচে সেই গরীবদের দাবিয়ে বড়োমানুষ হয়ে যাচ্চে।"

"এটা তোর বোজার ভুল। বাবু এখনও রোজ চারঘণ্টা পুজোপাঠ করেন।"

"কাদের জোরে এসব দানধম্ম পুজোপাঠ হয়?"

"নিজের জোরে।"

"না আমাদের মতো চাষা-মজুরের জোরে। এত পাপের ধন হজম হবে কি করে? তাই দান ধম্ম পুজোপাঠ করতে হয়। না খেয়ে না পরে ভগমানকে ডাক্‌তো তো বুজতুম। আমাদের কেউ দুবেলা দু মুঠো খেতে দিলে আমরাও আট পহর ভগমানের নাম জপতুম। একদিন ঐ মাঠে গিয়ে আখ রুইতে হলে সব ভক্তি উপে যাবে।"

হরি হার মানে, "তোর মুখের সঙ্গে কে পারবে বাপু। তুই তো ভগমানের লীলাকেও হেসে উড়িয়ে দিচ্চিস।"

বেলা তিন প্রহরে গোবর কোদাল নিয়ে বেরোলে হরি বলে, "একটু দাঁড়া বাবা, আমিও যাবো। ততক্ষণ দুটি ভুষি বার করে রাখ তো। আমি ভোলাকে দোব বলেছি। বেচারা বড়ো বিপদে পড়েচে।"

গোবর ভর্ৎসনাভরা চোখ তুলে বলে, "আমাদের কাছে তো বেচবার মতো ভুষি নেই।"

"বেচবো না রে বাপু, অমনিই দোব। ও বিপদে পড়েচে। একটু সাহায্য না করলে চলে।"

"আমাদের তো কখনো একটা গরু দিয়ে দেয়নি।"

"দিচ্ছিল তো, কিন্তু আমি নিইনি।"

ধনিয়া ভেংচি কেটে বলে, "গরু দিচ্ছিল। ওঁকে গরু দেবে! চোকে কাজল পরবার জন্যে কোনদিন এক আঁজলা দুধ পাঠায়নি আর গরু দেবে।"

হরি দিব্যি গেলে বোঝায়, "না গো, সত্যি বলচি, নিজের ভালো 'পছিয়া' গরুটা দিচ্ছিল। হাত-খালি, খোল ভুষি কিনে রাখতে পারেনি। এখন একটা গরু বেচে ভুষি কিনতে চাইছিল। ভাবলুম লোকটার বিপদের সুযোগ নিয়ে গরুটা নোব কি বলে? কিছু ভুষি দিয়ে দিই হাতে কিছু টাকা এলে গরুটা নিয়ে নোব। তারপর একটু একটু করে সব চুকিয়ে দিলেই হবে। আশি টাকা দাম, কিন্তু তাকিয়ে দেখবার মতো।"

গোবর চটেমটে বলে, "তোমার ভালোমানষির জন্যেই তোমার দুর্দশা ঘোচে না। বলতে পারলে না, আশী টাকার গরু যখন, আমাদের কাচ থেকে বিশ টাকার ভুষি নিয়ে গরুটা দিয়ে দিক। বাকী ষাঠ টাকা আস্তে আস্তে শুধবো। এতো সাফ কতা।"

হরি রহস্যময় হাসি হেসে বলে, "আরে আমি এমন চাল এঁচেচি যে গরু আপনিই হাতে এসে যাবে। শুধু ভোলার একটা বে দিতে হবে। ব্যস, দু-চার মণ ভুষি তো খালি রঙ-তামাসা জমাবার জন্যে দেওয়া।"

গোবর রাগ করে, "তুমি কি সবার বে ঠিক করে বেড়াবে নাকি?"

ধনিয়া তীব্র কটাক্ষ হেনে বলে, "হ্যাঁ ওই কাজটিই তো শুধু বাকী আছে। দিতে হবে না ভুষি। ভোলা ভালি কারুর ধারে খাই নে আমরা।"

হরি সাফাই গায়, "যদি আমি একটু চেষ্টা চরিত্তির করলে কারুর ঘর-বসত হয়, তাহলে ক্ষতি কি?"

গোবর কোন কথা না বলে কল্‌কেটা তুলে নিয়ে বাইরে চলে যায়। এসব ঝামেলা তার ভালো লাগে না। ধনিয়া মাথা নেড়ে বলে, "আর কেউ ওর বে ঠিক করতে গেলে সে শুধু একটা গরু নিয়ে চুপ করে থাকতো না, টাকার থলিও গুণে নিতো।"

হরি অসহায় ভাবে বলে, "সে তো আমিও জানি রে। কিন্তু ওর ভালোমানষিটাও তো দ্যাখ। যখন দেখা হয় তখনি তোর ব্যাখ্যানা করে। বলে একেবারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, কী বুদ্ধি বিবেচনা, এই সব।"

ধনিয়ার মুখে স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়লো। কপট ক্রোধে মাথা নেড়ে ঝঙ্কার দেয়, "আমি ওঁর ব্যাখ্যানা শোনবার জন্যে হাত ধুয়ে বসে আচি কি না। নিজের ব্যাখ্যানা নিজে করুক গে।"

হরি সস্নেহে হাসে, "আমি তো তাই বললুম রে, তোর গালমন্দের চোটে আমার নাকের ওপর মাছিটি বসতে পায় না, কথা কয় না তো ঝগড়া করে। তবু ভোলার এক কথা, তোমার পরিবার মানুষ নয়, একেবারে লক্ষ্মীঠাকরুণ। আসলে ওর বৌটা ছিল খাণ্ডারী, ভোলা ভয়ে ভয়ে পালিয়ে বেড়াতো। বলে, যেদিন সকালে তোমার পরিবারের মুখ দেখতে পাই, সেদিন কিছু না কিছু

হাতে আসবেই। আমি বলি তোমার হাতে আসে আমার সেদিন পাই পয়সার সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয় না।"

"আহা তোমার কপাল মন্দ তো আমি কি করবো!"

"সে তো নিজের বৌয়ের নিন্দে শুরু করে দিল—ভিখিরীকে ভিক্ষে দিত না, ঝাঁটা উঁচিয়ে মারতে ছুটতো। আর এমন লুভী কি বলো, নুনটাও পরের বাড়ি থেকে চেয়ে আনতো।"

"মড়ার নিন্দে করতে নেই, আমায় দেখলে মাগী যেন জ্বলে উঠতো।"

"ভোলা বেচারা খুব দুঃখী। ভালোমানুষ বলেই ওই বউয়ের সঙ্গে ঘর করেচে। অন্য কেউ হলো বিষ খেয়ে মরতো। আমার চেয়ে বছর দশেকের বড়ো তবু দেখা হলেই আগে 'রাম রাম' বলে।"

"হ্যাঁ তা কি যেন বলছিল, যেদিন তোমার পরিবারের মুখ দেখি, সেদিন কি হয়?"

"সেদিন ভগমান কিছু না কিছু জুটিয়ে দেবেনই দেবেন।"

"ছেলের বোগুলোও হয়েছে তেমনি, খালি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। এই তো সেদিন দু টাকার খরবুজ ধার করে খেলো। তা ধার যে আবার শুধতে হবে সে খেয়াল পয্যন্ত নেই।"

"আরে তা না হলে ভোলা কেঁদে মরবে কেন?"

গোবর এসে বলে, "ভোলাকাকা এসে গেচে। ঘরে মণ দুয়েক ভুষি আচে দিয়ে দাও তারপর সম্বন্ধ খুঁজতে বেরিয়ে পড়ো।"

ধনিয়া বোঝায়, "লোকটা দোরে দাঁড়িয়ে আচে। কোতায় তাকে খাট-পাট পেতে বসতে দিবি তা নয়, উপরন্তু ঘ্যান-ঘ্যান করচিস। একটু সভ্য-ভব্য হবি তো। যা, কলসী করে একটু জল ভরে দে। বেচারা হাত-মুখ ধুয়ে নিলে একটু শরবৎ দে। বিপদে পড়েই না লোকে অন্যের কাছে হাত পাতে।"

হরি বলে, "আবার সরবৎ কেন? কোন কুটুম এসেছে নাকি?"

ধনিয়া চটে ওঠে, "কুটুম আবার কি করে হয়? রোজ তো তোমার দরজায় আসে না। এত দূর থেকে রোদে পুড়ে মানুষটা এলো, তেষ্টা পাবে না? রুপিয়া দ্যাখ্ তো কোটোয় তামাক আছে কিনা, গোবরের জ্বালায় কি আর আচে। ছুটে গিয়ে মুদির দোকান থেকে এক পয়সার তামাক নিয়ে আয় তো!"

ভোলা আজ যেমন খাতিরযত্ন পেলো তেমনটি আর কোনদিন পায়নি। গোবর খাট পেতে দিল, সোনা সরবৎ নিয়ে এলো, রুপা তামাক সেজে আনলো, ধনিয়া দরজার আড়ালে উৎকর্ণ হয়ে নিজের কানে নিজের প্রশংসা শোনার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলো। ভোলা হুঁকো হাতে নিয়ে বললে,

"ঘরের গিন্নী যদি ভালো হয় তাহলে ধরে নাও ঘরে লক্ষ্মী এসে গেচে। সেই জানে ছোট-বড়ো সকলের কি করে আদরযত্ন করতে হয়।"

ধনিয়ার হৃদয় উল্লাসে কাঁপতে থাকে। চিন্তা হতাশা আর অভাবের তাড়নায় তার আহত মনটি এসব কথার কোমল-শীতল স্পর্শে যেন জুড়িয়ে গেল।

হরি ভোলার টুকরিটা নিয়ে ঘর থেকে ভুষি আনতে গেলে ধনিয়াও পিছু পিছু আসে। হরি বলে, "কে জানে কোথেকে এত বড়ো টুকরি এনেচে। কোন ধান-চালওলার কাচ থেকে চেয়ে এনেচে বোধহয়। বাপ্‌বাঃ, একমণের কম ধরবে না। দু টুকরি দিলেই দু মণ বেরিয়ে যাবে।"

উল্লাসে ধনিয়ার মনটা ভরে উঠেছিল। সে স্বামীকে ভর্ৎসনা করে বলল, "দেখো, কাউকে নেমন্তন্ন করতে না চাও কোরো না কিন্তু করলে ভরপেট খাওয়াতে হয়। তোমার কাছে কি ফুলপাতা নিতে এসেচে যে চ্যাঙাড়ি নিয়ে আসবে। দিচ্চোই যখন তিন টুকরি দাও। ভালোমানষের পো, ছেলেদের কেন আনোনি? একলা কত বইবে জান বেরিয়ে যাবে যে।"

"তিন টুকরি আমি দিতে পারবো না।"

"তবে কি এক টুকরি দিয়ে পাশ কাটাবে? গোবরকে বলো এক টুকরি নিয়ে সঙ্গে যাক।"

"গোবর আখ রুইতে যাচ্ছে।"

"একদিন না রুইলে আখ শুকিয়ে যাবে না।"

"ওরই উচিত ছিল কাউকে নিয়ে আসা। ভগমান দু-দুটো জোয়ান বাটা দিয়েছেন।"

"হয়তো ঘরে নেই, দুধ নিয়ে বাজারে গেছে।"

"এ তো ঝকমারী হলো। নিজের জিনিষও দোব, আবার ঘরে পেঁচিও দোব। সেই বলে না, "লাদ দে, লদা দে, লাদনেওয়ালা সাথ কর্ দে।"*

"আচ্ছা আচ্ছা, কাউকে যেতে হবে না। আমিই পেঁাছে দোব। বড়ো-দের সেবা করতে লজ্জা নেই।"

"তিন টুকরি দিলে নিজেদের হেলে গরুগুলো কি খাবে?"

"এসব কথা নেমন্তন্ন করার আগে ভাবা উচিত ছিল। না হয়, তুমি আর গোবর দুজনে যাও।"

"দয়াধম্ম করারও একটা সীমা আছে। নিজের ঘর উজোড় করে কেউ দিয়ে আসে না।"

"এক্ষুণি জমিদারের প্যায়দা এসে বললে তো তুমিই ছেলেমেয়ে গুষ্টি-শুদ্ধু সকলে ভুষি মাথায় করে নে যাবে। চাইলে সেখানে দু মণ কাঠও চিরে দে আসবে।"

"জমিদারের কতা আলাদা।"

"হ্যাঁ, সে যে লাঠির জোরে কাজ আদায় করে।"

* "ভরে দাও, ভরিয়ে দ্যাও, আবার ভর্ত্তি করার লোক সঙ্গে দাও"

"ওদের ক্ষেত চষি যে।"

"ক্ষেত চষার জন্যে খাজনা দিইনে ?"

"আচ্ছা ভাই, আর মাথা খাস না। আমরা দুজনেই যাবো। কি কুক্ষণেই না ওকে ভুষি দোব বলেচি। আর তুইও তেমনি, এমনিতে চলবি না, আবার যদি চলতে শুরু করিস তাহলে দৌড়ুবি।"

তিন টুকরি ভুষি ভরা হলো। গোবর গজগজ করছিল। বাপের কাজ-কর্মের ওপর তার একটুও বিশ্বাস নেই। সে ভাবে হরি যেখানেই যাবে কিছু না কিছু খুইয়ে আসবে। ধনিয়া বেশ খুশি আর হরি ধর্ম ও স্বার্থ দুই কূলের কোন কূল বজায় রাখবে ভাবছিল।

হরি আর গোবর দুজনে মিলে একটা টুকরি বাইরে আনতেই ভোলা চট করে নিজের গামছাটাকে বিঁড়ে বানিয়ে মাথার ওপর রাখতে রাখতে বলে, আমি এটা রেখে এখুনি দৌড়ে আসচি। আর এক টুকরি নোব।"

হরি বলে, "একটা নয় আরো দু টুকরি ধরা আচে। তোমায় আসতে হবে না। আমি আর গোবর এক এক টুকরি নে তোমার সংগে যাবোখন।"

ভোলা স্তম্ভিত হয়ে গেল। মনে হলো হরি তার নিজের ভাই কিংবা তার চেয়েও বেশি। অপারিসীম তৃপ্তি যেন তার রুক্ষ্ম তপ্ত জীবনটাকে নিমিষে হরিৎ করে দিল।

তিনজনে ভুষি নিয়ে যেতে যেতে অনেক কথা বলে। ভোলা প্রশ্ন করে, "দশহরা তো এসে গেল, এবার বাবুদের দেউড়িতে খুব ধুমধাম হবে শুনচি।"

"হ্যাঁ, তাঁবু সামিয়ানা পড়েচে। এবারে রামলীলায় আমিও থাকবো। রায়সাহেব বললেন তোকে রাজা জনকের মালী সাজতে হবে।"

"বাবু তোমার ওপর খুব খুশি, না ?"

"তাঁর দয়া।"

একটু পরে ভোলা বলে, "পুণ্যাহের টাকা জোগাড় হলো ? মালী সাজলে তো আর গলা বাঁচবে না।"

হরি মুখের ঘাম মুছে বলে, "সেই চিন্তাই তো মেরে ফেলেচে রে দাদা, ফসল তো সব খামারে উঠে গেল। জমিদার নিজেরটা নিল, মহাজন বাকীটা নিল। আমার জন্যে মোটে পাঁচ সের বাঁচলো। এই ভুষি আমি রাতারাতি বয়ে এনে লুকিয়ে ফেলেছিলুম নইলে কুটোটিও বাঁচতো না। জমিদার তো একটাই আচে কিন্তু মহাজন আচে তিনজন। মুদীবৌ, মগরুশাহ আর দাতা-দীন পন্ডিত। কারুর সুদই পুরো শোধ করতে পারলুম না। জমিদারেরও অদ্দেক টাকা বাকী। মুদীবৌয়ের কাছে আবার ধার নিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে। সবরকম ফন্দিফিকির খাটিয়ে দেখেচি রে ভাই, কিছুতেই কিছু হয় না। আমাদের জন্মই হয়েছে নিজের রক্ত জল করে বড়লোকদের ঘর ভর্তি করার জন্যে। আসলের দুগুণ সুদ গুনেচি তবু আসলের বোজা যেমন কে তেমন মাথার ওপর রয়েছে। লোকে বলে সময় অসময় পালা পাব্বনে

হাত গ‍ুটিয়ে খরচা কর। মোদ্দা রাস্তা কেউ দেখাতে পারে না। রায়সাহেব ছেলের বেতে বিশ হাজার টাকা খরচা করলেন। কেউ কিছ‍ু বললে না! মগর‍ু বাপের ছেরাদ্দে পাঁচ হাজার টাকা ওড়ালে, কেউ জিজ্ঞেস করলে না। মনে হইত তো সকলেরি আছে।"

ভোলা কর‍ুণ স‍ুরে বলে, "বড়োমান‍ুষের সমান তুমি কি করে হবে ভাই?"

"আমরাও তো মান‍ুষ।"

"কে বললে আমরা মান‍ুষ। মান‍ুষের কি আচে আমাদের কাচে। যার টাকা আচে, জোর আচে, বিদ্যে আচে সেই মান‍ুষ। আমরা হল‍ুম হেলে গর‍ু যাতে ইচ্ছে জ‍ুতে দাও। তার ওপর আমরা নিজেদের মধ্যেও মিলেজ‍ুলে থাকি না। সংসার থেকে যেন স‍ুখ শান্তি সব উপে গেচে।"

ব‍ুড়োদের কাছে অতীতের স‍ুখ, বর্তমানের দ‍ুঃখ আর ভবিষ্যতের আশঙ্কার চেয়ে ম‍ুখরোচক গল্প আর নেই। দ‍ুই বন্ধ‍ু নিজের নিজের দ‍ুঃখের কথা বলে। ভোলা নিজের ছেলেদের কীর্তিকলাপ আর হরি নিজের ভাইদের কুব্যবহারের কাহিনী ব্যক্ত করে। একটা কুয়োর ধারে বোঝা নামিয়ে একট‍ু জিরোয়। গোবর বেনের কাছ থেকে ঘটি চেয়ে এনে জল তোলে, সবাই তৃষ্ণা মেটায়।

ভোলা সমবেদনার স‍ুরে বলে, "ভেন্ন হবার সময় তো তোমার খ‍ুব কষ্ট হয়েচে। ভাইদের ছেলের মতো মান‍ুষ করেছিলে।"

হরি আর্দ্রকণ্ঠে বলে, "ও কথা আর জিজ্ঞেস কোরো না দাদা, তখন মনে হচ্ছিল কোথাও গে ড‍ুবে মরি। আমি বেঁচে থাকতেই এ সব হলো। যাদের জন্যে জোয়ান বয়েসটা ধ‍ুলোয় মিশিয়ে দিল‍ুম তারাই শত্ত‍ুর হয়ে গেল। আর ঝগড়ার কারণ কি, না আমার পরিবার ক্ষেতে কাজ করতে যায় না কেন? বোজো, ঘর দেখবার জন্যেও তো একটা লোক চাই, না কি? দেওয়া-থোয়া রাখা-ঢাকার কাজই বা কে করে বলো দিকি? আর ও তো বসে থাকতো না, ঝাঁটপাট দেওয়া, রান্নাবান্না, ঘর ধোওয়া, বাসন মাজা, ছেলেপিলে সামলানো কি কম কাজ? শোভার বৌ ঘর সামাল দিতে পারতো না হীরের বৌ পারতো। যখন থেকে ভেন্ন হয়েছে তখন থেকে দ‍ু বাড়িতেই এক বেলা করে র‍ুটি হয়। আর আগে সবার দিনে চারবার করে খিদে পেতো। এখন চারবার খাক তো দেকি। একত্তরে থাকার সময় গোবরের মার যে দ‍ুর্দশা গেছে, সে আমি জানি। বেচারী ছোট জায়েদের ছেঁড়াফাটা শাড়ি পরে আধপেটা খেয়ে কাটাতো তব‍ু জায়েদের ম‍ুখে জলখাবার জ‍ুগিয়ে যেত। গায়ে গয়নার নামে একটি স‍ুতোও নেই তব‍ু জায়েদের দ‍ু একখানা করে র‍ুপোর গয়না গড়িয়ে দিয়েচে। তারা জবলে মরতো আমি বাড়ির কত্তা বলে। ভালই হয়েচে ভেন্ন হয়ে আমার মাথার বোঝা নেমে গেচে।"

ভোলা এক ঘটি জল খেয়ে বলল, "আরে ভাই, সব ঘরেই এই হাল। ভাইদের কথা বলচো কি আমার নিজের ছেলেদের সঙ্গেই বনে না, আর বনে

না আমি কারুর কুচাল দেকতে পারিনে বলে। তুমি জুয়ো খেলবে, চরস খাবে, গাঁজা টানবে কিন্তু এসব আসবে কার ট্যাঁক থেকে। খরচা করবে তো রোজগার করো। তার বেলা নেই। আছে শুধু খরচের বেলায়। বড়ো ছেলে কামতাটা জিনিষ নে বাজারে যাবে তা আদ্দেক পয়সা ফেরৎ দেবে না। জিজ্ঞেস করলে, জবাব নেই। ছোট জঙ্গীটা আরো ত্যাঁদড়, গানের দলে ভিড়ে বসে আছে। সন্ধ্যে হলো তো ঢোল বাঁশি নিয়ে বসে গেল। এসব খারাপ বলচি নে অবসর সময়ে করো, তা না, ঘরের কাজ করবে না আট পহর ঐখেনে পড়ে থাকবে। আমারই মরণ গরুকে খোল-জাব দোব, গরু মোষ দুইব. দুধ নিয়ে বাজারেও যাব। সংসার তো নয়. জঞ্জাল। এ যেন সোনার হেঁসো. ফেলাও যায় না কাজেও লাগে না। একটা মোটে মেয়ে ঝুনিয়া তার কপালপোড়া, তুমি তো তার বে-তে এসেছিলে। কত ভালো ঘর-বর, জামাইয়ের বোম্বাইয়ে দুধের দোকান ছিল। হিন্দু-মোছলমাণ দাঙ্গার সময় খুন হয়ে গেল ছেলেটা। ঘরদোর সব যেন উপে গেল। কোন উপায় নেই দেখে মেয়েটাকে নিয়েলুম। বলচি আবার একটা বে-থা কর্ তাতে রাজী নয়। ঘরে দুটি ভাজ রাতদিন ওকে জ্বালাচ্ছে। মহাভারতের যুদ্ধু লেগেই আচে। বিপদে পড়ে এলো, এখেনেই বা শান্তি কই?"

ভোলার পাড়াটি ছোট হলেও বেশ সরগরম। বেশিরভাগ গয়লার এখানেই বাস। চাষীদের তুলনায় এদের অবস্থা এমন কিছু খারাপ নয়। ভোলা গ্রামের মোড়ল: দরজার সামনে একটা বড়ো গোছের খাটাল, সেখানে দশ বারোটা গরু-মোষ জাবনা খাচ্ছে। বারান্দায় একটা বড়োসড়ো তক্তপোষ, দশটা লোকেও তুলতে পারবে কিনা সন্দেহ। খুঁটিগুলোর কোনটায় ঢোল কোনটায় কর্ত্তাল বাঁধা রয়েছে। একটা কুলুঙ্গীতে বস্তাবন্দী কটা বই, বোধহয় রামায়ণ। বোদুটি সামনে বসে ঘুঁটে দিচ্ছিল, ঝুনিয়া চৌকাঠে দাঁড়িয়ে, তার চোখ লাল, নাকের কাছটাও লাল, মনে হচ্ছিল সবে কেঁদে উঠেছে। তার সুগঠিত দেহে যৌবনের উত্তাল তরঙ্গ। মুখটা গোলগাল, চোখ দুটো ঈষৎ ছোট আর একটু চাপা হলেও তীক্ষ্ন। শরীরের চড়াই-উৎরাই চোখ টানে তার ওপর গোলাপী ছাপা শাড়িতে তাকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে।

ভোলাকে দেখেই সে দৌড়ে এসে তার মাথা থেকে বোঝা নামায়। ভোলা গোবর আর হরির মাথা থেকে টুকরি নামাতে নামাতে ঝুনিয়াকে বলল, "যা, এক ছিলিম তামাক নে আয়। তারপর জলখাবারের ব্যবস্থা কর। হরি মাহাতোকে চিনিস তো।" আবার হরির দিকে তাকিয়ে বলে, "ঘরনী বিনে ঘর থাকে নারে ভাই!" সেই পুরনো বচন আছে না, "নাটন খেতী বহুরিয়ন ঘর।"* যবে থেকে এর মা মরেচে তবে থেকে ঘরের শোভা গেচে। বৌরা

* নাটন খেতী বহুরিয়ন ঘর=বেঁড়ে বলদের ক্ষেত চষা ও ছেলেবৌয়ের ঘরকন্না দুই-ই জঘন্য

মোটা কাজগুলো করে, গেরস্থালীর কি বোজে। হ্যাঁ, মুখ চালাতে খুব জানে বটে। ছোঁড়া দুটো কোতায় জমে গেচে। সব কটা কুঁড়ের বেহদ্দ। গতরখেকো। মেয়েটাও হয়েচে তেমনি। ছোট্ট একটা কাজ করলেও হাজারবার ঘ্যান ঘ্যান করবে। আমি বাপ বলে শুনি, বে দিলে বর শুনবে কেন ?”

ঝুনিয়া এক হাতে হুঁকো আর এক হাতে এক ঘটি সরবৎ নিয়ে হাসিমুখে এসে হাজির হয়। তারপর দড়ি-কলসী নিয়ে জল তুলতে গেল। গোবর এবার একটু লজ্জা পেয়ে তার হাত থেকে কলসীটা নেবার জন্যে হাত বাড়ায়, “তুমি ছেড়ে দাও, আমি ভরে নিচ্চি।”

ঝুনিয়া কলসী দিল না। কুয়োর পাড়ে গিয়ে মুচ্‌কি হেসে বলে, “তুমি যে আমার অতিথ গো। বলবে, এক ঘটি জলও তুলে দেয়নি।”

“অতিথ হতে যাবো কেন, আমরা তো তোমাদের পড়শী।”

“সারা বছরে যে পড়শীর একবারও দেখা মেলে না তাকে অতিথ বলবো নাতো কি ?”

“রোজ রোজ এলে খাতির থাকে না যে।”

ঝুনিয়া মুচকি হেসে চোখ ঠেরে বলে, “সেই খাতিরই তো কচ্চি গো। মাসে একবার এলে সরবৎ করে দোব, পনেরো দিন অন্তর এলে হুঁকো দোব আর সপ্তাহে একদিন এলে বসবার পিঁড়ে পেতে দোব। রোজ এলে কিছুই পাবে না।”

“দর্শন দেবে তো ?”

“দর্শনের জন্যে তপিস্যে করতে হয় গো।” বলতে বলতে ঝুনিয়ার মুখে উদাস ছায়া নেমে এলো। তার মনে পড়ে গেল সে বিধবা। তাই সে নিজের মনের দুয়ার বন্ধ করে রাখে। কখনো কখনো শূন্যতার জ্বালায় অধীর হয়ে বন্ধদুয়ার নিজেই খোলে আর কাউকে আসতে দেখলেই সভয়ে বন্ধ করে দেয়।

গোবর তার হাত থেকে কলসীটা নিয়ে জল ভরে নিয়ে আসে। সরবৎ আর এক ছিলিম তামাক খেয়ে হরি আর গোবর এক সময় বাড়ি ফেরে। ভোলা বলে, “কাল এসে গরুটা নে যেও গোবর। এখন জাবনা যাচ্চে তো।”

গোবর গরুটিকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেল। এত সুন্দর গরু! এ যে তার কল্পনার অতীত। হরি লোভ সামলে বলে, “এত ব্যস্ত কেন ? সময় মতো নে যাবোখন।”

“তোমার তাড়া না থাক আমার আচে। গরুটা দোরের কাচে বাঁধা থাকলে ওই কতাটা তোমার মনে পড়ে যাবে।”

“সে আমার মনে আচে, আমি তাকে তাকে রইলুম।”

“তাহলে কাল গোবরকে পাঠিয়ে দিও।”

দুজনে টুকরি হাতে ঘরের পথ ধরে। মন খুশিতে ভরপুর। হরির

মনে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের আনন্দ, গরুটা পেয়ে গেছে বিনা পয়সায়। গোবর আরো বহুমূল্য বস্তু পেয়েছিল। তার মনে যৌবন বাসনা জেগে উঠেছে। একবার সে পেছন ফেরে। দেখে ঝুনিয়া দোর ধরে দাঁড়িয়ে আছে—মূর্তিমতী আশার মতো মত্ত অধীর, চঞ্চল।

৪

রাতে হরির ঘুম এলো না। নিমগাছের নীচে খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে বার-বার তারা গুনলো। সে ভাবে 'গরুর জন্যে আর একটা নাদা বসাতে হবে। হেলে গরুগুলোর কাছে নয়। এখন তো বাইরেই থাকবে কিন্তু চার মাসের মাথায় সরাতে হবে। সে সময় বাইরে থাকলে লোকে নজর দেয়। কখনও কখনও এমন তুকতাক করে যে পালানে দুধ শুকিয়ে যায়, বাঁটে হাত দিতে দেয় না, লাথি মারে। নাঃ, বাইরে বাঁধা ঠিক হবে না। আর বাইরে তাকে নাদা পুঁততে কেই বা দেবে? গোমস্তা ঘুষ না পেলে মুখ ভার করবে। ছোট ছোট কথা নিয়ে রায়সাহেবের কাছে আর্জি করাও ঠিক নয়। আর গোমস্তার বদলে আমার কথা শুনবে কে? ওঁকে কিছু বললে গোমস্তা শত্রু হয়ে যাবে। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা বোকামি। ঘরেই বাঁধবো, উঠোনটা ছোট বটে তবে একটা চালা তুলে দিলেই চলব। এই তো পয়লা বিয়েন। কম করেও সের পাঁচেক দুধ দেবে। এক সের তো গোবরেরই চাই, রুপিয়াটা দুধের জন্যে বায়না করে, এখন যত খুশি খাক। মাঝে মাঝে দু চার সের বাবুকে দে আসবোখন। গোমস্তাকে খুশি রাখতে হবে। ভোলার টাকাটাও দিতে হবে।' বে দেবার মিথ্যে আশায় কত আর ঘোরাবো? বেচারা! যে লোকটা আমাকে এত বিশ্বেস করেচে তাকে দাগা দিলে পাপ হয়। আশী টাকার গরুটা আমাকে শুধু বিশ্বেস করে দিয়ে দিল? এখেনে তো কেউ একটা পয়সাও দেয় না। কোনরকমে পঁচিশটা টাকা দিলেও ভোলার বিশ্বাস হবে। ধনিয়াকে না বললেই হতো। চুপি চুপি গরুটা এনে বেঁধে দিলে চমক উঠতো। জিজ্ঞেস করতো, 'কার গরু, কোত্থেকে নিয়েলে গো?' খুব জ্বালালে তখন বলতুম। কিন্তু পেটে কথা থাকলে তো!' কখনো দু চার পয়সা উপরি হাতে এলেও ওকে লুকোতে পারি না। এক হিসেবে ভালোই। বেচারী ঘরের জন্যে ভেবে মরে। আমার কাছেও পয়সা আচে জানলে ঝগড়া করতে বসবে। গোবরটা একটু কুঁড়ে নয়তো আমি গোসেবা কাকে বলে দেখিয়ে দিতুম। নাঃ, কুঁড়েটুঁড়ে কিছু নয়। এই বয়সে কে না কুঁড়ে হয়? বাপ বেঁচে থাকতে আমিও খাটবার ভয়ে ছুতো করে পড়ে থাকতুম। মা-বাপ থাকতে ছেলেপুলেরা একটু আয়েসী হবে না তো হবে কখন? যখন ঘাড়ে সংসার পড়বে তখন? বাপ মরতে আমিই কি ঘর সামলাইনি? সারা গাঁয়ের লোক ভেবেছিল হরির হাতে পড়ে সংসারটা ভেসে যাবে। কিন্তু আমি এমন বদলে গেলুম যে লোকে হাঁ হয়ে গেল। শোভা

আর হীরা ভেন্ন না হয়ে গেলে আজ এ বাড়ির চেহারাই বদলে যেত। তিনটে হাল এক সংগে চলতো। আজ সব আলাদা। কপালের ফের আর কী! ধনিয়ার আর দোস কি? বেচারী ঘরে এসে অব্দি আরাম পায়নি। ডুলী থেকে নেমেই সংসার ঘাড়ে নিয়েছে। মায়ের পান থেকে চুণ খসতে দিত না। সংসারের জন্যে মুখে রক্ত তুলে খাটতো। সে জায়েদের একটু কাজ করতে বললেই দোষ! তারও তো একটু আরাম দরকার। কিন্তু ভাগ্যে সুখ থাকলে তো! তখন দেওরদের জন্যে খেটে মরতো এখন নিজের ছেলেমেয়ের জন্যে মরে। ধনিয়া এত ভালোমানুষ না হলে শোভা আর হীরেকে গোঁফে তা দিয়ে বেড়াতে হতো না। মানুষ কত স্বার্থপর হয়, যার জন্যে খেটে মরি সেই শত্তুর হয়!'

হরি আবার পূব আকাশের দিকে চাইলে। বোধহয় ভোর হয়ে আসছে। গোবর কি জেগেছে? বলেছিল 'আঁধার থাকতেই চলে যাবো।' উঠে নাদাটা পুঁতবো. নাঃ থাক. গরু যতক্ষণ না আসচে নাদা পোঁতা ঠিক নয়। যদি ভোলার মত বদলায় কিংবা অন্য কোন কারণে যদি গরু না দেয় তাহলে সারা গাঁয়ের লোক হাততালি দেবে। ভোলা বাড়ির মালিক বটে তবে ছেলেরা সেয়ানা হলে সব সময় বাপের কথা খাটে না। কামতা আর জংগী যদি বিগড়ে বসে, ভোলা কি গরুটা দেবে? কক্‌খনো না।

হঠাৎ গোবর চমকে উঠে বসে। দু হাতে চোখ রগড়ে বলে, "আরে এ যে ভোর হয়ে গেল। বাবা তুমি নাদাটা পুঁতেচো?"

হরি গোবরের সুগঠিত দেহ আর বুকের চওড়া ছাতিটা দেখে ভাবলো, যদি একটু দুধ পেতো তাহলে পালোয়ান হয়ে উঠতো। বলে, "না এখনো পুঁতিনি। ভাবচি যদি গরু না মেলে, নাহক বোকা বনি কেন?" গোবর রেগে ওঠে. "পাবো না কেন?"

"যদি ভোলার মন বদলায়, ধন্দ লাগে?"

"মনে যাই হোক গরু ওকে দিতেই হবে।" একথা বলে গোবর লাঠি কাঁধে নিয়ে হাটতে শুরু করে। তাকে যেতে দেখে হরি মনটাকে ঠাণ্ডা করলো। এবার ছেলের বে দিতেই হবে। সতেরো বছর বয়স হয়ে গেল। কিন্তু কি করে কি হবে? পয়সার দেখা মেলে না। যখন থেকে তিন ভাই ভিন্ন হয়েচে তখন থেকে ঘরের শ্রী নেই। মাহাতোরা ছেলে দেখতে আসে. ঘরের দশা দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। দু তিনজন রাজী হয় তো টাকা চায়। দু তিনশো টাকা কন্যাপণ দিতে হবে আরো অতগুলি টাকা এদিক ওদিক খরচ করলে তবে বে হবে। কোত্থেকে আসবে এত টাকা? সারা বছর খাবার জোটে না বে হবে কি করে? এখন তো সোনাও বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠলো। ছেলের বে হোক না হোক মেয়ের বে দিতে না পারলে যে জ্ঞাতগুষ্ঠি হাসবে। আগে ওর বের জোগাড় করতে হবে তারপর যা হয় দেখা যাবে।

একটা লোক সামনে এসে বলল, "রাম রাম মাহাতো! তোমার বাড়ি

থেকে কিছু বাঁশ মিলবে?" হরি দেখলে দমড়ী বাঁশোর* তার সামনে দাঁড়িয়ে। কালো, বেঁটে, মোটা, চওড়া মুখ, বড় গোঁফ, লাল চোখ—কোমরে বাঁশ কাটবার কাটারি গোঁজা রয়েছে। দমড়ী বছরে দু একবার আসে। চিক, বেড়া, মোড়া, ঝুড়ি ইত্যাদি বোনবার জন্যে বাঁশ কিনে নিয়ে যায়।

হরি খুশি হলো, আমদানীর আশা আচে। দমড়ীকে নিয়ে গিয়ে তিনটি বাঁশঝাড় দেখালে। দরদাম করে পঁচিশ টাকা শ' দরে পঞ্চাশটা বাঁশের দাম বায়না নিলো। ফিরে এসে হরি তাকে জলখাবার আর এক ছিলিম তামাক খাইয়ে রহস্যময় ভাবে বলে, "আমার ঝাড়ের বাঁশ আমি তিরিশ টাকার কমে বেচি না, তবে তুমি ঘরের লোক তোমার কতা আলাদা। তোমার সেই ছেলে, যার বে হলো, সে ফিরেচে?"

দমড়ী কল্কেতে লম্বা টান দিয়ে কাসতে কাসতে বলে, "সেই হতভাগাটার জন্যেই তো মরে গেলুম মাহাতো। জোয়ান বৌটাকে ঘরে ফেলে ছোঁড়া পড়শীর একটা মেয়েকে নিয়ে ভিনদেশে মজা লুটতে গেল। বৌটাও আরেকটা লোকের সঙ্গে ভেগে গেল। বড়ো খারাপ জাত গো মাহাতো, ওরা কখনো কারুর আপন হয় না। কত বোজালুম যা ইচ্ছে খা, যা খুশি পর, আমার নাক কাটিস নে, তা কে শুনচে? ভগমান মেয়েমানুষকে যা খুশি দিতে চান দিন ক্ষতি নেই শুধু রূপ যেন না দ্যান। রূপ থাকলে তাদের কাবু করা যায় না। কে জানে হয়তো কোন্ বেশ্যাবাড়িতে গিয়ে উঠেচে।"

হরি আকাশের দিকে তাকিয়ে উদাস সুরে বলল, "সব কিছু ভাগ হয়ে গেল চৌধুরী! যাদের ছেলের মতো পেলে-পুষে বড়ো করলুম তারা আজ ভাগীদার হয়ে গেচে। কিন্তু ভায়ের ভাগের টাকা খাওয়ার শখ আমার নেই। এদিকে তোমার কাচে টাকা পাবো, ওদিকে দুভাইকে সমান ভাগে ভাগ করে দোব। চারদিনের জীবনের আর ছলচাতুরি করে কি হবে? নয়তো যদি বলি কুড়ি টাকা শ-দরে বাঁশগুলো বেচেচি, ওরা কি বুঝতে পারবে? না, তুমিই ওদের বলতে যাবে। তোমাকে তো আমি সব সময় নিজের ভাই মনে করি।"

ভাই কথাটা আমরা স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কত ভাবেই না অপপ্রয়োগ করি। কিন্তু এই শব্দটির পবিত্র ব্যঞ্জনা আমাদের ছিটোনো কালিতে কখনই মলিন হয় না। হরি পরোক্ষভাবে প্রস্তাবটা করে বুঝতে চাইল দমড়ী আসল কথাটা বুঝেছে কি না। তার মুখেচোখে একটা ছদ্মবিনয়ের ভাব ফুটে উঠলো।

দমড়ী সুযোগ পেয়ে বলে, "সে কতা আর বলতে। তোমার আমার সম্বন্ধ তো ভাইয়ের মতো। এখন কথা হচ্চে এই যে, মানুষ ধম্ম বেচে কোন কিছুর লোভে। বিশ টাকা কেন, বলবোখন পনেরো টাকা। কিন্তু তোমাকে বিশ টাকা দরে দিতে হবে।"

* বাঁশোর=ডোম

হীরা খেঁকিয়ে ওঠে, "তুমি তো সব্বোনেশে কথা বলচো. বিশ টাকায় এমন বাঁশ পাওয়া যায়?"

"এমন বাঁশ কি? এর চেয়ে ভালো বাঁশ দশ টাকায় বিকোচ্চে। আরো দশ কোশ পশ্চিম দিকে যাওনা তাহলেই পাবে। দামটা বাঁশের জন্যে নয়, শহরের কাছে বলে দিচ্চি।"

দরদাম ঠিক হয়ে গেল। দমড়ী মেরজাইটা খুলে রেখে বাঁশ কাটতে শুরু করলে। আখের ক্ষেতে সেচের কাজ চলছে। হীরার বৌ জলখাবার নিয়ে কুঁয়োর দিকে যেতে যেতে দমড়ীকে বাঁশ কাটতে দেখে ঘোমটার আড়াল থেকেই বলে, "কে বাঁশ কাটচে রে? এ ঝাড়ের বাঁশ কাটা চলবে না।"

দমড়ী হাত থামিয়ে বলে, "কাটা চলবে না কি? বাঁশ কিনে নিয়েচি, পনেরো টাকা শ দরে বায়না হয়েছে। মাগনা কাটচি নাকি?"

হীরার বৌ তার একলা ঘরে গিন্নী। তারই ঝগড়ার দাপটে ভাইয়েরা ভিন্ন হয়েছে। ধনিয়াকে হারিয়ে সে যেন বাঘিনী হয়ে উঠেছে। শুধু হীরা মাঝে মাঝে তাকে মারে। এই তো সেদিন এত মেরেছিল যে, সে কয়েকদিন খাট থেকে উঠতেই পারেনি। কিন্তু নিজের অধিকার সে কোন-ভাবেই ছাড়তে রাজী নয়। হীরা রেগেমেগে মারে বটে আবার তার ইশারা-তেই চলে অবাধ্য টাট্টু যেমন মালিককে পিঠে নিয়ে বেড়ায় অথচ সুযোগ পেলেই চাঁট মারে ঠিক তেমনি।

জলখাবারের চুবড়ি মাথা থেকে নামিয়ে হীরার বৌ বলল, "পনেরো টাকায় আমার বাঁশ আমি বেচবো না।"

দমড়ী মেয়েছেলের সঙ্গে কথা বাড়াতে ভালোবাসে না। বলে, "ঘরে গে তোমার মরদকে* পাঠিয়ে দাও গে। যা বলার সেই এসে বলুক।"

হীরার বৌয়ের নাম পুন্নি। মোটে দুটো বাচ্চা, তবু শরীরে যৌবনের বাঁধুনি নেই। তাই সেজেগুজে বয়সটা লুকোয়। কিন্তু যেখানে খাবারই জোটে না সেখানে সাজগোজের কথাই বাহুল্য। নিরুপায় অভাব তাকে আরো উগ্র করে তুলেছে। সে কাছে এসে দমড়ীর হাত ধরে ফেলার চেষ্টা করে বলে "ঘরের লোককে পাঠাতে যাবো কেন? যা বলার আমাকে বলো না। আমি বলে দিয়েচি, আমাদের বাঁশ কাটবে না।"

দমড়ী এক একবার হাত ছাড়িয়ে নেয় পুন্নি আবার ধরে ফেলে। কিছুক্ষণ ধরপাকড় হবার পর দমড়ী একটু জোরে ধাক্কা দিলে পুন্নি চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। কিন্তু সামলে নিয়ে উঠেই পা থেকে ছেঁড়া চটি খুলে দমড়ীকে এলোপাথাড়ি মারতে লাগলো। ডোম হয়ে তাকে ঠেলে ফেলে দিল. এত বড়ো অপমান! মারার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে কাঁদতে শুরু করে দেয়। দমড়ী তাকে ধাক্কা দিয়ে—বিশেষতঃ মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলে একটু

* মরদ=স্বামী

অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাওয়া ছাড়া তার কোন উপায় ছিল না।

পুন্নির কান্না শুনে হরি দৌড়ে এলো। তাকে দেখে পুন্নির কান্নাও বেড়ে যায়। হরি ভাবলে, দমড়ী নিশ্চয় পুনিয়াকে মেরেছে! তার মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। ভাগ সীমানার উঁচু বেড়া ভেঙে ছুটে টসে দমড়ীকে এক লাথি মেরে বললে, "যদি নিজের ভালো চাও চৌধুরী তবে কেটে পড়ো, নয়তো এখান থেকে তোমার লাস উঠবে। তুমি নিজেকে কি ভেবেচো বলো তো! এ্যাঁ, তোমার এত বড়ো আস্পদ্দা যে আমাদের ঘরের বৌয়ের গায়ে হাত তোলো?"

দমড়ী দিব্যি গেলে নিজের সাফাই গায়। তার অপরাধী মন জুতোটা নীরবে সয়েছিল কিন্তু বিনা দোষে পিঠে লাথি পড়তে তার ফোলা ফোলা গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়লো। সেতো বৌকে ছোঁয়নি। সে কি এত বোকা যে মাহাতোদের বৌয়ের গায়ে হাত দেবে।

হরি অবিশ্বাসের সুরে বলল, "আমার চোকে ধুলো দেবার চেষ্টা কোরো না চৌধুরী, তুমি কিছু না বললে বৌ কি শুধুমুদু কাঁদছে? টাকার গুমোর হয়েছে না? গরম বার করে দোব। ভেন্ন থাকলেও আমরা কি আলাদা? মন্দ চোকে তাকালে চোক উবড়ে নোব।"

পুন্নি একেবারে রণচণ্ডী হয়ে আছে, গলা ফাটিয়ে চেঁচায়, "তুই আমায় ঠেলে ফেলে দিসনি? বল্, নিজের ব্যাটার মাথার দিব্যি দিয়ে বল্।"

হীরা খবর পায় পুনিয়ার সঙ্গে দমড়ীর ঝগড়া চলছে। দমড়ী পুনিয়াকে ঠ্যালা মেরেছে আর পুনিয়া তাকে জুতো পেটা করেছে। সে সব কিছু ফেলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। তার রাগ গ্রামের সবাই চেনে। বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, চোখ দুটো কড়ির মতো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। রাগে ঘাড়ের শিরাও ফুলে উঠেছে। তার রাগ পুনিয়ার ওপর। সে কেন দমড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করে তার মানইজ্জত মাটিতে মিশিয়ে দিল। ডোমের সঙ্গে লড়াই-ঝড়া করার দরকারই বা কি? তার উচিত ছিল হীরাকে খবর দেওয়া। হীরা যা ভালো বুঝতো, করতো। সে নিজে কেন ঝগড়া করতে গেল? পুনিয়াকে গুরুজনদের সঙ্গে তর্ক করতে দেখলেই তার রাগ হয়। নিজে রাগী বলেই বোধহয় হীরা পুনিয়াকে শান্তশিষ্ট দেখতে চাইতো। তাছাড়া, দাদা যখন দরদাম ঠিক করেছে তখন এর ভেতরে পুনিয়ার নাক গলানোর দরকারই-বা কি?

হীরা এসেই পুনিয়ার হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে লাথি মেরে বলে, "হারামজাদী, তোর জন্যে আমার মাথা কাটা যাচ্চে। তুই যত ছোটলোকদের সঙ্গে ঝগড়া করে আমাদের মাথা হেঁট করিচিস কি না বল।" আরো একটা লাথি মেরে গরজায়, "আমি বলে ওখেনে জলখাবারের জন্যে হাপিত্যেস করে

পথ চেয়ে রইচি আর তুই এখেনে ঝগড়া কচ্চিস। নিলজ্জ বেহায়া! চোখের জল বেরুলেই হলো। চল্ আজ তোকে মাটিতে পুঁতে তবে ছাড়বো।"

পুনিয়া হায় হায় করে স্বামীকে খুঁড়তে থাকে, "তোর যক্ষা হোক ওলাউঠো হোক। তুই মর্। মা শেতলা তোকে নিক। তোর ইনফ্লুএন্জা হোক। ভগমান করুন তোর যেন কুঠ হয়, হাত পা গলে পচে খসে খসে পড়ুক।"

হীরা অন্যান্য গালাগালি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল কিন্তু শেষের কথাটা সহ্য করতে পারলো না। ওলাউঠা মায়ের দয়ায় মরতে কষ্ট হয় না। ব্যামোয় পড়লো আর মরলো কিন্তু কুঠ! এত ঘৃণ্য মৃত্যু আর ততোধিক ঘৃণ্য জীবন আর নেই! তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে দাঁতে দাঁত ঘষে সে পুনিয়ার ঝুঁটি ধরে মুখটা মাটিতে রগড়ে দিয়ে বলে, "হাত পা খসে খসে পড়বে আর আমি তোকে মাথায় করে নাচবো। তুই আমার ছেলেপুলেকে মানুষ করবি? এত বড়ো সংসার চালাবি কেমন! তুই তো আরেকটা ভাতার খুঁজতে বেরুবি।"

পুনিয়ার দুর্গতি দেখে দমড়ীরও দয়া হলো। সে উদার হয়ে হীরাকে বোঝায়, "যেতে দাও হীরা মাহাতো, অনেক হয়েছে। বৌ আমাকে মেরেছে তো কি হয়েছে আমি তো ছোট হয়ে যাইনি। ভাগ্য ভালো ভগমান এ দিনটাও দেখালেন।"

হীরা ধমক দেয়, "তুমি চুপ করো চৌধুরী। আমার রাগ চড়ে গেলে আরো খারাপ হবে। মেয়েমানুষ জাতটাই এমনি। বকে মরে। আজ তোমার সঙ্গে ঝগড়া করচে কাল আরেকজনের সঙ্গে করবে। তুমি ভালোমানুষ বলে হেসে উড়িয়ে দিলে। অন্য লোকে তো 'বরদাস্' করবে না। সেও যদি হাত চালায়? তখন লাজলজ্জা কোথায় থাকবে বলো।"

এই ভাবনাই তাকে ক্ষেপিয়ে তোলে। আবার পুনিয়ার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলে হরি দৌড়ে এসে হীরাকে পেছনে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলে "আরে হয়ে তো গেচে আবার কি? দুনিয়ার সবাই দেখেচে তুমি কত বড়ো বাহাদুর। এখন কি ওকে চিবিয়ে খাবে নাকি"

হীরা সাদাসিধে মানুষ, বড়ো ভাইকে খাতির করে। ইচ্ছে করলে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিতে পারতো, নিলে না। দমড়ীকে বলল, "তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখচো কি? নিজের বাঁশ কাটো গে। পনেরো টাকা শ দরে আমি সই করে দিইচি।"

পুন্নি এতক্ষণ কাঁদছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কপাল চাপড়ে বলে, "যা খুশি করগে যা, ঘরেদোরে আগুন লাগিয়ে দে। আমার কি, বয়ে গেচে! আমার পোড়া কপাল তাই তোর মতো কসাইয়ের হাতে পড়ে জেবনটা গেল। দে ঘরেদোরে আগুন লাগিয়ে দে।" জলখাবারের চুবড়িটা ফেলে সে ঘরের দিকে এগোলে হীরা গর্জে ওঠে, "ওদিকে কোতায় যাচ্ছিস? চল্ কুয়ো পাড়ে চল্, নয়তো আজ তোর রক্ত খেয়ে ছাড়বো।"

পুনিয়ার পা উঠলো না। সে এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে অভিনয় করতে চায় না। চুপচাপ চুবড়িটা তুলে নিয়ে কুয়োর দিকে এগোলে হীরাও তার পিছু নেয়।

হরি হেঁকে বলে, "আবার মারধোর কোরো না। এতে মেয়েমানুষের হায়ালজ্জা থাকে না।"

ধনিয়া দরজায় দাঁড়িয়ে হরিকে ডাকাডাকি করছিল, "তুমি ওখেনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি তামাশা দেখচো? তোমার কথা কে শোনে যে শিক্ষে দিচ্চো। সেদিন এই বৌই না তোমাকে ঘোমটার আড়াল থেকে কত অকথা কুকথা বলল সব ভুলে গেচো নাকি? বৌমানুষ হয়ে পরপুরুষের সংগে লড়াই ঝগড়া করলে মার খাবে নাতো কি?"

হরি কাছে এসে ঠাট্টা করে বলে, "আর আমি যদি তোকে এমনি করে মারি?"

"কেন কখনো মারোনি নাকি যে এখনি মারতে সাধ যাচ্চে।"

"অমন করে মারলে তুই ঘর ছেড়ে পালাতিস। পুনিয়ার সহ্যশক্তি আচে।"

"আহা! বড্ড দরদী মনে হচ্চে। এখনো মারের দাগ মিলোয়নি। হীরে যেমন মারে তেমনি সোহাগও করে। তুমি তো খালি মারতে শিখেচো একটা মিষ্টি কথা বলতেও শেখোনি। আমার মতো মেয়ে মানুষ বলেই তোমার সংগে ঘর করি।"

"আচ্ছা আচ্ছা হয়েচে। তোকে আর নিজের গুণপনা ব্যাখ্যান করতে হবে না। মনে নেই রেগেমেগে তুই বাপের বাড়ি পালাতিস আর আমি সেধে সেধে নিয়ে আসতুম।"

"যখন নিজের গরজ পড়তো তখন যেতে গো মশাই! আমাকে সোহাগ করতে যেতে না।"

"তাই বুঝি সক্কলের কাছে তোর গুণপনার কথা বলি?"

দাম্পত্য জীবনের শুরুতে কামনা-বাসনার গোলাপী মাদকতা মনের আকাশে সোনালী কিরণ ছড়িয়ে দেয় বটে কিন্তু মধ্যাহ্নের ধূসর ঘূর্ণীঝড়ে তার চিহ্নমাত্র থাকে না। কিন্তু শান্ত সন্ধ্যায় যখন আবার তারা ক্লান্ত পথিকের মতো নিজের কথা শোনাতে বসে তখন আর দুঃখের কথা মনে থাকে না। এখানেও তাই হলো। আনন্দে ধনিয়ার চোখে জল আসে। বলে, "যাও যাও ভারি ব্যাখ্যানাওলা এলেন। পান থেকে চুণ খসলে তো গলায় পা দিতে ছাড়ো না।"

হরি মিঠে সুরে বলল, "এবার তোর মিছে কথা সহ্য হচ্চে না ধনিয়া। তুই ভোলাকেই জিজ্ঞেস করে দ্যাখ না, আমি তোর সুখ্যাত ওর কাছে করিচি কিনা।"

ধনিয়া কথা ঘুরিয়ে বলে, "দ্যাখো, গোবর গরু নিয়ে আসে না খালি হাতে।"

দমড়ী ঘামে নেয়ে এসে দাঁড়ায়, "মাহাতো চলো বাঁশ গুণে নাও। কাল ঠ্যালা এনে তুলে নে যাবো।"

হরি বাঁশ গোণার প্রয়োজন অনুভব করে না। দমড়ী সেরকম লোক নয়। আর এক আধটা বাঁশ বেশি কাটলেই বা কি? রোজই তো মাগনা বাঁশ কাটতে হয়। বিয়ে শাদীর মণ্ডপ তৈরি করার জন্যে লোকে ডজন ডজন বাঁশ কেটে নিয়ে যায়।

দমড়ী ট্যাঁক থেকে সাড়ে সাত টাকা বার করে হরির হাতে দেয়। হরি গুণে বলে, "হিসেবে তো আরো আড়াই টাকা বেশি হচ্ছে।" দমড়ী অভদ্রভাবে বলল, "পনেরো টাকায় রফা হয়েছে কিনা।"

"পনেরো টাকা নয়, বিশ টাকায়।"

"হীরা মাহাতো তোমার সামনে পনেরো টাকা বলে গেল। তাকে ডেকে আনবো?"

"রফা বিশ টাকাতেই হয়েছিল চৌধুরী। এখন তুমি জিতেচো। যা বলবে তাই সই, আড়াই টাকা না হয়, তুমি দুটো টাকাই দাও।"

কিন্তু দমড়ী কাঁচা ছেলে নয়। এখন তার আর ভয় কি? হরির মুখে তো তালা পড়েছে। কপাল চাপড়ানো ছাড়া তার গতি নেই। তবুও বলে, "ঠিক করলে না চৌধুরী, দুটো টাকা মেরে তুমি রাজা হয়ে যাবে না।"

দমড়ী তীক্ষ্ন স্বরে বলে, "আর তুমিই কি ভাইদের কটা টাকা ঠকিয়ে রাজা হয়ে যাবে। আড়াই টাকার লোভে ধম্ম ছাড়ছিলে। এখন আমাকে খুব উপদেশ দিচ্চো। এক্ষুণি যদি সব ফাঁস করে দি তোমার মাথাটা কোথায় থাকবে শুনি।"

হরির মাথায় যেন একশো জুতোর ঘা পড়লো। দমড়ী তার সামনে টাকাটা রেখে চলে যায়। কিন্তু হরি নিমগাছের নীচে অনেকক্ষণ বসে মনে মনে আফসোস করে। সে যে কত স্বার্থপর, কত লোভী নিজেই অনুভব করলো। দমড়ী যদি আড়াইটা টাকা দিয়ে দিত তাহলে সে আনন্দে ফুলে উঠে ভাবতো বুদ্ধির জোরে ঘরে বসেই আড়াই টাকা পাওয়া গেল। মানুষ তো ঠোক্কর খেয়েই সাবধান হয়।

ধনিয়া ঘর থেকে ফিরে এসে টাকাগুলো পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিয়ে গুণে বলে, "আর টাকা কই? দশ টাকা দেবার কথা ছিল না?"

হরি মুখ ভার করে বললে, "হীরে পনেরো টাকায় দিয়ে দিল, আমি আর কি বলবো?"

"হীরে পাঁচ টাকায় দিকগে। আমরা এই দামে দোব না।"

"ওখানে মারপিট হচ্ছিল। আমি মধ্যিখানে কি করি।" হরি নিজের পরাজয়ের লজ্জা মনেই চেপে রাখলো। জিতে গিয়ে নিজের লোকঠকানো বুদ্ধির অহংকার করা চলে। পরাজয়ের লজ্জা কাউকে বলা যায় না।

ধনিয়া স্বামীকে ধিক্কার দেয়। এমন সুযোগ সে কমই পায়। হরি তার

চেয়ে বুদ্ধিমান কিন্তু আজ সে সুযোগ পেয়েছে। আঙুল মটকে বলে, "তা কেন বলবে! ভাই পনেরো টাকা বলে দিয়েচে তবে আর কি! তুমি কি করে বলবে? আরে রাম রাম! সোহাগের ভাইয়ের বড়ো মুখটা ছোট হয়ে যাবে যে! তায় আবার আদরের ভাদ্দরবৌয়ের ওপর মারধোর চলচে। তুমি কি করে বলবে! তখন কেউ তোমার সব্বস্ব লুটে নিলেও তোমার হুঁস হতো না।"

হরি বাধ্য হয়ে চুপ করে শোনে। কথা বাড়াতে ভয় হয়। রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। দাঁতে দাঁত চিপে কথা না বলে সে কোদাল হাতে আখের ক্ষেতের দিকে চললো।

ধনিয়া তার হাত থেকে কোদাল ছিনিয়ে নিয়ে বললে, "এখনো কি সকাল আছে যে আখ রুইতে চলেছ। সুর্য্যিঠাকুর যে মাথার ওপর এসে গেছেন। চান-টান সেরে নাও। রুটি হয়ে গেচে।"

হরি আপত্তির সুরে বলে, "আমার খিদে নেই।"

ধনিয়া কাটা ঘায়ে নুন ছিটোয়, "হাঁ, খিদে কেন পাবে। ভাই বড়ো বড়ো লাড্ডু খাইয়েছে তো! ভগমান যেন এমন সুপুত্তুর ভাই সব্বাইকে দেয়।"

হরির মেজাজ বেগড়ায়। তেড়ে উঠে বলে, "তুই কি সত্যি সত্যি মার খাবি নাকি?"

ধনিয়া ব্যঙ্গের সুরে বলে, "কি করবো তোমার আদর-সোহাগ খেয়ে মাথা ঘুরে গেছে যে।"

"তুই ঘরে থাকতে দিবি না, না কি?"

"ঘর তোমার, বাড়ি তোমার, মালিক তুমি, আমি তোমাকে তাড়াবার কে?"

হরি আজ ধনিয়ার কাছে সম্পূর্ণ পরাস্ত। তার তীক্ষ্ম ব্যঙ্গের একটাও প্রত্যুত্তর দিতে না পেরে হরি কোদাল রেখে গামছা কাঁধে স্নান করতে চলে যায়, ফেরে আধঘণ্টা পরে। গোবর এখনও আসেনি। একলা কি করে খায়? ছোঁড়া নিশ্চয় কোথাও গিয়ে শুয়ে আছে ভোলার সেই ডব্‌কা মেয়েটা আছে না, ঝুনিয়া! তার সঙ্গে হাসি মস্করা করছে হয়তো। কালও তো তার পেছনে লেগেছিল। গরু না দেয় তো চলে আয়! হত্যে দিয়ে পড়ে থেকে কি হবে? ধনিয়া বলে ওঠে, "দাঁড়িয়ে আচো কেন? গোবর সন্ধ্যেবেলা আসবে।"

হরি কথা বাড়ালে না। খেয়ে উঠে নিম গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ে। কোত্থেকে রূপা এসে কাঁদতে কাঁদতে শুয়ে পড়ে। খালি গা, কোমরে এক ফালি কাপড় জড়ানো, ঝাঁকড়া চুল হাওয়ায় উড়ছে। তার দিদি সোনা বলেছে 'গরু আসবে', আমি সেই গরুর গোবরে ঘুঁটে দোব। রূপার সহ্য হয়নি। সোনা কোথাকার মহারানী যে, ঘুঁটে দেবে। সে সোনার চেয়ে কম কিসে? সোনা রুটি বানায় আর সে কি বাসন মাজে না? সোনা জল আনে, রূপা দড়ি বয়ে নিয়ে যায়। সোনা কলসী ভরে আনে, সে দড়ি গুটিয়ে আনে। তাহলে সোনা একলা কেন ঘুঁটে দেবে? এত অন্যায় রূপা সইতে পারে না। হরি রূপার সারল্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে ভোলায়, "না-না, নতুন গরুর গোবরে শুধু

তুই ঘুটে দিবি মা। সোনা গরুর কাছে এলে ভাগিয়ে দিবি কেমন!"

রূপা বাপের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, "দুধও আমি দুইবো।"

"হ্যাঁ রে হ্যাঁ। তুই না তো আবার কে দুইবে?"

"গরুটা আমার হবে।"

"ঠিক ঠিক, ষোলো আনা তোর।"

রূপা প্রসন্ন চিত্তে স্নেনাকে বিজয়বার্তা শোনায়, "গরু আমার হবে। আমি তার দুধ দুইবো। আমি তার গোবর ঘুটে দোব। তুই কিছু পাবি না।"

সোনা বয়সে কিশোরী, দেহের গঠনে যুবতী, বুদ্ধিতে বালিকা। দেখে মনে হয় যৌবন তাকে সামনে টানছে আর শৈশব পেছনে। কোন কোন বিষয়ে সে এত চালাক যে লেখাপড়া জানা গ্র্যাজুয়েট মেয়েকেও ঘোল খাইয়ে দিতে পারে আবার কোন কোন সময় সে শিশুর চেয়েও বোকা। লম্বা রুক্ষ একহারা তন্বী। চোখে কাজল নেই, চুলে তেল নেই, গায়ে একটা গয়না নেই, তবু চোখে তৃপ্তির আবেশ। সংসারের ভারে তার যৌবনের বাড় বন্ধ হয়ে গেছে। সে সব শুনে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "যা তুই ঘুঁটে দিগে যা। যখন দুধ দুয়ে রাখবি তখন আমি খেয়ে নোব।"

"আমি দুধের কেঁড়ে তালা বন্ধ করে রাখবো।"

"আমি তালা ভেঙে দুধ বের করে আনবো।"

বলতে বলতে সে বাগানে ছোটে। আমগুলো পেকে এসেছে। হাওয়ার ঝাপটায় এক আধটা মাটিতে খসে পড়ছে। লুয়ের গরম হাওয়ায় নীরস বিবর্ণ হলদে তবু বাচ্চাকাচ্চারা সেই আম কুড়োতে যায়। রুপাও দিদির পেছনে ছোটে। দিদি যা করবে রুপারও তাই করা চাই। সোনার বিয়ের কথা চলছে কিন্তু রুপার বিয়ে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তাই সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে খোঁজ নেয়। তার বর কেমন হবে, কি কি আনবে, তাকে কি রকম সুখে রাখবে, কি কি খাওয়াবে, কি পরাবে তার এমনই বিশদ বর্ণনা দেয় যে কোন ছেলেই আর তাকে বিয়ে করতে রাজী হয় না।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। কুড়েমি করে হরি আর ক্ষেতের কাজে বেরুলো না। হেলে গরু দুটোকে জাবনা দিয়ে এক ছিলিম তামাক সেজে সুখটান দেয়। এবারের সমস্ত ফসল গোলায় তুলে দিলেও এখনো তার মাথায় তিনশো টাকার দেনা রয়েছে। যার ওপর কয়েকশো টাকার সুদ বেড়ে চলেছে। মগরু শাহের কাছ থেকে বলদ কেনবার জন্যে ষাট টাকা ধার নিয়েছিল বছর পাঁচেক আগে, এর মধ্যে ষাট টাকা সুদ দেওয়া হয়ে গেছে তবু ষাট টাকার ঋণ যেমন কে তেমন রয়ে গেল। দাতাদীন পণ্ডিতের কাছে তিরিশ টাকা ধার নিয়ে আলু পুঁতেছিল। আলু তো চোরের পেটে গেল কিন্তু এই তিন বছরে তিরিশ টাকা সুদে আসলে একশো ছুঁয়েছে। বিধবা মুদীবৌ দুলারী গ্রামে তেল-নুন-তামাকের দোকান করেছে। ভাগবাঁটোয়ারার সময় তার কাছ থেকে চল্লিশ টাকা নিয়ে ভাইদের দিতে হয়েছিল। সেও বোধ হয় এতদিনে একশো পেরিয়ে

গেছে। টাকায় এক আনা করে সুদ দিতে হয়। খাজনার পঁচিশ টাকা এখনও বাকী। তার ওপর পুণ্যাহের টাকাও জোগাড় হয়নি। দমড়ীর টাকাটা খুব দরকারের সময় পাওয়া গেছে। পুণ্যাহের সমস্যাটা মিটবে। কে জানে! এখানে তো একটা পয়সা হাতে এলেই গ্রামে শোরগোল পড়ে যায়, পাওনাদাররা ছেঁকে ধরে। কিন্তু এই টাকাটা সে পুণ্যাহেই দেবে। এখনো দুটো বড়ো কাজ বাকী। গোবর আর সোনার বিয়ে দিতে হবে। অনেক হাতটান করলেও শ' তিনেকের কমে হবে না। কোত্থেকে আসবে? এই হারে সুদ দিতে হলে তো তার ঘরবাড়ি সব নীলাম হয়ে যাবে আর ছেলেমেয়েরা পরের দোরে ভিক্ষে করবে। হরি যখনই ভাবতে বসে তখনই এই দুশ্চিন্তা কালো দেওয়ালের মতো চারদিক থেকে এসে তাকে চেপে ধরে। গ্রামের প্রত্যেকেরই এই অবস্থা। কারুর তো আরো খারাপ। শোভা আর হীরা তিন বছর হলো ভিন্ন হয়েছে। দুজনেরই মাথায় চারশো টাকার দেনা। ঝিঙুরের খেতে দুটো হাল তবু তার দেনা হাজার খানেকের বেশি। আর জিয়াত্তন মাহাতোর ঘরে তো ভিখিরিও ভিক্ষা পায় না তবু দেনার ঠিকঠিকানা নেই। করাল রাহুর হাত থেকে কে কবে বেঁচেছে?

হঠাৎ সোনা-রূপা দুজনেই দৌড়ে এসে চেঁচায়, "দাদা গরু আনচে। আগে-আগে গরু, পেছন-পেছন ছাদা।" রূপাই গোবরকে আগে দেখেছিল কাজেই খবর শোনাবার সুযোগ তারই পাওয়া উচিত কিন্তু সোনা সব ব্যাপারে ভাগীদার হয়ে যায়। রূপার সহ্য হয় না। বলে, "আমি আগে দেখিচি আর দৌড়েচি। দিদি তো পেছন থেকে দেখেচে।"

সোনা পরাস্ত না হয়ে বলে, "তুই দাদাকে চিনতে পারলি কই? শুধু বলেছিলি একটা গরু পালিয়ে এসেচে। আমি তো বললুম দাদা আসচে!" দুজনে আবার বাগানে ছোটে।

ধনিয়া আর হরি গরু বাঁধার ব্যবস্থা করে। হরি বলে, "চলো তাড়াতাড়ি নাদাটা পুঁতে ফেলি।"

ধনিয়ার মুখে বিগত যৌবনের চকিত আভাস ফুটে ওঠে। বলে, "না, আগে থালায় একটু আটাগুড় গুলে রাখি। বেচারা অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছে। খুব তেষ্টা পেয়েছে তো। তুমি নাদাটা পোঁতো। আমি আটা গুলি।"

"একটা ঘণ্টি পড়েছিল না, খুঁজে বার করো তো গলায় বেঁধে দোব।"

"সোনা কোথায় গেল? মুদীর দোকান থেকে একটু কালো কার আনিয়ে নাও তো। গরুর গলায় বাঁধতে হবে। নয়তো নজর লেগে যাবে।"

"আজ আমার সবচেয়ে বড় সাদ পুন্ন হলো গো।"

ধনিয়া নিজের আনন্দ চেপে রাখতে চাইছিল। এত বড়ো সম্পদের সঙ্গে আবার বিপত্তি না আসে। আকাশের দিকে চেয়ে বলে, "গরু আসার আনন্দ তো হবে তার চাঁটও মিঠে হলে, এখন কি। সবই ভগমানের ইচ্ছে।" সে যেন ঈশ্বরকেও দেখাতে চায় গরু আসায় তার খুব বেশি আনন্দ হয়নি। কে

জানে? তিনি যদি হিংসে করে সুখের পাল্লা উঁচু করে দেবার জন্যে নতুন বিপত্তি পাঠিয়ে দেন।

ধনিয়া আটা গুলছে ঠিক সেই সময় গোবর গরু নিয়ে পেঁাছোয়। তার পেছনে পাড়ার যত বাচ্চাকাচ্চার মিছিল। হরি দৌড়ে এসে গরুর গলা জড়িয়ে ধরে আর ধনিয়া আটা ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে একটা পুরনো শাড়ির কালো পাড় ছিঁড়ে গরুর গলায় বেঁধে দেয়।

হরি শ্রদ্ধাবিহ্বল চোখে গরুর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন সাক্ষাৎ ভগবতী তার ঘরে পদার্পণ করেছেন। গোমাতার চরণস্পর্শে তার ঘর পবিত্র হয়ে গেল। 'ওঃ ভগমান তাকে সেই সুখের মুখ তাহলে দেখালেন। এত সৌভাগ্য! না জানি কোন্ পুণ্যের ফলে।'

ধনিয়া ভয় পেয়ে বলে, "দাঁড়িয়ে আচো কেন? উঠোনে নাদাটা পুঁতে ফেলো না।"

"উঠোনে জায়গা কই?"

"অনেক জায়গা আছে।"

"আমি ভাবচি বাইরে পুঁতবো।"

"পাগলামী কোরো না। গাঁয়ের হালচাল জেনেও অবুজের মতো কথা বলচো।"

"আরে এক বিঘৎ উঠোনে গরু বাঁধবো কোথায় বল?"

"যে কথা বোজো না তা নিয়ে হাসিঠাট্টা করো কেন বলোতো। সংসারের সব্ব বিদ্যে তোমার জানা আচে নাকি।"

হরি সত্যিই নিজের মধ্যে ছিল না। গরু তার কাছে শুধু শ্রদ্ধা ভক্তির বস্তু নয়, সজীব সম্পত্তি। সে বাড়ির দরজায় গরু বেঁধে নিজের গৌরব বাড়াতে চাইছিল। তার ইচ্ছে করছিল, তার দরজায় গরু বাঁধা দেখে লোকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করবে 'এ বাড়ি কার?' অন্য লোকে বলবে হরি মাহাতোর। তখন মেয়ের বাপেরাও তার ঐশ্বর্য দেখে প্রভাবিত হবে। উঠোনে বাঁধলে কে দেখবে? ধনিয়া বিপরীত আশংকা করছে। সে গরুটাকে সাতটা পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রাখতে পারলে খুশী হতো। যদি গরু অষ্টপ্রহর ঘরে থাকতে পারতো তাহলে সে হয়তো তাকে বেরোতেই দিত না। যদিও প্রতি কথায় হরির জিৎ হয় আর ধনিয়া হারে কিন্তু আজ ধনিয়ার সামনে হরির কথা টিকলো না। ধনিয়া কোমর বেঁধে লড়াই করতে প্রস্তুত। গোবর সোনা রুপো সবাই হরির পক্ষে ছিল তবু ধনিয়া একাই সবাইকে হারিয়ে দিল। আজ তার মধ্যে এক বিচিত্র আত্মবিশ্বাস আর হরির মধ্যে বিচিত্র বিনয়ের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু তামাশা বন্ধ করা গেল না। গরু তো ডুলীতে বসে আসেনি সুতরাং গ্রামের লোক এত বড়ো খবরটা পাবে না তা কি সম্ভব? যে শোনে সেই কাজ ফেলে ছুটে আসে। এতো মামুলী দেশী গরু নয়, ভোলার ঘর থেকে আশী টাকায় এসেছ। হরি কি আর আশী টাকায় এনেছে। পঞ্চাশ ষাট

টাকায় কিনেছে নিশ্চয়। গ্রামের ইতিহাসে পঞ্চাশ ষাট টাকা দিয়ে গরু কেনা এক অভূতপূর্ব ঘমনা। হেলে গরু কিনতে পঞ্চাশ একশো টাকাও দিতে হয়েছে কিন্তু গরুর জন্যে পঞ্চাশ টাকা খরচ করবার ক্ষমতা চাষা কোথায় পাবে? এতো শুধু গয়লারাই পারে। তারাই আঁজলাভরা টাকা দিয়ে গরু কেনে। তবে হ্যাঁ, গরুটি যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। দর্শকদের কচকচি লেগেই ছিল। হরি দৌড়ে দৌড়ে সবাইকে আপ্যায়ন করছিল। তাকে এত নম্র এত প্রসন্ন কেউ কোনদিন দেখেনি।

সত্তর বছরের বৃদ্ধ দাতাদীন পণ্ডিত লাঠি ঠুকঠুক করে এসে ফোকলা মুখে বললেন, "হরি কোতায় রে? আমাকেও গরুটা দেখা। শুনলুম খুব সুন্দর গরু এনিচিস।"

হরি ছুটে এসে পণ্ডিতের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে, গর্ব আর উল্লাসে ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে পণ্ডিতকে উঠোনে নিয়ে যায়। পণ্ডিত তাঁর প্রবীণ চোখ দিয়ে গরুর চোখ দেখলেন, সিং দেখলেন, পালান দেখলেন, পিঠ দেখলেন। তারপর ঘন সাদা ভুরুর নীচে লুকিয়ে থাকা নিষ্প্রভ চোখে যৌবনের চাপল্য ফুটিয়ে বললেন, "না রে বেটা, কোন খুঁৎ নেই। সাক্ষাৎ ভগবতী। ভগমানের ইচ্ছে হলে তোর ভাগ্য খুলে যাবে। খুব সুলক্ষণা। দেখাশোনার ত্রুটি যেন না হয়। এক একটা বাচ্চা একশো টাকায় বিকোবে।"

হরি সুখসাগরে ডুব দেয়, "সবই আপনার আশীর্বাদ।"

দাতাদীন খৈনির পিক ফেলে বললেন, "আমার আশীর্বাদে নয় বাবা, ভগমানের দয়া। সব প্রভুর ইচ্ছে। টাকা কি নগদ দিলে?"

হরি বেপরোয়া হয়ে ওঠে। মহাজনের সামনে নিজের সমৃদ্ধি দেখাবার এমন সুযোগ সে ছাড়বে কি করে? বলে, "ভোলা এত ভালো মানুষ নয় মহারাজ, পুরো টাকা নগদ গুণে নিয়েচে।"

মহাজনের সামনে বড়াই করা মূর্খতা সন্দেহ নেই তবে দাতাদীনের মুখে অসন্তোষের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। এ কথার মধ্যে কতটা সত্য আছে তাঁর অভিজ্ঞ চোখে তা গোপন রইল না। এই বয়সে চোখের জ্যোতি কমে এলেও অভিজ্ঞতার অনুভব সে ঘাটতি পূরণ করে দেয়। তিনি প্রসন্ন হাসি হাসলেন, "কোন ক্ষতি হয়নি বাবা, তাতে কোন ক্ষতি হয়নি। ভগবান সবার কল্যাণ করবেন। বাচ্চার জন্যে দুধ ছেড়েও সের পাঁচেক দুধ হবে।"

ধনিয়া বাধা দিয়ে বলে, "না-না মহারাজ, এত দুধ কোথায়? বুড়ী গরু। তারপর আমাদের মতো ঘরে সেবা-যত্ন কতটুকুই-বা।"

দাতাদীন অভিজ্ঞ চোখে ধনিয়ার দিকে তাকান। হ্যাঁ এই তো গিন্নির মতো কথা! পুরুষমানুষ সমই লাফাক ঝাঁপাক মেয়েদের একটু হিসেবী হতেই হয়। বলেন, "আর একটা কথা বলে যাই শোন্, বাইরে বাঁধিস নি যেন।"

ধনিয়া স্বামীর দিকে বিজয়গর্বে তাকায় 'কেমন আমি বলেছিলুম না।'

দাঅদীনকে বলে, "না মহারাজ বাইরে কেন বাঁধবো ? ভগমানের দয়া হলে এই উঠোনে তিনটে গরু বাঁধতে পারি।"

গ্রামের সবাই গরু দেখতে এলো, এলো না শুধু হরির সহোদর ভাই শোভা আর হীরা। হরির মনে ভাইয়েদের জন্যে এখনও একটু নরম জায়গা ছিল। যদি তারা এসে গরু দেখে খুশি হয়ে দুটো কথা বলে যেত তাহলে তার মনস্কামনা ষোলো কলায় পূর্ণ হতো। সন্ধ্যে হয়ে এলো। দুজনেই দরজার সামনে দিয়ে নিজেদের ঘরে ফেরে তবু কিছু জিজ্ঞেস করে না।

হরি ভয়ে ভয়ে ধনিয়াকে বলে, "শোভাও এলো না, হীরেটাও না। শোনেনি বোধহয়।"

ধনিয়া রুক্ষ স্বরে বললে, "তা এখেন থেকে কে তাদের ডেকে আনতে যাবে ?"

"তুই কথা না শুনেই ঝগড়া করবার জন্যে মুখিয়ে আছিস। ভগমান যখন এমন দিনই দিলেন তখন একটু মাথা নীচু করে চলতে হবে তো। লোকে নিজের আপনজনের মুখ থেকেই ভালোমন্দ দুটো কথা শুনতে চায়, বাইরের লোকের কথা নয়। আর নিজের ভাই হাজার মন্দ হলেও ভাই তো! নিজের নিজের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে তো সবাই ঝগড়া করে, তাতে কি রক্তের সম্পর্ক বদলায়। আমি বলি কি, দুজনকে ডেকে দেখিয়ে দেওয়াই ভালো। নয়তো বলবে গরু কিনলো, আমাদের একবার বললেও না।"

ধনিয়া নাক সিঁটকে বলে, "আমি তোমাকে একশোবার কেন, হাজারবার করে বলে দিয়েছি আমার সামনে তোমার ভাইদের ব্যাখ্যান কোরো না। ওদের নাম শুনলে আমার গা জ্বলে যায়। সারা গাঁয়ের লোক জানে আর ওরা শুনতে পায়নি ? এমন কিছু দূরে তো আর থাকে না। গাঁয়ের সবাই দেখে গেলো আর ওদেরই পায়াভারি হলো, না ? আসবে কি করে ? আমাদের ঘরে গরু এসেছে, বুক ফেটে যাচ্ছে, না ? জ্বলে মরচে যে!"

আলো জ্বালার সময় হলো। ধনিয়া ঘরে গিয়ে দেখলে বোতলে এক ফোঁটা কেরাসিন নেই। তাই তেল আনতে যায়। পয়সা থাকলে রূপাকে পাঠাতো, ধারে আনতে গেলে মুদির সঙ্গে কথাবার্তা বলে খোশামোদ করতে হবে তো!

হরি রূপাকে ডেকে কোলে বসিয়ে বলে, "একটু দেখে আয় তো মা, হীরে-কাকা ফিরলো কি না। অমনি শোভাকাকাকেও দেখে আসবি। বলবি, বাবা তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছে। না এলে হাত ধরে টেনে আনবি কেমন ?"

রূপা গোঁজ হয়ে বলে, "ছোট কাকী আমাকে বকে।"

"কাকীর কাছে যাবি কেন ? আর শোভা বৌমা তো তোকে ভালোবাসে।"

"শোভা কাকা আমাকে রাগায়...আমি যাবো না।"

"কি বলে বল্ তো।"

"বড্ডো রাগায়।"

"আরে কি বলে রাগায়, বল্‌বি তো।"

"বলে তোর জন্যে ইঁদুর ধরে রেখেচি, নে যা, ভেজে খাবি।"

হরি খুশি হয়। বলে, "তুই বলিস না কেন আগে তুমি খাও, তারপর আমি খাবো।"

"মা মানা করে। বলে ওদের বাড়ি যাবি না।"

"তুই মায়ের মেয়ে, না বাবার?"

রূপা তার গলা জড়িয়ে ধরে হি-হি করে হেসে বলে, "মায়ের"।

"তাহলে আমার কোল থেকে নেমে যা। আজ থেকে আমি তোকে আমার থালায় খেতে দোব না।"

ঘরে একটাই কাঁসার থালা ছিল। হরি সেই থালায় খায়। থালায় খাবার গৌরব পাবার জন্যে রূপাও বাপের সঙ্গে খেতে বসে। এই গৌরব সে ছাড়ে কি করে? তাই ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে, "আচ্ছা, তোমার মেয়ে।"

"তাহলে আমার কথা শুনবি, না মায়ের কথা।"

"তোমার।"

"তাহলে যা হীরে আর শোভাকে টেনে আন্‌গে।"

"আর মা যদি বকে।"

"মাকে বলতে যাচ্চে কে?"

রূপা লাফাতে লাফাতে হীরার বাড়ির দিকে রওনা হয়। ঈর্ষার মায়া-জালে বড়োরাই ধরা পড়ে, ছোটরা পড়ে না, পড়লেও ছোট মাছের মতোই তক্ষুনি বেরিয়ে যায়। তাদের কাছে ঘাতক জালটা শুধু খেলার জিনিষ। ভাইদের সঙ্গে হরির কথাবার্তা বন্ধ হলেও রূপার জন্যে সর্বত্রই অবারিত দ্বার। শিশুর সঙ্গে আবার শত্রুতা কি?

রূপা বেরিয়েই ধনিয়ার সামনে পড়ে গেল। বললে, "সন্ধ্যেবেলা কোথায় যাচ্চিস? বাড়ি চল্‌।"

রূপা মাকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করে কিন্তু ধনিয়া ধমকে ওঠে, "না না, কাউকে ডাকতে যেতে হবে না, চল্‌ বাড়ি চল্‌ বল্‌চি।" রূপার হাত ধরে টানতে টানতে সে বাড়ি ফিরে হরিকে বলে, "আমি তোমাকে হাজার বার বলেছি না আমার ছেলে মেয়েদের কারুর বাড়ি পাঠাবে না। কেউ যদি তুকতাক কিছু করে দেয় তখন কি হবে? আর এতই যদি দরদ তো নিজে যাও না কেন, এখনও আশ মেটেনি বুঝি।"

হরি নাদা পুঁতছিল। হাতে মাটি মেখে কিছু না জানার ভাণ করে বললে, "কেন চট্‌ছিস বাপু। কাণী কুকুরের মতো তোর এই ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধু করা আমার ভালো লাগে না।"

ধনিয়া কথা বাড়ালে না। কুপীতে তেল ভরতে গেল। রূপা খেলতে চলে গেল।

রাত এক প্রহরের বেশি হয়নি। খোলজাব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু গরু

নাদায় মুখ ঠেকালে না। মনমরা হয়ে উদাস মনে বসে রইল। নতুনবৌ যেন শ্বশুরবাড়ি এসেছে। হরি আর গোবর খাওয়াদাওয়া সেরে আধখানা করে রুটি তার মুখের সামনে ধরলো কিন্তু গরু ছুঁয়েও দেখলে না। অবশ্য এটা নতুন ব্যাপার নয়। পোষা জীব জানোয়ারও পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে এলে দুঃখ পায়!

হরি বাইরে খাটিয়ায় বসে তামাক খেতে খেতে আবার ভাইদের কথা ভাবে। জীবনের এই শুভমুহূর্তে ভাইদের উপেক্ষা করা ঠিক নয়। তার মন অকল্পনীয় ঐশ্বর্য পেয়ে উদার হয়ে উঠেছিল। ভাইরা ভিন্ন হয়ে গেছে তো কি হয়েছে? তার শত্রু তো নয়। এই গরু তিন বছর আগে এলে তো সবার সমান অধিকার হতো। আর কাল যখন এই গরু দুধ দেবে তখন কি সে ভাইদের দুধ দৈ পাঠাবে না? এ তার ধর্ম নয়। ভাইরা তার মন্দ চায় বলে সে কেন তাদের মন্দ চাইবে। নিজের কর্মফল নিজের সঙ্গেই থাকে।

সে হুঁকোটা খাটিয়ার পায়ায় ঠেস দিয়ে রেখে হীরার বাড়ির দিকে এগোয়: শোভার বাড়িও কাছেই। দুজনে আপন আপন দোরের সামনে শুয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। ঘোর অন্ধকারে তারা হরিকে দেখতে পেল না। ওরা কি বলছে শোনার লোভে হরি দাঁড়িয়ে পড়ে। পরের মুখে নিজের আলোচনা শুনতে চায় না এমন লোক কমই আছে।

হরি শুনলো হীরা বলছে, "যখন একত্তরে ছিলুম তখন একটা ছাগলও কেনোনি। আর এখন পাছিয়া গরু এসেছে। যাক, ভাইদের হক্ মেরে কাউকে বড়ো হতে দেখিনি।"

শোভা বলে, "এ তোমার অন্যায় হীরে। দাদা পাই-পয়সার হিসেব চুকিয়ে দিয়েছে। আমি মানবো না যে দাদা আগেভাগেই টাকা পয়সা লুকিয়ে রেখেছিল।"

"তুমি মানো আর নাই মানো এ নিশ্চই তখনকার টাকা।"

"কারুর ওপর মিথ্যে বদনাম দেওয়া ঠিক নয়।"

"আচ্ছা তাহলে বলো এ টাকা এলো কোত্থেকে? আকাশ থেকে? আমাদেরও তো সমান জমি আচে। সমান ফসল হয়। তাহলে? আমাদের কাছে ঘাট খর্চার কড়িও নেই আর দাদার ঘরে নতুন গরু আসছে, কেমন!"

"ধারে নিয়েচে হয়তো।"

"ভোলা ধার দেবার লোক নয়।"

"যাই হোক, গরুটা খুব সুন্দর। গোবর নিয়ে আসছিল, আমি রাস্তা থেকে দেখিচি।"

"বেইমানীর ধন আসতেও যেমনি যেতেও তেমনি। ভগমান চাইলে ও গরু বেশিদিন রাখতে পারবে না।"

হরি আর শুনতে পারলো না। সে অতীতের তিক্ততা ভুলে গিয়ে স্নেহভরা বুকে ভাইদের কাছে এসেছিল, বুকটা ভেঙে গেল। সেই কোমল সরস

ভাবটা আর রইলো না। ঘাস পাতা দিয়ে তো নদীকে বাঁধা যায় না। প্রতিটা কথার চোখা জবাব তার ঠোঁটে ছিল কিন্তু কথা বেড়ে যাবার ভয়ে চুপচাপ ফিরে এলো। সে যখন নির্দোষ তখন কেউ কিছু করতে পারবে না ঠিকই তবু কথাগুলো বিষাক্ত তীরের মতো তার মর্মে বিঁধে রইল। খাটিয়ায় শুয়েও ঘুমোতে পারলে না। উঠে হেলে-গরু দুটোর গায়ে হাত বোলায়, আর এক ছিলিম তামাক খেয়ে শেষে উন্মাদের মতো বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে। দরজা খোলাই ছিল। উঠোনের একপাশে চাটাই বিছিয়ে শুয়ে ধনিয়া সোনাকে দিয়ে হাত-পা টেপাচ্ছিল আর রূপা, অন্যদিন সে ঘুমিয়ে পড়ে আজ গরুর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আদর করছিল। হরি গরুর দাঁড় খুলে তাকে দরজার দিকে টেনে নিয়ে যায়। এক্ষুনি গরুটা ভোলার হাতে ফিরিয়ে দিতে পারলে সে যেন নিশ্চিন্ত হয়। এত বড়ো কলঙ্ক মাথায় নিয়ে সে গরু রাখতে পারবে না, কিছুতেই না।

ধনিয়া জিজ্ঞেস করে, "কোথায় নে যাচ্চো এত রাতে।"

হরি আরেক পা বাড়ায়, "ভোলার বাড়ি নে যাচ্চি, ফেরৎ দেব বলে।"

ধনিয়া ধড়মড় করে উঠে বলে, "ফেরৎ দেবে কেন? ফিরিয়ে দেবার জন্যে এনেছিলে?"

"হ্যাঁ ফিরিয়ে দেওয়াই ভালো।"

"কেন কি হয়েছে? এত শখ করে আনলে আবার এক্ষুনি ফেরৎ দিতে যাচ্চো। ভোলা কি টাকা চাইচে?"

"না, ভোলা এলো কখন?"

"তাহলে?"

"জেনে কি করবি?"

ধনিয়া লাফিয়ে উঠে এসে হরির হাত থেকে দাঁড়টা ছিনিয়ে নেয়। সে তার তীক্ষ্ন বুদ্ধি দিয়ে উড়ন্ত পাখি ধরার মতো সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলে বলে, "তোমার ভাইদের যদি এত ভয় করো তাহলে তাদের পায়ে পড়গে। আমি কাউকে ভয় পাই না। আমার বাড়বাড়ন্ত দেখে কারুর বুক ফাটে তো ফাটুক পরোয়া করিনে।"

হরি বিনীত সুরে বলে, "একটু আস্তে কথা বল্ মহারাণী। কেউ শুনলে বলবে এরা এত রাত জেগে জেগে ঝগড়া করচে। আমি নিজের কানে যা শুনিচি তুই কি তা জানিস। ওখানে বলাবলি হচ্ছে আমি ভেন্ন হবার সময় টাকা লুকিয়ে রেখে ভাইদের ফাঁকি দিইচি। এখন সেই টাকা বেরোচ্চে।"

"হীরে বলচে বোধহয়।"

"গাঁয়ের সব্বাই বলচে। একা হীরেকে বদনাম দেবো কেন?"

"গাঁয়ের সব্বাই বলচে না, একলা হীরে বলচে। আমি এক্ষুনি গিয়ে জিজ্ঞেস করচি, তোমাদের বাপ কত টাকা রেখে মরেছিল? এই শয়তানগুলোর জন্যে আমাদের সব কিছু ছারখার হয়ে গেল। পেলে পুষে বড়ো করলুম

আর আজ আমরা বেইমান? গরু ঘর থেকে বেরোলে আজ অনর্থ হয়ে যাবে বলে দিলুম। হ্যাঁ হ্যাঁ টাকা লুকিয়ে রেখে দিইচি, ক্ষেতের মধ্যে মাটিতে পুঁতে রেখেচি। ঢাক পিটিয়ে বলবো এক কলসী সোনার মোহর লুকিয়ে রেখেছিলুম। হীরে আর শোভা যা করতে পারে করুক গে। কেন রাখবো না শুনি? দু-দুটো ষণ্ডার বে দিতে হয়নি, গওনা* করতে হয়নি?"

হরি থতমত খেয়ে যেতে ধনিয়া গরুটা যথাস্থানে বেঁধে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। হরি বাধা দেবার চেষ্টা করে কিন্তু ধনিয়া ততক্ষণে তার নাগালের বাইরে চলে গেছে। হরি সেখানেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। পথের ওপর ওকে ধরবার চেষ্টা করে নাটক দেখাবার ইচ্ছে তার নেই। ধনিয়াকে সে চেনে। রাগলে একেবারে রণচণ্ডী হয়ে ওঠে। তখন মারো-কাটো কিছু শুনবে না। কিন্তু হীরেটাও তো গোঁয়ার। যদি হাত পা চালিয়ে দেয় তবে তো পোয়াবারো। 'নাঃ হীরে এত মুখ্যু নয়। আমিই মরতে অনর্থ বাঁধাতে গেলুম'। তার নিজের ওপরই রাগ হয়। কথাটা চেপে গেলে তো এত ঝামেলা হতো না। হঠাৎ ধনিয়ার কর্কশ স্বর কানে আসে, সেই সঙ্গে হীরার গর্জন আর পুন্নির চিল চীৎকার। হঠাৎ গোবরের কথা মনে পড়ে। বাইরে এসে দেখে, গোবর নেই। তাজ্জব ব্যাপার! গোবরও ওখানে গেছে। ভালো হলো না। তার নতুন রক্ত! কে জানে কি করে বসে। কিন্তু হরি কি করে যায়? হীরা বলবে, নিজে কথা বলে না তাই ডাইনীটাকে লড়তে পাঠিয়েছে। কোলাহল বেড়ে চলে। সারা গ্রাম জেগে উঠেছে। যেন কোথাও আগুন লেগেছে আর সবাই নেভাতে ছুটেছে।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর হরি আর পারলে না। ধনিয়ার ওপর রাগ হচ্ছিল, সে কেন চড়াও হয়ে লড়তে গেল। নিজের ঘরে মানুষ কত কথাই বলে তাতে কি? যতক্ষণ মুখে না বলছে ততক্ষণ কিছু করা উচিত নয়। হরির কৃষক প্রকৃতি ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলতে চায়। আপোষে মিটমাট করাই ভালো। মার-দাঙ্গা, থানা-পুলিশ, আইন-আদালত করতে গেলে চাষ-বাস জাহান্নমে যায়। হীরা তার কথা শুনবে না কিন্তু ধনিয়াকে তো টেনে হিঁচড়ে আনতে পারে। বড় জোর চেঁচামেচি করে গাল দেবে কি দু-একদিন রেগে থাকবে, থানা পুলিশের ঝামেলা তো হবে না। সে হীরার বাড়ির সবচেয়ে দূরের দেয়ালের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। সেনাপতি যেমন যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখে তেমনি করে সে বুঝতে চায়। তার জয় হলে করার কিছু নেই, হারলে যুদ্ধে নামবে। দেখলে, সেখানে গোটা পঞ্চাশ লোক জড়ো হয়েছে। পণ্ডিত দাতাদীন আর লালা পটেশ্বরীও এসে পড়েছেন। ধনিয়ার পাল্লা হালকা হচ্ছে। তার উগ্রতায় জনমত তার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। আসলে, ধনিয়া রণনীতিতে কুশল নয়, রাগের মাথায় এমন সব কথা শোনাচ্ছে যে ক্রমেই লোকের সহানুভূতি হারাচ্ছে।

* গওনা=দ্বিরাগমন

ধনিয়া চেঁচায়, "তুই আমাদের দেখে জ্বলে মরিস কেন বল্‌তো? আমাদের দেখে কেন তোর বুক ফেটে যায়। বল্‌! পেলেপুষে বড়ো করলুম আর ভালো প্রিতিদান দিলি। আমরা মানুষ না করলে কোতায় গিয়ে ভিক্ষে মাঁগতিস। গাছের ছায়াও জুটতো না।"

এসব কথা হরির ভালো লাগে না। নাবালক ভাইদের মানুষ করা বড়ো ভাইয়ের কর্তব্য। তার ওপর তাদের ভাগের জমিও ছিল। পেলেপুষে বড়ো না করলে দুনিয়ায় মুখ দেখাবার উপায় থাকতো নাকি?

হীরা জবাব দেয়, "ওসব আমি কিচ্ছু জানি না। তোর ঘরে কুকুরের মতো দু টুকরো রুটি খেতুম আর দিনভোর কাজ করতুম। বুঝতেই পারিনি কি করে ছোটবেলাটা কাটলো। সারাদিন শুকনো গোবর কুড়িয়ে দিন কেটেছে। তার ওপর দশটা গাল না দিয়ে তুই রুটি দিতিস না। তোর মতো রাক্ষুসীর হাতে পড়ে জেবনটাই নষ্ট হয়ে গেল।"

"মুখ সামলে কথা বল্‌। নয়তো জিভ টেনে ছিঁড়ে নোব। রাক্ষুসী তোর বৌ। তুই তো লোকের গলা কাটিস। হাড়মাস খেকো, নেমক হারাম।"

দাতাদীন ঠুকলেন, "এত কটু কথা বলচিস কেন ধনিয়া। মেয়েমানুষের ধম্ম হলো সহ্য করা। ওতো একটা কাঠগোঁয়ার। কেন ওকে এত কথা শোনাচ্চিসই।"

লালা পাটেশ্বরী পাটোয়ারী তাঁকে সমর্থন করেন, "কতার জবাব হলো কতা গালাগালি নয়। তুই ছোট বেলায় ওকে মানুষ করেচিস ভালো কথা। কিন্তু ওদের বিষয়-সম্পত্তিও তো তোর হাতেই ছিল।"

ধনিয়া নিজের কোণঠাসা অবস্থার কথা বুঝতে পেরে চতুর্মুখী লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হয়, "আচ্ছা আচ্ছা খুব হয়েচে লালা, কাউকে চিনতে আমার বাকী নেই। এ গাঁয়ে বিশ বছর ধরে বাস করচি। সব্বাইকে আমি চিনি। আমি শুধু গাল দিচ্চি, আর ও ফুল বর্ষাচ্চে তাই না?"

দুলারী মুদিবৌ আগুনে ঘি দেয়, "কী মুখ রে ভাই! পুরুষমানুষকেও মুখ করতে ছাড়ে না। এমন মেয়েমানুষ দেখিনি। হরি ভালোমানুষ বলেই মাগীকে নিয়ে ঘর করে অন্য কেউ হলে একদিনও টিকতো না।"

এ সময় হীরা একটু নরম হলেই জিতে যেত কিন্তু সে আর নিজেকে সামলাতে পারলে না। লোকেদের সমর্থনে জোর পেয়ে চীৎকার করে বলে, "দূর হ আমার বাড়ির দোর থেকে। নয়তো জুতিয়ে বার করবো। ঝুঁটি ধরে মুখ ঘসে দেব। গাল দিচ্চে দেখো না ডাইনী কোথাকার। জোয়ান ছেলের গব্বে মাটিতে পা পড়ছে না। রক্ত..."

পাশার দান পাল্টে গেল। হরির রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। সে এগিয়ে এসে বলে, "আচ্ছা ব্যস! এবার চুপ করো হীরে। আর শোনা যাচ্ছে না। আর

এই মাগীর কথা কি বলবো? আমার মুখে যত চুণকালি পড়ে সবই এই মাগীর জন্যে। জানি না কেন চুপ করে থাকতে পারে না।"

সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে হীরার নিন্দেমন্দ শুরু হয়। দাতাদীন বললেন, 'বেহায়া'। পটেশ্বরী তাকে 'গুণ্ডা' বললেন আর ঝিঙুরী সিং 'শয়তান' উপাধি দিলেন। দুলারী বললে 'কুপুত্তুর'। একটি উগ্র শব্দ ধনিয়ার পাল্লা হাল্কা করেছিল আর একটি উগ্র শব্দ হীরাকে পরাস্ত করলো। তার ওপর হরির সংযত বাক্য সব দোষ ত্রুটি ঢেকে দিল।

হীরা নিজেকে সামলে নেয়। সারা গ্রাম তার বিরুধে। এখন চুপ করে থাকাই ভালো। রাগলেও এটুকু হুঁস তার ছিল।

ধনিয়ার বুক ফুলে ওঠে। হরিকে বলে, "তুমি কান খুলে শুনে নাও এই ভাইদের জন্যে মরো। একে ভাই বলে? এমন ভাইয়ের মুখও দেখতে নেই। আমাকে জুতো মারবে। খাইয়ে দাইয়ে..."

হরি ধমকে ওঠে, "ফের বকবক কচ্চিস! যা বাড়ি যা।"

ধনিয়া মাটিতে বসে পড়ে আর্ত স্বরে বলে, "আজ তো জুতো খেয়ে তবে যাবো। ওর মদ্দানী দেখে তবে উঠবো। গোবর কোথায় গেলি রে বাপ? আর কবে কোন্ কাজে লাগবি বাবা! তুই দ্যাখ্, দেখে যা তোর মাকে জুতো পেটা হচ্চে।"

তার কান্নায় হরি আরো রেগে ওঠে আর হীরা পরাজিত হয়ে পিছু হটে। পুন্নি তাকে হাত ধরে টানছিল। হঠাৎ ধনিয়া সিংহীর মতো লাফিয়ে উঠে আচমকা হীরাকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিয়ে বলে, "বলি যাচ্ছিস কোথায়? মার মার, জুতো মার, দেখি তোর মদ্দানী।"

হরি দৌড়ে এসে তাকে হিঁচড়ে টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে যায়।

৫

ওদিকে খাওয়া দাওয়া সেরে গোবর গয়লাপাড়ায় পেঁৗছে গেছে। আজ ঝুনিয়ার সঙ্গে তার অনেক কথা হয়েছিল। সে যখন গরু নিয়ে ফিরছে তখন ঝুনিয়া অর্ধেকটা পথ তার সঙ্গে এসেছিল। গোবর একা, কি করে গরু নিয়ে যাবে। অপরিচিত লোকের সঙ্গে গরু যাবে কেন? এই ছুতোয় ঝুনিয়া কিছু দূর আসার পর গোবরের দিকে একটি মর্মভেদী কটাক্ষ হেনে বলেছিল, "আর তুমি কি এখেনে আসবে?"

একদিন আগে পর্যন্ত গোবর কিশোর ছিল। গ্রামের যুবতীরা তার কাছে বোন বা বৌঠান। বোনেদের সঙ্গে তো কোনরকম রসের ঠাট্টাতামাশা চলতেই পারে না। তবে বৌঠানরা মাঝে মাঝে ঠাট্টাঠুট্টি করে। সেসব নিছক সরল গ্রাম্য প্রমোদ! তাদের চোখে গোবর ছেলেমানুষ। তাই গোবরের কৌমার্য অক্ষুণ্ণ ছিল। আর ঝুনিয়ার বঞ্চিত হৃদয় ভাজেদের ব্যংগবিদ্রূপে জর্জরিত হয়ে উঠেছিল, সেও গোবরের প্রতি আকৃষ্ট হলো। শিকারী জানোয়ার যেমন

পাতার খসখস শব্দে চমকে জেগে ওঠে গোবরের মনের বাঘও ঝুনিয়ার আকার ইঙ্গিতে তেমনি জেগে উঠলো। সে না রেখে ঢেকেই রসিকতা করে, "যদি ভিক্ষে পাবার আশা থাকে তাহলে ভিখিরি তোমার দরজায় দিনরাত পড়ে থাকতে রাজী।"

ঝুনিয়া আর একটি কটাক্ষ হেনে বলে, "আচ্ছা, তাহলে তুমিও ডুবে ডুবে জল খাও।"

গোবর ধমনীতে প্রবল রক্তের চাপ অনুভব করে, "উপোষী মানুষ হাত বাড়ালে তাকে ক্ষমা করা উচিত।"

ঝুনিয়া আরো গভীর জলে নামে, "দশ দোর না ঘুরলে ভিখিরীর পেট ভরে বুঝি? আমি ওসব ভিখিরীর মুখ দেখিনে। অলিতে গলিতে অনেক মেলে। আর ভিখিরী দেয়ই বা কি—বড়োজোর আশীর্বাদ করবে। তাতে কারুর পেট ভরে না, বুজলে।"

গোবর তার মোটাবুদ্ধি দিয়ে ঝুনিয়ার ইঙ্গিত বুঝতে পারলো না। ঝুনিয়া ছোটবেলা থেকেই বাড়ি বাড়ি দুধের জোগান দেয়। শ্বশুরবাড়িতেও সেই কাজই করতো। এখনো দৈ বেচার ভার তার ওপরই বর্তেছে। কাজেই বিভিন্ন ধরণের মানব চরিত্রের সঙ্গে সে পরিচিত। কখনো কখনো এক আধ-ঘন্টার মনোরঞ্জনের জন্যে তার হাতে দু-চার টাকাও আসতো কিন্তু এই আনন্দ তার কাছে মূল্যহীন দেহজ সুখমাত্র! সে চায় প্রেম, যে প্রেম জোনাকির আলোর মতো ক্ষণস্থায়ী নয়, প্রদীপ শিখার মতো স্থির, উজ্জ্বল। এই প্রেমের জন্যে সে সব ত্যাগ করতে পারে, মরতেও পারে। আসলে ঝুনিয়া গ্রাম্য গৃহস্থের মেয়ে; রসিক নাগরের সঙ্গে মন দেওয়া-নেওয়ার খেলা তার গৃহিণী-পণার স্বপ্নকে ভেঙে দিতে পারেনি।

গোবর কামোদ্দীপ্ত মুখে বলে, "ভিখিরী যদি এক জায়গাতেই পেটভরা ভিক্ষে পায় তাহলে সে দোরে দোরে ঘুরবে কেন?"

ঝুনিয়া সদয়ভাবে তাকায়। গোবর কি বোকা, কিচ্ছু বোঝে না। বলে, "ভিখিরী এক জায়গায় ভরপেট ভিক্ষে কি করে পাবে। বড়ো জোর এক মুঠো ভিক্ষে পাবে। তুমি সব্বস্ব দিলে তবে তো সব্বস্ব পাবে।"

"আমার কাছে কি আচে ঝুনিয়া?"

"তোমার কাছে কিছু নেই? আমাকে দেবার মতো জিনিষ তোমার যা আচে বড়ো বড়ো লাখপতিরও তা নেই। তুমি আমার কাচে ভিক্ষে না চেয়ে আমাকে কিনে নিতে পারো।"

গোবর অবাক হয়ে যায়। ঝুনিয়া আবার বলে, "আর কি দাম দিতে হবে জানো? আমার হয়ে থাকতে হবে। যদি কখনো আর কারুর কাছে হাত পাতো তাহলে দূর করে দোব।"

গোবরের মনে হলো সে যেন অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে তার ঈপ্সিত বস্তু পেয়ে গেছে। এক বিচিত্র ভয়মিশ্রিত আনন্দের শিহরণ জাগলো। এও

কি সম্ভব? ঝুনিয়াকে না হয় রাখলো। তারপর? রক্ষিতা নিয়ে ঘরে থাকবে কি করে? বেরাদরীর ঝামেলা আছে। সারা গাঁয়ের লোক চ্যাঁচাবে। মা তো একে বাড়িতে ঢুকতেই দেবে না। কিন্তু ঝুনিয়া যদি মেয়ে হয়ে না ডরায় তবে সে পুরুষ হয়ে কেন ভয় পাবে? বড়জোর লোকে তাকে একঘরে করে দেবে তা সে না হয় আলাদাই থাকবে। ঝুনিয়ার মতো মেয়ে সারা গাঁয়ে আর একটাও আচে না কি? কি বুদ্ধি! ও কি জানে না আমি ওর যুগ্যি নই তবু আমাকেই ভালোবাসে। আমার হয়েই থাকতে চায়। গাঁয়ের লোক একঘরে করবে তো কি? দুনিয়ায় কি আর কোন জায়গা নেই? আর গাঁ ছাড়তে হবে কেন? মাতাদীন একটা চামারনী রেখেচে—লোকে তার কিছু করতে পেরেচে? দাতাদীন দু-চারবার দাঁত খিঁচিয়েই চুপ করে গেচে। অবশ্য হ্যাঁ, মাতাদীন নিজের বামনাই বজায় রেখেচে। দুবেলা পুজোপাঠের পর তবে জল খায়। স্বপাকে আহার করে তবে একলা খায় না বাপের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খায়। ঝিঙুরী সিং আবার একটা বামনী রেখেচে। তাতে তার মানসম্মান বেড়েছে বই কমেনি। আগে চাকরি করতো এখন মহাজনী কারবার খুলেচে। তার হঠাৎ মনে হলো ঝুনিয়া ঠাট্টাতামাশা করচে না তো? তাই বলে, "এটা কি তোমার মনের কতা ঝুনা? না খালি লোভ দেখাচ্চো? আমি তো সেই পেরথম দিন থেকেই তোমার হয়ে গেচি কিন্তু তুমি কি সত্যি সত্যি কোনদিন আমার হবে?"

"তুমি যে আমার হয়েচো বুজবো কি করে?"

"তুমি আমার পেরানটা চাইলে তাও দোব।"

"পেরান দেবার মানে বোজো?"

"তুমি বুজিয়ে দাও না।"

"পেরান দেবার মানে হলো আমার সঙ্গে থাকতে হবে। একবার হাত ধরলে জেবনভোর আর ছাড়তে পাবে না। দুনিয়ার যে যাই বলুক। তার জন্যে মা বাপ ভাই বোন ঘর দোর সব ছাড়তে হতে পারে। মুখে পেরানদেনে-ওলা আমি ঢের দেখেছি। সব্বাই ভোমরার মতো ফুলের মধু খেয়ে উড়ে যায়। তুমিও তেমনি উড়ে যাবে না তো?"

গোবরের এক হাতে গরুর দড়ি। সে অন্য হাতে ঝুনিয়াব হাতটা ধরে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে সে কেঁপে ওঠে যেন বিজলী তারে হাত ঠেকে গেছে। সারা দেহে যৌবনের প্রথম স্পর্শ। কী নরম কী মোলায়েম কোমল হাত!

ঝুনিয়া হাতটা সরিয়ে নিলে না। যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে গম্ভীর হয়ে বলে, "আজ তুমি আমার হাত ধরেচো। মনে রেখো।"

"খুব মনে রাখবো। মরবার আগে পর্যন্ত মনে রাখবো।"

ঝুনিয়া অবিশ্বাসভরা চোখ তুলে বললে, "এমন করে তো সবাই বলে গোবর, এর চেয়েও মিষ্টি মিষ্টি করে বলে। মনে যদি ছলনা থাকে তাহলে আমাকে এখুনি বলে দাও। আমি কপটীকে মন দিই না। ওদের সঙ্গে হাসি-

ঠাট্টার সম্পর্ক রাখি মাস্তর। অনেকদিন ধরে বাজারে দুধ বেচচি। একের পর এক বাবু, মহাজন, ঠাকুর, উকিল, আমলা, সব্বাই আমাকে রসের কথা বলে ফাঁসাতে চেয়েচে। কেউ বুকে হাত দিয়ে পিতিজ্ঞে করে, কেউ চারপাশে রসের নাগরের মতো ঘোরে, কেউ টাকা দেখায়, কেউ গয়না। সব্বাই আমার গোলামী করতে রাজী, সারাজেবন এমনকি পরজন্মেও। কিন্তু আমি ওদের হাড়ে হাড়ে চিনি। সব্বাই ভোমরা, মধু খেয়ে উড়ে যাবে। আমিও ওদের নাচাই, কখনো বাঁকা চোখে চাই কখনো হাসি। ওরা আমাকে গাধী বানাবে আর আমি ওদের উল্লুক বানাবো না? আমি মরলে ওদের চোখে একফোঁটাও জল আসবে না আর ওরা মরলে আমি বলবো 'আপদ গেছে'।" এরপর ঝুনিয়া নিজের কথা বলে, "আমি যার হবো সারাজেবন তার হয়েই থাকবো। সুখে-দুখে আপদে-বেপদে তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবো। সব্বার সঙ্গে শুধু হাসি, গল্প করি। তাতে তো দোষ নেই। আমি টাকাও চাই না, কাপড় গয়নাও চাই না। শুধু একটা ভালোমানুষ চাই যে আমাকে আপন করে নেবে আর আমিও যাকে নিজের করে পাবো। একবার কি হয়েছিল শোনো।

"আমি এক তেলকধারী পণ্ডিতের বাড়ি দুধ দিতে যেতুম। রোজ আধসের করে দুধ নিত। একদিন তার গিন্নী কোতায় নেমন্তন্নে গেছে। আমি তো জানি না; দুধ নে গিয়ে 'বৌদি' 'বৌদি' বলে ডাকছি। কেউ সাড়া দেয় না। হঠাৎ দেখি পণ্ডিত দোর বন্ধ করে আসছে। বুঝলুম ব্যাপার সুবিধের নয়। রুকে উঠে বললুম, "তুমি দোর বন্ধ করলে কেন? বৌদি কোথাও গেচে বুঝি? ঘর খালি রয়েচে।" তা বললে, 'সে নেমন্তন্নবাড়ি গেচে।' বলে আরো দু পা এগোলো। বললুম, "তোমার দুধ নেবার হয় তো নাও, নয়তো আমি চললুম।" বলে কিনা, "আজ তো তুমি যেতে পাবে না ঝুনি রাণী। রোজ রোজ আমার কলজেটায় ছুরি চালিয়ে পালাও। আজ আর বাঁচবে না। তোমায় সত্যি বলচি গোবর ভয়ে আমার রোঁয়া খাড়া হয়ে উঠলো।"

গোবর বলে, "বেটাকে পেলে মাটিতে পুঁতে ফেলবো। রক্ত চুষে খাবো। তুমি আমাকে চিনিয়ে দাও তো।"

"আরে সবটা শোনো তো। এসব লোককে কি করে জব্দ করতে হয় আমি জানি। তখন তো আমার বুক ধকধক করছিল। যদি বদমাসী করে কিছু করে বসে তাহলে কি করবো? চেঁচালেও তো কেউ শুনতে পাবে না। ঠিক করলুম, আমাকে ছুঁতে এলেই দুধের কেঁড়েটা ওর মাথায় ভাঙবো। চার পাঁচ সের দুধ যাবে, বাঁচলে মান থাকবে। শক্ত হয়ে বললুম, 'এসব চালাকি কোরো না মহারাজ, আমি গয়লার মেয়ে। এক একটা করে গোঁফ ছিঁড়ে নোব। বলি, পরের মেয়ে-বৌকে নিজের ঘরে বন্ধ করে বেইজ্জত করার কথা তোমার পুঁথি পত্তরে লেখা আচে নাকি? তাই ফোঁটা তেলক কেটে বসে আচো?' ব্যস হাতজোড় করে পায়ে পড়তে লাগলো, 'আমি তোকে ভালোবাসি ঝুনারাণী! গরীবের ওপর দয়া করো। নয়তো ভগমান তোমাকে জিজ্ঞেস

করবেন আমি তোমাকে এত যে রূপ দিলুম তা দিয়ে একটা বামুনেরও উপকার করলে না। কি জবাব দেবে? বলে কিনা, 'আমি বামুন রোজ টাকা পয়সা দান পাই আজ রূপ-যৌবন দান করো।' তা আমি তার মন বোজবার জন্যে বললুম, 'আমি পঞ্চাশ টাকা নোব।' সত্যি বলচি গোবর, সে ওমনি ঘর থেকে পাঁচ পাঁচটা দশ টাকার নোট এনে আমার হাতে দিল। আমি সব নোট মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যেই দোরের দিকে এগিয়েচি তক্ষুনি ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরেচে। আমিও দুধের কেঁড়েটা তার মাথায় ভাঙলুম। মাথা থেকে পা অব্দি দুধে ভেসে গেল। চোটও খেয়েছিল। ব্যাটা মাথায় হাত দিয়ে খুব হায় হায় করতে লাগলো, আমি তার পিঠে কষে দু লাথি কসিয়ে দরজা খুলে পালিয়ে এলুম।"

গোবর হেসে বললে, "বেশ করেচো। দুধে চান করে ব্যাটার ফোঁটা-তেলক ধুয়ে গেল বোধহয়। গোঁফটাও ছিঁড়ে নিলে না কেন?"

"পরদিন আমি আবার তার বাড়ি গেলুম। বামণী এসে গিছলো। দেখি নিজের বৈঠকখানায় মাথায় পটি বেঁধে পড়ে আচে। বললুম, 'বলো তো তোমার বউয়ের কাছে কালকের কথা ফাঁস করে দি মহারাজ।' শুনে হাত জোড় করতে লাগলো। মাটিতে মাথা ঠুকে বললে, 'আমার মানইজ্জত সব তোর হাতে ঝুনা। তুই যদি বলে দিস তাহলে বামনী আমাকে জ্যান্ত ছাড়বে না।' তা আমারও শেষে দয়া হলো।"

কথাটা গোবরের ভালো লাগলো না। বলে, "এ তুমি কি করলে? ওর বোকে বলে দিলে না কেন? জুতো পেটা করতো, বেশ হতো। এমন পাষণ্ডকে দয়া করা উচিত নয়। তুমি কালই আমাকে চিনিয়ে দাও না, আমি আচ্ছা করে মেরামত করে দোব।"

ঝুনিয়া তার শৌর্যবীর্য দেখে বলে, "তুমি ওর সঙ্গে পারবেই না। ইয়া মোটা লোক। আর ফোকটে পেলে কে না লুঠতে চায় বলো।"

গোবর নিজের অপমান সহ্য করতে পারে না। রোয়াব দেখিয়ে বলে, "মোটা তো কি হয়েছে। আমার হাড় লোহার মতো শক্ত। রোজ তিনশোবার করে ডনবৈঠক করি। দুধ, ঘি খেতে পাই না তাই, তা না হলে বুকের ছাতি আরো বেড়ে যেত।" বলে সে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়।

ঝুনিয়া তার প্রশস্ত বুকের দিকে চেয়ে আশ্বস্তভাবে বলে, "আচ্ছা একদিন দেখিয়ে দোব। কিন্তু সব্বাই তো সমান, কটাকে মেরামত করবে। আর পুরুষ মানুষের স্বভাবও বলিহারি! কোন রূপসী জোয়ান মেয়ে দেখলেই তার পেছনে লাগবে। এরা আবার সব ভদ্দরলোক। সব কটা লম্পট বদমাইস। আর আমিও তো এমন কিছু সুন্দরী নই—"

গোবর প্রতিবাদ করে, "তুমি! তোমাকে দেখলেই তো মনে হয় সব সময় বুকের মধ্যে ধরে রাখি।"

ঝুনিয়া তার পিঠে আলতো চাপড় মেরে বলে, "ও, অন্যদের মতো তুমিও

লাইন ধরেচো। আমি জানি, আমি কি। কিন্তু লোকেরা আমার দেহটা নিয়ে মজা মারতে চায়। ঘণ্টাখানেক আমোদের জন্যে এর বেশি দরকার কি। কিন্তু যার সঙ্গে সারা জেবন কাটাতে হয় মানুষ তার মধ্যেই মন খোঁজে। আমি সব দেখি, সব শুনি। আজ বড়ো ঘরেও সব বিচিত্র লীলা চলছে। যে পাড়ায় আমার শ্বশুরবাড়ি ছিল সেখানে গপড়ু নামে এক কাশ্মীরী ছিল। খুব বড়ো লোক। রোজ পাঁচ সের দুধ নিত। তার তিনটি মেয়ে, কুড়ি পঁচিশের মধ্যে বয়স, খুব সুন্দরী। বড়ো কলেজে পড়াশোনা করেচে। এক বোন কলেজে পড়াতো, তিনশো টাকা মাইনে। এ সেতার হারমুনিয়া বাজায় তো ও নাচে। আরেকজন গান করে। কিন্তু কেউ বে-থা করে না। ওরা ছেলেদের পছন্দ করতো না, না ছেলেরা ওদের বে করতে চাইতো না তা রামচন্দ্রই জানেন। আমি একবার বড়ো মেয়েকে জিজ্ঞেস করায় সে বলেছিল "আমাদের ওসব বালাই ভাল্ লাগে না।" কিন্তু ভেতর ভেতর ঠাট্টা তামাশা করতো, সব সময় দু-চারজন ছোকরা ওদের ঘিরে থাকতো। বড়ো বোন তো কোট প্যান্টালুন পরে ছেলেদের সঙ্গে ঘোড়া চড়ে হাওয়া খেতে বেরোতো। সারা শহরে ঢি ঢি, গপড়ুবাবু লজ্জায় মাথা নীচু করে থাকতো, মেয়েদের বোঝাতো। তা মেয়েরা বলতো. 'তুমি আমাদের মধ্যে কথা বলবার কে, আমরা যা খুশি তাই করবো।' বেচারা বাপ. জোয়ান মেয়েদের কি বলবে বলো? আমাদের মেরে-ধরে-বকে-ঝকে রাখতে পারে বড়োলোকদের কথায় কে কথা বলবে। ওদের তো পড়শী আর পঞ্চায়েতের ভয় নেই। আমি তো বুঝতেই পারি না, রোজ রোজ এদের মন বদলায় কি করে? মানুষ কি গরু ছাগলেরও অধম। কিন্তু কেউ তো মন্দ বলে না ভাই। মন যা চায় তাই করে। কেউ ডাল-রুটি খেয়ে মুখের স্বাদ বদলাবার জন্যে হালুয়া-পুরি খায় আবার কারুর হয়তো ডাল-রুটি রোচেই না। আবার কেউ কেউ ডাল-রুটি খেয়েই সুখে থাকে আর কিছু চায় না। আমার দুই ভাজকেই দ্যাখো না, আমার দাদারা কানাও নয়, কুঁজোও নয়, গায়ে দশটা মরদের তাকত। কিন্তু ভাজেদের পছন্দ নয়। তারা চায় সোয়ামীরা সোনার বালা দেবে, মিহি শাড়ি দেবে, ভালো খাবার খাওয়াবে। সোনার বালা কি মণ্ডামেঠাই আমারও যে ভাল্‌লাগে না তা নয় তবে তার জন্যে যদি লাজ-লজ্জা খোয়াতে হয় তাহলে ভগমান রক্ষে করুন। একজনের সঙ্গে মোটামুটি খেয়ে পরে কাটিয়ে দেওয়াই আমার সাধ। সত্যি কথা বলতে কি জানো, পুরুষের জন্যেই মেয়েরা নষ্ট হয়। ছেলেরা ইদিক ওদিক উঁকিঝুঁকি মারলে মেয়েরাও চোখে চোখে তাকায়। ছেলেরা মেয়েদের পেছনে দৌড়ুলে তারাও ঘুরবে। ছেলেদের এই স্বভাব মেয়েদের ভালো লাগে না বুঝেচো। আমি তো আমার সোয়ামীকে সাফ সাফ বলে দিইছিলুম তুমি যদি ইদিক সিদিক করো তবে আমিও যা খুশি তাই করবো। আমি মেয়ে বলে মারের ভয়ে কাবু থাকবো না। তুমি খোলাখুলি করলে আমি লুকিয়ে চুরিয়ে করবো। আমাকে জ্বালিয়ে তুমি সুখ পাবে না।"

গোবরের চোখের সামনে একটা নতুন জগৎ ভেসে উঠছিল। ঝুনিয়া প্রথমে তাকে রূপে মুগ্ধ করেছিল এবার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল। নিজের সতীত্বের কথা শুনিয়ে সে গোবরকে মুগ্ধ করলো। এমন রূপবতী গুণবতী মেয়েকে সে যদি পায় তাহলে তার জীবন ধন্য! আর সেই-বা জ্ঞাতগুস্টি কি পঞ্চায়েতের ভয়ে মরবে কেন?

ঝুনিয়া যখন দেখলো গোবর তার মোহজালে বন্দী হয়েছে তখন বুকে হাত দিয়ে জিব কেটে বলে, "আরে এ যে তোমাদের গা। তুমি জালাতেও পারো বটে। বলবে তো, এবার ফেরো।" এই বলে সে পেছন ফিরে এগোয়।

গোবর সাগ্রহে বলে, "একটুক্ষণের জন্যে আমাদের বাড়িতে চলো না। আমার মাও তোমাকে দেখতো।"

ঝুনিয়া লজ্জা পায়. "তোমার বাড়ি এখন যাবো না। আমার তো অবাক লাগছে এতদূর এলুম কি করে? আচ্ছা, আবার কবে আসবে? রাত্তির বেলা আমাদের বাড়িতে ভালো গানবাজনা হয়। এসো না, দেখা হবে।"

"আর যদি দেখা না হয়?"

"তাহলে ফিরে যাবে।"

"তাহলে আমি আসবো না।"

"আসতেই হবে, বলে দিচ্ছি।"

"তুমিও কতা দাও দেখা করবে।'

"আমি কতা দিই না।"

"তবে আমিও আসবো না।"

"আমার মাথার দিব্যি রইল।" বলে ঝুনিয়া বুড়ো আঙুল তুলে কলা দেখিয়ে চলে গেল। প্রথম মিলনেই তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ঝুনিয়া জানে গোবর আসবেই, না এসে যাবে কোথায়? গোবর জানে, ঝনিয়া দেখা করবেই, না করে কি উপায় আছে। বাকী পথটুকু হাঁটবার সময় গোবরের মনে হচ্ছিল সে যেন স্বর্গ থেকে কঠিন মাটিতে নেমে এসেছে।

৬

বেশ ভালো করে জল ছেটানোর ফলে জ্যৈষ্ঠ মাসের গুমোট গরমেও সের্মারি গ্রামের গলি-সড়ক সর্বত্র একটা স্নিগ্ধ-শীতল বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। মণ্ডপের চার পাশে ফুল আর গাছের টব সাজানো হচ্ছে, বিজলী পাখা ঘুরছে। রায়সাহেব নিজেই ডায়নামোর সাহায্যে বৈদ্যুতিক আলো-পাখার সুযোগ করে নিয়েছেন। তাঁর সেপাইরা হলদে পোষাক পরে নীল পাগড়ী বেঁধে জনসাধারণের ওপর চোটপাট দেখাচ্ছে। চারক-বাকররা সাদা উর্দীর ওপরে জাফরানী পাগড়ী বেঁধে অতিথি আর মোড়লদের আদর যত্ন করছে। এমন সময় একটা মোটর তিনজন ভদ্রলোককে নিয়ে সিং দরজায় এসে থামলো। তিনজনের মধ্যে যিনি খদ্দরের পোষাক আর চপ্পল পরেছিলেন

তাঁর নাম পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ, দৈনিকপত্র 'বিজলী'র যশস্বী সম্পাদক, স্বদেশচিন্তায় মগ্ন। আর যিনি কোট প্যান্ট পরে আছেন তিনি উকিল হলেও ওকালতীতে পশার জমাতে না পেরে এক বীমা কোম্পানীর দালালী করেন আর মহাজন ও ব্যাঙ্কের কাছ থেকে তালুকদারদের* সুদ পাইয়ে দিয়ে অনেক বেশি উপার্জন করেন এঁর নাম শ্যামবিহারী তংখা। তৃতীয় ব্যক্তির পরনে রেশমী আচকান আর চোস্ত পাজামা, ইনি মিস্টার বি মেহতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক। তিনজনেই রায়সাহেবের সহপাঠী এবং পুণ্যাহের উৎসবে আমন্ত্রিত। আজ সব এলাকার প্রজারা আসবে পুণ্যাহের টাকা দিতে। রাতে হবে 'ধনুযযজ্ঞ'** আর অতিথিদের ভূরিভোজ। হরি পুণ্যাহের জন্যে পাঁচ টাকা দিয়েছে আর গোলাপী মেরজাই গোলাপী পাগড়ী পরে, হাঁটু পর্যন্ত কোঁচা ঝুলিয়ে, মুখে পাউডার মেখে খুরপী হাতে জনকরাজার মালী সেজে গর্বে ফুলে উঠেছে। যেন তার জন্যেই এ সমস্ত আয়োজন।

রায়সাহেব অতিথিদের স্বাগত জানালেন। তাঁর দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, তেজস্বী চেহারা, ফরসা রঙ—ফিকে হলুদ শরবতী রঙের রেশমী চাদরে সুন্দর মানিয়েছে।

ওঙ্কারনাথ প্রশ্ন করলেন, "এবার কি নাটক হচ্ছে? ওটাই আমার কাছে প্রধান আকর্ষণ।"

রায়সাহেব তিনজনকে নিজস্ব ছোটখাটো সামিয়ানার নীচে বসাতে বসাতে বললেন, "আগে 'ধনুষযজ্ঞ' হবে তারপর একটা প্রহসন। কোন ভালো নাটক পাওয়া গেল না। কোনটা এত বড়ো যে শেষ হতে পাঁচ ঘণ্টা লাগে আবার কোনটা এত দুর্বোধ্য যে বোঝাই যায় না। তাই আমি নিজেই একটা প্রহসন লিখে ফেলেছি। দু ঘণ্টায় শেষ হয়ে যাবে।"

রায়সাহেবের রচনাশক্তির ওপর ওঙ্কারনাথের বিশ্বাস ছিল না। তিনি ভাবতেন প্রতিভার প্রদীপ দারিদ্র্যের অন্ধকারেই জ্বলজ্বল করে। মনোভাব লুকোতে না পেরে তিনি অবজ্ঞাভরে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

মিস্টার তংখা এসব বাজে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে নারাজ তবু রায়-সাহেবকে দেখাবার জন্যে বললেন, "দেখুন নাটকের সার্থকতা নির্ভর করে অভিনেতাদের কৃতিত্বের ওপর। ভালো নাটকও খারাপ অভিনেতার হাতে পড়ে মার খায়। যতদিন পর্যন্ত না শিক্ষিতা অভিনেত্রীরা স্টেজে আসছে ততক্ষণ নাট্যকলার উন্নতি সম্ভব নয়! এবার তো আপনি কাউন্সিলে দারুণ প্রশ্ন করে হৈচৈ বাধিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তো বলবো, কোন মেম্বারের এত ভালো রেকর্ড নেই।"

দর্শনের অধ্যাপক মিস্টার মেহতা এত প্রশংসা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তাঁর দার্শনিক যুক্তি দিয়ে বিরোধিতা করলেন। তিনি অনেক পরিশ্রম

* তালুকদার=বাংলাদেশের জমিদার

** রামায়ণের সীতা স্বয়ম্বরের রামলীলার মত অভিনয়

করে কয়েক বছর ধরে একখানি বই লিখেছেন, হালে ছাপাও হয়েছে। কিন্তু যতখানি প্রশংসা পাওয়া উচিত ছিল তার শতাংশও তিনি পাননি। তাই মনে ক্ষোভ জমেছিল। বললেন, "আমি খুব তর্কবিতর্কের মধ্যে যেতে চাই না। তবে আমার মতে আমাদের জীবনধারণ পদ্ধতি আমাদের নিজের নিজের আদর্শের অনুকূল হওয়াই উচিত। রায়সাহেব নিজেই বলেন যে তিনি প্রজাদের হিতাকাঙ্খী। তাদের নানারকম সুযোগ দেওয়া উচিত, জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ হওয়া উচিত, জমিদার সমাজের অভিশাপ অথচ তিনি নিজেই একজন জমিদার। আরো পাঁচ জন জমিদারের সংগে তাঁর কোনই প্রভেদ নেই। যদি তাঁর মনে হয় চাষীদের মুক্তি দিতে হবে তাহলে তিনি নিজেই তো এ কাজ শুরু করতে পারেন—প্রজাদের দর্শনী নেওয়া বন্ধ করুন, বেগার খাটানো ছেড়ে দিন, খাজনা মাফ করুন, গোচারণের জমি দিন। যারা কথা বলে কম্যুনিস্টের মতো আর জীবন কাটায় রাজা-বাদশার মতো তাদের আমি পছন্দ করি না। এরাই প্রকৃত স্বার্থপর।"

একথা শুনে রায়সাহেব ক্ষুণ্ণ হলেন, উকিলের কপালে ভাঁজ পড়লো আর সম্পাদকের মুখ কালো হয়ে গেল। কারণ তিনি সমাজতন্ত্রের পূজারী হলেও ঘরের চালে আগুন লাগাতে চান না। তংখা রায়সাহেবের ওকালতি করে বললেন, "আমার মনে হয় রায়সাহেব তাঁর প্রজাদের সংগে যেমন ভালো ব্যবহার করেন অন্য জমিদাররাও সেরকম করলে সব সমস্যা মিটে যায়।"

মেহতা আবার হাতুড়ি ঠুকলেন, "আচ্ছা, ধরেই নিচ্ছি আপনি প্রজাদের সংগে খুব ভালো ব্যবহার করেন, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তাতে স্বার্থ আছে কি নেই। কে না জানে যে, মাঝারি আঁচে রান্না ভালো হয়। যারা বিষ খাইয়ে মারে তাদের চেয়ে যারা গুড় দিয়ে মারে তারা কি বেশি দক্ষ নয়? আমি তো শুধু জানতে চাই, আমরা সাম্যবাদী কি না; হলে সেইরকম হও না হলে বাজে বকা ছেড়ে দাও। আমি এই নকল জীবনযাপনের বিরোধী। মাংস খাওয়া যদি ভালো বোঝো প্রাণ খুলে খাও, খারাপ বোঝো ছেড়ে দাও, সোজা হিসেব। কিন্তু 'বলবো এক করবো আর' এরকম করার মানে বুঝি না। আমি তো এদের কাপুরুষ আর ধূর্ত বলি আর আসলে ও দুটোই এক।"

রায়সাহেব অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। অপমান আর আঘাতকে ধৈর্য আর ঔদার্য দিয়ে উড়িয়ে দেওয়াই তাঁর অভ্যাস। একটু অসুবিধেয় পড়ে তিনি বললেন, "আপনার কথা একেবারে অভ্রান্ত মেহতাজী। আপনি তো জানেন আমি স্পষ্ট কথা পছন্দ করি। কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে অন্যদের মতো বিচারকেও একজায়গায় এসে থামতে হয়। মানবজীবনের ইতিহাসই তার প্রমাণ। আমি যে পরিবেশে মানুষ হয়েছি সেখানে রাজা হচ্ছেন ঈশ্বর আর জমিদার ঈশ্বরের মন্ত্রী। আমার বাবা প্রজাদের সাহায্য করতেন, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টির সময় খাজনা মাফ করে দিতেন কিন্তু এসব করতেন যতক্ষণ প্রজারা তাঁকে হুজুর ধর্মাবতার বলে পুজো করতো ততক্ষণ পর্যন্ত। প্রজাপালন তাঁর সনাতন ধর্ম হলেও নিজের অধিকার খর্ব হতে দিতেন না।

আমি এই পরিবেশেই মানুষ। তবে আমি মনে করি, আমি যে ব্যবহারই করি না কেন মনের দিক থেকে আমি তাঁকে ছাড়িয়ে গিয়েছি। কারণ আমি বিশ্বাস করি, চাষীরা এই সুযোগ সুবিধে যতক্ষণ না অধিকার হিসেবে পাবে ততক্ষণ কেউই তাদের ভালো করতে পারবে না। আমি নিজে অনেক ভেবেও স্বার্থ ছাড়তে পারিনি। আমি চাই, আইন নীতির সাহায্যে আমাদের জোর করে স্বার্থত্যাগ করতে বাধ্য করা হোক। একে আপনি ভীরুতা বলছেন আমি বলবো অসহায়তা। আমি স্বীকার করি, পরজীবী হওয়া লজ্জার কথা। প্রাণী মাত্রেরই কাজ করা উচিত। সমাজের এই ব্যবস্থা, যেখানে কিছু লোক মজা মারে আর বাদবাকী শুকিয়ে মরে কখনও ভালো হতে পারে না। পুঁজি আর শিক্ষার তাসের প্রাসাদ যত তাড়াতাড়ি ভাঙে ততই ভালো, এই ব্যবস্থাই জমিদারদের বিলাসিতার পংককুণ্ডে ডুবিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এসব কারণে আমি এ ব্যবস্থার বিরোধিতা করছি না। বরং আমি বলবো, নিজের স্বার্থেই এই ব্যবস্থা অনুমোদন করা উচিত নয়। কারণ তার জন্যেই আমরা আমাদের মনুষ্যত্বের গলা টিপে মারছি। আমরা প্রজাদের লুটেপুটে নিই কারণ অফিসারদের ভেট না দিলে চলে না। প্রগতির সামান্য স্পর্শেই ফেঁপে উঠি। আমাদের পুরুষার্থ নেই, আত্মবিশ্বাস নেই। আমরা রুপোর চামচ মুখে করে জন্মাই তো, তাই বাইরেটা মোটাসোটা কিন্তু ভেতরটা ফোঁপরা অন্তঃসারহীন।"

মেহতা হাততালি দিয়ে বললেন, "হিয়ার! হিয়ার! হায়, আপনার মুখে যত বুদ্ধির ছটা তার অর্ধেকও যদি মস্তিষ্কে থাকতো। দুঃখ এই যে সব কিছু বুঝেও আপনি বাস্তবে কিছুই করতে পারলেন না।"

ওংকারনাথ বললেন, "এক হাতে তো তালি বাজে না মেহতাজী। আমাদের যেমন সময়ের সংগে তাল মিলিয়ে চলতে হবে তেমনি সময়কেও আমাদের সুবিধে মতো ব্যবহার করতে হবে। খারাপ কাজে সাহায্য লাগে না, ভালো কাজে সহযোগিতা সবচেয়ে জরুরী। আপনিই বা কেন প্রতি মাসে আটশো টাকা মাইনে মারেন, আপনার কোটি কোটি ভাইরা যখন মাসে আট টাকাও রোজগার করতে পারে না।"

রায়সাহেব মনে মনে খুশি হয়ে বাইরে খেদ প্রকাশ করে বললেন, "ব্যক্তিগত কথা নিয়ে আলোচনা করবেন না সম্পাদকজী। আমরা এখানে সমাজ ব্যবস্থার কথা বলছি।"

মেহতা শান্তভাবে বললেন, "না-না, আমি এতে কিছু মনে করিনি। ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ গড়ে ওঠে। আর ব্যক্তিকে ভুলে আমরা কোন ব্যবস্থার সমালোচনা করতে পারি না। আমি এত টাকা বেতন নিই কারণ আমি এ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নই।"

সম্পাদক বিস্মিত হলেন, "আচ্ছা, আপনি তাহলে বর্তমান ব্যবস্থার সমর্থক।"

"আমি মনে করি, পৃথিবীতে চিরকালই ছোট বড়ো থাকবে আর থাকাই

উচিত। একে বদলাবার চেষ্টা করলে মানবজাতির সর্বনাশ ডেকে আনা হবে।"

যেন কুস্তির জুটি বদল হলো। রায়সাহেব একধারে সরে দাঁড়ালেন আর ময়দানে নামলেন ওঙ্কারনাথ, "আপনি বিংশ শতাব্দীতেও উঁচু-নীচু ভেদাভেদ মানেন?"

"হ্যাঁ মানি এবং জোরের সঙ্গেই মানি। আপনি যে মতের সমর্থক সেটাও তো কোন নতুন জিনিস নয়। যবে থেকে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়েছে তখন থেকেই তার জন্ম হয়েছে। বুদ্ধ, প্লেটো, যিশু, সকলেই তো সমাজে সাম্যবাদ প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন আর গ্রীক, রোমান, সিরিয়ান সভ্যতা সেটা পরীক্ষা করে দেখেছিল কিন্তু অবাস্তব এবং অপ্রাকৃতিক বলেই টেকেনি।"

"আপনার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।"

"আশ্চর্য হওয়া অজ্ঞানতারই নামান্তর।"

"আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আরো ভালো হয় আপনি যদি এ বিষয়ে কিছু প্রবন্ধ লেখেন।"

"আজ্ঞে আমি আহাম্মক নই। ভালোরকম কিছু দিলে চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

"আপনি তো খোলাখুলিভাবেই পাবলিককে আকৃষ্ট করতে পারেন।"

"আপনার সঙ্গে আমার পার্থক্য এই যে, আমি যা ভালো মনে করি সেই নীতি অনুসারেই চলি। আপনারা যা বলেন করেন তার উল্টো। ধনকে আপনি যে কোনভাবে সমানভাবে বণ্টন করতে পারেন কিন্তু বুদ্ধি, প্রতিভা, চরিত্র, রূপ বা শক্তিকে আপনি এভাবে ছড়াতে পারেন না। ছোট-বড়োর ভেদ তো শুধু ধনেই হয় না। আমি বড়ো বড়ো ধনকুবেরকেও ভিক্ষুকের সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে দেখেছি। আপনিও নিশ্চয় দেখেছেন। রূপের চৌকাঠে বড়ো বড়ো রাজা উজীর নাকে খত দিচ্ছেন, এও কি সামাজিক বৈষম্য নয়? আপনি রাশিয়ার উদাহরণ দেবেন। ওখানেই বা কি আছে, বলুন? মিল মালিকেরা রাজ কর্মচারীর রূপ নিয়েছে। বুদ্ধি তখনও রাজত্ব করতো, এখনও করে, ভবিষ্যতেও করবে।"

রেকাবি করে পান এসে গেল। রায়সাহেব অতিথিদের পান-এলাচ দিতে দিতে বললেন, "বুদ্ধি যদি স্বার্থমুক্ত হয় তাহলে তার প্রভুত্ব মানতে আমার আপত্তি নেই। সাম্যবাদের আদর্শই তাই। আমরা সাধু মহাত্মাদের সামনে মাথা নীচু করি কারণ তাঁদের ত্যাগের শক্তি আছে। এই ভাবেই আমরা বুদ্ধির হাতে নেতৃত্ব অধিকার আর সম্মান দিতে চাই কিন্তু সম্পদ নয়। বুদ্ধির অধিকার আর সম্মান ব্যক্তির সঙ্গে চলে যায় কিন্তু বিষয় সম্পত্তি যায় না। বুদ্ধি ছাড়া সমাজ চলতে পারে না। আমরা কেবল তার হুল ভেঙে দিতে চাই।"

আরেকটা মোটর এসে গেল। গাড়ি থেকে নামলেন মিস্টার খান্না। তিনি একাধারে একটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও একটি সুগার মিলের ম্যানেজিং ডাইরেকটর। তাঁর সঙ্গে দুজন মহিলা—যিনি খদ্দরের শাড়ি পরা, গম্ভীর

ও বিচারবোধসম্পন্না তিনি হচ্ছেন মিস্টার খান্নার স্ত্রী, কামিনী* খান্না। দ্বিতীয়া মিস মালতী। তাঁর মুখে মিষ্টি হাসি, পায়ে হাই হিল জুতো। তিনি বিলেত থেকে ডাক্তারী পাশ করে এখানে প্র্যাকটিশ করছেন। তালুক-দারদের মহলে তাঁর অবাধ প্রবেশাধিকার। রায়সাহেব তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন।

মালতীকে দেখলেই বোঝা যায় তিনি নবযুগের সাক্ষাৎ প্রতিমা। তাঁর সর্বাঙ্গে কোমল লাবণ্যের সঙ্গে মিশে আছে যৌবনের চাপল্য। কোথাও কোন আড়ষ্টতা নেই বরং চড়া মেক-আপে অভ্যস্ত প্রগলভা মালতীকে প্রথম দর্শনে ছলনাময়ী বলেই মনে হয়। পুরুষ মনোবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ, আমোদ প্রমোদে উচ্ছল মালতীকে অন্তঃসারশূন্য সপ্রতিভ মেয়ে বলাই ভালো। তিনি মেহতার হ্যান্ডসেক করে বললেন, "সত্যি বলছি, আপনাকে দেখলেই বোঝা যায় আপনি একজন ফিলসফার। এবারের নতুন প্রবন্ধে তো দেখলাম আপনি ভাববাদী-দের ওপর খুব চটা, পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল আপনার সঙ্গে তর্ক করি। দার্শনিকরা সহৃদয় হয় না কেন বলুন তো?"

মেহতা লজ্জা পেলেন। তিনি অবিবাহিত এবং আধুনিকাদের এড়িয়ে চলেন। পুরুষদের সঙ্গে খুব বাকযুদ্ধ চালালেও মহিলাদের দেখলেই তাঁর বুদ্ধির ঘরে তালা পড়তো। নারীদের সঙ্গে স্বাভাবিক শিষ্ট ব্যবহার করতেও ভুলে যেতেন। মিঃ খান্না বললেন, "দার্শনিকদের চেহারার বৈশিষ্ট্য কি বলুন তো?"

মালতী মেহতার দিকে সদয় চোখে চেয়ে বললেন, "মেহতাজী আপত্তি না করেন তো বলি।"

খান্না মালতীর ভক্তদের একজন। মালতী কোথাও গেলেই তিনি ভোমরার মতো ঘুরে ফিরে বেড়ান। সব সময় চাইতেন মালতীর সঙ্গে তিনিই বেশি কথা বলবেন আর মালতীর নজরও তাঁর ওপরেই পড়বে। চোখ টিপে বললেন, "ফিলসফাররা কারুর কথায় রাগ করেন না। এটাই ওঁদের সবচেয়ে বড়ো গুণ।"

"তাহলে শুনুন, ফিলসফারদের প্রাণে রসকষের বালাই থাকে না। যখনি দেখুন, নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে। তিনি আপনার দিকে তাকাবেন কিন্তু আপনাকে দেখবেন না; আপনি কথা বললে উত্তরও পাবেন না। সব-সময় যেন শূন্যে ভাসমান।"

সবাই হেসে উঠলেন আর মেহতা লজ্জায় মাটিতে মিশে গেলেন। মালতী আবার বললেন, "অক্সফোর্ডে আমাদের ফিলসফির প্রফেসার ছিলেন হাসব্যান্ড।"

খান্না টুকলেন, "নামটি তো বেশ অদ্ভুত।"

"হ্যাঁ। অথচ বিয়ে করেননি..."

* প্রেমচন্দ এখানে মিসেস খান্নার নাম লিখেছেন কামিনী কিন্তু পরে গোবিন্দী থাকায় আমরা প্রথম নামটিই ব্যবহার করলাম।

"মিস্টার মেহতাও তো অবিবাহিত।"

"এ রোগ সব ফিলসফারকেই ধরে।"

এবার মেহতা সুযোগ পেয়ে বললেন, "আপনিই তো এই রোগের রুগী।"

"আমি প্রতিজ্ঞা করেছি বিয়ে যদি করতেই হয় তো এক ফিলসফারকেই করবো কিন্তু তাঁরা বিয়ের কথা শুনলেই দশ হাত পেছিয়ে যান। হাসব্যান্ড-সাহেব তো মেয়েদের দেখলেই ঘরে লুকিয়ে পড়তেন। ছাত্রীরা না বলে কয়ে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি এত ঘাবড়ে যেতেন যে মনে হতো একটা বাঘ এসে পড়েছে। আমরা তাঁকে খুব জ্বালাতুম কিন্তু তিনি ছিলেন গোবেচারা সরল প্রকৃতির মানুষ। কয়েক হাজার টাকা মাইনে পেতেন কিন্তু আমরা সবসময় তাঁকে একটাই স্যুট পরতে দেখেছি। তিনি অনেক সময় খেতেও ভুলে যেতেন। লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের ভয়ে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে লেখাপড়া করতেন। খাবার সময় তাঁর বোন আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে তাঁর বইটা কেড়ে নিলে তিনি বুঝতেন খাবার সময় হয়েছে। রাত্রে তাঁর বোন এসে ঘরের আলো নিবিয়ে দিতেন। একদিন তো তাঁর বোন বই কেড়ে নিতে এলে তিনি বইটা বুকে চেপে বোনের সঙ্গে ঝুটোপুটি শুরু করলেন। শেষে তাঁর বোন চাকাওয়ালা চেয়ারটাই খাবার ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন।"

রায়সাহেব বললেন, "কিন্তু মেহতাসাহেব তো খুব খোশমেজাজ দিল-খোলা মিশুকে লোক।"

"তাহলে উনি ফিলসফার নন। যখন নিজের ভাবনাতেই আমাদের মাথা ধরে যায় তখন বিশ্বের চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে কেউ খুশী থাকতে পারে?"

ওদিকে ওঙ্কারনাথ শ্রীমতী খান্নার সঙ্গে নিজের আর্থিক অসুবিধের কথা বলছিলেন, 'বুঝলেন মিসেস খান্না, সম্পাদকের জীবন হচ্ছে এক দীর্ঘ বিলাপ। যা শুনে লোকে দয়া করার বদলে কানে আঙুল দেয়। বেচারা না পারে নিজের উপকার করতে, না পরের। পাবলিক আশা করে হরেক আন্দোলনে সম্পাদক সবার আগে জড়িয়ে পড়বে, জেলে যাবে, মার খাবে, ঘরের জিনিওপত্র নস্যাৎ করবে এবং এই তার ধর্ম। কিন্তু তার অসুবিধের কথা কেউ ভাবে না' এদিকে আবার তাকে সর্ববিদ্যায় পারঙ্গম হতে হবে অথচ তার বেঁচে থাকবার অধিকার নেই। আজকাল তো আপনি কিছু লিখছেন না। আপনার সেবা করবার যে সামান্য সৌভাগ্য আমি পাই, তা থেকে কেন আমায় বঞ্চিত করছেন বলুন তো?"

মিসেস খান্না কবিতা লেখেন। এই সূত্রে তিনি ওঙ্কারনাথের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ করতেন কিন্তু ঘরসংসারের কাজের চাপে ইদানীং কিছু লিখতে পারেননি। সত্যি কথা বলতে কি, ওঙ্কারনাথের উৎসাহেই তিনি কবি হয়েছিলেন, সত্যিকারের প্রতিভা তাঁর ছিল না।

"কি লিখব? কিছু ভেবেই পাই না। আপনি মালতীকে কখনো লিখতে বলেন না কেন?"

"ওঁর সময় খুব মূল্যবান কামিনী দেবী! যাদের অন্তরে বেদনা, দরদ ও ভালোবাসা আছে তারাই লিখতে পারে। যারা অর্থ আর ভোগবিলাসকে জীবনের লক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছে তারা কিই-বা লিখবে?"

কামিনী ঈর্ষামিশ্রিত আনন্দে বললেন, "আপনি ওঁকে দিয়ে যদি লেখাতে পারেন তাহলে আপনার কাগজের প্রচার দ্বিগুণ হয়ে যাবে। লক্ষ্ণৌয়ের রসিকরা আপনার পত্রিকার গ্রাহক হবেন।"

"যদি অর্থ উপার্জনই জীবনের আদর্শ হতো তাহলে আমার আজ এ দশা হতো। আমিও টাকা রোজগার করতে জানি। কিন্তু প্রবৃত্তি হয় না। সাহিত্যসেবাই আমার জীবনের ধ্যানজ্ঞান।"

"অন্ততঃ আমার নামটা গ্রাহক হিসেবে লিখে নিন।"

"আপনার নাম গ্রাহক হিসেবে নয়, পৃষ্ঠপোষক হিসেবে লিখবো।"

"পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কোন রাণী মহারাণীকে রাখুন। যাঁদের একটু খোশামোদ করলেই পত্রিকা প্রচারকে লাভের ব্যবসা করে তুলতে পারবেন।"

"আমার রাণী মহারাণী তো আপনি। আমি তো আপনার পাশে কোন রাণী মহারাণীকে যোগ্য মনে করি না। যার বিবেক আছে, দয়া আছে তিনিই আমার কাছে রাণী। খোশামোদকে আমি ঘৃণা করি।"

কামিনী ঠাট্টা করে বললেন, "কিন্তু আপনি তো আমার খোশামোদই করছেন সম্পাদকমশাই!"

ওঙ্কারনাথ গম্ভীর হয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "একে খোশামোদ বলবেন না কামিনীদেবী। এ হলো আমার মনের কথা।"

রায়সাহেব ওদিক থেকে ডাকলেন, "ওঙ্কারনাথজী একটু এদিকে আসুন। মালতী আপনাকে কিছু বলবেন।"

সম্পাদকের সমস্ত দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্যের মুখোশ উড়ে গেল। তিনি একেবারে বিনয় ও নম্রতার প্রতীক হয়ে মালতীর কাছে ছুটে গেলেন। মালতী তাঁকে সদয় নেত্রে দেখে বললেন, "আমি এখনই বলছিলাম যে পৃথিবীতে আমি সম্পাদকদের সবচেয়ে বেশি ভয় পাই। আপনারা যাকে খুশি, এক মিনিটে বিগড়ে দিতে পারেন। আমাকে তো চীফ সেক্রেটারী একবার বলেছিলেন, আমি যদি এই ব্লাডি ওংকারনাথকে জেলে পাঠাতে পারি তাহলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবো।"

ওঙ্কারনাথের বড়ো বড়ো গোঁফ খাড়া হয়ে উঠলো, চোখে গর্বের জ্যোতি ঝিলিক মারলো। এমনিতে উনি খুব শান্ত প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু প্রশংসা শুনলে উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। দৃঢ় স্বরে বললেন, "এজন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। ঐ সভায় আমাকে নিয়ে আলোচনা তো হয়েছে তা সে যেভাবেই হোক। আপনি সেক্রেটারীমহাশয়কে বলে দেবেন যে ওংকারনাথ এইসব ধমকধামকের ভয় পাবার লোক নয়। তার জীবন শেষ হলে তবেই তার কলম বিশ্রাম নেবে। সে দুর্নীতি আর স্বেচ্ছাচারের শেকড় উপড়ে ফেলার ভার নিয়েছে।"

মালতী মন্তব্য করলেন, "কিন্তু আমি একটা কথা বুঝতে পারি না। যখন মামুলী ভদ্র ব্যবহার করেই সহযোগিতা পাওয়া যায় তখন আপনি এদের পেছনে লাগেন কেন? যদি আপনার সমালোচনায় আগুন আর বিষের জ্বালা একটু কম করেন তাহলে আমি কথা দিতে পারি আমি আপনাকে অনেক সরকারী সাহায্য পাইয়ে দেব। জনসাধারণকে তো আপনি চেনেন। তাদের কাছে আপীল করেছেন, খোশামোদ করেছেন, নিজের কষ্টের কথা বলেছেন কিন্তু কোন লাভ হয়নি। এবার একটু শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতাও দেখুন। তিনমাস পরে যদি মোটরগাড়ি চড়ে না বেরোন কি সরকারী নিমন্ত্রণ না পান তো আমাকে যা খুশি তাই বলবেন। তখন এই ধনী আর ন্যাশানালিস্টরা, যারা আপনার পরোয়া করে না তারাও আপনার দরজায় ঘোরাঘুরি শুরু করে দেবে।"

ওঙ্কারনাথ অভিমান করে বললেন, "আমার দ্বারা এসব হবে না মালতী-দেবী। আমি নিজের আদর্শকে সবসময় ওপরে রেখেছি। যতদিন বাঁচবো ততদিন রক্ষা করবো। ধনের পুজারী তো পথে ঘাটে ছড়িয়ে রয়েছে। আমি আদর্শের পুজারী।"

"আমি একে ভণ্ডামি মনে করি।"

"আপনার অভিরুচি।"

"অর্থকে আপনি মূল্যবান মনে করেন না?"

"আদর্শকে হত্যা করে নয়।"

"তাহলে আপনার পত্রিকায় বিলিতি জিনিষের বিজ্ঞাপন থাকে কেন? আমি তো আর কোন কাগজে এত বিলিতি বিজ্ঞাপন দেখিনি। আপনি আদর্শবাদী সেজে বসে আছেন অথচ নিজের সুবিধের জন্যে দেশের টাকা বিদেশে পাঠাতে আপনার একটুও দুঃখ নেই। আপনি কোন যুক্তি দিয়েই এটা সমর্থন করতে পারেন না।"

"ওঙ্কারনাথের কাছে সত্যিই এর কোন উত্তর ছিল না। তাঁকে বিপন্ন দেখে রায়সাহেব ওঁকে সাহায্য করবার জন্যে বললেন, "আপনি কি চান বলুন তো? এদিক থেকেও মার খাবে আবার ওদিক থেকেও মার খাবে? কাগজ চলবে কি করে?"

মালতী দয়া করতে শেখেননি। বললেন, "না চলে তো বন্ধ করে দিন। নিজের কাগজ চালাবার জন্যে বিলিতি জিনিষ প্রচার করার অধিকার কারোর নেই। আর যদি আপনি নিরুপায় হন তাহলে আদর্শবাদের ভণ্ডামি ছাড়ুন। আমি তো এসব আদর্শবাদী কাগজ দু চক্ষে দেখতে পারি না। ইচ্ছে করে দেশলাই জ্বেলে পুড়িয়ে দিই। যে নিজের কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে পারে না সে আর যাই হোক যুক্তিবাদী নয়।"

মেহতা খুশি হলেন। কিছুক্ষণ আগে তিনিও ঠিক এই কথাই বল-ছিলেন। ভাবলেন মহিলাটি শুধু রঙীন প্রজাপতি নয়, বিচারশক্তিও আছে। তাঁর সংকোচ কমতে থাকে। বললেন, "আমিও তো এ কথাই বলছিলাম।

কাজে এবং কথায় সামঞ্জস্য না থাকাই বঙ্গজাতির লক্ষণ।"

মালতী প্রসন্ন মুখে বললেন, "তাহলে এ বিষয়ে আমরা একমত। আমিও নিজেকে ফিলসফার বলে দাবি করতে পারি।"

খান্নার জিভ কুটকুট করছিল। এবার বললেন, "আপনার এক এক অংগ ফিলসফীতে ডুবে আছে।"

মালতী তাঁর রাশ টানলেন, "আচ্ছা, আপনারও ফিলসফীতে দখল আছে। আমি তো ভাবছিলাম আপনি অনেক আগেই নিজের ফিলসফীর গঙ্গায় ডুবে গেছেন। নাহলে এত ব্যাঙ্ক আর কোম্পানীর ডিরেক্টর হতে পারতেন না।"

রায়সাহেব খান্নার পক্ষ নিলেন, "আপনি কি মনে করেন ফিলসফার সব সময় দীন দরিদ্র ফকির হয়ে ঘুরে বেড়াবে?"

"নিশ্চয়ই। ফিলসফার যদি মোহ জয় করতে না পারে তবে আবার কিসের ফিলসফার?"

"আপনার মতে তাহলে মিস্টার মেহতাও ফিলসফার নন।"

মেহতা যুদ্ধে নেমে বললেন, "আমি তো কখনো এমন কথা বলিনি রায়-সাহেব। আমি শুধু বলি, যে যন্ত্রপাতি দিয়ে কামার কাজ করে সেই যন্ত্র-পাতি দিয়ে স্যাকরা কাজ করে না। আপনি কি চান, আপনিও বাবলা কিংবা তালগাছের মতো ফুলে ফলে ভরে ওঠেন। আমার কাছে অর্থ কয়েকটি সুযোগ-সুবিধের নাম। যার সাহায্যে আমি জীবন সার্থক করে তুলতে পারি। অর্থ আমার কাছে বড়ো হবার সার্থক হবার উপায়মাত্র। আপনি যদি জীবনকে সার্থক করে তোলার উপকরণগুলি আমাকে জুটিয়ে দিতে পারেন তাহলে আমার অর্থের কোন প্রয়োজন নেই।"

ওংকারনাথ সাম্যবাদী, তিনি ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকার করতে পারলেন না। বললেন, "শ্রমিকরাও তো বলতে পারে তাদের কাজ করার সুবিধের জন্যে এক হাজার টাকা মাইনের প্রয়োজন আছে।"

যদি আপনি মনে করেন ঐ শ্রমিকদের ছাড়া আপনার কাজ চলবে না তাহলে আপনাকে ঐ সুবিধে দিতেই হবে। আর ঐ কাজই যদি অন্য শ্রমিক অল্প মজুরিতে করে দেয় তাহলে প্রথম শ্রমিকদেব খোশামোদ করার দরকার নেই।"

"যদি শ্রমিকদের হাতে ক্ষমতা থাকতো তাহলে তাদের কাছেও ফিলসফার-দের মতো সুরা ও নারী প্রয়োজনীয় জিনিষ হতো।"

"বিশ্বাস করুন, আমি তাদের ঈর্ষা করতাম না।"

"যদি আপনি জীবনকে সার্থক করে তোলার জন্যে স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় মনে করেন তাহলে নিজে বিয়ে করছেন না কেন?"

মেহতা নিঃসংকোচ বললেন, "কারণ আমি মনে করি, মুক্ত ভোগ আত্মার বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। বিবাহ আত্মা ও জীবনকে বন্দী করে।"

খান্না সমর্থন করলেন, "বন্ধন আর যন্ত্রণা পুরনো থিওরী। নতুন থিওরীতে মুক্ত জীবন যাপনকে সমর্থন করা হয়।"

মালতী মন্তব্য করেন, "তাহলে মিসেস খান্নাকে তালাক নেবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে।"

"ডিভোর্সের বিল পাশ হোক, তবে তো।"

"বোধহয় আপনিই প্রথম সেই সুযোগ নেবেন।"

কামিনী মালতীর দিকে বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। মালতী মেহতাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ বিষয়ে আপনার কি মত মিস্টার মেহতা?"

"বিবাহ একটি সামাজিক চুক্তি। তাকে ভাঙবার অধিকার পুরুষ বা নারী কারুর নেই। চুক্তি করার আগে আপনি স্বাধীন। কিন্তু চুক্তির পরে আপনার হাত কাটা গেছে ধরে নিতে হবে।"

"তাহলে আপনি তালাকের বিরোধী, এই তো?"

"নিশ্চয়ই।"

"আর মুক্ত ভোগের সিদ্ধান্ত?"

"সে যাঁরা বিয়ে করেননি তাঁদের জন্যে।"

"আত্মার সম্পূর্ণ বিকাশ তো সবাই চায়। তাহলে কে বিয়ে করবে আর কেনই বা করবে?"

"করবে কারণ মুক্তি সবাই চাইলেও এমন লোক খুব কমই আছে, যে লোভের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে।"

"আপনি বিবাহিত না অবিবাহিত কোন ধরণের জীবন যাপনকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন?"

"সমাজের দিক থেকে বিবাহিত জীবন আর ব্যক্তির দিক থেকে অবিবাহিত জীবন।"

'ধনুষযজ্ঞে'র সময় হয়ে গিয়েছিল। দশটা থেকে একটা পর্যন্ত 'ধনুষযজ্ঞ হবে. একটা থেকে তিনটে প্রহসন অতিথিদের থাকবার জন্যে বাঙলোতে আলাদা আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে। সবাই নিজের নিজের ঘরে গিয়ে পোষাক বদলে পুনরায় খাবার ঘরে জড়ো হলেন। এখানে ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই নেই। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই খেতে বসেছেন। শুধু ওংকার-নাথ নিজের ঘরে ফলাহার করতে গিয়েছেন আর কমিনীর মাথা ধরেছিল বলে তিনি আসেননি। অতিথিদের সংখ্যা পঁচিশ জনের কম হবে না। সেখানে মদ মাংসের ঢালাও ব্যবস্থা। রায়সাহেব নানারকমের উৎকৃষ্ট সুরা সংগ্রহ করেছেন। মাংসও ছিল নানারকম—কোফতা, কাবাব, পোলাউ, মুর্গী, পাঁঠা. হরিণ, তিতির, ময়ূর—যার যা পছন্দ সে তাই খেতে পারে।"

খাওয়া দাওয়া শুরু হতে মালতী জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, সম্পাদক মশাইকে দেখছিনে তো, কোথায় গেলেন? কাউকে পাঠিয়ে দিন না রায়-সাহেব, ওঁকে ধরে আনুক।"

"উনি বৈষ্ণব, ওঁকে এখানে ডেকে কেন বেচারার ধর্ম নষ্ট করবেন? বড্ড গোঁড়া মানুষ।"

"আর কিছু না হোক একটু তামাশা করা যাবে।" হঠাৎ একজন অতিথিকে দেখে মালতী বললেন, "আরে মির্জা খুরশেদ আপনিও এসে গেছেন? তাহলে একাজের ভার আপনাকেই দেওয়া হলো। আপনার দক্ষতার পরীক্ষাও হয়ে যাক।"

মির্জা খুরশেদের দোহারা গড়ন, বড়ো বড়ো গোঁফ আর মাথা ভর্তি টাক; গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা আর চোখদুটোয় নীলচে আভা। তাঁর পরনে আচকান ও চুড়িদার পাজামা, মাথায় হ্যাট। ভোটের সময় ন্যাশানালিস্ট পার্টিকে ভোট দেন। সুন্নী মুসলমান, দুবার হজ সেরে এসেছেন কিন্তু খুবই পান করেন। বলেন, 'আমি যখন খোদার একটা হুকুমও তামিল করতে পারিনি তখন ধর্মের জন্যে প্রাণ দিতে যাবো যেন?' খুব হাসিখুশি হুল্লোড়ে মানুষ। আগে বসরায় ঠিকে কারবারে লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন। কিন্তু এক মেমসাহেবকে ভালোবেসে বিপদে পড়লেন। মামলা-মোকর্দমায় সর্বস্বান্ত হয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঐ মুলুক ছেড়ে এ দেশে চলে আসতে বাধ্য হলেন। এদেশে এসে বাদবাকী যা ছিল তাও খুইয়ে লক্ষ্ণৌ-এ এসে যখন নামলেন তখন তাঁর পোষাকটি ছাড়া কিছুই ছিল না। রায়সাহেব এবং অন্য বন্ধুদের সাহায্যে শেষে একটা জুতোর দোকান খুললেন। এখন সেই দোকানটিই লক্ষ্ণৌয়ের সেরা জুতোর দোকান, রোজ চার-পাঁচ শো জুতো বিক্রী হয়। তারপর জনগণের বিশ্বাসভাজন হয়ে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই এক জাঁদরেল মুসলমান তালুকদারকে হারিয়ে কাউন্সিল পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। তিনি নিজের জায়গায় বসে বসে বললেন, "আজ্ঞে না আমি কারুর ধর্ম নষ্ট করি না। একাজ আপনারই করা উচিত। ওকে আপনি যদি আজ মদ খাওয়াতে পারেন তবে আপনার রূপের জাদুরও পরীক্ষা হয়ে যাবে।"

সবাই চেঁচিয়ে উঠলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, মালতী দেবী, পরীক্ষা হয়ে যাক।"

মালতী মির্জাকে বললেন, "কিছু পুরস্কার দেবেন?"

"একশো টাকার একটি থলি।"

"ধ্যুৎ! এক শো টাকা। লাক্ষ টাকার ধর্ম নষ্ট করবো এক শো টাকার জন্যে।"

"আচ্ছা আপনিই বলুন।"

"এক হাজারের এক কানাকড়িও কম নয়।"

"আচ্ছা রাজী।"

"আজ্ঞে না, টাকা এনে মিস্টার মেহতার কাছে জমা রাখুন।"

মির্জা তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে একশো টাকা বার করে সেটা দেখিয়ে বললেন, "ভাই সব, এ আমাদের সমস্ত পুরুষের মান-সম্মানের প্রশ্ন! যদি মালতীদেবীর ফরমায়েস পূর্ণ না হয় তাহলে আমাদের মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। আমার কাছে টাকা থাকলে আমি দিতাম। একজন শায়ের* তো

* শায়ের=কবি

তাঁর প্রিয়তমার একটি কালো তিলের জন্যে সমরকন্দ আর বুখারা সুবা দান করেছিলেন। আজ আপনাদের পৌরুষ ও নারীর সৌন্দর্যের পরীক্ষা হবে। যার কাছে যা আছে সব বার করুন। আপনাদের মানসম্মানের দিব্যি পেছু হটবেন না। এমন তামাশা লাক্ষ টাকার হলেও সস্তা হতো। দেখুন, লক্ষ্ণৌয়ের রাণী একজন পুরুষের ওপর কিভাবে যাদুমন্ত্র খাটান।" বক্তৃতা শেষ করেই মির্জা সবার পকেট তল্লাশী শুরু করলেন। প্রথমে মিস্টার খান্নার পকেট দেখা হলো। মাত্র পাঁচ টাকা বেরোলো। মির্জা হতাশ হয়ে বললেন, "বাঃ খান্নাসাহেব বাঃ! 'নাম বড়ে দর্শন থোড়ে' এতগুলো কোম্পানীর ডিরেক্টর, লাখটাকার ওপর আমদানী আর আপনার পকেটেই মোটে পাঁচ টাকা! 'লাহৌল বিলা কুবত'। কই মিস্টার মেহতা কই? আপনি একটু যান তো মিসেস খান্নার কাছ থেকে কম করেও একশো টাকা উসুল করে আনুন!"

খান্না রেগে উঠলেন, "আজ্ঞে না, তাঁর কাছে এক পয়সাও নেই। কে জানতো যে আপনি এখানে তল্লাশী করবেন।"

"যাক, আপনি চুপ করুন। আমার নিজের ভাগ্যের পরীক্ষাই হোক।"

"আচ্ছা আমিই জিজ্ঞেস করে আসছি।"

"না মশাই, আপনি এখান থেকে নড়তে পারবেন না। মিস্টার মেহতা আপনি ফিলসফার, মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিত। দেখবেন, হেরে আসবেন না যেন।"

মেহতা মদ খেলেই মাতাল হয়ে যান। তিনি প্রায় লাফিয়ে উঠে মিসেস খান্নার ঘরে গেলেন এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে মুখ নীচু করে ফিরে এলেন।

মির্জা বললেন, "আরে, এ কী? খালি হাতে?

রায়সাহেব হেসে মন্তব্য করলেন, "কাজী কে ঘর চুহে ভী সয়ানে"।*

মির্জা আবার বললেন, "খান্নাসাহেবের কপাল ভালো! খোদা কসম!"

মেহতা হো-হো করে হেসে পকেট থেকে পাঁচটা একশো টাকার নোট বার করে দিলেন। মির্জা দৌড়ে গিয়ে মেহতাকে জড়িয়ে ধরলেন আর চারদিক থেকে রব উঠলো, "সাবাশ! কামাল করে দিলেন। বাহাদুর বটে। হবে না কেন ফিলসফার তো।"

মির্জা নোটগুলিকে একেবারে চোখের কাছে ধরে বললেন, "ভাই মেহতা আজ থেকে আমি আপনার শাগরেদ হলাম। বলুন কি করে যাদুর খেলা দেখালেন?"

মেহতা রাঙা চোখে চারদিকে তাকিয়ে বললেন, "আরে কিছু না, কিছু না। এ আর এমন কি কাজ। গিয়ে বললাম, 'ঘরে আসতে পারি।' তা বললেন, 'কে মেহতাজী, আসুন।' আমি তাঁকে বললাম, 'ওখানে ব্রীজ খেলা হচ্ছে! মিস মালতীর হাতে আংটিটা দেখেছেন তো, হাজার টাকার কম নয়। ওটাই বাজী রেখেছেন, আপনি পাঁচশো টাকা দিয়ে হাজার টাকার বাজী জিতে নিন। মালতী ভেবেছেন বোধহয় এখানে কারুর কাছে অত টাকা নেই। অমনি হেসে

* কাজী কে ঘর চুহে ভী সয়ানে—কাজীর ঘরে ইঁদুরও চালাক।

ব্যটুয়া খুলে পাঁচটি নোট বার করে দিয়ে বললেন, 'আমি হাতে কিছু না নিয়ে ঘর থেকে বেরোই না, কে জানে কখন কি দরকার পড়ে।"

খান্না খেঁকিয়ে উঠে বললেন, "আমাদের প্রফেসাররাই যদি এরকম হয় তাহলে য়ুনিভারসিটির অবস্থা কি হবে ভগবানই জানেন।"

মির্জা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে বললেন, "আরে এ আর এমন কি ব্যাপার, যে আপনার মন খারাপ হয়ে গেল। খোদা যদি আমাকে দিয়ে মিথ্যে না বলান তাহলে বলবো এতো আপনার একদিনের উপার্জনের টাকা। আর টাকাটা পড়ছেও মালতীর হাতে। যদি একদিনের জন্যে অসুখেই পড়তেন তাহলে কি হতো? টাকা মালতীর হাতেই যেতো। আর আপনার মনের ব্যথার ওষুধও তো মালতীর কাছেই রয়েছে, না কি ?"

মালতী ঠেস দিয়ে বললেন, "দেখুন মির্জাজী, কথায় বলে না "তবেলে মে লাতিআহুজ"* ভালো লাগে না।"

মির্জা জিভ কাটলেন, "কান মলছি।"

মিস্টার তংখার পকেট থেকে কষ্টেসৃষ্টে দশ টাকা বেরোলো। মেহতার পকেট থেকে শুধু একটা আধুলি। অন্যান্যরা নিজে থেকেই একটাকা দু টাকা করে দিলেন। গুণে দেখা গেল তিনশো টাকা কম পড়ছে সেটুকু রায়সাহেব পূরণ করে দিলেন।

ওঙ্কারনাথ কিছু ফল-মিষ্টি খেয়ে শুয়েছিলেন। রায়সাহের তাঁকে ডাকতে এলেন, "আপনাকে মালতীদেবী একটু স্মরণ করেছেন।"

ওঙ্কারনাথ খুশি হয়ে বললেন, "মালতী আমায় ডাকছেন ? তাহলে আমার কপাল ভালো বলতে হবে।" তিনি রায়সাহেবের সঙ্গেই হলঘরে ফিরে এলেন।

ইতিমধ্যে চাকরেরা টেবিল পরিস্কার করে দিয়ে গেছে। মালতী এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালে ওঙ্কারনাথ সবিনয়ে বললেন, "বসুন বসুন। আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমি এমন কিছু তালেবর লোক নই।"

মালতী শ্রদ্ধামেশানো কণ্ঠে বললেন, "আপনি একে কষ্ট করা বলছেন, আমি তো মনে করি, আমি নিজের সম্মান বাড়াচ্ছি। যদিও আপনি নিজেকে 'কিছু না' বলে বিনয় প্রকাশ করছেন কিন্তু এখানে যাঁরা এসেছেন তাঁরা সবাই আপনার দেশভক্তি ও সাহিত্যসেবার সঙ্গে পরিচিত। আপনি যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন এখন হয়তো লোকে তার মূল্য বুঝতে পারছে না কিন্তু একদিন পারবে। আর সেদিনও খুব দূরে নেই, আমি তো বলবো, সে সময় এসে পড়লো বলে—যখন আপনার নামে রাস্তা তৈরি হবে, ক্লাব তৈরি হবে, টাউন হলে আপনার ছবি টাঙানো থাকবে। এখন যে একটু সচেতনতা এসেছে সে সবই হয়েছে আপনার চেষ্টায়। আপনার গ্রামোদ্ধার আন্দোলনে সবাই সাহায্য করতে রাজী। সবাই চাইছেন একাজ করবার জন্যে আপনার নেতৃত্বে একটা গ্রামোদ্ধার সংঘ স্থাপন করা হোক।"

* তবেলে মে লাতিআহুজ=আস্তাবলে বসে ঘোড়ার লাথি খাওয়া

ওঙ্কারনাথ জীবনে এই প্রথম ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে এত সম্মান পেলেন। তিনি কখনো কখনো জনসভায় বক্তৃতা করতেন, কোন কোন সভায় সম্পাদক বা উপ-সম্পাদক হয়েছেন কিন্তু শিক্ষিত সমাজে এখনও তিনি উপেক্ষিত। অন্য পথ না পেয়ে তিনি জনসভায় তাদের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তা ও স্বার্থান্ধতার অভিযোগ করেন ও নিজের পত্রিকায় তাদের এক হাত করে নিতেন। ওঙ্কারনাথের কলমে শক্তি আছে, ভাষাও ওজস্বী কিন্তু সংযমের পরিবর্তে বাগাড়ম্বরের ঘটা দেখে সুধীসমাজ তাঁকে শূন্য ঢোলের মতো অসার বস্তু বলে মনে করেন। সেই সমাজে আজ তাঁর এত সম্মান। আজ কোথায় গেল 'স্বরাজ', 'স্বাধীন ভারত' আর 'হান্টার' পত্রিকার সম্পাদকেরা, তারা এসে দেখুক আর জ্বলে মরুক। ওঁংকারনাথ কৃতজ্ঞতায় পুলকিত হয়ে বললেন, "মালতী দেবী আপনি যে আমাকে কাঁটার মুকুট পরাচ্ছেন। আমি যা করেছি নিজের কর্তব্য মনে করে করেছি। এ সম্মান আমার প্রাপ্য নয়। যে উদ্দেশ্যে আমি জীবন উৎসর্গ করেছি সেই কাজই হচ্ছে এই সম্মানের যোগ্য। কিন্তু আমার বিনীত অনুরোধ, সভাপতির পদে কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে বসানো হোক। এ ব্যাপারে আমার কোন মোহ নেই, আমি শুধু সেবা করে যেতে চাই।"

মালতী একথা মানতে রাজী নন। সভাপতি পণ্ডিতজীকেই হতে হবে। শহরে আর একটিও প্রভাবশালী ব্যক্তি দেখা যাচ্ছে না—যাঁর কলমে জাদু আছে, ব্যক্তিত্বে জাদু আছে তিনি প্রভাবশালী ব্যক্তি নন তো কী! বিত্তের সঙ্গে প্রভাবের যোগ থাকার দিন আর নেই, এখন প্রতিভার সঙ্গেই প্রভাবের যোগ! অতএব সম্পাদকজীকেই এ পদ গ্রহণ করতে হবে, সম্পাদিকা হবেন মালতী। এই সভার জন্যে এক হাজার টাকা চাঁদা পাওয়া গেছে। এখনও সারা শহর বাকী। চার পাঁচ লাখ পেয়ে যাওয়া তো মামুলী ব্যাপার!

ওঁঙ্কারনাথের মনে নেশার রঙ লাগে। উত্তেজনায় কেঁপে উঠে গাঢ় গম্ভীরস্বরে বললেন, "কিন্তু কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মালতী দেবী, আপনাকে এর জন্যে অনেক সময় দিতে হবে। আমার কথা বলতে পারি, আমি সভা-ভবনে সব সময় সবার আগে উপস্থিত হবো।"

মির্জা টিপ্পনী কাটেন, "আপনার অতি বড়ো শত্রুও বলতে পারবে না যে আপনি দায়িত্ব পালনের সময় পিছিয়ে থাকেন।"

মালতী দেখলেন পানের আগেই সুরার প্রভাব শুরু হয়ে গেছে। তিনি আরো গম্ভীর হয়ে বললেন, "যদি আমরা এ কাযের গুরুত্ব অনুভব না করতাম তাহলে এই সভা স্থাপন করা হতো না আর আপনাকেও সভাপতি হতে হতো না। আমরা কোন পয়সাওলা তালুকদারকে সভাপতি করে খুব টাকা জোগাড় করতে পারতাম কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য তা নয়। আমরা জনসাধারণের সেবা করতে চাই। আর তার সবচেয়ে বড়ো উপায় হচ্ছে আপনার কাগজ। সমস্ত শহরে ও গ্রামে কাগজটা প্রচার করতে হবে। অন্ততঃ বিশ হাজার গ্রাহক করা চাই। এই অঞ্চলের মিউনিসিপালটি আর জেলাবোর্ডের

চেয়ারম্যানেরা আমার বন্ধু। তাঁরা যদি প্রত্যেকে চার পাঁচশোর ভার নেন তাহলেও পঁচিশ হাজার হয়ে যাবে ধরে নিতে পারেন। রায়সাহেব আর মির্জাজী বলছেন কাউন্সিলে প্রস্তাব করতে হবে যে, প্রত্যেক গ্রামের জন্যে 'বিজলী'র এক সংখ্যা সরকারী টাকায় কেনা হবে কিংবা কিছু বার্ষিক সাহায্য দিতে হবে। আমার তো মনে হয়, এ প্রস্তাবও পাশ হয়ে যাবে।"

ওঙ্কারনাথ নেশায় চুরচুর হয়ে বললেন, "গভর্নরের কাছে ডেপুটেশন নিয়ে যেতে হবে।"

মির্জা সমর্থন জানালেন, "ঠিক! ঠিক!"

"তাঁকে বলতে হবে কোন সভ্য শাসন ব্যবস্থার পক্ষে খুবই লজ্জার কথা যে গ্রামোন্নয়নের একটি মাত্র পত্রিকা হওয়া সত্ত্বেও 'বিজলী'র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না।"

মির্জা বললেন, "অবশ্য! অবশ্য!"

"আমি গর্ব করছি না। এখনও গর্ব করার সময় আসেনি কিন্তু আমি দাবি করতে পারি আজ পর্যন্ত গ্রামসংগঠনের জন্যে 'বিজলী' যত প্রচেষ্টা করেছে..."

মেহতা সুধরে দিয়ে বললেন, "প্রচেষ্টা নয়, তপস্যা বলুন।"

"আমি মিস্টার মেহতাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একে তপস্যা বলাই উচিত। কঠিন তপস্যা! 'বিজলী' যে তপস্যা করেছে তা শুধু এখানকার ইতিহাসে নয়, দেশের ইতিহাসেও অভূতপূর্ব ঘটনা।"

মির্জা সায় দিলেন, "নিশ্চয়! নিশ্চয়!"

মালতী আর এক পেগ এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আমাদের সংঘ ঠিক করেছে কাউন্সিলে যে জায়গাটা খালি আছে সেখানে আপনাকেই মনোনীত করা হবে। এখন শুধু আপনার অনুমতি চাই, বাকি সব কাজ আমরা সামলাবো। আপনাকে খরচ কি দৌড়ঝাঁপ কিছু করতে হবে না।

ওঙ্কারনাথের চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে, "আমি আপনাদের দীন সেবক, আপনারা যা বলবেন তাই করবো।"

"আমরাও আপনার কাছে এইটি আশা করেছিলাম। আমরা এতদিন শুধু মিছে-দেবতার পায়ে নাকখত দিয়েছি তাই কোন কাজ হয়নি। এবার আমরা আপনার মতো প্রকৃত পথপ্রদর্শক, সাচ্চা গুরু পেয়েছি। এই শুভদিনটিকে আমরা এক মন এক প্রাণ হয়ে পালন করবো। আজ থেকে আমাদের কেউ ব্রাহ্মণ নয়, শূদ্র নয়, হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, উঁচু-নীচু কিছু নয়। আমরা সব এক মায়ের সন্তান, একই কোলে হেসে-খেলে, একই থালায় খেয়ে ভাই-ভাই বড়ো হয়েছি। যে ভেদভাবে বিশ্বাসী, গোঁড়া ও ছুৎমার্গী আমাদের সভায় তার স্থান হবে না। যেখানে পূজ্য ওঙ্কারনাথজী সভাপতি সেখানে জাত-পাঁতের ভেদ থাকতে পারে না। যিনি একথা স্বীকার করেন না তিনি দয়া করে এখান থেকে উঠে যান।"

রায়সাহেব শংকা প্রকাশ করলেন, "আমি তো মদ খাই না তাহলে কি আমাকে সভা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে?"

মালতী নির্মম কণ্ঠে বললেন, "নিশ্চয়ই। আপনি এই সংঘে থেকে কোন ভেদাভেদ মানতে পারবেন না।"

মেহতা উপযুক্ত ঠোক্কর দিলেন, "আমার সন্দেহ হচ্ছে, আমাদের সভাপতিমশাই স্বয়ং খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একতায় বিশ্বাসী নন।"

ওঙ্কারনাথ ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন। এ বদমাশটা আবার বেসুরে সানাই বাজাতে বসলো যে! হতচ্ছাড়া "গাড়া মুর্দা ওখড়না"* শুরু করলো বুঝি। এক্ষুণি সারা সৌভাগ্য স্বপ্নের মতো শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে।

মালতী তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে বললেন, "আপনার সন্দেহ নিরর্থক মেহতাজী। আপনি কি মনে করেন দেশের ঐক্যে এমন উদারচেতা পুরুষ, এমন অনন্য উপাসক, এমন রসিক কবি কখনও লজ্জাকর ভেদাভেদ মানেন। এমন চিন্তাও যে তাঁর দেশপ্রেমের অপমান।"

ওঙ্কারনাথের মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। মালতী পুনরায় বললেন, "আর এর চেয়েও বড়ো কথা তাঁর পৌরুষ। একজন রমণী যদি নিজের হাতে পানপাত্র এগিয়ে দেয় তাহলে কি কোন ভদ্রলোক তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন? সে যে সমগ্র নারীজাতির অপমান! নিয়ে আসুন পেয়ালা। এই শুভমুহূর্তে কোন শংকা কোন আপত্তি দেশদ্রোহিতা। প্রথমে সভাপতির স্বাস্থ্যপান করবো।"

বরফ মদ আর সোডা প্রথম থেকেই তৈরি ছিল। মালতী নিজের হাতে ওঙ্কারনাথকে রক্তিম বিষের গ্লাস তুলে দিয়ে এমন একটি জাদুভরা মোহিনী কটাক্ষপাত করলেন যে, ওঙ্কারনাথের সমস্ত নিষ্ঠা ও বর্ণশ্রেষ্ঠের অভিমান কর্পূরের মতো উবে গেল। মালতী মনে মনে বললেন, "সব আচার বিচারই অবস্থার অধীন। আজ তুমি গরীব তাই আর কাউকে মোটরে চড়তে দেখলে রেগে ওঠো কিন্তু তোমার মনেও গাড়ি চড়ার শখ কম নেই। পরিস্থিতিই সব কিছুর নিয়ামক। তোমার বাপ ঠাকুরদা মদ খাননি তো কি হয়েছে। আমাকে তুমি কি ফিরিয়ে দিতে পারবে।"

ওঙ্কারনাথ গ্লাসটি নিয়ে মাথা নীচু করে সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এক নিঃশ্বাসে সবটা খেয়ে ফেললেন। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে যেন বলতে চাইলেন, এবার বিশ্বাস হলো তো।

সমস্ত হলঘর তখন হাসি-হাততালি-হৈ-হুল্লোড়ে ফেটে পরছে। "সাবাশ মালতীদেবী সাবাশ! কি খেলাই না দেখালেন! 'নমক কা কানুন তোড় দিয়া, ধর্ম কা কিলা ফোড় দিয়া, নেম কা ঘড়া ফোড় দিয়া'—ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার গেল, ধর্মের কেল্লা ফতে হলো. সদাচারের ঘট ফুটো হলো, বাঃ।"

ওঙ্কারনাথের পেটে মদ পড়তেই তাঁর রসিকতা উছলে উঠলো। বললেন, "আমি আমার ধর্মকর্মের সব ভার মালতীদেবীর কোমল হাতে সমর্পণ করলাম আমার বিশ্বাস তিনি এর যথোচিত রক্ষা করবেন। তাঁর বরণ কমলে আমি

* গাড়া মুর্দা ওখাড়না=পুরনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করা

একটা কেন হাজারটা ধর্ম বিসর্জন দিতে পারি।"

আরেক দফা হাসির ঝড় উঠলো। সম্পাদকের মুখ আরক্ত চোখ ঢুলুঢুলু। দ্বিতীয় গ্লাস তুলে তিনি বললেন, "মালতী দেবীর স্বাস্থ্যপান করছি। আপনারা ওঁকে আশীর্বাদ করুন।" সকলেই নিজের নিজের গ্লাস খালি করলেন। মির্জা খুরশেদ একটা মালা এনে ওঙ্কারনাথকে পরিয়ে দিয়ে বললেন, "মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণ, এই অধম মহামান্য সভাপতি মহাশয়ের উদ্দেশ্যে একটি 'কসীদা'* লিখেছে। আপনারা অনুমতি দিলে পড়ে শোনাই।" চারদিক থেকে সোৎসাহ সমর্থন এলো।

ওঙ্কারনাথ ভাঙের নেশায় অভ্যস্থ কিন্তু মদ্যপানের অভিজ্ঞতা তাঁর এই প্রথম। ভাঙের নেশা মন্থর গতিতে মেঘলা আকাশের মতো একটি স্বপ্ন-ছায়া ঘনিয়ে তোলে। তখন তাঁর মনে হয় তাঁর বাণী বড়ো সুন্দর, কল্পনা খুব প্রবল। কিন্তু মদের নেশা তাঁর ওপর সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে গ্রাস করে ফেলছিল। তিনি কথা বলতে চাইলেন, মুখ দিয়ে আরেক কথা বেরোচ্ছিল। ক্রমে জ্ঞান-বোধও হারালেন। এখন আর স্বপ্নের বৈচিত্রময় রোমাঞ্চ ছিল না, জাগরণের মধ্যেই তিনি ঘুরপাক খাচ্ছিলেন আর সব একাকার হয়ে যাচ্ছিল।

কেন কে জানে তাঁর মনে হলো এসময় 'কসীদা' পাঠ খুবই অনুচিত কাজ। টেবিল চাপড়ে জড়িত স্বরে বললেন, "না, না, এখানে কোন কসীদা পড়া অবে না, অবে না। আমি সবাপতি, আমার হুকুম। আমি এখুনি সবা ভেঙে দিতে পারি। এখুনি সবাইকে বার করে দিতে পারি। কেউ আমার কিচু করতে পারবে না। আমি সবাপতি। আর কোন সবাপতি নেই।"

মির্জা হাতজোড় করে বললেন, "হুজুর এই 'কসীদা'য় তো আপনারই তারিফ করা হয়েছে।"

ওঙ্কারনাথ জ্যোতিহীন লাল চোখ তুলে বললেন, "তুমি আমার তারিপ কয়েছ কেন? কেন? বলো কেন আমার তারিপ কয়েছ? আমি কারুর চাকর নই। কারোর বাপের চাকর নই। কোন শালার পয়সায় খাই না। আমি অচ্চ সম্পাদক। আমি 'বিজলী'র সম্পাদক। আমি তাতে সব্বার তারিপ করবো। মালতী দেবী আমি তোমার তারিপ করবো না। আমি কোন বড়ো মানুষ নই। আমি সবার গোলাম। আমি আপনার চরণ-রজ। মালতীদেবী আমার লক্ষ্মী, আমার সরস্বতী, আমার রাধা..."

বলতে বলতে ওঙ্কারনাথ মালতীর পায়ের দিকে ঝুঁকতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে ফরাশের ওপর পড়ে গেলেন। মির্জা দৌড়ে এসে তাঁকে ধরে চেয়ার সরিয়ে ফরাশের ওপরে শুইয়ে দিয়ে কানের কাছে মুখ এনে বললেন, "রাম নাম সত্ হ্যায়! বলুন তো আপনার 'জনাজা'র** ব্যবস্থা করি।"

রায়সাহেব বললেন, "কাল বুঝবেন মজা। নিজের কাগজে এর শোধ

* কসীদা=প্রশস্তিমূলক কবিতা ** জনাজা=শবযাত্রা

ভুলবে। আর এমন লিখবে যে মনে থাকবে। লোকটার এই একটাই দোষ। যখন লিখবে তখন কাউকে দয়ামায়া করবে না। লেখেও ভালো। এরকম একটা গাধা যে কি করে এত ভালো লেখে সেটাই রহস্য।

কয়েকজন ধরাধরি করে ওঙ্কারনাথকে তাঁর ঘরে শুইয়ে দিয়ে আসে। ওদিকে 'ধনুষযজ্ঞ' অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কয়েকবার ডাক এসেছে। সবাই সেখানে যাবার তোড়জোড় করছে এমন সময় এক পাঠান এসে হাজির হলো। ফর্সা রঙ, বড়ো বড়ো গোঁফ, লম্বা দেহ, চওড়া বুক, চোখে নির্ভীক উন্মাদনা, ঢিলে-ঢালা লম্বা কুর্তা ও শালোয়ারের ওপর জরীর কাজ করা সদ্‌রী,* মাথায় পাগড়ী আর কুলাহ্‌,** কাঁধে চামড়ার ব্যাগ ও বন্দুক, কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে সামনে এসে গর্জন করে বলে, "খবরদার! কেউ এখান থেকে বাইরে যাবে না। আমার সঙ্গীসাথীদের ওপর ডাকাত পড়েছে। এখানকার সরদারই লুঠতরাজ করায়। ওদের সব টাকা তোমাদের দিতে হবে। কোথায় তোমাদের সরদার। তাকে ডাকো।"

রায়সাহেব সামনে এসে ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "কে লুঠ করেছে? কোথায় ডাকাতি হয়েছে। এসব তোমাদেরই কাজ। এখানে কেউ কারুর জিনিষ লুঠ করে না। ঠিক করে বলো, কি হয়েছে।"

পাঠান চোখ বার করে বন্দুকের কুঁদো মাটিতে ঠুকে বলল, "আমাকে জিজ্ঞেস করছে, ডাকাতির কথা? তুমি লুঠ করো। তোমার লোকেরা লুঠ করে। আমি এখানকার কুঠির মালিক। আমার কুঠিতে পঞ্চাশটা জোয়ান লোক আছে। তারা ধারে কারবার করে ফিরছিলো। এক হাজার টাকা। তুমি লুঠ করিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করছো কি রকম ডাকাতি? দাঁড়াও বুঝিয়ে দিচ্ছি। এক্ষুণি পঞ্চাশটা জোয়ান আসছে। তোমার গ্রাম লুটে নেব। কোন শালা কিছু করতে পারবে না বুঝেছ, কেউ না।"

খান্না কাবুলিওয়ালা'র তেজ দেখে চুপি চুপি উঠে পালাবার চেষ্টা কর-ছিলেন। সরদার তাঁকে ধমকে উঠলো,"কোথায় যাচ্ছো তুমি? কেউ কোথাও যেতে পাবে না। পালাবার চেষ্টা করলে আমি সব্বাইকে কোতল করবো। আমার তুমি কিছুই করতে পারবে না। আমি তোমার পুলিশকে ভয় পাই না। পুলিশের লোক আমার চেহারা দেখে পালিয়ে যাবে। আমি চিঠি নিয়ে লাটসাহেবের কাছে যেতে পারি তা জানো। আমার টাকা না দিলে আমি কাউকে যেতে দেব না। তোমরা অন্য লোকের মাল লুঠ করে এখানে মেয়েদের সঙ্গে বসে বসে মদ খাচ্ছে।"

মালতী তার চোখ এড়িয়ে বাইরে যাবার চেষ্টা করতেই কাবুলি বাজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে, "তুমি এই বদমাশগুলোকে বলে আমার মাল পাইয়ে দাও। নয়তো তোমাকে আমার কোঠিতে ধরে নিয়ে যাবো। তোমার রূপ দেখে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। এক্ষুণি হাজার টাকা পাইয়ে দাও নয়তো তোমাকে

* সদ্‌রী=জ্যাকেট

** কুলাহ্‌=এক শ্রেণীর টুপী

ধরে নিয়ে যাবো। হাজার টাকা না দিলে আমি গ্রাম লুটে নেব। খুন করতে আমার ভালো লাগে। আমি রক্তের নদী বইয়ে দেব।"

সারা মজলিশে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। মালতী তাঁর ছলাকলা ভুলে গেলেন। খান্নার বুক কাঁপতে থাকে। বেচারা ঝামেলার ভয়ে একতলা বাড়িতে থাকেন। ছাতে ওঠা তাঁর কাছে শূলে চড়ার সামিল, গরমেও তিনি ঘরে শোন। রায়সাহেবের জমিদারীর অভিমান ছিল। তিনি নিজের গ্রামে একটা কাবুলির কাছে নাস্তানাবুদ হবেন! কিন্তু ওর বন্দুকের সামনে কী-ই বা করবেন? একটু চেঁচামেচি করলেই যদি গুলি চালিয়ে দেয়। লোকটা কাউকে বেরোতে দিচ্ছে না, নয়তো সব লোক জড়ো করে এদের সবাইকে পিটিয়ে শেষ করে দেওয়া যেত। মনে জোর এনে বললেন, "তোমাকে তো বলে দিয়েছি আমরা চোর-ডাকাত নই। আমি এখানকার কাউন্সিলের মেম্বার-আর এই মহিলা লক্ষ্ণৌয়ের নামকরা ডাক্তার। সবাই ভদ্রলোক। তোমার লোকেদের কে লুঠ করেছে আমরা কিছু জানি না। তুমি থানায় গিয়ে রিপোর্ট করোগে যাও।"

কাবুলি মাটিতে পা ঠুকে বলে, "বাজে বকবক কোরো না। আমার হাত শক্ত, মনও শক্ত। খোদাতালা ছাড়া কাউকে ভয় পাই না। তুমি আমার টাকা না দিলে আমি তোমাকে কোতল করবো।"

নিজের দিকে বন্দুকের নিশানা দেখে রায়সাহেব নীচু হয়ে টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। আচ্ছা বিপদে পড়া গেল! শয়তানটা কিছু শুনছেও না, কাউকে বেরোতেও দিচ্ছে না। চাকর-বাকর-সেপাই-পেয়াদারা 'ধনুষযজ্ঞ' দেখায় মগ্ন! একটা লোকও যদি এদিকে আসতো তাহলে সেপাইদের খবর দিয়ে খানসাহেবের খানগিরি ঘুচিয়ে দেওয়া যেত।

মির্জা বললেন, "কি বলবো, কিছুই মাথায় আসছে না। পিস্তলটা তো বাড়িতেই ফেলে এসেছি।"

খান্না কাঁদো-কাঁদো মুখে বললেন, "কিছু টাকা দিয়ে ঐ আপদবালাই বিদেয় করুন।"

রায়সাহেব মালতীকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি করতে বলেন?"

মালতী ক্রোধে লাল হয়ে উঠলেন, "বলবো আবার কী? আমাকে এত অপমান করছে আর আপনারা বসে বসে তাই দেখছেন। বিশজন পুরুষমানুষ থাকতে একটা কাবুলি আমার এত দুর্গতি করছে তবু আপনাদের রক্ত গরম হয়ে উঠছে না। প্রাণটাই সবচেয়ে বড়ো হলো? একজনও বাইরে গিয়ে চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করতে পারছেন না? একজনও ওর হাত থেকে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিতে পারছেন না? বন্দুক ছুঁড়বে এই তো? ছুঁড়ুক না। বড়জোর একটা কি দুটো প্রাণ যাবে এই তো। এর জন্যে এত ভয়!"

কিন্তু মালতী মরে যাওয়া যত সহজ ভাবতেন অন্যরা তা ভাবতেন না। কেউ বেরোবার চেষ্টা করলে যদি খানসাহেব গুলি চালিয়ে পাঁচ দশজনকে সাবাড় করে দেয় তখন কি হবে? বড়োজোর ওর ফাঁসি হবে। তারই বা ঠিক কি? কাবুলি সরদারকে ফাঁসি দিতে সরকারও ইতস্ততঃ করবে। শয়তানটা,

দু' একটা খুন না করে যাবে বলে মনে হয় না।

খান্না মালতীকে ভর্ৎসনা করে বললেন, "আপনি আমাদের এমন অপমান করছেন যেন আত্মরক্ষার চেষ্টা করা পাপ। প্রাণী মাত্রেই বাঁচতে চায় আমরাও চাই তাতে লজ্জা কি? এক হাজার টাকার মামলা! আপনার কাছেই তো পড়ে পাওয়া হাজর টাকা রয়েছে। সেটাই দিয়ে ওকে বিদেয় করুন না। আপনি নিজেই নিজের এত অপমান করছেন। এতে আমাদের দোষ কী?"

রায়সাহেব রেগে উঠলেন, "ও যদি মালতীদেবীর গায়ে হাত দেয় তাহলে আমি বাধা দেব। তাতে যা হবার হোক। আমার লাস পড়ে তো পড়বে। ও-ও তো একটা মানুষ।"

মির্জা সন্দিগ্ধ হয়ে মাথা নেড়ে বললেন, "রায়সাহেব আপনি এদের মেজাজের সঙ্গে পরিচিত নন। ফায়ার করতে শুরু করলে একজনকেও ছাড়বে না। এদের নিশানা খুব ভালো।"

মিস্টার তংখা আগামী ইলেকশনের সমস্যা আলোচনা করতে এসেছিলেন। দশ-পাঁচ হাজার টাকার ব্যবস্থা করে ঘরে ফেরার স্বপ্ন দেখছিলেন। বললেন, "সবচেয়ে সরল উপায় খান্নাজী তো বলেই দিলেন। এক হাজার টাকার ব্যাপার আর টাকাও মজুত রয়েছে। তাহলে আপনারা এত ভাবছেন কেন?"

মালতী মিস্টার তংখার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "আপনারা এত কাপুরুষ তা জানতাম না।"

"আমিও জানতাম না টাকা আপনাব এত প্রিয়। তাও আবার পড়ে পাওয়া টাকা।"

"যখন আপনারা আমার অপমান চোখ মেলে দেখছেন তখন নিজের ঘরের মেয়ে বৌয়ের অপমানও দেখতে পারেন বোধহয়।"

"আপনিও টাকার জন্যে ঘরের পুরুষদের বলি দিতে সংকোচ করবেন মনে হয় না।"

খানসাহেব এবার বললে, "আর আমি শুনবো না। আমি তোমাদের এক মিনিট সময় দিচ্ছি। তারপরই বাঁশি বাজিয়ে আমার দলের লোকদেব ডাকবো।" তারপর মালতীর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি আমার সঙ্গে যাবে দিলদার! আমি তোমার নোকর হয়ে থাকবো। আমার জান-প্রাণ তোমার পায়ের তলায় রেখে দেব। এতগুলো লোক তোমার প্রেমিক কিন্তু কেউ সত্যিকারের ভালবাসে না। সত্যিকারের প্রেম কি আমি দেখিয়ে দেব। তোমার ইশারা পেলে আমি বুকে খঞ্জর* বসিয়ে দিতে পারি।"

মির্জা কম্পিত স্বরে বললেন, "মালতীদেবী, খোদার নামে বলছি, এই বদমাশটাকে টাকা দিয়ে দিন।"

খান্না হাতজোড় করলেন, "আমাদের দয়া করুন মালতী।"

রায়সাহেব রেগে গেলেন, "কক্‌খনো না। যা হবার হোক। হয় আমরা

* খঞ্জর=ছোরা

মরবো নয় তো বদমাশটাকে চিরকালের মতো শেষ করে দেব।"

তংখা ধমক লাগালেন, "বাঘের গর্তে ঢোকায় বাহাদুরি নেই রায়সাহেব, সেটা মূর্খের কাজ।"

মালতী অন্য কিছু ভাবছিলেন। খানের মুগ্ধ দৃষ্টি তাঁকে আশ্বস্ত করেছিল। তিনি এর মধ্যে এক বিচিত্র আনন্দ পাচ্ছিলেন। তাঁর মন সভ্যভব্য পুরুষদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে হঠাৎ আদিম প্রেম উপভোগের বাসনায় অধীর হয়ে উঠলো। শান্তশিষ্ট প্রেমের নিরাবেগ শীতলতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল আজ রুক্ষ অর্ধসভ্য পাঠানের উন্মত্ত বর্বর প্রেমসম্ভোগের জন্যে তাঁর মন প্রলুব্ধ হয়ে উঠলো। অবাক হবার কিছু নেই, মানুষ গান শোনার আনন্দ উপভোগের পর মত্ত হাতির লড়াই দেখতে ছোটে।

তিনি খানসাহেবের কাছে গিয়ে বললেন, "তুমি টাকা পাবে না।"

খান হাত বাড়িয়ে বলে, "তুমি তাহলে লুঠ হয়ে যাবে।"

"তুমি এত লোকের মধ্যে থেকে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না।"

"আমি তোমাকে এক হাজার লোকের মধ্যে থেকে নিয়ে যেতে পারি।"

"প্রাণের মায়া ছাড়তে হবে।"

"আমি আমার মাশুকের* জন্যে সারা শরীর টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে পারি।" বলে সে মালতীর হাত ধরে টানতেই ঠিক সে সময় ঘরের মধ্যে হরি এসে দাঁড়ালো। সে জনকরাজার মালী সেজে গেঁয়ো দর্শকদের খুব হাসিয়েছে। সে ভাবলে, রায়সাহেব এলেন না কেন, তিনিও দেখুন গাঁয়ের লোকেরা কত ভালো অভিনেতা। ওঁর বন্ধুরাও দেখুন। তাই সে ডাকতে এসেছিল। এখানকার দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। সবাই কাতর নয়নে দেখছে খান মালতীকে নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে। হরি ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করে। ঠিক সেই মুহূর্তে রায়সাহেবও হেঁকে বলেন, "হরি দৌড়ে গিয়ে সেপাইদের ডেকে আন্, জলদি!"

হরি পেছন ফিরতেই খান বন্দুক উঁচিয়ে বলে, "কোথায় যাচ্ছিস শুয়োর, আমি গুলি মেরে দেব।"

হরি গোঁয়ার মানুষ। লাল পাগড়ী দেখলে ভয়ে তার প্রাণ বেরিয়ে যায়-বটে কিন্তু পাগলা ষাঁড়ের ওপর লাঠি নিয়ে লাফিয়ে পড়তে পারে। সে ভীতু নয়, মরতে-মারতে দুই-ই পারে তবে পুলিশের হাতকড়ির সামনে তার জারি-জুরি খাটে না। দড়ি বেঁধে কোথায় ঘোরাবে, ঘুষের টাকা কোথায় পাবে, বাল-বাচ্চাকে কার কাছে রেখে যাবে—এই ভয়! কিন্তু এখন মালিক যখন চেঁচাচ্ছেন তখন আর ভয় কী! এখন সে মৃত্যুর মুখেও ঝাঁপ দিতে পারে। তাই দিলও। ঝাঁপিয়ে পড়ে এমন করে খানের কোমর জড়িয়ে ধরলো যে খান চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। হরি তার বুকের ওপর চড়ে বসে দাড়ি চেপে ধরতেই দাড়িটা খুলে তার হাতে চলে এলো। খানও উঠে দাঁড়িয়ে পাগড়ি-কুলাক খুলে দাঁড়াতে

* মাশুক=প্রেমিকা

সবাই দেখলেন খান আর কেউ নন, মিস্টার মেহতা। হ্যাঁ তিনিই!

সবাই চারদিক থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বাহবা দিলেন। মেহতার মুখে হাসি, নির্বিকারভাব, যেন কিছুই হয়নি। মালতী কপট রোষে বললেন, "আপনি এই বহুরূপীর খেলা কবে শিখলেন। এখনও আমার বুক ধড়ফড় করছে।"

মেহতা মৃদু হেসে বললেন, "এই ভদ্রলোকদের সাহসের পরীক্ষা নিচ্ছিলাম। যদি অপরাধ করে থাকি, ক্ষমা করবেন।"

৭

এই অভিনয় যখন শেষ হলো তখন 'ধনুষযজ্ঞ' শেষ হয়ে সামাজিক প্রহসন শুরু হচ্ছে। ভদ্রলোকদের সেদিকে বিশেষ আগ্রহ ছিল না। শুধু মিস্টার মেহতা দেখতে গেলেন এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জমিয়ে বসে দেখলেন। তাঁর খুব ভালো লাগছিল এবং মাঝে মাঝে হাততালি দিয়ে এনকোর এনকোর বলে অভিনেতাদের উৎসাহও দিচ্ছিলেন। রায়সাহেব এই প্রহসনে এক মামলাবাজ জমিদারকে ব্যঙ্গ করছেন। প্রহসন বলা হলেও নাটকটি করুণ রসে ভরা। তবে মামলা দায়ের করা উকিলদের আচরণ, সাক্ষীদের আচরণ প্রভৃতি বাস্তব দৃশ্য দেখে সবাই হেসে উঠছিল। নাটক শেষ হলে মিস্টার মেহতা উচ্ছ্বসিত হয়ে সব অভিনেতাদের নামে একটা করে মেডেল দেবার কথা ঘোষণা করলেন। তারপর দৌড়ে গিয়ে রায়সাহেবকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "আপনার দৃষ্টি এত তীক্ষ্ম, আমি জানতাম না।"

দ্বিতীয় দিন জলখাবারের পর শিকারের প্রোগ্রাম। ওখানেই নদীর ধারের কোন বাগানে বনভোজন সেরে, জলকেলি করে সন্ধ্যেবেলা ঘরে ফেরা। গ্রাম্য জীবনের আনন্দ উপভোগ আর কী! যাদের বেশী কাজ ছিল তাঁরা চলে গেলেন। রইলেন রায়সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা। মিসেস খান্নার মাথা ধরেছিল বলে তিনি গেলেন না আর রইলেন ওঙ্কারনাথ। তিনি এই দলটির ওপর চটে লাল হয়ে গিয়েছিলেন এবং এদের বিরুদ্ধে লেখার জন্যে খবর সংগ্রহের কথা ভাবছিলেন। সব্বাই গুন্ডা বদমাশ। গরীবের পয়সা ওড়ায় আর গোঁফে তা দেয়। দুনিয়ার কি হচ্ছে না হচ্ছে বয়ে গেল। এই মেহতা, দার্শনিক সেজে বসে আছে তার নীতি হচ্ছে জীবনকে সম্পূর্ণ করতে হবে। তা তো হবেই। মাসে হাজার টাকা পাচ্ছো তাই তোমার জীবনকে পরিপূর্ণ করে পাবার অধিকার আছে বৈকি। যাদের ভাবতে হয় ছেলের বিয়ে দেব কি করে, স্ত্রীর অসুখে বৈদ্য ডাকবো কি করে, ঘর ভাড়া দেব কি করে তারা নিজের জীবনকে পূর্ণ করবে কি করে? ধর্মের ষাঁড় হয়ে পরের ক্ষেতে চরে বেড়াচ্ছো আর ভাবছো, সংসারে সবাই সুখী। যখন বিপ্লব হবে আর তোমাকে বলা হবে 'বাছা ক্ষেতে গিয়ে লাঙল ঠ্যালো' তখন তোমার চোখ খুলবে। আর ওই যে মালতী, বাহাত্তর ঘাটের জল খেয়েও কুমারী সেজে বেড়াচ্ছেন। বিয়ে করবেন না তাতে জীবন বন্দী হয়ে যাবে, বন্দীজীবনের পূর্ণবিকাশ হয় না। হুঃ, জীবনের পূর্ণবিকাশ

মানে তো দুনিয়াকে লুটেপুটে বিলাসিতায় ডুবে থাকো। মা-বাপের সঙ্গে বনে না, তাদের দূর করে দাও। বিয়ে কোরো না, মোহবন্ধন বাড়বে, বাচ্চাকাচ্চা মানুষ করতে হবে। বেশ বুঝলাম, আইন কানুনও তো বন্ধন তাকে কেন ভেঙে ফেলো না? তার বেলা কেন এড়িয়ে যাও? কারণ তুমি জানো আইন ভাঙতে গেলে হাতে দড়ি পড়বে। তাই সেই বন্ধন কাটো যাতে তোমার ভোগলিপ্সা বাধা না পায়। সেই বলে না, 'রসসী কো সাপ বনাকর পিটো আউর তীস মার খাঁ বনো' তোমার হচ্ছে তাই দড়িকে সাপ বানিয়ে তাকে মেরে বাহাদুরি করো। জ্যান্ত সাপের কাছে গেলে যে সে তেড়ে আসবে। তাকে আসতে দেখলেই ল্যাজ গুটিয়ে পালাবে। এই তো তোমার জীবনের পূর্ণতা!

আটটার সময় শিকার পার্টি রওনা হলো। খান্না কখনো শিকার করেননি তিনি বন্দুকের আওয়াজ শুনলেই ভয় পান তবু মালতী যাচ্ছেন তিনি কি করে বসে থাকেন। মিস্টার তংখা এখনও ইলকশন নিয়ে কথাবার্তা বলবার সুযোগ পাননি, হয় তো এখানে সে সুযোগ মিলবে। রায়সাহেব এই তালুকে অনেক দিন আসেননি। সেখানকার রঙ-ঢঙ দেখার ইচ্ছেও ছিল। তাছাড়া মাঝে মাঝে মহল পরিদর্শন করে এলে প্রজাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে. গোমস্তা আর পেয়াদারাও সচেতন হয়। মির্জা খুরশেদ নতুন অভিজ্ঞতা লাভের আশায় যাবার জন্যে প্রস্তুত। মালতী আর একলা থাকেন কি করে? তাঁর তো আবার রসিকের ভিড় চাই। শুধু মিস্টার মেহতা সত্যিকারের শিকার উৎসাহ নিয়ে যাচ্ছিলেন। রায়সাহেবের ইচ্ছে ছিল রান্নার তৈজসপত্র নিয়ে রাঁধুনী, কাহার,* খিতমদগার** সব যাবে কিন্তু মিস্টার মেহতা এর বিরোধিতা করলেন।

খান্না বললেন, "শেষে ওখানে যাওয়া হবে না, উপোষ করে মরতে হবে।"

মেহতা বললেন, "খাওয়া হবে না কেন, আজ আমরাই সব কাজ করবো। দেখতে হবে চাকর-বাকর ছাড়াও আমরা জীবন কাটাতে পারি কি না। মালতী রান্না করবেন, আমরা খাবো। গ্রামে তো হাঁড়ি আর পাতা পাওয়া যাবেই, কাঠেরও অভাব নেই। আমরা শিকার করবো।"

মালতী আপত্তি জানালেন, "মাপ করবেন। আপনি কাল রাতে এত জোরে আমার কবজী চেপে ধরেছিলেন যে এখনও ব্যথা করছে।"

"কাজ তো আমরা করবো, আপনি শুধু বলে দেবেন।" মির্জা বললেন, "আরে আপনারা তামাশা দেখবেন শুধু, আমি সব ঠিক করে দেব। কী এমন কথা! জঙ্গলে হাঁড়িকুঁড়ি খোঁজা মুস্কিল। আমি বলি কি, হরিণ শিকার করুন, আগুনে ঝলসান, খান আর গাছের ছায়ায় শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোন।"

এই প্রস্তাবই গৃহীত হলো। মালতী একটি গাড়ি ড্রাইভ করছিলেন, আরেকটি স্বয়ং রায়সাহেব। বিশ-পঁচিশ মাইল যাবার পর পাহাড়ী এলাকা শুরু হলো। দুদিক উঁচু পাহাড়, সব পথও ঘুরে ঘুরে উঠেছে। কিছু দূর

* কাহার=চাকর ** খিতমদগার=হুকুম তামিলকারী

চড়াইয়ের পর উৎরাই শুরু হলো। দূর থেকে নদীর পাড় চোখে পড়ে। একটা ঘন বটগাছের ছায়ায় গাড়ি রেখে সবাই নামলেন। ঠিক হলো, দুজন-দুজন করে তিনটে দল হবে আর শিকার করে সবাই বারোটার মধ্যেই ফিরে আসবে। মালতী মেহতার সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলে খান্না মনে মনে চটলেন। মালতী এমন দাগা দেবেন জানলে তিনি ঘরে ফিরে যেতেন অবশ্য রায়সাহেবের সঙ্গ খুব ভালো না লাগলেও মন্দ লাগনো না। তৃতীয় দলে রইলেন তংখা ও মির্জা। তিনটি দল তিনদিকে রওয়া হলো।

কিছুদূর পাথুরে পাকদণ্ডী-পথে মেহতার সঙ্গে উঠে মালতী বললেন, "তুমি তো হেঁটেই চলেছো, একটু দম ফেলার জন্যে দাঁড়াতে দাও।"

মেহতা হেসে ফেললেন, "এখনও তো আমরা এক্মাইল পথ আসিনি, এরই মধ্যে ক্লান্ত হয়ে গেলে?"

"ক্লান্ত হইনি। কিন্তু একটু বিশ্রাম নিতে দোষ কি?"

"একটা শিকার করতে না পারা পর্যন্ত আরাম করার অধিকার নেই।"

"আমি শিকার করতে আসিনি।"

"ও আমি বুঝতে পারিনি। তাহলে এলে কেন?"

"ওঃ, তোমাকে কি করে যে বোঝাই।"

একপাল হরিণ দূরে চরছিল। মেহতা একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে গুলি ছুঁড়লেন। সব হরিণ পালিয়ে গেল। মালতী প্রশ্ন করে, "এবার?"

"কিছু না, চলো আবার কোন শিকার নিশ্চয় পাবো।"

দুজনে নীরবে কিছুক্ষণ চলার পর মালতী আবার দাঁড়িয়ে বলে, "গরমে কণ্ট হচ্ছে। এসো এই গাছের ছায়ায় একটু বসি।"

"এখন না। তুমি বসতে চাও, বোসো। আমি বসবো না।"

"সত্যি বলছি, তুমি বড়ো নিষ্ঠুর।"

"যতক্ষণ কোন শিকার না পাই, আমি বসবো না।"

"তাহলে তো তুমি আমায় মেরে ফেলবে দেখছি। আচ্ছা কাল রাতে তুমি আমায় এত জ্বালালে কেন বলো তো? তোমার ওপর যা রাগ হচ্ছিল। মনে আছে তুমি আমায় কি বলেছিলে? আমি জানতাম না তুমি এত অসভ্য। আচ্ছা সত্যি বলো তো, তুমি কি সত্যিই আমাকে ধরে নিয়ে যেতে?"

মেহতা উত্তর দিলেন না, যেন শুনতেই পাননি। আরো একটু হাঁটার পর জ্যৈষ্ঠের গরমে ক্লান্ত হয়ে মালতী বসে পড়েন। মেহতা দাঁড়িয়েই বললেন, "ভালো কথা, তুমি বিশ্রাম নাও, আমি এখানেই চলে আসবো।"

"আমাকে একলা ফেলে চলে যাবে?"

"আমি জানি তুমি আত্মরক্ষা করতে পারো।"

"কি করে জানলে?"

"নবযুগের মহিলাদের এটাই বৈশিষ্ট্য। তাঁরা পুরুষের আশ্রয় চায় না তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটতে চায়।"

মালতী লজ্জিত হয়ে বললেন: "তুমি খাঁটি ফিলসফার মেহতা, সত্যি।"

সামনের গাছে একটা ময়ূর বসে ছিল। মেহতা তাক করতেই উড়ে গেল। মালতী হেসে বললেন, "ঠিক হয়েছে। আমার শাপ লেগেছে।"

"তুমি আমাকে নয়, নিজেকেই শাপ দিয়েছ। শিকার পেলে আমি তোমাকে দশ মিনিট বসতে দিতাম। এখন তোমাকে উঠতেই হবে।"

মালতী উঠে মেহতার হাত ধরে বললেন, "ফিলসফারের বোধহয় হৃদয় থাকে না। তুমি ভালোই করেছো, বিয়ে করোনি। নয়তো সে বেচারীকে মেরেই ফেলতে। কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়বো না। তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পাবে না।"

মেহতা এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে এগোলেন। মালতী সজল নেত্রে বললেন,"যেও না, নইলে আমি পাথরে মাথা ঠুকবো।" মেহতা শুনলেন না। তখন মালতী ছুটে গিয়ে আবার মেহতার সঙ্গ নিলেন। একলা বসে থাকতে ভালো লাগে না। কাছে গিয়ে বললেন, "আমি তোমাকে এত পশু ভাবিনি।"

"আমি যে হরিণটা মারবো, তার চামড়াটা তোমায় উপহার দেব।"

"চুলোয় যাক চামড়া। আমি তোমার সঙ্গে আর কথা বলবো না।"

"আমরা যদি কিছু মারতে না পারি আর অন্যেরা শিকার করে তাহলে লজ্জার ব্যাপার হবে।"

তারা একটা ঝরণার সামনে এসে পড়লো। পাথরের ওপর দিয়ে খরস্রোতা ঝরণা বয়ে চলেছে। তার ওপর মধ্যাহ্নসূর্যের তৃষ্ণার্ত আলো নেমে এসে জলকেলি করছে। মালতী খুশী হয়ে বললেন, "এবার তো ফিরতে হবে।"

"কেন? ওই পারে যাবো। ওদিকেই তো শিকার পাওয়া যাবে।"

"কি স্রোত দেখছো না: আমি তো ভেসে যাবো।"

"বেশতো, তুমি এখানেই বোসো, আমি যাচ্ছি।"

"হ্যাঁ যাও, জীবনের সঙ্গে আমার শত্রুতা নেই।"

মেহতা সাবধানে এগোলেন। জল গভীর, ক্রমে তাঁর বুক পর্যন্ত পেঁছোয়। মালতী অধীর হয়ে উঠলেন। শংকায় মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কই আগে তো কখনো হয়নি। চীৎকার করে উঠলেন.

"ওখানে গভীর জল। দাঁড়াও, আমিও যাচ্ছি।"

"না না তুমি পড়ে যাবে, স্রোত বড্ড বেশি।"

"হোকগে। আমি যাচ্ছি। আর এগিও না।" মালতী শাড়ি সামলে জলে নামলেন কিন্তু দশ হাত যেতে না যেতেই জল তাঁর কোমর ছুঁয়ে ফেলে।

মেহতা ভয় পেয়ে গেলেন. "তুমি এখানে এসো না মালতী। এখানে তোমার গলা পর্যন্ত জলে ডুবে যাবে।"

মালতী আরেক পা এগিয়ে বললেন. "ডুবুক গে। তুমি তো চাও আমি মরে যাই, বেশ তোমার পাশে দাঁড়িয়েই মরবো।"

জল মালতীর কোমর ছাড়িয়ে ওঠে। মেহতা ফিরে এসে এক হাতে মালতীকে ধরে ফেলেন। মালতী রেগে বললেন, "আমি তোমার মতো হৃদয়-হীন মানুষ কখনো দেখিনি। একেবারে পাথর। থাক, আজ যা পারো করো,

আমিও একদিন দেখে নেব।"

মালতীর পা পিছলে যাচ্ছিল। মেহতা তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "তুমি এখানে দাঁড়াতে পারবে না। আমি তোমাকে আমার কাঁধে তুলে নিয়ে যাবো।"

মালতী ভ্রূকুটি হেনে বললেন, "তাহলে তো ওপারে যাওয়াটা খুবই জরুরী মনে হচ্ছে।"

মেহতা একথার উত্তর না দিয়ে বন্দুকটা পিঠে ঝুলিয়ে মালতীকে দু-হাতে কাঁধের ওপরে তুললেন। মালতী খুশী চেপে বললে,

"যদি কেউ দেখে ফেলে।"

"দেখতে খারাপ লাগবে নিশ্চয়ই।"

দু'পা যাবার পর মালতী করুণ সুরে বললেন, "আচ্ছা আমি যদি এখানে জলে ডুবে যাই, তোমার দুঃখ হবে? আমার তো মনে হয় তোমার কিছুই মনে হবে না।"

মেহতা আহত স্বরে বললেন, "তুমি কি মনে করো, আমি মানুষ নই।"

"আমার তো সন্দেহ হয়, মিথ্যে বলবো কেন?"

"সত্যি বলছো মালতী?"

"তুমি কি ভাবো বলতো।"

"আমি। কোনদিন সময় পেলে বলবো।"

জল মেহতার গলা পর্যন্ত পেঁাছেচে। মালতীর বুক কাঁপে। বললেন, "ভগবানের দোহাই মেহতা, আর এগিও না। আমি তাহলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বো।" সংকট মুহূর্তে মালতীর ঈশ্বরের কথাই মনে পড়লো। সে ঈশ্বরকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে তবু মন যখন অবলম্বন খোঁজে তখন আর কাকেই বা খুঁজবে? জল কমতে শুরু করলে মালতী প্রসন্ন হয়ে বললেন, "এবার তুমি আমায় নামিয়ে দাও।"

"না না, চুপ করে বসে থাকো। যদি সামনে কোন গর্ত থাকে।"

"তুমি ভাবছো মেয়েটা কি স্বার্থপর!"

"ঠিক আছে, আমাকে মজুরী দিয়ে দিও।"

মালতী পুলকিত স্বরে বললেন, "কি মজুরী নেবে?"

"যখন তোমার জীবনে এমন কোন বিশেষ মুহূর্ত আসবে তখন তুমি আমাকে ডেকো।"

ওপারে পেঁাছে মালতী শাড়ির জল নিঙড়ালেন, জুতো ঝাড়লেন, হাত-মুখ ধুলেন কিন্তু মেহতার কথাগুলো আশ্চর্য রহস্যময় হয়ে ওঠে তাঁর পুলক-দেউলের মণিকোঠায় স্থান পেলো। তিনি আনন্দে পূর্ণ হয়ে বললেন, "এই দিনটি মনে থাকবে।"

"তুমি কি খুব ভয় পেয়েছিলে?"

মজুরী=পারিশ্রমিক

"প্রথমে পেয়েছিলাম। কিন্তু পরে বুঝলাম তুমি দুজনকেই বাঁচাতে পারবে।"

মেহতা সগর্বে মালতীর দিকে তাকালেন। তাঁর মুখে ক্লান্তির লালিমার সঙ্গে মিশে আছে শৌর্য বীর্যের দীপ্তি। বললেন, "একথা শুনে আমার যে কী আনন্দ হলো, মালতী, তুমি কি তা বুঝবে!"

"তুমি বুঝতে দিলে কই? উলটে জঙ্গল চষে বেড়াচ্ছো। আবার তো ফেরার সময় এই ঝরণা পার হতে হবে। কি বিপদে ফেললে বলো তো। তোমার সঙ্গে থাকতে হলে আমার তো একদিনও বনবে না।"

মেহতা হাসলেন। একথার অন্তর্নিহিত অর্থ তিনি ভালো করেই বুঝেছেন, "তুমি আমাকে এত বজ্জাত ভাবো? আর আমি যদি বলি আমি তোমাকে ভালোবাসি, বিয়ে করতে চাই।"

"এমন রসকষহীন কাঠখোট্টা মানুষকে কে বিয়ে করবে?" মুখে একথা বললেও মালতীর স্নিগ্ধ কোমল চোখে মাধুরী ফুটে ওঠে। মনে মনে বললেন, 'এ কথার আসল অর্থ তুমি বুঝবে না, এত বুদ্ধু নও।'

মেহতা সচেতন হয়ে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ মালতী আমি কোন নারীকে নিয়ে সুখী হতে পারবো না। আমাকে কোন নারী প্রেমের ছলা-কলায় মুগ্ধ করতে পারবে না। আমি একেবারে তার মনের গহনে পেঁৗছে যাবো। তারপরে আর তাকে ভালো লাগবে না।"

মালতী কেঁপে উঠলেন। কথাটা নির্মম হলেও সত্য। বললেন "তুমি কেমন ভালোবাসা চাও বলো তো।"

"যা মনে আসবে তাই মুখে বলবে, ব্যস এইটুকু। আমার কাছে রঙ-রূপ, হাব-ভাব, ছলা-কলার দাম যতটুকু হওয়া উচিত ততটুকুই, তার বেশি নয়। আমি আত্মার তৃপ্তি চাই, উত্তেজক নেশার প্রয়োজন আমার নেই।"

"তোমার ওপরে কেউ যেতে পারবে না। তুমিই সবচেয়ে বুদ্ধিমান। আচ্ছা আমাকে তুমি কি ভাবো?"

মেহতা দুষ্টুমীর হাসি হেসে বললেন, "তুমি সব কিছু করতে পারো। তুমি বুদ্ধিমতী, চতুরা, প্রতিভাময়ী, দয়াবতী, প্রাণচঞ্চল, অভিমানী সব কিছু ত্যাগ করতে পারো কিন্তু ভালোবাসতে পারো না।"

মালতী তাঁর দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "তুমি মিথ্যেবাদী: ডাহা মিথ্যুক! একটু আগে বলছিলে না, তুমি মেয়েদের হৃদয় পর্যন্ত দেখতে পাও। এখন বুঝতে পারছি তোমার সে দাবি কত অসার।"

দুজনে ঝরণার ধার দিয়ে এগোচ্ছেন। বারোটা বেজে গেছে। কিন্তু মালতীর বিশ্রাম করার ইচ্ছেও নেই, ফেরবার ইচ্ছেও নেই। আজ তিনি এত আনন্দ পেয়েছেন বলার কথা নয়। এ সুখানুভূতি তাঁর জীবনে প্রথম। সামান্য মুচকি হেসে তিনি কত বড়ো বড়ো লোকের চিত্তহরণ করেছেন, একটি সরস কথা বলে কত লোককে বোকা বানিয়েছেন তার ঠিক নেই। কিন্তু বালির দেওয়ালের ওপর তিনি জীবনের ভিত গড়তে পারেননি, আজ শক্ত পাথুরে জমির সন্ধান

পেয়ে মুগ্ধ হলেন।

একটা লালসর পাখি উড়ে যাচ্ছিল, মেহতা গুলি করে তাকে ধরাশায়ী করলেন। অবশ্য পাখিটা ঝরণার জলে পড়ে ভেসে চললো। মালতী বললেন, "এবার কি হবে?"

"এখুনি তুলে আনছি, যাবে কোথায়?" বলেই মেহতা বালির ওপর দৌড়ে জলে নামলেন কিন্তু প্রাণপণে আধমাইল সাঁতার কেটেও পাখির নাগাল পেলেন না। মরেও পাখিটা যেন উড়ে চলেছে।

হঠাৎ মেহতা দেখলেন একটি গ্রাম্যযুবতী তীরের একটা ছোট কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে ঝরণার জলে পাখিটা বয়ে যাচ্ছে দেখে শাড়িটা হাঁটু পর্যন্ত তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক মিনিটের মধ্যে পাখিটা ধরে ফেললো। তারপর মেহতার দিকে পাখিটা উঁচিয়ে বললে, "জল থেকে উঠে এসো বাবু, তোমার পাখি এই-খেনে।" মেহতা তার সাহস আর সারল্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

যুবতীর গায়ের রঙ ঘোর কালো, কাপড়চোপড় ময়লা, ছেঁড়াখোঁড়া, গয়না বলতে হাতে দুটো মোটা চুড়ি, মাথার চুল এলোমেলো। মেয়েটির মুখের মধ্যে এমন কিছু নেই যাকে সুন্দর-সুছাঁদ বলা চলে অথচ স্বচ্ছ নির্মল জল-হাওয়া তার কালো রঙে এমন একটি লাবণ্য এনে দিয়েছে যে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতে হয়। প্রকৃতির নিভৃত কোলে মানুষ হওয়ায় তার যৌবন-পুষ্ট অংগ-প্রত্যংগ স্বচ্ছন্দ-সুন্দর।

মেহতা বললেন, "তুমি ঠিক সময়ে এসে গেছ। নয়তো আমাকে কতদূর যেতে হতো কে জানে?"

মেয়েটি খুশী হয়, "আমি তোমাকে সাঁতার কেটে আসতে দেখে দৌড়ে এলুম। শিকার করতে এসেছিলে বুজি?"

"হ্যাঁ, কিন্তু দুপুর হয়ে গেল। এই পাখিটা ছাড়া কিছুই পাইনি।"

"চিতাবাঘ মারতে চাও তো আমি তার আস্তানা দেখিয়ে দিতে পারি। রাত্তিরে রোজ এখানে জল খেতে আসে, কখনো কখনো দুপুরেও আসে।" তারপর একটু সংকোচের সংগে বলে, "ওর চামড়াটা আমাকে দিতে হবে কিন্তু। চলো আমার দোরের সামনে। ওখেনে অশ্বত্থ গাছের ছায়া আছে। এখেনে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, কাপড়টাও তো ভিজে গেছে।"

মেহতা তার অঙ্গে সেঁটে থাকা ভিজে শাড়ির দিকে চেয়ে বললেন, "তোমার কাপড়ও ভিজে গেছে।"

"হুঃ, আমার কি হবে? আমি তো জঙ্গলে থাকি। দিনের পর দিন রোদ আর জলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। তুমি তাই পারবে না কি?"

মেহতার মনে হয় মেয়েটি বুদ্ধিমতী অথচ কি সরল! বললেন, "তুমি চামড়া নিয়ে কি করবে?"

"আমার দাদু বাজারে বিক্রী করবে। এটাই তো আমাদের কাজ।"

"দুপুরে এখানে থাকলে তুমি কি খাওয়াবে?"

মেয়েটি লজ্জিত হয়ে বলে, "তোমাকে খাওয়াবার মতো জিনিষ আমাদের

ঘরে কি'ই-বা আছে? ভুট্টার রুটি আছে, পাখির মাংস রেঁধে দোব। তুমি বলে দিও কেমন করে রাঁধতে হবে। একটু দুধও আছে। আমাদের গরুটাকে চিতাটা একবার ধরেছিল। কিন্তু ও চিতাকেই গুঁতিয়ে দিয়েচে। সেই থেকে চিতাটা ওকে ভয় পায়।

"আমি কিন্তু একলা নই আমার সঙ্গে একজন মহিলা আছেন।"

"তোমার গিন্নী বুঝি?"

"না, এখনো গিন্নী হয়নি তবে চেনাশোনা আছে।"

"তাহলে আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে ডেকে আনছি।"

"না-না আমি ডেকে আনছি।"

"তুমি হাঁফিয়ে পড়েছো যে। শহরের লোক কেন যে জঙ্গলে আসে। আমি তো জংলী মানুষ। পাড়েই দাঁড়িয়ে আছেন বুজি?"

মেহতা মুখ খোলার আগেই সে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। মেহতা ওপরে উঠে অশ্বত্থের ছায়ায় বিশ্রাম নেন। এই স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা তাঁকে আকৃষ্ট করে। একটু পরেই মেয়েটি মালতীকে নিয়ে এলো। একজন বনফুল, প্রখর রোদে ঝলমল করছে অপরজন ফুলদানীতে সাজানো বাসীফুলের মতো বিবর্ণ-ম্লান। মালতী এসেই হৃদয়হীন স্বরে বললেন, "এখানে খুব ভালো লাগছে বুঝি? আর খিদেয় যে প্রাণ বেরিয়ে গেল।"

মেয়েটি ঘর থেকে দুটো বড়ো কলসী বার করে বলে, "তুমি এখেনে একটু বোসো, আমি দৌড়ে জল তুলে আনচি। তারপর উনুন ধরিয়ে দোবখন। আর আমার হাতে যদি খাও তাহলে আমি এক্ষুণি বাটি* শেঁকে দোব, নাঃ, নিজেরটা নিজেই শেঁকে নিও বাবা। তবে হ্যাঁ গমের আটা আমাদের ঘরে নেই। এখেনে কোন দোকানও নেই যে কিনে এনে দোব।"

মালতী ক্রমশই রেগে যাচ্ছিলেন, "তুমি এখানে এসে পড়ে রইলে কেন?"

মেহতা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "একদিন এই জীবনের আনন্দও উপভোগ করো। দেখো না ভুট্টার রুটি খেতে কেমন লাগে।"

"আমি ভুট্টার রুটি খেতে পারবো না। আর যদি বা কোনরকমে গিলি তবু হজম হবে না। তোমার সঙ্গে এসে অবধি পস্তাচ্ছি। রাস্তা ভোর ছুটিয়ে এনে এখানে একেবারে ফেললে।"

মেহতা পোষাক খুলে শুধুমাত্র একটি নীল জাঙিয়া পরে বসেছিলেন। মেয়েটিকে কলসী নিয়ে যেতে দেখে তিনি তার হাত থেকে কলসী ছিনিয়ে নিয়ে নিজেই কুঁয়োর দিকে এগোলেন। অধ্যাপক হলেও নিয়মিত শরীরচর্চার ফলে তাঁর সুগঠিত দেহ গ্রীক ভাস্কর্যের মতো পৌরুষের পরিচয় দিচ্ছিল। মেয়েটি তার দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল। কুঁয়োটা খুব গভীর, অন্ততঃ ষাঠ হাত তো হবেই। কলসীটা ভারী হওয়ায় মেহতা দড়ি টানতে টানতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে মেয়েটি দৌড়ে এসে তাঁর হাত থেকে দড়ি কেড়ে নিয়ে বলে, "তুমি

* বাটি=এক প্রকারের মোটা রুটি

টানতে পারবে না বাবু। তুমি ঐ খাটিয়ার ওপর বোসোগে, আমি জলনে যাচ্ছি।"

মেহতা পৌরুষের অপমান সহ্য করতে পারেন না, চক্ষের পলকে কলসীটা ভরে ফেলে দু হাতে দুটো কলসী নিয়ে কুঁড়ের দরজায় পৌঁছে দেয়। মেয়েটি চটপট উনুন ধরিয়ে লালসরের পালক ছাড়িয়ে কেটেকুটে মাংস চড়ায়। অপর উনুনে দুধ জ্বাল দিতে বসে। মালতী অপ্রসন্ন মনে ভ্রুকুঁচকে বসে থাকেন।

মেহতা কুঁড়ের দরজায় দাড়িয়ে বললেন, "আমাকেও একটা কাজ দাও, বলো কি করবো?"

মেয়েটি মধুর মুখঝামটা দিয়ে বলে, "তোমায় কিছু করতে হবে না বাবু। ওখেনে বাঈয়ের* কাছে বোসো। বেচারীর খুব খিদে পেয়ে গেচে। দুধ গরম হয়ে এলো, ওকে খাইয়ে দাও।" তারপর সে আটা মাখতে বসে। মেহতা মুগ্ধনেত্রে তার ঘরকন্না, তার অঙ্গসঞ্চালন দেখেন। মেয়েটি আড়চোখে তাঁকে দেখে আর আপনমনে নিজের কাজ করে যায়।

মালতী ডেকে বললেন, "তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছো? আমার ভীষণ মাথা ব্যথা করছে। আধখানা কপাল যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে।"

মেহতা এসে বললেন, "মনে হচ্ছে, রোদ লেগে গেছে।"

"আমি কি জানতাম তুমি আমাকে মারবার জন্যে এখানে নিয়ে আসছো।"

"তোমার সঙ্গে কোন ওষুধ নেই?"

"আমি কি রোগী দেখতে এসেছি যে ওষুধ আনবো। একটা ওষুধের বাক্স এনেছি সেটাও সেমারিতে পড়ে রয়েছে। ওঃ! মাথা ফেটে যাচ্ছে।"

মেহতা মালতীর মাথার কাছে বসে ধীরে ধীরে মাথা টিপে দেন, মালতী চোখ বোঁজেন।

মেয়েটি হাত ভর্তি আটা নিয়ে সেখানে এসে দাঁড়ায়। ধোঁয়ায় তার দু-চোখ জলে ভর্তি হলেও ঈষৎ লাল হয়ে উঠেছে, চুলগুলো এলোমেলো, সারা গা ঘামে ভিজে উঠেছে, তাতে অবশ্য তার পীনোন্নত যৌবনসৌন্দর্য আরো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মালতীকে দেখে বলে, "বাঈয়ের কী হলো?"

মেহতা বললেন, "মাথা ধরেছে।"

"সমস্তটা না আধকপালে।"

"বলছে তো অর্ধেকটা।"

"ডান দিকে না বাঁ দিকে।"

"বাঁদিকে।"

"আমি এখুনি একটা শেকড় এনে দিচ্ছি। বেটে লাগিয়ে দিলেই সেরে যাবে।"

"তুমি এত রোদে কোথায় যাবে?"

মেয়েটি এ কথা শোনার আগেই ছুটে চোখের আড়ালে চলে গেল। প্রায় আধঘণ্টা পরে মেহতা তাকে পাহাড়ের অনেক ওপরে একটা পুতুলের মতো

* বাঈ—সম্ভ্রান্ত মহিলাকে সম্বোধন করার সময় 'বাঈ' বলা হয়।

উঠতে দেখলেন। এই জংলী মেয়েটির সেবা ও আন্তরিকতা তাঁকে মুগ্ধ করে। রোদ আর প্রচণ্ড লু-য়ের মধ্যে সে আকাশে উঠতে চলেছে তাঁদেরই জন্যে।

মালতী চোখ খুলে বললেন, "কালটী ছুঁড়িটা কোথায় গেল? উঃ কালো বটে, যেন আবলুস কাঠ কুঁদে তৈরি করা। ওটাকেই পাঠিয়ে দাও না, রায়-সাহেবকে গাড়িটা এখানে পাঠিয়ে দিতে বলে আসুক। গরমে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।"

"কোন ওষুধ আনতে গেছে। বলছিল, মাথাব্যথা একেবারে সেরে যাবে।"

"ওসব ওষুধে ওদেরই উপকার হয়, আমার হবে না। তুমি তো ছুঁড়িটাকে দেখে মজে গেছ। সত্যি, কি নীচ রুচি তোমার! সেই বলে না 'য়্যায়সে রুহ ওয়সে সারিস্তা',* ঠিকই বলে দেখছি।"

মেহতা রূঢ় কথা মুখের ওপর বলতে সংকুচিত হন না। বললেন, "ওর মধ্যে এমন কতকগুলো গুণ আছে, যা তোমার নেই, থাকলে তুমি দেবী হয়ে যেতে।"

"তার গুণ নিয়ে সে থাক, আমার দেবী হবার শখ নেই।"

"তুমি চাও তো আমি গিয়ে গাড়ি নিয়ে আসতে পারি। যদিও এখানে মটোর আসতে পারবে কিনা জানি না।"

"ওই কাল্টীকে পাঠাও না।"

"ও ওষুধ আনতে গেছে, আবার রান্না করবে।"

"ওঃ আজ তাহলে আপনি ওর অতিথি। বোধহয় রাতেও এখানেই থাকা হবে। তা, রাতের শিকারও ভালোই মিলবে, কি বলো?"

মেহতা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "এই মেয়েটির প্রতি আমার মনে যে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা জেগেছে তাতে বাসনার ছায়া থাকলে আমার চোখ খসে যাবে। আমি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর জন্যেও তো এই লু আর রোদ মাথায় করে পাহাড়ে উঠতে যাবো না। অথচ ও জানে আমরা এখানে ঘণ্টাখানেকের জন্যে এসেছি তবু ওষুধ আনতে গেছে। এখন একটা গরীব মেয়ে এলেও ও ঠিক এমনি করেই ওষুধ আনতে ছুটতো। আমি বিশ্বপ্রেম নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে পারি, ভাষণ দিতে পারি। আর ওই মেয়েটি সত্যি সত্যি ভালোবেসে ত্যাগ করতে পারে। বলার চেয়ে যে করা কঠিন সেটা তুমিও জানো।"

মালতী উপহাসের সুরে বললেন, "ব্যস! ব্যস! ও একটি দেবী, আমি স্বীকার করছি। ওর ভারী বুক, ভারী নিতম্ব—দেবী হবার জন্যে আর কী চাই।"

মেহতা জ্বলে উঠে তৎক্ষণাৎ পোষাক পরে বন্দুক নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলে মালতী ফুঁসে উঠলেন. "তুমি আমাকে ফেলে যেতে পারবে না।"

"তাহলে কে যাবে?"

"ও-ই। তোমার দেবী।"

মেহতা হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। নারী কত সহজে যে পুরুষের

* "যেমন আত্মা, তেমনি দেবদূত"—প্রবাদ

ওপর জয়ী হতে পারে, জীবনে এই প্রথম অনুভূত হয়।

সে দৌড়ে আসছিল। সেই কৃষ্ণাঙ্গী যুবতী, হাতে একটি বুনো গাছ। মেহতাকে যাবার জন্যে প্রস্তুত দেখে বললেন, "আমি সেই শেকড় খুঁজে এনেছি। এক্ষুনি বেটে লাগিয়ে দোব। তুমি কোথায় যাচ্ছো বাবু? মাংস হয়ে গেছে এতক্ষণে, রুটি সেঁকে দিচ্ছি, দু-একটা খাও। বাঈ দুধ খাবেন। একটু বেলা পড়লে ঠান্ডা হবে তখন চলে যেও।"

সে নিঃসংকোচে মেহতার জামার বোতাম খুলে দেয়। মেহতা অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করেন। তাঁর ইচ্ছে করছিল এই গ্রাম্য যুবতীটিকে প্রণাম করেন। মালতী বললেন, "তোর ওষুধ রেখে দে। নদীর ধারে বটগাছের নীচে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, লোকও আছে। ওদের বলবি গাড়িটা এখানে আনতে। যা দৌড়ে যা।"

মেয়েটি করুণ চোখে মেহতার দিকে তাকায়। এত কষ্ট করে সে শেকড় খুঁজে আনলো, তার এত অনাদর! মন রাখার জন্যেও কি একটু লাগানো যেত না? সে শেকড়টা মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, "ততক্ষণে যে চুলো নিবে যাবে বাঈ। বলো তা রুটি সেঁকে রাখি। বাবু রুটি খান, তুমি দুধ খাও আর আরাম করো। ততক্ষণে আমি গাড়িওলাদের ডেকে আনবোখন।"

সে কুঁড়েতে গিয়ে আবার নতুন করে উনুন জ্বালে। মাংস সেদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, একটু বুঝি পুড়েও গেছে। তাড়াতাড়ি রুটি সেঁকে, দুধ গরম করে মালতীর কাছে নিয়ে আসে। বাটিটার চেহারা দেখে মালতী মুখ বিকৃত করলেন কিন্তু দুধের মায়াটুকু ছাড়তে পারলেন না। মেহতা কুঁড়ের দরজায় রুটি ও মাংস নিয়ে বসলেন। মেয়েটি পাখার বাতাস করে।

মালতী বললেন, "ওঁকে খেতে দে, কোথাও পালিয়ে যাচ্ছেন না। তুই গাড়ি নিয়ে আয়।"

মেয়েটি মালতীর দিকে প্রশ্ন ভরা চোখে তাকায়। মালতীর মুখে নম্রতা বা কৃতজ্ঞতার লেশ নেই। তার জায়গায় অবজ্ঞা আর অহংকার ঝলমল করছে। গ্রাম্য যুবতী মনোভাব বুঝতে ভুল করে না। বলে, "আমি কারুর কেনা বাঁদী নই বাঈ! তুমি বড়োলোক আছো, সে তোমার আপন ঘরে। আমি তোমার কাছে কিছু চাইতে যাইনি তো। আমি গাড়ী আনতে পারবো না।"

মালতী ধমক দেয়, "আচ্ছা, তুই বজ্জাতি করবার জন্যে কোমর বেঁধেছিস তাহলে। বল, তুই কার এলাকায় বাস করিস?"

"এটা রায়সাহেবের এলাকা।"

"তোকে আমি ওই রায়সাহেবকে দিয়ে হাণ্টার পেটাবো।"

"আমাকে পিটিয়ে তুমি যদি সুখ পাও বাঈ তবে তাই করো। আমি তো রাণী-মহারাণী নই যে আমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে লস্কর পাঠাতে হবে।"

মেহতা দু চার গ্রাস খেয়েছিলেন। মালতীর কথা কানে যেতেই তাঁর গলায় রুটি আটকে গেল। তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে এসে বললেন, "ও যাবে না। আমি যাচ্ছি।"

মালতীও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ওকে যেতেই হবে।"

মেহতা ইংরেজিতে বললেন, "ওকে অপমান করে তুমি নিজের সম্মান বাড়াতে পারবে না মালতী!"

মালতী চিৎকার করে বললেন, "এমনি ছুঁড়িদেরই পুরুষেরা পছন্দ করে। গুণ থাক আর নাই থাক ছুটে ছুটে হুকুম তামিল করে যারা ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেয় তোমাদের কাছে তারাই দেবী, তারাই শক্তি, বিভূতি সব কিছু। আমি ভাবতাম অন্ততঃ তোমার মধ্যে এই হীন পৌরুষ নেই। কিন্তু ভেতরে, সংস্কারে তুমিও ওদেরই মতো সমান বর্বর।"

মেহতা মনোবিজ্ঞানের সুপণ্ডিত। তিনি মালতীর মনোরহস্য বুঝতে পেরেছিলেন। ঈর্ষার এমন নগ্ন ও হিংস্র উদাহরণ আগে তিনি কখনো দেখেন নি। কোমল সদাহাস্যমুখী মালতীর মনে ঈর্ষার এত প্রচণ্ড জ্বালা! বললেন, "তোমার যা খুশী বলো, ওকে আমি যেতে দেব না। ওর সেবা আর ভালবাসার এই প্রতিদান দিয়ে আমি কিছুতেই নিজের চোখে নেমে যেতে পারবো না।"

মেহতার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যে, মালতীও যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বললেন, "আচ্ছা, তাহলে আমিই যাচ্ছি, তুমি ওর পা-পুজো করার পর যেও।"

মালতী দু তিন পা এগোতে মেহতা মেয়েটিকে বললেন, "এখন আমায় বিদায় দাও বোন, তোমার এই স্নেহ আর নিঃস্বার্থ সেবার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে।"

মেয়েটি সজল নেত্রে দু হাত ঠেকিয়ে মেহতাকে প্রণাম করে নিজের কুঁড়েতে ফিরে যায়।

দ্বিতীয় দলে ছিলেন রায়সাহেব ও খান্না। রায়সাহেব রেশমী চাদর আর রেশমী কুর্তা পরে থাকলেও খান্না শিকারের পোষাক পরেছিলেন। এ পোষাক সম্ভবতঃ আজকের কথা ভেবেই তৈরী করা হয়েছে নয়তো খান্নার আসামী-শিকার ছেড়ে পশুশিকারের সময় কোথায়. খান্না রোগা, একহারা, রূপবান পুরুষ; পাকা গমের মতো গায়ের রঙ, বড়ো বড়ো চোখ, মুখে বসন্তের দাগ থাকলেও কথাবার্তায় খুবই কুশলব্যক্তি। কিছু দূর যাবার পর তিনি মেহতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন, "এই মেহতাটা আজব লোক। আমার তো কিছু লোকদেখানো ব্যাপার মনে হয়।"

রায়সাহেব মেহতাকে সম্মান করেন এবং তাঁকে প্রকৃত জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি বলে জানেন। তবে খান্নার সঙ্গে তাঁর লেনদেনের সম্পর্ক আছে বলে কোন বিরোধের মধ্যে গেলেন না। বললেন, "আমি তো ওঁকে শুধু ঠাট্টাঠুট্টির মানুষ বলে মনে করি। কখনো ওঁর সঙ্গে তর্ক করি না করতে চাইলেও অত বিদ্যা পাবো কোথায়? যে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই পা বাড়ায়নি সে যখন জীবনের বিষয়ে বড়ো বড়ো কথা বলে তখন আমার হাসি পায়। বসে বসে হাজার টাকা করে

মাইনে মারছে আর মজা মারছে। কথায় বলে, "না জরু না জাঁতা না কোই চিন্তা না বাধা"* ওর হয়েছে তাই। কোন দায় দায়িত্ব নেই, চিন্তাভাবনা নেই, ও দর্শনের বুলি আওড়াবে না তো কি করবে?"

"আমি শুনেছি ওর চরিত্রও ভালো নয়।"

"উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যে চরিত্র ভালো থাকবে কি করে? সমাজে থেকে সমাজের কর্তব্য-কর্ম পালন করো, তবে তো বুঝবো।"

"মালতী না জানি কি দেখে ওর দিকে ঢলেছে।"

"আমার মনে হয়, শুধু আপনাকে জ্বালাবার জন্যে।"

"আমাকে আবার কি জ্বালাবে? বেচারী! আমি তো ওকে একটা খেলনা মনে করি।"

"একথা বলবেন না মিস্টার খান্না। মালতীর জন্যে আপনি প্রাণ দিতে পারেন।"

"এ বদনাম তো আমিও আপনাকে দিতে পারি।"

"আমি সত্যিই ওকে প্রতিমা ভাবি, আপনি ওকে প্রতিমা করেছেন।"

খান্না হো হো করে হাসলেন যদিও হাসার প্রয়োজন ছিল না বললেন, "যদি এক ঘটি জল ঢাললেই বর পাওয়া যায় তো ক্ষতি কি?"

এবার রায়সাহেব হো হো করে হাসলেন, তারও কোন প্রয়োজন ছিল না। বললেন, "তবে আপনি ঐ দেবীকে চিনতেই পারেননি। আপনি তার যত পুজো করবেন সে ততই দূরে পালাবে। আপনি দূরে গেলে সে আপনার পেছনে ছুটবে।"

"তবে তো তার দৌড়নো উচিত ছিল আপনার দিকে।"

"আমার দিকে? আমি ঐ রসিক সমাজের বাইরে থাকি মিস্টার খান্না। আমার যত বলবুদ্ধি আছে সবই প্রজাদের চিন্তায় শেষ হয়ে যায়। ঘরে যত প্রাণী আছে সবাই নিজের নিজের নিয়ে মত্ত, কেউ উপাসনায় মগ্ন কেউ বিষয় বাসনায়, 'কোই কাহু মে মগন, কোউ বাহু মে মগন' বুঝলেন কিনা। আর এই অজগরের মুখে খাবার জোগানোই হচ্ছে আমার কাজ। এই জীবনের চেয়ে মৃত্যুও ভালো। জানি না কোন সংস্কারে আমি অন্যরকম হলাম। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় আমার অন্য সব ভাইয়েরা মদ-মাংসে ডুবে রইল, আমি জেলে গেলাম। লাখ টাকার ঝামেলায় পড়লাম। অবশ্য এরজন্যে আমি গর্ব অনুভব করি। নির্জীব প্রজাদের রক্ত চুষে খেতে আমারও ভালো লাগে না। কিন্তু কি করবো যে ব্যবস্থায় মানুষ হয়েছি সেই চাকাতেই দিনরাত ঘুরে মরছি। যাতে ইজ্জত-আবরু বাঁচে অথচ আত্মহত্যা করতে হয় না। এমন লোকের পেছনে মালতী দেবী কেন কোন দেবীই ছুটবে না, আর ছোটেও যদি তবে তার সর্বনাশ হবে। তবে হ্যাঁ একটু আধটু মনোরঞ্জন করা অন্য জিনিষ।"

মিস্টার খান্নাও সাহসী ব্যক্তি। সংগ্রামে এগিয়ে যেতে চান। দুবার জেলে

* না জরু...বাধা=যার বৌও নেই যাঁতাও নেই তার চিন্তাও নেই বাধাও নেই

গিয়েছেন। খদ্দর পরেন, ফ্রান্সের মদ্যপান করেন কিন্তু বিপদে পড়লে ভেঙে পড়েন না। জেলে তিনি স্বেচ্ছায় 'সি' ক্লাসের কয়েদীদের সঙ্গে থেকেছেন, এক ফোঁটা মদ খাননি অথচ রাজবন্দী হিসেবে তিনি সব সুবিধেই পেতে পারতেন। কিন্তু যুদ্ধে যাবার রথও যেমন বিনা তেলে চলে না তেমনি খান্নার জীবনেও একটু রঙ্গরসের প্রয়োজন ছিল। তিনি বললেন, "আপনি সন্ন্যাসী হতে পারেন আমি পারি না। আমি মনে করি যে ভোগী নয় সে যোদ্ধাও হতে পারে না। যে কোন নারীকে ভালো বাসেনি সে দেশকে ভালো বাসবে কি করে?"

রায়সাহেব হাসলেন, "আপনি আমাকেই কুপোকাৎ করে দিচ্ছেন?"

"কুপোকাৎ করছি না, তত্ত্বকথা বলছি।"

"তাই হয় তো।"

"আপনি আপনার নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখুন, বুঝতে পারবেন।"

"আমি দেখেছি, আর বিশ্বাস করুন সেখানে যত খারাপ জিনিষই থাক, বিষয় লালসা নেই।"

"তবে তো আপনি দয়ার পাত্র। আপনার দুঃখের একমাত্র কারণ আপনার বাধাবিপত্তি। আমি তো এই নাটকেই ডুবে থাকবো তাতে যত করুণ পরিণতিই আসুক না কেন ভয় পাই না। মালতী আমায় নিয়ে মজা করে, ভাব দেখায় আমাকে সে গ্রাহ্যই করে না কিন্তু আমিও হাল ছেড়ে দেবার মানুষ নই। এখনো তার মেজাজমর্জি বুঝতে পারিনি ঠিকই, কোনদিকে নিশানা ঠিক করবো ভেবে পাই না।"

"তার সন্ধান যদিও বা আপনি পান, মেহতা আপনার ওপর বাজীমাৎ করে দেবেন বলে রাখছি।"

বড়ো বড়ো কালো শিঙওয়ালা একটা হরিণ কয়েকটা হরিণীর সঙ্গে চরছিল। রায়সাহেব বন্দুক তুললে খান্না বাধা দিয়ে বললেন, "কেন মারছেন ভাই? বেচারা চরছে, চরতে দিন। রোদ কড়া হয়ে গেছে। আসুন কোথাও একটু বসি। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

রায়সাহেব গুলি ছুঁড়লেও হরিণটা পালিয়ে গেল। বললেন, "শিকারটা পেয়েও মারা গেল না।"

"একটা প্রাণী হত্যা কম হলো। আচ্ছা আপনার এলাকায় আখ হয়?"

"অনেক চেষ্টা করে।"

"তাহলে আমাদের সুগার মিলের পার্টনার হয়ে যান। ধড়াধড় শেয়ার বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। আপনি, বেশি নয়, এক হাজার শেয়ার কিনে নিন।"

"বিপদে ফেললেন, আমি এত টাকা কোথা থেকে আনবো।"

"এত নামী দামী জমিদার হয়েও আপনার টাকার অভাব! সবশুদ্ধ পঞ্চাশ হাজার হলেই চলবে। তার মধ্যেও এখনই মোটে পঁচিশ পার্সেন্ট দিতে হবে।"

"না ভাই, আমার কাছে সত্যিই এখন অত টাকা নেই।"

"টাকা যত চান আমার ব্যাঙ্ক থেকে নিন না। আপনি বোধহয় এখনো আপনার লাইফ ইনসিওর করাননি। আমার কোম্পানী থেকে একটা ভালো

পলিশী করিয়ে নিন। একশো-দুশো টাকা তো আপনি সহজেই মাসে মাসে দিতে পারবেন—পরে এক সঙ্গে পাবেন চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার! ছেলেদের জন্যে এত ভালো ব্যবস্থা আপনি আর করতে পারবেন না। আমরা পূর্ণ সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করি। দপ্তরের খরচ ছাড়া আর এক পয়সাও কারুর পকেটে যায় না। আপনি দেখে অবাক হবেন। আমার আরও পরামর্শ যে আপনি একটু আধটু স্পেকুলেশনের কাজও শুরু করে দিন এই যে এত কোটিপতি হয়েছে সব তো স্পেকুলেশনের জোরে। তুলো, চিনি, গমন, রবার যে কোন জিনিষ নিয়ে ফাটকা খেলুন আর কয়েক মিনিটের মধ্যে লক্ষপতি হোন। কাজটা একটু ঝঞ্ঝাটের হলেও আপনার মতো বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত লোকের কাছে কিছু নয়। একবার ভালো করে দেখে নিলেই ফাটকাবাজারের সব চালাকি বুঝতে পারবেন।”

কোম্পানীর ওপর রায়সাহেবের বিশ্বাস ছিল না। তিক্ত অভিজ্ঞতাও হয়েছে তবে মিস্টার খান্নাকে তিনি নিজের চোখে বড়ো হতে দেখেছেন। দশ বছর আগে মিস্টার খান্না ছিলেন ব্যাঙ্কের ক্লার্ক আর আজ শহরের সর্বত্র পুজো পাচ্ছেন। খান্না পথ প্রদর্শক হলে লাভ হতে পারে। এ সুযোগও ছাড়া উচিত নয়।

হঠাৎ একটি গ্রাম্য লোক টুকরি করে কিছু ‘জড়িবুটি’ শেকড়বাকড় নিয়ে যাচ্ছে দেখে খান্না তাকে ডাকলেন, “কি বেচতে যাচ্ছিস রে।”

লোকটি ভয় পায়। এখুনি না বেগার খাটার কাজে লাগিয়ে দেয়। বলল, “কিচ্ছু না মালিক। এই ঘাস পাতা আর কি।”

“কি করবি এসব?”

“বেচবো মালিক, এসব হলো গে জড়িবুটি।”

“কি কি ওষুধ আছে বল্ তো।”

গ্রাম্য লোকটি নিজের ওষুধবিষুধ দেখায়। এসব গাছপালা লোকেরা বনজঙ্গল থেকে তুলে এনে শহরের হাতুড়েদের কাছে দু-চার আনায় বিক্রী করে। মামুলী সব জিনিষ—কাঁটাওয়ালা মকোয়, কনুঘী, সহদেই, কুকরেঁধা, করজা, ধুমচী, ধুঁতরো বিচি, মাদার ফুল এই সব*। লোকটি তাদের গুণ মুখস্ত বলে যায়, “সরকার, এ হলো গিয়ে মকোয়—গরম হলে, পিলে বাড়লে, খিদে না হলে, বুক ধড়ফড় করলে, শূলবেদনা কি কাশি হলে এক খোরাকেই আরাম হয়ে যাবে। আর এটা ধুঁতরো বীজ, মালিক গাঁট ফুললে, বাত হলে ..”

খান্না দাম জিজ্ঞেস করলে সে জানালো আট আনা। খান্না একটা টাকা দিয়ে তাকে টুকরির জিনিষপত্র গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে বললেন। গরীব লোকটি যা চেয়েছিল তার দ্বিগুণ পেয়ে আশীর্বাদ করে চলে গেল। রায়-সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি এই সব ঘাস পাতা নিয়ে কি করবেন?”

* এগুলি বিভিন্ন ধরণের গাছপালার নাম—ওষুধের কাজে ব্যবহৃত হয়।

খান্না হেসে বললেন, "একে আসরফী* বানাবো। আপনি বোধহয় জানেন না আমি একজন কীমিয়াগর**।

"তাহলে আমাকে ঐ বিদ্যাই শিখিয়ে দিন।"

"নিশ্চয় দেব। আমার সাগরেদী করুন। প্রথমে সোয়া সের লাড্ডু ভোগ চড়ান তারপর বলবো। আসল কথা হচ্ছে, আমাকে নানারকম লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়। কিছু কিছু এমন লোক আছি, যারা জড়ীবুটির জন্যে হাপিত্যেস করে মরে। তারা যদি জানতে পারে যে এই সেকড় বাকড় আপনাকে কোন ফকীর দিয়েছেন তাহলে আপনার এত খোশামোদ করবে, বলার কথা নয়। আর আপনি সেটি দিয়ে দিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। এক টাকা খরচ করে দশবিশটা বন্ধুর ওপর যদি কৃতজ্ঞতার জাল বেছানো যায় তবে মন্দ কি? একটু উপকারের বিনিময়ে অনেক বড়ো বড়ো কাজ পাওয়া যায়।"

রায়সাহেব কৌতূহলী হয়ে বললেন, "কিন্তু এসব ওষুধবিষুধের গুণ আপনার মনে থাকবে?"

খান্না অট্টহাসি করে বললেন, "ওঃ রায়সাহেব আপনিও খুব মজার কথা বলতে পারেন বটে। জড়ীরপ্রটির গুণের কথা আপনি যদি ব্যাখ্যা করতে চান ভালো কথা, সেটা জ্ঞানের পরিচয় দেবে। কিন্তু আসল অসুখের আট আনা তো বিশ্বাসের জোরেই সেরে যায়। এই যে বড়ো বড়ো অফিসারদের দেখেন কিংবা বড়ো বড়ো ডিগ্রীর ল্যাজওয়ালা বিদ্বান পণ্ডিত—এরা সবই অন্ধ বিশ্বাসী হয়। আমি এক বট্যানীর প্রফেসারকে জানি, তিনি কুকরোঁধার*** নামও শোনেননি। এদের নিয়ে আমার স্বামীজী মহারাজ খুব মজা করেন। আপনি তো তাঁকে কখনও দেখেননি। এবার যখন আমার ওখানে আসবেন আলাপ করিয়ে দেব। আমার বাগানেই এসে উঠেছেন, সেখানে রাতদিন হৈচৈ লেগে রয়েছে। মায়া তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। দিনে একবারমাত্র দুধ খান। এমন বিদ্বান আর মহাত্মা আমি দেখিনি। জানি না কত বছর হিমালয়ে তপস্যা করে এসেছেন। আপনি তাঁর কাছে দীক্ষাও নিতে পারেন। আপনার সমস্ত বিপদ-আপদ ছুমন্তরের মতো অদৃশ্য হয়ে যাবে। আপনাকে দেখেই আপনার ভূত ভবিষ্যত বলে দেবেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, নিজে মহাত্মা হয়েও সন্ন্যাসী, পন্থ, মঠ, মন্দির, সম্প্রদায় সব কিছুকে ঢঙ আর ভণ্ডামি বলতে দ্বিধা করেন না। বলেন, সংস্কারের বন্ধন ভাঙো আর মানুষ হও। দেবতা হবার চেষ্টা কোরো না। দেবতা হলে তুমি আর মানুষ থাকবে না।"

রায়সাহেব শংকিত হন। সাধারণ ধনী প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষীদের মতো তিনিও সাধুসন্তদের বিশ্বাস করতেন। যখন আর্থিক বিপত্তির মধ্যে পড়ে হতাশ হতে হতো তখন মনে হতো সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে একান্তে বসে মোক্ষ-চিন্তা করবেন। সংসার বন্ধনকে অতি সাধারণ মানুষের মতো তিনিও

* আসরফী=মোহর। ** কীমিয়াগর=অপরসায়নবিদ (Alchemist)

*** কুকরোধা=কুকুরশোকা গাছ।

আত্মোন্নতির পথে বাধা মনে করতেন। আর এর থেকে দূরে থাকাই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। কিন্তু সন্ন্যাস আর ত্যাগ ছাড়া বন্ধন ছিন্ন করার উপায়ই বা কি? বললেন, "উনি যখন সন্ন্যাসকে ঢঙ বলেন তখন নিজে কেন সন্ন্যাসী হয়েছেন?"

"উনি সন্ন্যাস নিলেন আর কই? বরং বলেন মানুষকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করতে হবে। বিচার স্বাতন্ত্র্য তাঁর উপদেশের বৈশিষ্ট্য।"

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না। বিচার স্বাতন্ত্র্য আবার কি?"

"বুঝতে তো আমিও পারি না। এবার আসুন, ওঁর সঙ্গে কথা হবে। উনি প্রেমকেই জীবনের সারসত্য বলে মনে করেন। আর এত সুন্দর ব্যাখ্যা করেন যে মুগ্ধ হয়ে শুনতে হয়।"

"মালতীকে ওঁর কাছে নিয়ে গেছেন তো?"

"আপনিও ঠাট্টা করছেন? মালতীকে ওঁর কাছে কেন..." কথা শেষ হবার আগেই সামনের ঝোঁপের মধ্যে সরসর শব্দ শুনে খান্না চমকে লাফিয়ে উঠে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে রায়সাহেবের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ঝোঁপ থেকে একটা চিতা বাঘ বেরিয়ে ধীরে সুস্থে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

রায়সাহেব বন্দুক তাগ করতে চাইলে খান্না বললেন, "এ কী করছেন? খামোখা ওকে জ্বালাচ্ছেন কেন? যদি ফিরে আসে?"

"ফিরে আসবে কেন, ওইখানেই মরে যাবে।"

"তাহলে আমাকে ঐ টীলাটার ওপরে উঠে যেতে দিন। এরকম শিকারের শখ আমার নেই।"

"তবে কি শিকার করতে এসেছেন?"

"পোড়াকপাল আর কী!"

রায়সাহেব বন্দুক নামিয়ে বললেন, "বড়ো ভালো শিকার ফস্কে গেল। এমন সুযোগ কমই আসে।"

"আমি আর এখানে থাকতে পারবো না। উঃ কী ভয়ানক জায়গা।"

"এক আধটা শিকার করতে দিন। খালি হাতে ফিরতে লজ্জা করছে।"

"আপনি আমাকে দয়া করে গাড়ির কাছে পৌঁছে দিয়ে যত খুশি বাঘ, চিতাবাঘ শিকার করুন।"

"ওঃ আপনি বড্ড ভীতু মিস্টার খান্না, সত্যি!"

"শুধু শুধু নিজেকে বিপদে ফেলা বাহাদুরি ছাড়া কিছু নয়।"

"আচ্ছা, তাহলে আপনি খুশি মনে ফিরে যেতে পারেন।"

"একলা?"

"রাস্তা তো একেবারে পরিষ্কার।"

"আজ্ঞে না, আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

রায়সাহেব অনেক বোঝালেন কিন্তু খান্না একটা কথাও শুনলেন না। ভয়ে তাঁর চেহারা হলদে হয়ে গিয়েছিল। এখন ঝোঁপ থেকে একটা নেংটি ইঁদুরও যদি বেরিয়ে আসে তাহলে তিনি চীৎকার করে মূর্ছা যাবেন। সর্বাঙ্গ

কাঁপছে। সারা গা ঘামে ভর্তি। নিরুপায় হয়ে রায়সাহেবকে ফিরতেই হলো।

যখন দুজনে অনেক দূরে ফিরে এসেছেন তখন খান্নার হুঁস হলো। বললেন, "বিপদকে আমি ভয় পাই না কিন্তু বিপদের মুখে ঝাঁপ দেওয়া বোকামি।"

"আরে যান যান। এইটুকু একটা চিতা দেখে ভয়ে মরে যাচ্ছিলেন।"

"আমি শিকার করাকে সেকেলে সংস্কার মনে করি। যখন মানুষ পশু ছিল তখন শিকার করতো। এখন মানুষ অনেক এগিয়ে গিয়েছে।"

"আমি মালতীকে দিয়ে আপনাকে জব্দ করবো।"

"আমি অহিংসাবাদকে লজ্জার কথা মনে করি না।"

"আচ্ছা! এই তাহলে আপনার অহিংসাবাদ?" খান্না গর্ব করে বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এই আমার অহিংসাবাদ। আপনি বুদ্ধ আর শংকরের নাম নিয়ে গর্ব করেন আবার পশুহত্যাও করেন। লজ্জা আপনার হওয়া উচিত, আমার নয়।"

আরো কিছু দূর হাঁটবার পর খান্না বললেন, "তাহলে আপনি কবে যাচ্ছেন? আমি বলি কি আপনার পলিসির ফর্ম আজই ভরে ফেলুন আর চিনির শেয়ারও। আমার কাছে দুটো ফর্মই আছে।"

রায়সাহেব চিন্তিত স্বরে বললেন, "একটু ভাবতে দিন।"

"এতে ভাবার কি আছে।"

তৃতীয় দলে ছিলেন মির্জা খুরশেদ আর মিস্টার তংখা। মির্জা খুর্শেদের কাছে ভূত-ভবিষ্যৎ সাদা কাগজের মতোই পরিষ্কার। তিনি বর্তমানে মধ্যে বাস করেন। তাঁর না আছে অতীতের স্মৃতি না আছে ভবিষ্যতের চিন্তা! যা সামনে এসে পড়ে তাকেই মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেন। বন্ধুদের কাছে তিনি খুব প্রিয়, কাউন্সিলের উৎসাহী সভ্য। যে কোন প্রশ্ন নিয়ে মন্ত্রীকেও কাঁদিয়ে ছাড়েন। কিন্তু কারুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন না। তাঁর কাছে 'আজই' জীবন, 'কাল' বলে বলো কোন কিছু নেই। রাগের মাথায় তাল ঠুকে দাঁড়াতেও পারেন আবার নম্রতার সামনে বিনয়ে গলে যেতেও বিলম্ব করেন না। কারুর মধ্যে কোন গুণ দেখলেই তিনি তার পছনে ছোটেন। নিজের পাওনার কথাও যেমন ভুলে যান তেমনি পরের দেনার কথাও মনে রাখেন না। শখ বলতে শুধু দুটি জিনিষ—শের ও শরাব*। নারী তাঁর কাছে শুধুই মনোরঞ্জনের বস্তু কারণ অনেকদিন আগেই তিনি হৃদয়ের ব্যাপারে দেউলিয়া প্রতিপন্ন হয়েছেন।

মিস্টার তংখা ঘোর প্যাঁচওয়ালা মানুষ। তিনি পাগিয়ে জিনিষ গছানোয়, মামলার জট ছাড়ানোয়, বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করতে কিংবা পরের গলা কাটতে সিদ্ধ হস্ত। তিনি দরকার হলে শুকনো ডাঙায় নৌকো চালাতে পারেন কিংবা পাথরে দুব্বো গজিয়ে দিতে পারেন। তালুকদারদের ঋণ পাইয়ে দেওয়া, নতুন কোম্পানী খোলা, ভোটের প্রার্থী দাঁড় করানোই তাঁর ব্যবসা।

* শের ও শরাব—উর্দু কবিতা ও মদ

বিশেষ করে ভোটের সময় যেন তাঁর ভাগ্যও ঝলমল করে। কোন জায়গায় প্রার্থীর জন্যে খেটেখুটে দশবিশ হাজার টাকা উপার্জন করেন। যখন কংগ্রেসের জোর ছিল তখন কংগ্রেসী প্রার্থীর সাহায্য করেন আবার যখন সাম্প্রদায়িক দল জোরালো হতো তখন হিন্দুসভার হয়ে কাজ করেন। কিন্তু এই উল্টোপাল্টা কাজের সমর্থনেও তাঁর এমন যুক্তি ছিল যে কেউ আঙুল উঁচিয়ে তাঁকে দায়ী করতে পারতো না। শহরের সমস্ত ধনী-মানী ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল এবং অনেকে তাঁকে পছন্দ না করলেও তাঁর ভদ্রস্বভাবের জন্যে মুখের ওপর কিছু বলতে পারতো না।

মির্জা রুমাল দিয়ে মাথার ঘাম মুছে বললেন, "আজকের দিনটা শিকার করার দিন নয়, আজ মুসায়রা* হওয়া উচিত ছিল।"

তংখা সমর্থন করেন, "হ্যাঁ ওই বাগানে খুব সুন্দর হবে।" একটু পরে তিনি আবার বললেন, "এবার ইলেকশনে বড়ো বড়ো ফুল ফুটবে। আপনার খুব মুস্কিল হবে।"

মির্জা বিরক্ত হয়ে বললেন, "এবার আমি দাঁড়াবোই না।"

"কেন?"

"মিছিমিছি বকবক করে কি হবে বলুন তো? আমার আর এই ডেমোক্রেসীর ওপরে ভক্তি নেই। একটুখানি কাজ করে তো সারা মাস চুলোচুলি। তবে হ্যাঁ, জনসাধারণের চোখে ধুলো দেবার ভালো ভণ্ডামি বলতে হবে। এর চেয়ে তো একজন গভর্নর, তা সে ভারতীয়ই হোক বা ইংরেজই হোক থাকা ভালো তাতে এসব চুলোচুলি হবে না। একটা ইঞ্জিন গাড়িকে কত সহজে হাজার মাইল টেনে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু দশ হাজার লোক মিলেও গাড়িটাকে অত দূর নিয়ে যেতে পারে না। আমি তো সারা তামাশা দেখে কাউন্সিলের ওপর বেজার হয়ে বসে আছি। ইচ্ছে করে আগুন লাগিয়ে দিই। যাকে আমরা ডেমোক্র্যাসী বলি আসলে তা বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী আর জমিদারদের রাজত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। ইলেকশনে তারাই জেতে, যাদের টাকা আছে। টাকার জোরে তাদের জন্যে সব সুবিধে তৈরি হয়ে যায়। বড়ো পণ্ডিত, মৌলবী, লেখক আর বক্তা, যারা কথা ও কলমের জোরে পাবলিককে যে দিকে খুশি নিয়ে যেতে পারেন। তাঁরা সবাই সোনা-দেবতার পায়ে মাথা খোঁড়েন। আমি ঠিক করেছি, এবার ইলেকশানের ধারে কাছে যাবো না। ডেমোক্র্যাসীর বিরুদ্ধে প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা করবো।"

মির্জা কোরাণের বয়াত থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখালেন যে, পুরনো দিনের বাদশাদের আদর্শ কত উঁচু ছিল। খাজনার একটা কড়িও বাদশা নিজের জন্যে খরচ করতে পারতেন না। তিনি পুঁথি নকল করে, কাপড় সেলাই করে, ছেলে পড়িয়ে নিজের পেট চালাতেন। মির্জা আদর্শ রাজাদের একটা লম্বা তালিকা দিয়ে বললেন, "কোথায় সেই প্রজাপালক বাদশা আর কোথায় আজ–

* মুশায়রা=কবিতা পাঠের আসর

কালকার মিনিস্টারেরা। পাঁচ-ছ হাজার টাকা মাইনে পাওয়া চাই। একে লুঠ বলবো, না ডেমোক্র্যাসী বলবো।"

একদল হরিণ চরতে দেখে মির্জা গুলি চালালেন। একটা কালো হরিণ তৎক্ষণাৎ পড়ে গেল। "মরেছে! মরেছে!" বলে চীৎকার করে দু হাত তুলে মির্জা শিশুর মতোই ছুটে গেলেন।

কাছেই একটা গাছে কাঠুরে কাঠ কাটছিল। সেও মির্জার সঙ্গে ছুটে যায়। হরিণটার গলায় গুলি লেগেছে, পা নড়ছে, চোখ দুটো স্থির।

কাঠুরে হরিণটার দিকে করুণ চোখে চেয়ে বলে, "খুব তাগড়া, এক মণের কম হবে না। হুজুর হুকুম করেন তো পৌঁছে দিয়ে আসি।"

মির্জা কিছু বললেন না। হরিণটার নিথর নিষ্কম্প চোখের দিকে চেয়ে তাঁর অনুশোচনা হচ্ছিল। একটু আগেও ও বেঁচেছিল! একটু পাতার শব্দ পেলেই চমকে ছুটে পালাতো। নিজের বন্ধু-বাচ্চাকাচ্চার সঙ্গে চরে ফিরে ভগবানের দেওয়া ঘাস খাচ্ছিল। আর এখন নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে। চামড়াটা খুলে নাও, মাংস থুড়ে কিমা বানাও—ও তার খবরও পাবে না। ওর সেই প্রাণ চঞ্চল দৃষ্টি, দেহভঙ্গীর লাবণ্য চকিত চমকের সুখস্মৃতি ফুলের পাপড়ির মতো ঝরে পড়েছে। গ্লানিতে মির্জার মন ভরে যায়।

কাঠুরে আবার বলে, "কোথায় পৌঁছে দিতে হবে মালিক? আমাকেও দুটো-চারটে পয়সা দেবেন।"

মির্জার যেন ধ্যান ভঙ্গ হয়। বললেন, "আচ্ছা তোল্। কোথায় যাবি?"

"যেখানে আপনি হুকুম করবেন মালিক।"

"না, তোর যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যা, এটা আমি তোকে দিলাম।"

কাঠুরে মির্জাকে কৌতূহলী হয়ে দেখে। সে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। বলে, "হুজুর আপনি শিকার করলেন আর আমি কি করে খেয়ে নেব?"

"না না, আমি খুশি হয়ে বলছি, তুই নিয়ে যা। তোর ঘর এখান থেকে কত দূরে?"

"পেরায় আধ কোশটাক হবে মালিক।"

"তাহলে আমিও তোর সঙ্গে যাবো। দেখবো, তোর বালবাচ্চারা কত খুশি হয়।"

"না সরকার। আপনি কত দূর থেকে এলেন। এত কড়া রোদে শিকার করলেন। আমি কি করে নিয়ে যাবো।"

"ওঠা ওঠা দেরী করিস না। আমি বুঝেছি তুই খুব ভালোলোক।"

কাঠুরে ভয়ে ভয়ে বারবার মির্জার মুখের দিকে চেয়ে হরিণটা তুলে আবার ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বলে, "আমি বুঝেছি মালিক। এটাকে জবাই করা হয়নি বলে হুজুর খাবেন না!"

মির্জা হেসে ফেলে বললেন, "ব্যস-ব্যস, তুই খুব বুঝেছিস। এবার ওঠা, চল্ বাড়ি চল্।" মির্জা ধর্মের বিষয়ে গোঁড়া নন। দশ বছর নমাজ

পারেননি। দু মাসে একবার নির্জলা উপোষ করেন কিন্তু কাঠুরে এ কথা ভেবে সান্ত্বনা পেল বলে তিনি তার ভুল ভাঙার চেষ্টা করলেন না।

কাঠুরে হালকা মনে হরিণটাকে কাঁধে করে নিয়ে ঘরের দিকে রওনা হলো। তংখা এতক্ষণ তটস্থ হয়ে সেই গাছের নীচেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। রোদে হরিণের কাছে ছুটে গিয়ে কষ্ট করতে যাবেন কন? দূর থেকে কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। কিন্তু যখন কাঠুরে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করলো তখন তিনি মির্জার কাছে এসে বললেন, "আপনি ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন? রাস্তা ভুলে গেলেন নাকি?"

মির্জা অপরাধীর মতো হেসে বললেন, "আমি শিকারটা এই গরীবকে দিয়ে দিয়েছি। এখন একটু ওর বাড়ি যাচ্ছি। আপনিও চলুন না।"

তংখা মির্জার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকালেন, "আপনার হুঁশ আছে, না নেই?"

"বলতে পারি না। নিজেই জানি না তা বলবো কি?"

"শিকারটা ওকে দিলেন কেন?"

"এটা পেয়ে ওর যত আনন্দ হবে, আপনার-আমার তা হবে না বলে।"

তংখা রেগে উঠে বললেন, "দূর মশাই। ভেবেছিলাম খুব কষে কাবাব খাবো। আপনি সারা মজা মাটি করে দিলেন। যাক্, মেহতা আর রায়-সাহেব নিশ্চয় কিছু আনবেন। কাজেই দুঃখ নেই। আমি এবারের ইলেক-শনের ব্যাপারে কিছু আরজি জানতে চাই। আপনি দাঁড়াতে চান না, ভালো কথা, আপনার যা খুশি কিন্তু যারা দাঁড়াচ্ছে তাদের কাছ থেকে যদি ভালো দাম উসুল করে নেওয়া যায় তো আপনার আপত্তির কি আছে? আমি শুধু বলতে চাইছি আপনি এখনো কাউকে বলবেন না যে আপনি দাঁড়াবেন না। স্রেফ এইটুকু দয়া আমাকে করুন। এই শহর থেকে খাজা জামাল তাহিরও দাঁড়াচ্ছেন। বড় লোকদের ভোট ষোলো আনাই উনি পাবেন, সরকারী আমলারাও ওঁর পক্ষে কিন্তু পাবলিকের ওপর আপনার প্রভাব বেশি। আপনি চাইলে ওঁর কাছ থেকে দশ-বিশ হাজার টাকা কামিয়েও নিতে পারেন। শুধু জানাবেন আপনি ওঁর জন্যেই দাঁড়াচ্ছেন না। নয়তো আমাকে আরজি জানাতে দিন। এই ব্যাপারে আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না শুধু চুপচাপ থাকবেন। আমি আপনার তরফ থেকে একটা মেনিফেস্টো বার করে দেবো আর সেই সন্ধ্যেবেলাই আপনি আমার কাছ থেকে দশটি হাজার নগদ টাকা উসুল করে নেবেন।"

মির্জা তংখার দিকে বিদ্রূপ ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "আমি এমন টাকা আর আপনার ওপর অভিশাপ দিই।"

মিস্টার তংখা কিছুই মনে করলেন না। বললেন, "আমায় যত খুশি অভিশাপ দিন কিন্তু টাকায় লাথি মেরে আপনি নিজেরই ক্ষতি করছেন।"

"আমি এরকম কাজকে 'হারাম'* মনে করি।

* হারাম=অপবিত্র

"আপনার ধর্মে তো এসব বন্ধন নেই।"

"লুঠের টাকাকে 'হারাম' বলতে হলে ধর্মের অনুশাসন খুঁজতে হয় না।"

"তাহলে এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত বদলাবে না?"

"আজ্ঞে না।"

"বেশ! এসব তাহলে বাদ দিন। কোন বীমা কোম্পানীর ডিরেক্টর হতে তা আপনার আপত্তি নেই? আপনাকে কোম্পানীর একজন পার্টনারও হতে হবে। আপনি স্রেফ আপনার নাম দিয়ে দেবেন।"

"আজ্ঞে না আমি এতেও রাজী নই। আমি কয়েকটা কোম্পানীর ডিরেক্টর, এজেন্ট, আর চেয়ারম্যান ছিলাম। ঐশ্বর্য আমার পায়ের তলায় পড়ে থাকতো। আমি জানি অর্থ সুখের যাদু উপকরণ জড়ো করতে পারে কিন্তু এও জানি অর্থ মানুষকে কত স্বার্থপর, আয়েসী ও বজ্জাত করে তোলে।"

মিস্টার তংখা আর নতুন কোন প্রস্তাব করতে সাহস পেলেন না। মির্জার বুদ্ধি ও প্রভাবের ওপর তাঁর যে বিশ্বাস ছিল তা অনেক কমে গেল। তাঁর কাছে অর্থই সব। যে হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলে তার সংগে তাঁর মিল হতে পারে না।

কাঠুরে হরিণ কাঁধে নিয়ে লাফাতে লাফাতে যাচ্ছিল। মির্জাও পা বাড়ান কিন্তু স্থূলকায় তংখা পিছিয়ে পড়েন। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "একটু দাঁড়ান মির্জাসাহেব আপনি যে দৌড়ে যাচ্ছেন।"

মির্জা না থেমে জবাব দিলেন, "ওই গরীব মানুষটা বোঝা মাথায় নিয়েও এত জোরে যেতে পারে আর আমরা শরীরটুকু নিয়ে ওর মতো চলতে পারবো না।"

কাঠুরে হরিণটাকে নামিয়ে দম নিচ্ছিল। মির্জা প্রশ্ন করলেন, "হাঁফিয়ে গেছিস, না?"

কাঠুরে সসংকোচে বলে, "খুব ভারী যে সরকার!"

"তাহলে দে, আমি কিছু দূর নিয়ে যাই।"

কাঠুরে হাসলো। মির্জা লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান পুরুষ আর সে রোগা-পটকা চেহারার অধিকারী। তবু সে হাসলো। মির্জার পিঠে চাবুক পড়লো বললেন, "তুই হাসলি কেন? ভাবছিস আমি এটা তুলতেই পারবো না?"

কাঠুরে যেন ক্ষমা চায়, "সরকার আপনারা বড়োমানুষ। বোঝা তোলা তো আমাদের মতো মজুরের কাজ।"

"আমি যে তোর চেয়ে দ্বিগুণ মোটা রে।"

"তাতে কি হয়েছে মালিক।"

মির্জার পৌরুষ আর অপমান সইতে পারলে না। তিনি এগিয়ে এসে হরিণটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে এগোলেন; কিন্তু অনেক কষ্টে পঞ্চাশ পা এগোতেই তাঁর জিভ বেরিয়ে এলো। থরথর করে পা কাঁপতে থাকে, চোখের সামনে প্রজাপতি ওড়ে। নিজেকে শক্ত করে আরো বিশ হাত এগোলেন। হতচ্ছাড়াটা কোথায় গেল! লাসের ভেতরে যেন সিসে পোরা আছে। একটু

মিস্টার তংখার ঘাড়ে চাপালে বেশ মজা হবে। দিন দিন মসকের* মতো ফুলেই চলেছেন, একটু দেখুন মজা! আরো ভাবলেন, 'বোঝাটা নামাই কি করে? দুজনেই বলবে ওঃ খুব বাহাদুরি দেখানো হচ্ছে। পঞ্চাশ পা যেতে না যেতেই চিঁচিঁ করছে।'

কাঠুরে ঠাট্টা করে, "বলুন মালিক, কেমন লাগছে? খুব হাল্কা, না?"

মির্জার বোঝা এবার একটু হাল্কা বোধ হয়। বললেন, "তুই যতখানি এনেছিস আমি ততখানি নিয়ে যাবো।"

"ক'দিন ঘাড় ব্যথা করবে যে, মালিক।"

"তুই কি মনে করিস, আমি এমনিই ফুলে উঠেছি?"

"না মালিক, আর তা মনে হচ্ছে না। মোদ্দা, আর আপনি হয়রাণ হবেন না। ওই উঁচু পাথরটার ওপর বোঝাটা নামিয়ে রাখুন।"

"আমি আরো অনেক দূর নিয়ে যেতে পারি।"

"আমি খালি হাতে যাবো আর আপনি বোঝা কাঁধে যাবেন, সে আমার ভালো লাগচে না।"

মির্জা পাথরের ওপর হরিণটা নামিয়ে রাখলেন। মিস্টার তংখাও ততক্ষণে এসে গেছেন। মির্জা বললেন, "এবার আপনাকেও কিছু দূর নিয়ে যেতে হবে।"

তংখার চোখে আর মির্জার কোন দাম নেই। বললেন, "মাফ করবেন। আমি পালোয়ান নই।"

"খুব বেশি ভারী নয়, সত্যি।"

"আরে, এসব কি হচ্ছে।"

"আপনি যদি এটাকে একশো পা নিয়ে যান তাহলে আমি কথা দিচ্ছি, আপনি আমাকে যা বলবেন, তাই করবো।"

"আমি এসব ছলচাতুরিতে বিশ্বাস করি না।"

"আমি আপনাকে ধোঁকা দিচ্ছি না। সত্যি! আপনি যে এলাকায় দাঁড়াতে বলবেন দাঁড়াবো, যখন ছেড়ে দিতে বলবেন ছেড়ে দেব। যে কাম্পানীর ডিরেক্টার, মেম্বার, মন্ত্রী, কনভেনার যা বলবেন, তাই হবো। 'শুধু একশো পা চলুন'। যারা দরকার পড়লে সব কিছু করতে পারে তাদের সঙ্গেই আমার ভালো বনে।"

তংখার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। মির্জা নিজের কথা রাখে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। হরিণটা এমন কি আর ভারী হবে? মির্জাও তো এত দূর এনেছে। খুব বেশি ক্লান্ত বলে তো মনে হচ্ছে না। যদি আপত্তি করে তো সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। এমন কি আর ভারি হবে? দু-চারদিন ঘাড়ে ব্যথা থাকবে এই তো। তা পকেটে পয়সা এলে অসুখও সুখ হয়ে যায়। বললেন, "তাহলে একশো পা যেতে হবে।"

"হ্যাঁ, একশো পা। আমি গুণবো।"

*মসক—চামড়ার জলপাত্র

"দেখবেন ভুল না হয়।"

"ভুলের মাথায় লাথি মারি।"

তংখা জুতোর ফিতে বেঁধে কোটটা কাঠুরের হাতে দিয়ে প্যান্টের পা গুটিয়ে মুখ পুঁছে হরিণটার দিকে এমন করে তাকালেন যেন হাড়কাঠে মাথা দিতে চলেছেন। তারপর হরিণের লাশ ঘাড়ে তোলার দু-তিনবার চেষ্টা করলেন। শেষে লাশ ঘাড়ে উঠলেও আর ঘাড় তুলতে পারেন না। কোমর ঝুঁকিয়ে হাঁফিয়ে লাশ ফেলে দেবার উপক্রম করলে মির্জা তাঁকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলেন।

তংখা এক পা বাড়ালেন। মনে হলো ঘাড় ভেঙে যাচ্ছে।

"মার দিয়া কেল্লা ফতে? বেঁচে থাকো।"

তংখা দুপা এগোলেন। তাঁর চোখ বেরিয়ে আসছিল।

"ব্যস, আর একবার চেষ্টা করুন দোস্ত। একশো পায়ের শর্ত বাতিল। পঞ্চাশ পা গেলেই চলবে।"

তংখার অবস্থা তখন শোচনীয়। মরা হরিণ জ্যান্ত বাঘের মতো তাঁকে দাবিয়ে রেখে যেন বুকের রক্ত চুষছে। সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত। শুধুমাত্র লোভ, লোভই তাঁকে লোহার বিমের মতো খাড়া করে রেখেছিল। শেষে সেও জবাব দিল। তংখার মাথা ঘুরতে লাগলো। চোখের সামনে আঁধার নেমে এলে তিনি হরিণ সমেত পাথুরে পাটির ওপর লুটিয়ে পড়লেন। মির্জা তৎক্ষণাৎ তাঁকে তুলে ধরে নিজের রুমাল দিয়ে হাওয়া করে পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়ে বললেন, "আপনি অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আপনার ভাগ্যই খারাপ।"

তংখা হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, "আপনি আজ আমার প্রাণ নিতে বসেছিলেন। দু মণের কম হবে না।"

মির্জা হেসে বললেন, "কিন্তু ভাইজান। আমিও তো এতদূর তুলে এনেছি।"

তংখা খোশামুদী শুরু করলেন, "আমি তো আপনার ফরমাশ পুরো করেছি। আপনি তামাশা দেখতে চেয়েছিলেন, দেখেছেন। এবার আপনার কথা রাখতে হবে।"

"আপনি শর্ত পূরণ করলেন কই?"

"প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করেছি।"

"তার প্রমাণ পাইনি।"

কাঠুরে আবার হরিণ কাঁধে বীরের মতো চলে। যেন দেখাতে চায়, এই প্রতিযোগিতায় তোমরা যতই চেষ্টা করো, দুর্বল হলেও আমি জিতবোই। সামনে একটা খাদ, তাতে সামান্য জল। খাদের ওপারে টিলায় ছোট ছোট পাঁচ-ছটি কুঁড়ে নিয়ে একটি ছোট গ্রাম দেখা দিল। কয়েকটি শিশু তেঁতুল গাছের নীচে খেলছিল। কাঠুরেকে দেখেই তারা কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানায়, "বাপু এসেছে। বাপু এসেছে।" একসঙ্গে অজস্র প্রশ্ন ঝরে পড়ে, "কে মারলো বাপু?" "কি করে মারলো?" "কোথায় মারলো?" "কি করে গুলি লাগলো?"

"কোথায় লাগলো?" "এর গায়েই বা লাগলো কেন?" "অন্য হরিণগুলো মরলো না কেন?" কাঠুরে হুঁ-হাঁ করে হরিণটা নামিয়ে রেখে দুই মহানুভব ব্যক্তির জন্যে, খাটিয়া আনতে ছোটে। তার চার ছেলেমেয়ে হরিণের ওপর নিজের নিজের অধিকার সাব্যস্ত করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

সবচেয়ে ছোটটি বলে, "এটা আমাল।"

তার দিদির বয়স চোদ্দ-পনেরো. অতিথিদের দেখে ধমক দেয়, "চুপ, নয় তো সেপাই ধরে নিয়ে যাবে।"

মির্জা ছেলেটির পেছনে লাগলেন, "তোমার নয়, আমার।"

ছেলেটি হরিণের ওপর বসে পড়ে বলে. "বাপু এনেচে তো।"

বোন শেখায়, "বলে দে ভাই. হ্যাঁ তোমার।"

এই বাচ্চাদের মা ছাগলের জন্যে পাতা পাড়ছিল। দুজন নতুন ভালো-মানুষ অতিথি দেখে ছোট্ট ঘোমটাখানা কষ্টেসৃষ্টে মাথায় টানে আর লজ্জা পায়। তার শাড়ি কি ময়লা, ছেঁড়াখোঁড়া, কাটিকুটিতে ভর্তি। সে এই বেশে কি করে অতিথিদের সামনে যাবে? আবার না গেলেও নয়। জল-টল দিতে হবে তো!

এখনও দুপুর হতে একটু দেরী আছে কিন্তু মির্জা ঠিক করলেন দুপুরটা এই গ্রামেই কাটাবেন। গ্রামের লোকজনকে জড়ো করা হলো। মদ আনালেন, মাংস রান্না হলো, কাছের বাজার থেকে ময়দা আর ঘি আনিয়ে সারা গ্রামে জবর ভোজের ব্যবস্থা করলেন। ছোট-বড়ো নারী-পুরুষ সকলেই নিমন্ত্রণ পেলো। পুরুষেরা মদ খেয়ে সন্ধ্যে পর্যন্ত নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে রইল। আর মির্জা শিশুর সঙ্গে শিশু, মাতালের সঙ্গে মাতাল, বুড়োর সঙ্গে বুড়ো, ছোঁড়ার সঙ্গে ছোঁড়া হয়ে সুখে কাটালেন। অল্প সময়ে সারা গ্রামের লোকের সঙ্গে তাঁর এমন ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল যে মনে হচ্ছিল তিনি এই গ্রামেরই আপন মানুষ।

সূর্যাস্তের সময় যখন তাঁরা বিদায় নিলেন তখন গ্রামের সবাই তাদের সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত এলো। কেউ কেউ তো কেঁদেই ফেললো। এমন সৌভাগ্য সম্ভবত গরীবগুর্বোদের ভাগ্যে এই প্রথম জুটলো। এঁর দর্শন কি তারা আর পাবে!

কিছু দূর হাঁটার পর মির্জা পেছন ফিরে দেখে বললেন, "বেচারারা কত খুশি হয়েছিল। হায়! আমার জীবনে যদি এমন সুযোগ প্রতিদিন আসতো। আজকের দিনটি বড়ো সুখের দিন।"

তংখা রুক্ষ স্বরে বললেন, "আপনার জন্যে শুভদিন হতে পারে আমার পক্ষে ঘোর অভিশাপ হয়েছে। কাজকর্মের কথা হলো না। সারাদিন জঙ্গল আর পাহাড়ে টো টো করে ধুলো খেয়ে এখন মুখ কালো করে ফিরে যাচ্ছি।"

মির্জা নির্দয় হয়ে বললেন, "আপনার প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নেই।"

দুজনে যখন বটগাছের কাছে পেঁছলেন তখন অন্য জুটিও এসে পড়েছে।

মেহতা মুখ নীচু করে বসেছিলেন। মালতী বিমনা হয়ে দূরে বসেছিলেন, যা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। রায়সাহেব আর খান্না অভুক্তই রয়েছেন, মুখে কথা নেই। তংখা মির্জার খারাপ ব্যবহারে দুঃখিত। শুধু মির্জার মন এক অলৌকিক আনন্দে পূর্ণ হয়েছিল।

৮

যখন থেকে হরির ঘরে গরু এসেছে তখন থেকে তার ঘরের শ্রী যেন বদলে গেছে। ধনিয়া তো গর্বে ফেটে পড়ছে। যখন দেখ, শুধু গরুর চর্চা!

ভুষি কমে গিয়েছিল। আখের মধ্যে কিছু 'চরী ঘাস' বুনে দেওয়া হয়েছে। তাই কুচিকুচি করে কেটে পশুদের খাওয়াতে হচ্ছে। আর চোখ পড়ে আছে আকাশের দিকে, কখন জল হবে, ঘাস গজাবে। আষাঢ়ের অর্ধেক কেটে গেল কিন্তু বর্ষা এলো না।

হঠাৎ একদিন মেঘ ঘনিয়ে আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণ হয়ে গেল। চাষীরা 'খরীফ' শস্য বোনবার জন্যে লাঙল নিয়ে বেরোতেই রায়সাহেবের গোমস্তা বলে পাঠালেন যে, বাকী খাজনা চুকিয়ে না দিলে কাউকে মাঠে লাঙল নিয়ে নামতে দেওয়া হবে না। চাষীদের মাথায় বজ্রপাত হলো। আর কখনো তো এমন কড়া হুকুম শোনা যায়নি। এ কেমন হুকুম? কেউ কি গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে? ক্ষেতে লাঙল না চললে টাকা আসবে কি করে? সবাই গোমস্তার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লো। গোমস্তার নাম পণ্ডিত নোখেরাম। মানুষটা খারাপ নয়। কিন্তু মালিকের হুকুম। কি করবে? এই তো সেদিন রায়সাহেব হরির সঙ্গে কেমন দয়াধর্মের কথা বলছিলেন। আর আজ প্রজাদের ওপরে এই জুলুম!

হরি রায়সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে ঠিক করলো। তারপর ভাবলে, উনি গোমস্তাকে যে হুকুম দিয়েছেন তা কি আর রদ করবেন? সে আগ বাড়িয়ে চক্ষুশূল হতে যাবে কেন? যা সবার ভাগ্যে আছে তাই সে ভাগ করে নেবে।

চাষীদের মধ্যে হৈচৈ পড়ে গেল। সবাই গ্রামের মহাজনদের কাছে টাকা ধার করতে ছোটে। মগরু শাহের অবস্থা এবার ভালো। এ বছরে প্রচুর লাভ করেছে। গম আর তিসিতেও কিছু কম আয় করেনি। পণ্ডিত দাতাদীন আর মুদীবৌ দুলারীও লেনদেনের কারবারী। সবচেয়ে বড়ো মহাজন হচ্ছে ঝিঙুরী সিং। সে শহরের এক বড়ো মহাজনের এজেন্ট। তার অধীনে কয়েকজন লোক আছে যারা আশপাশের গ্রামে ঘুরে ঘুরে লেনদেন করে। এরা ছাড়াও আরো কয়েকজন টাকায় দু আনা সুদ নিয়ে বিনা লেখাপড়ায় টাকা ধার দেয়। গ্রামবাসীদের মহাজন হবার এমনই শখ যে, যার কাছে দশ-বিশ টাকা জমে সেই মহাজন হয়ে বসে। এক সময় হরিও মহাজনী করতো। তারই প্রভাবে লোকে ভাবে এখনও হরির কাছে লুকোনো টাকা আছে।

নয়তো সে টাকা গেল কোথায়? ভাগবাঁটোয়ারার সময় সে টাকা বেরোয়নি। হরি তীর্থে যায়নি, বাড়িতে ভোজ দেয়নি। তবে? জুতো গেলেও পায়ের কড়া যায় না!

যে যেমন পারলো এক এক দেবতারকাছে ছুটলো। কেউ এক আনা সুদ দিতে রাজী হলো কেউ দু আনা। হরির আত্মসম্মান সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। যাদের ধার শোধ করতে পারেনি তাদের কাছে কোন্ মুখে যায়? ঝিঙুরী সিং ছাড়া আর কাউকেই সে দেখতে পেল না। সে পাকা কাগজ লেখায়, তার সেলামী, দস্তুরী, স্ট্যাম্পের কাগজে লেখার সব খরচ আলাদা আলাদা। তার ওপর সে এক বছরের সুদ কেটে নিয়ে টাকা দেয়। পঁচিশ টাকা কাগজে লিখলে অনেক কষ্টে সতেরো টাকা হাতে আসে। কিন্তু এই বিপদের সময় কি করা যায়? রায়সাহেবের জবরদস্তী, না হলে কেউ এ সময় ধারের জন্যে হাত পাততে যায়?

ঝিঙুরী সিং বসে বসে দাঁতন করছিল। বেঁটে, মোটা, টেকো, কালো-কোলো চেহারা, লম্বা নাক আর বড়ো বড়ো গোঁফে দেখায় ঠিক যেন একটা ভাঁড়। আর হাসাতেও পারে। এই গ্রামে বিয়ে করে পুরুষদের সংগে শালা কিংবা শ্বশুর আর মেয়েদের সংগে শালীশালাজের সম্পর্ক জুড়ে ঠাট্টাতামাশা করে। রাস্তায় বেরোলে ছোট ছেলেরা তাকে জ্বালায়, "সিংজী পেন্নাম।" আর ঝিঙুরী সিংও চটপট আশীর্বাদ করে, "তোদের চোক খসে যাক, কোমর ভাঙুক, মিরগী হোক, ঘরে আগুন লাগুক।" ছেলেরা এই আশীর্বাদে কিছু-মাত্র আঘাত পেত না। কিন্তু লেনদেনের ব্যাপারে ঝিঙুরী সিং বড়ো কঠোর। কখনো সুদের এক পাই ছাড়ে না আর কথামতো টাকা দেবার দিন টাকা না নিয়ে এক পাও নড়ে না।

হরি তাকে সেলাম করে নিজের দুঃখের কথা শোনালে ঝিঙুরী ঠাট্টা করে বলে, "সেই সব আগেকার টাকা কি হলো?"

আগেকার টাকা থাকলে কি ঠাকুর, মহাজনের ছুরি গলায় পড়তো? সুদ দিতে আর কার ভালো লাগে!"

"পোঁতা টাকা তোমরা কিছুতেই বার করবেনা, তা সে যতই সুদ দিতে হোক।"

"পোঁতা টাকা কোত্থেকে আসবে বাবুসাহেব। খাবারই জোটে না। ছেলেটা জোয়ান হয়ে উঠলো বের ঠিকঠিকানা নেই। বড়ো মেয়েও বের জুগ্যি হয়ে উঠেছে। টাকা থাকলে আর কিসের জন্যে পুঁতে রাখবো।"

ঝিঙুরী সিং যবে থেকে হরির বাড়িতে গরুটা দেখেছে তখন থেকেই সেদিকে নজর রেখেছ। গরুর গড়ন-পেটন দেখেই বোঝা যাচ্ছিল. পাঁচ সেরের কম দুধ হবে না। মনে মনে ভাবে হরিকে কোন প্যাঁচে ফেলে গরুটা হাতাতে হবে। আজ সেই সুযোগ পাওয়া গেল। বলে, "আচ্ছা ভাই, তোমার কাছে কিছু নেই যখন, তাহলে রাজী। যত টাকা চাও, নে যাও তবে তোমার ভালোর জন্যেই বল্‌চি গয়নাগাঁটি কিছু থাকে তো বাঁধা দিয়ে টাকা নাও।

ইস্‌টাম্পে লিখলে সুদ বেশি পড়বে, ঝামেলাও বাড়বে।”

হরি দিব্যি দিয়ে জানালো তার ঘরে গয়না দূরে থাক এক গাছি সুতোও নেই। ধনিয়া হাতে যে দুটো কড় আছে সে দুটোও গিল্টী করা। ঝিঙুরী সহানুভূতি জানিয়ে বলে, “তাহলে এক কাজ করো। নতুন যে গরুটা কিনেছো সেটা আমার কাছে বেচে দাও। সুদ, ইসটাম্প সব ঝামেলা থেকে বেঁচে যাবে। চারজন যা দাম বলে আমার কাছ থেকে না হয় তাই নাও। আমি জানি, তুমি শখ করে কিনেচো, বেচতেও চাও না, কিন্তু এই বিপদ থেকে বাঁচতে হবে না কি ?”

হরি প্রথমে এই প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিল। পরেও ভাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ঝিঙুরী সিং অনেক বোঝাতে কথাটা হরির মনে ধরে যায়। ‘ঠাকুর তো ঠিকই বলেছেন, যখন টাকা হাতে আসবে তখন গরুটা ছাড়িয়ে নিয়ে গেলেই চলবে। তিরিশ টাকার কাগজ লেখা পড়া করলে হয়তো পঞ্চাশটি টাকা পাওয়া যাবে। আর তিন চার বছর পর্যন্ত দিতে না পারলে পুরো একশো টাকা হয়ে যাবে।’ পূর্ব অভিজ্ঞতা অবশ্য তাকে বলে দিচ্ছিল যে, ‘ঋণ হচ্ছে সেই অতিথি যিনি একবার এলে আর যাবার নামও করেন না।’ বলে, “আমি একবার শলা করে আসি, তারপর বলবো।”

“শলা করতে হবে না। ওরা বলবে টাকা ধার নিলে নিজের সব্বোনাশ হবে।”

“আমি সবই বুঝতে পারচি ঠাকুর, এক্ষুনি এসে বলবো।”

কিন্তু ঘরে এসে প্রস্তাবটা করতেই হৈচৈ বেঁধে গেল। ধনিয়া কম চেঁচালেও দুই মেয়ে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করলো। “আমাদের গরু দোব না। যেখান থেকে পারো টাকা আনো গে।” সোনা তো বলেই ফেললো, “তারচেয়ে আমাকেই বেচে দাও না। গরুর চেয়েও বেশি দাম পাবে।” হরি মহা ফাঁফরে পড়লো। মেয়ে দুটো সত্যিই গরুটার জন্যে প্রাণ দিতে পারে। রূপা গরুর গলা ধরে ঝুলে পড়ে। সে গরুকে না খাইয়ে নিজে খায় না। গরুটাও সস্নেহে তার হাত চাটে, মায়া ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে। ওর বাচ্চাটা না জানি কি সুন্দর হবে। এখনি তার নামকরণ হয়ে গেছে—মটরু! রূপা বলেছে সে তাকে কাছে নিয়ে শোবে। এই গরুর জন্যে দুবোনের বেশ কয়েকবার ঝগড়া হয়ে গেছে। সোনা বলে, “আমায় বেশি ভালোবাসে।” রূপা বলে, “আমাকে।” এখনো কিছু স্থির হয়নি বলে দুটো দাবিই কায়েম রয়েছে।

হরি অনেক বুঝিয়ে ধনিয়াকে রাজী করায়। এক বন্ধুর কাছে ধারে গরু কিনে তাকে নগদ দামে বেচে দেওয়া খুবই গর্হিত কাজ, কিন্তু বিপদে পড়লে মানুষের ধর্ম চলে যায়, তা এ আর এমন কি বড়ো কথা! গোবরেরও খুব আপত্তি ছিল না, সে এখন অন্য ভাবনায় মত্ত। শেষে ঠিক হলো রাতে মেয়ে দুটো যখন ঘুমোবে তখন গরু ঝিঙুরি সিংয়ের বাড়ি যাবে।

দিনটা কোনরকমে কাটলো। সন্ধ্যে আটটা বাজতে না বাজতেই মেয়ে দুটি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে। গোবর এই করুণ দৃশ্যের অবতারণা হবার

আগেই কেটে পড়েছে। এমন দৃশ্য দেখে সে চোখের জল ধরে রাখবে কি করে? হরিও ওপরে কঠোর। মনটা চঞ্চল। এমন কেউ নেই যে এই সময় তাকে পঁচিশটা টাকা ধার দেয়, না হয় ফেরৎ নেবার সময় পঞ্চাশ টাকাই নেবে। সে গরুটার সামনে এসে দাঁড়ায়। মনে হলো, গরু তার অতলকালো সজীব দুটি সজল চোখ ছলছলিয়ে বলছে, "দুদিনেই তোমার ভালোবাসা উপে গেল? তুমি না বলেছিলে প্রাণ থাকতে আমাকে বেচবে না। এই তোমার কথা রাখা? আমি তো কখনো তোমার কথায় কিছু মনে করিনি। রুখুসুখু যা দিয়েছো খুশি হয়ে খেয়েছি। তবে?"

ধনিয়া বলে, "মেয়েরা তো শুয়ে পড়েছে। এবার ওকে নে যাও। বেছতেই যখন হবে তখন আর মায়া বাড়িয়ে লাভ কী?"

হরি কম্পিত স্বরে বলল, "আমার হাত উঠচে না রে ধনিয়া! ওর মুখ দেখ্চিস নে? আহা থাক্, টাকা সুদ দিয়েই নোব। ভগবান মুখ তুলে চাইলে সব শোধ হয়ে যাবে। তিন-চারশো হলেই বা কী? একবার আখটা লাগলেই হলো।"

ধনিয়া খুশি হয়ে হরির দিকে তাকায়, "তবে না তো কী? এত-তপিস্যের পরে ঘরে ভগবতী এলো। তাকেও বেচে দেবে। কালই টাকা নাওগে। যেমন করে অন্য ধার শোধ হবে, তেমনি করে এও চুকিয়ে দোব।"

ভেতরে বড়ো গরম। হাওয়া নেই। একটা পাতাও নড়ছে না। গুমোট মেঘ, বৃষ্টি নেই। হরি গরুটাকে বাইরে বেঁধে দিল। ধনিয়া বাধা দিয়ে বলে, "কোথায় নে যাচ্ছো আবার?" হরি শুনলো না। বললে, "বাইরে হাওয়ায় বাঁধছি। আরামে থাকবে। আহা ওরও তো পেরান আছে।" গরু বেঁধে সে শোভাকে দেখতে গেল। শোভা কয়েক মাস হলো হাঁফানী ব্যারামে ভুগছে: ওষুধ-বিষুধ করার ক্ষমতা নেই। খাবারই জোটে না তবু কোন-রকমে কাজ করছে। শোভা শান্তশিষ্ট স্বভাবের মানুষ, ঝগড়াঝাঁটি পছন্দ করে না। হরিকে শ্রদ্ধা করে, হরিও তাকে স্নেহ করে। দুজনের অনেক কথা হয়। রাত বাড়ে।

এগারোটা নাগাদ হরি ফিরে এসে বাড়ি ঢুকতে যাবে হঠাৎ তার মনে হলো গরুর পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করে, "কে ওখেনে দাঁড়িয়ে?"

হীরা বলে, "দাদা আমি। তোমার কৌড়া* থেকে আগুন নিতে এসেছিলুম।"

হীরা তার 'কৌড়া' থেকে আগুন নিতে এসেছে! এই ছোট্ট কথাটার মধ্যে হরি ভাইয়ের আত্মীয়তার পরিচয় পেল। গ্রামে আরো তো 'কৌড়া' আছে। হীরা যেখান থেকে খুশি আগুন নিতে পারতো। অবশ্য গ্রামের সবচেয়ে বড়ো এবং ভালো 'কৌড়া' হরিরটাই তবু এখানে হীরার আসা অন্য ব্যাপার। তাও আবার সেদিনের ঝগড়ার পর। হীরাটা রাগী হতে পারে, মনটি

* কৌড়া=আগুন রাখার পাত্র, প্রধানতঃ শীতকালে ব্যবহৃত হয়।

পরিষ্কার। হরি স্নেহপূর্ণ স্বরে বলল, "তামাক আছে, না এনে দোব?"

"না দাদা, তামাক আছে।"

"শোভার অবস্থা তো ভালো নয় রে।"

"কোন ওষুদবিষুদ না খেলে কি করা যাবে বলো? ও ভাবে সব হাকিম-বদ্যিই বোকা আর আনাড়ি। ভগমান যত বুদ্ধি ওকে আর ওর বৌকে দিয়েচেন।"

হরি চিন্তিত হয়ে বলে, "এই তো ওর দোষ। নিজের সমান কাউকে ভাবে না। ফেলে রাখলে রোগ তো বাড়বেই। তোমার মনে আছে সেই তোমার 'ইনফিঞ্জা' হয়েছিল, তখন তুমি ওষুদ ছুঁড়ে ফেলে দিতে। আমি তোমার দু হাত ধরতুম আর তোমার বৌদি মুখে ওষুধ ঢেলে দিত। আর তুমি তাকে খুব গাল দিতে। মনে পড়ে।"

"হ্যাঁ দাদা, সে সব কথা কি ভুলতে পারি? তুমি যদি এত না করবে তাহলে তোমার সঙ্গে লড়বার জন্যে বেঁচে থাকবো কেন?"

হরির মনে হলো হীরার কণ্ঠস্বর ভারি। তার গলাও ধরে আসে। বলে, "ভাই লড়াই-ঝগড়া তো জীবনের ধম্ম। এতে কি আর আপনজন পর হয়ে যায়? ঘরে চারজন লোক থাকলে তো ঝগড়া হবেই। যার কেউ নেই তার সঙ্গে কে লড়তে আসবে।" দুজনে এক সঙ্গে বসে তামাক খায়। তারপর হীরা বাড়ি যায় আর হরি ঘরে ঢোকে।

ধনিয়া ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, "দেখেচো তোমার সুপুত্তুরের কাণ্ড! এত রাত হয়ে গেল এখনও বাবুর ফুর্ত্তি করা শেষ হলো না। আমি সব জানি। সব খবর পেয়েছি। ভোলার ওই রাঁড় মেয়েটা আছে না, ঝুনিয়া! ওরই পেছনে পড়ে আছে।"

হরির কানেও একথা অস্পষ্টভাবে ঢুকেছিল, সে বিশ্বাস করেনি। গোবর বেচারা এসবের কি বোঝে। বলে, "কে বলেছে তোকে?"

ধনিয়া প্রচণ্ড হয়ে বলে, "তোমাকে বলেনি বোধহয় নয়তো সব্বাই বলচে। ওই তো বাহাত্তরঘাটের জল খাকী ভুগ্গা, এসব কথা বলে বেড়াচ্ছে। যেন এসব খবরের জন্যে তার পেরান পড়ে রয়েছে। তুমি ওকে এখনি ভালো করে বুঝিয়ে দাও, হয়তো একটা কিছু হয়ে গেলে তার চারা থাকবে না।"

হরির মন প্রফুল্ল। খুশি হয়ে বলে, "ঝুনিয়া দেখতে শুনতে তো খারাপ নয়। ওর সঙ্গেই বে দিয়ে দে না! আর এত সস্তায় কে মেয়ে দেবে বল্।"

ধনিয়ার বুকে এই হাসি তীরের মতো বেঁধে, "ঝুনিয়া এখেনে আসবে? মুখ ঝল্সে দেবে রাঁড়টার। গোবরের পছন্দ তো ওকে নিয়ে থাকুকগে যেখেনে খুশি।"

"আর গোবর যদি এই ঘরেই নে আসে?"

"তাহলে এই দুটো মেয়েকে কার গলায় ঝোলাবে? বেরাদরির* মধ্যে

* বেরাদরি=কুটুম্ব, পারা প্রতিবেশী।

তোমাকে কেউ মানবে? দোরে এসেও দাঁড়াবে না।”

“এসব ওরা গেরাহ্যি করে নাকি?”

“এম্‌নি ছাড়বো না বাবুকে। মরতে মরতে মানুষ করলুম আর ঝুনিয়া এসে রাজত্বি করবে, তা হবে না। রাঁড়মাগীর মুখে আগুন লাগিয়ে দোব।”

হঠাৎ গোবরের গলা শোনা গেল। সে খুব ভয় পেয়ে ডাকছে, “বাবা, সুন্দরীয়ার কি হলো গো? কাল সাপে কাটলো নাকি রে বাবা। মাটিতে পড়ে ধড়ফড় করচে যে।”

হরি রান্নাঘরে খেতে বসেছিল। থালা ফেলে ছুটে এলো, “কি সব অলুক্ষুণে কথা বলচিস রে। এই মাত্র বাইরে দেখে আসছি। শুয়েছিল তো।”

তিনজনে বাইরে এসে প্রদীপ নিয়ে দেখে। সুন্দরীর মুখ থেকে গাঁজলা বেরুচ্ছে। চোখ পাথর, পেট ফোলা, চার পা ছড়ানো। ধনিয়া মাথা কুটতে থাকে। হরি দাতাদীনের কাছে ছোটে। তিনিই গ্রামের সেরা পশু চিকিৎসক। তিনি শুতে যাচ্ছিলেন, শুনেই ছুটে এলেন। ততক্ষণে সারা গ্রাম ভেঙে পড়েছে। গরুটাকে নিশ্চয় কেউ কিছু খাইয়েছে। বিষের লক্ষণ সুস্পষ্ট! কিন্তু গ্রামে কে এমন শত্রু আছে যে গরুকে বিষ খাওয়াবে! হরির সঙ্গে কারুর এমন কোন শত্রুতা নেই যে সন্দেহ করা যায়! হীরার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছিল বটে সে তো ভাই-ভাইয়ের ঝগড়া! সবচেয়ে বেশি দুঃখ তো হীরাই পেয়েছে। চীৎকার করে সেই তো বলছে ‘যে খুন করেছে তার খোঁজ পেলে টুঁটি ছিঁড়ে নোব।’ সে যতই রাগী হোক না কেন এত নীচ কাজ করতে পারে না। মাঝ রাত পর্যন্ত সবাই জমা হয়ে রইল। এ সময় খুনী ধরা পড়লে সে প্রাণে বাঁচতো কিনা সন্দেহ। সবাই হরির দুঃখে দুঃখী হয়ে হত্যাকারীকে গালাগাল দিচ্ছিল। সবার চিন্তা নিজের নিজের হেলে গরু কোথায় বাঁধবে? এখনও রাতবিরেত পর্যন্ত জন্তু-জানোয়ার বাইরেই পড়ে থাকে। নতুন বিপদ এলো। আহা কী গরু ছিল। দেখবার মতো! পুজোর যুগ্যি! পাঁচ সেরের কম দুধ হতো নাগো! এক একটা বাছা এক-একশো টাকায় বিকোতো গো! বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়ে গেল!

যখন সবাই নিজের নিজের বাড়ি ফিরে গেল তখন ধনিয়া হরিকে খুঁড়তে লাগলো, “তোমায় হাজার বোজালেও বুজবে না। নিজের গোঁ-য়ে কাজ করবে। তখন থেকে বলচি গরু নে বাইরে যেও না। আমাদের দিন খারাপ, কে জানে কোত্থেকে কি হয়! কি, নাঃ গরুর গরম লাগচে। এখন গরু ঠাণ্ডা হয়েচে তো। আর তোমার মনও ঠাণ্ডা হয়েচে। ঠাকুর চাইছিলেন দিলেই হতো। বোঝাও নামতো, দায় উদ্ধারও হতো। তা হবে কেন? কিছু হবার আগে যে মানুষের বুদ্ধি হরে যায়। এ্যাদ্দিন ঘরে কত ভালো ছিল। গরমও লাগেনি, জুড়িয়েও যায়নি। সব্বাইকে চিনে গেছিল। বাচ্চারা শিঙ ধরে খেলা করতো তবু কোনদিন মাথা নাড়েনি। যখন যা দিয়েচি চেটেপুটে খেয়েচে। সাক্ষাৎ মালক্ষ্মী অভাগার ঘরে থাকবে কেন? সোনারূপোও চেঁচামেচিতে জেগে উঠে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। গোসেবার ভার তাদের ওপরেই ছিল। সুন্দরী

ওদের সখী হয়ে উঠেছিল। হায়! কপাল পুড়লো! সব গেলো!

সোনা রূপা আর গোবর কেঁদে কেটে ঘুমিয়ে পড়লো। হরিও শোয়। ধনিয়া এক ঘটি জল দিতে এসেছিল। হরি বললে, "তোর পেটে তো কথা থাকে না, কিছু শুনলে সারা গাঁয়ে ঢ্যাঁটরা পিটিয়ে বল্‌বি।"

ধনিয়া আপত্তি জানায়, "বেশ শুনি, আমি কোন্‌ কথা বলে বেড়িয়েচি যে আমার বদনাম করছো।"

"আচ্ছা, তোর কাউকে সন্দ হয়।"

"আমার তো কাউকে সন্দ হয় না, বাইরের কেউ হবে।"

"কাউকে বল্‌বি নে তো।"

"বল্‌বো না তো গাঁয়ের লোক আমায় গয়না গড়িয়ে দেবে কি করে?"

"যদি কাউকে বলিস তো মেরেই ফেলবো।"

"আমাকে মেরে তোমার সুখ হবে না। এখন মেয়ে সহজে মেলে না। যতক্ষণ আছি তোমার ঘর গেরস্তালী দেখচি। যেদিন মরে যাবো, মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে বসবে। এখন আমার সব কিছু খারাপ লাগচে তখন চোখ দিয়ে জল গড়াবে।"

"আমার সন্দ হচ্ছে হীরেটাকে।"

"ভুল এ তোমার ভুল! হীরের মন এত নীচ নয়। তার মুখটাই যা মন্দ।"

"আমি নিজের চোখে দেখিচি যে। সত্যি। তোর মাথার দিব্যি।"

"তুমি নিজের চোখে কি দেখেচো? কবে?"

"ওই যে, শোভাকে দেখে আসছি, তখন ও সুন্দরীর নাদার পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমি বললুম 'কে'? তখন বলল 'আমি হীরে, কৌড়া থেকে আগুন নিতে এসেচি। আমার সঙ্গে দু চারটে কথাও বললে তারপর তামাক খাওয়ালে। ও-ও গেছে, আর গোবর এসে চেঁচামেচি শুরু করেছে। মনে হচ্ছে, আমি গরু বেঁধে শোভার কাছে গেলে ও কিছু খাইয়ে দিয়েছে। হয়তো পরে আবার দেখতে এসেছিল মরেছে কি না।"

ধনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, "ভাই এমন হয়, বড়ো ভাইয়ের গলা কাটতে একটুও হাত কাঁপলো না। উঃ হীরের মন এত কুটিল। আর এই হতভাগাকেই আমি কিনা পেলেপুষে বড়ো করেছি।"

"আচ্ছা, আচ্ছা শুনে যা। কাউকে কিছু বলিস না।"

"কি? বলবো না? সকাল হতেই বাবুকে যদি থানায় না পাঠাই তো আমি আমার বাপের বেটি নই। ওই খুনে বদমাসটা কি ভাই নামের যুগ্যি! এই ভাইয়ের কাজ! ও হলো শত্তুর! পাকা শত্তুর! শত্তুরকে মারা পাপ নয়, ছেড়ে দেওয়াই পাপ।"

হরি ধমকে ওঠে, "তাহলে অনত্থ হয়ে যাবে ধনিয়া।"

ধনিয়া নিজের মনেই বলে, "অনত্থ নয়, অনত্থর বাপ হবে। আমি তাকে হাজতে না পাঠিয়ে ছাড়বো না। তিন বচ্ছর চাকি পেষাবো। তিন বচ্ছর! ওখেন থেকে বেরোলে গরু মারার পাপ লাগবে, তীথ করতে হবে। ভোজ দিতে হবে।

এই ধোঁকা দেওয়া চলবে না। আমি সাক্ষী দেওয়াবো তোমাকে দিয়ে, ছেলের মাথায় হাত রেখে।"

সে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। আর হরি বাইরে শুয়ে নিজেকেই দোষ দেয়। তার পেটেই যখন কথা রইল না তখন ধনিয়ার পেটে থাকবে কি করে? এখন তো ডাইনী আর শুনবে না। রাগলে সে কারুর কথা শোনে না। এই প্রথম সে এত বড়ো ভুল করলো।

চারদিক অন্ধকারে স্তব্ধ। হেলে গরু দুটোর গলার ঘণ্টায় মাঝে মাঝে টুং টাং শব্দ উঠছে। দশ পা দূরে মরা গরুটা পড়ে আছে। হরি অনুশোচনায় এপাশ-ওপাশ করে। অন্ধকারে কোথাও যেন আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে না।

৯

সকালবেলা হরির বাড়িতে হাঙ্গামা বেঁধে গিয়েছিল। সেখানে হরি ধনিয়াকে মারছিল। ধনিয়া তাকে গাল দিচ্ছিল। দুই মেয়ে বাপের পা ধরে চেঁচাচ্ছিল আর গোবর মাকে বাঁচাচ্ছিল। সে বারবার হরির হাত ধরে পেছন দিকে ঠেলে দেয় কিন্তু যেই ধনিয়ার মুখ থেকে গালিগালাজ বেরোয় অমনি হরি আবার লাথি ঘুঁষি ছুঁড়ে মারতে শুরু করে। সারা গ্রাম বোঝাবার নাম করে তামাশা দেখতে ছুটে এলো। শোভা লাঠি ঠুকে এসে দাঁড়াল। দাতাদীন লাঠি ঠুকে ধমক দেন, "এ কী হচ্চে হরি? তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি? কেউ ঘরের লক্ষ্মীকে এমন করে মারে? তোমার তো এত রাগ ছিল না. হীরের ছোঁয়াচ লেগেচে বুজি?"

হরি তাঁর পায়ে পড়ে বলল, "মহারাজ, তুমি এখন কিছু বোলো না। আমি আজ ওর বদ অভ্যেসগুলো ছাড়িয়ে তবে দম্ নোব। আমি যত আস্কারা দিই মাগী ততই মাথায় চড়ছে।"

ধনিয়া ক্রুদ্ধ সজল কণ্ঠে বলে, "তুমি সাক্ষী রইলে মহারাজ, আমি আজ ওকে আর ওর খুনে ভাইকে হাজতে পাঠিয়ে তবে জল খাবো। ওর ভাই গরু-টাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেচে। এখন আমি যেই থানায় রপট লেখাতে বেরিইচি, অমনি খুনেটা আমাকে মারচে। ওরই জন্য সারা জেবনটা চৌপাট করে দিলুম, এখন তার বখশিশ দিচ্চে।"

হরি দাঁতে দাঁত পিষে চোখ পাকিয়ে বলে. "ফের ওই কথা মুখ দে বার করলি। তুই হীরেকে বিষ খাওয়াতে দেকিচিস?"

"তুই কসম* খেয়ে বল তুই হীরেকে নাদার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেকিসনি?"

"না, আমি দেখিনি, কসম খাচ্চি।"

"বেটার মাথায় হাত দিয়ে কসম খা।"

* কসম=দিব্য, প্রতিজ্ঞা

হরি গোবরের মাথায় কম্পিত হাত রেখে কাঁপতে কাঁপতে বলে, "বেটার কসম খেয়ে বল্‌চি, আমি হীরেকে নাদার কাছে দেকিনি।"

ধনিয়া মাটিতে থুতু ফেলে বলে, "থুঃ, থুতু ফেলি তোর মিছে কথার ওপর। তুই নিজে আমায় বলিচিস হীরে চোরের মতো নাদার পাশে দাঁড়িয়েছিল। আর এখন ভাইয়ের হয়ে মিছে কথা বলচিস। থু-থুঃ! যদি আমার ছেলের এক চুল ক্ষেতি হয় তাহলে ঘরেদোরে আগুন লাগিয়ে দোব। ভগমান, মানুষ নিজে মুখে এক কথা বলে আবার বেহায়ার মতো কথা ঘোরাতে পারে। ছি ছি!"

হরি মাটিতে পা ঠুকে বলে, "ধনিয়া, রাগাসনি ভালো হবে না।"

"মেরেই তো যাচ্চিস। আরো মার্। যদি তুই তোর বাপের ব্যাটা হোস তাহলে আমাকে মেরে তবে জল খাবি। পাপী কোথাকার, মারতে মারতে আমার গতর চুর করে দিয়েচে তবু আশ মেটেনি। আমাকে মেরে ভাবচে বড়ো পালোয়ান হয়ে গেচি। আর ভাইয়েদের কাছে ভিজে বেড়াল হয়ে মিউ মিউ করে। পাপী। খুনে!" আবার সে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে—এই ঘরে এসে সে কত কষ্ট পেয়েছে, কেমন করে খিদেয় পেট-পিঠ এক হয়ে গেছে, ন্যাতাকানি পরে দিন গেছে, কি করে একটা একটা করে পয়সা জমিয়েছে, কেমন করে সবাইকে খাইয়ে নিজে জল খেয়ে থেকেছে। আর এই তার পুরস্কার! ভগবান এই অন্যায় বসে বসে দেখছেন, আসছেন না! দৌপদীকে রক্ষা করতে তো বৈকুণ্ঠ ছেড়ে ছুটেছিলেন, আজ কি ঘুমিয়ে পড়লেন?

জনমত ধীরে ধীরে ধনিয়ার পক্ষ নেয়। এখন আর কারুর মনে সন্দেহ নেই। হীরাই গরুকে বিষ দিয়েছে। হরি যে মিথ্যে দিব্যি গেলেছে সেকথাও সবাই বিশ্বাস করলো। গোবরও বাপের মিথ্যে দিব্যি আর তার ফলস্বরূপ আগামী বিপদের আশংকায় হরির বিপক্ষে চলে গেল। তারপর দাতাদীনের ধমক খেয়ে হরি পরাস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেই সত্য প্রমাণিত হলো।

দাতাদীন শোভাকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কিছু জানো শোভা? কি কতাবাত্তা হয়েছিল।"

শোভা মাটিতে শুয়ে পড়ে বলে, "আমি তো মহারাজ আট দিন বাইরেই বেরোইনি। হরিদাদা মাঝে মাঝে কিছু দিয়ে আসে তাতেই কোনরকমে কাজ চলে। কাল রাতেও দাদা আমার কাছে গেছিল। কে কি করেচে আমি কিছু জানি না। কাল সন্ধ্যেবেলা হীরে আমার বাড়িতে খুরপী চাইতে গেছিলো বটে। বলছিল একটা জড়ীবুটির গাছ তুলবে। তারপর আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।"

ধনিয়া সমর্থন পেয়ে বলে, "মহারাজ, এ কাজ হীরেই করেচে। শোভার ঘর থেকে খুরপী এনে কোন বিষাক্ত শেকড়বাকড় খুঁড়ে গরুকে খাইয়ে দিয়েচে। সেদিন রাতের ঝগড়ার পর থেকে ও হিংসেয় মরে যাচ্ছিল।"

দাতাদীন বললেন, "একথার প্রমাণ পাওয়া গেলে ওর ওপর গোহত্যার পাপ লাগবে। পুলিশ কিছু করুক আর নাই করুক ধম্ম দণ্ড দিতে ছাড়বে না।

যাতো, রূপিয়া, হীরেকে ডেকে আন্‌তো। বল্‌বি পণ্ডিতদাদা ডাকচে। যদি সে খুন না করে থাকে তাহলে 'গঙ্গাজলী'* হাতে নিয়ে 'চৌরায়'** দাঁড়িয়ে কসম খাক।"

ধনিয়া বলে, "মহারাজ, ওর কসমের ওপর ভরসা নেই। এত ধম্মাত্মা হয়ে ওই যখন মিথ্যে কসম খেলো তখন হীরেকে বিশ্বেস কি?"

এবার গোবর বলে, "মিথ্যে দিব্যি দেয় তো দিক্‌গে। নিব্বংশ হয়ে যাক্‌। বুড়োরা বাঁচুক আর ছেলেরা সব মরুক।"

রূপা এক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে বলে, "কাকা ঘরে নেই পণ্ডিতদাদা! কাকী বলচে, কোথায় গেচে জানে না।"

দাতাদীন লম্বা দাড়ি নেড়ে ধমক লাগান, "তুই জিজ্ঞেস করতে পারলি না, কোথায় গেচে ঘরে লুকিয়ে বসে নেই তো। দেখে আর তো সোনা ঘরে বসে আচে নাকি?"

ধনিয়া বলে, "ওকে পাঠিও না মহারাজ, হীরের মাথায় খুন চেপেচে না জানি কি করে বসবে।"

দাতাদীন নিজেই লাঠি ঠুক ঠুক করে খবর নিয়ে এলেন যে হীরা সত্যি সত্যিই কোথাও চলে গেছে। পুনিয়া বললে লোটাকম্বল আর ডাণ্ডা*** নিয়ে বেরিয়েছে। পুনিয়া জিজ্ঞেস করেছিল, তাকে বলেনি। কুলুঙ্গীতে পাঁচটা টাকা ছিল তাও নিয়ে গেছে।

ধনিয়া শীতল হৃদয়ে বলে, "মুখে কালি মাখিয়ে কোথাও ভেগেচে আর কি।"

শোভা বলে, "পালিয়ে যাবে কোতায়? গঙ্গা নাইতে যায়নি তো?"

ধনিয়া শংকা প্রকাশ করে, "গঙ্গায় গেলে টাকা নে যাবে কেন? আর এখন তো কোন 'পরব' নেই।"

এই প্রশ্নের সমাধান হলো না। ধারনা বদ্ধমূল হলো। হরির ঘরে আজ রান্না হলো না। হেলে গরু দুটোকেও কেউ খোলজাব দিলে না। সারা গ্রামে থমথমে ভাব। জায়গায় জায়গায় দু-চারজন লোকের জটলা। সবাই একথা আলোচনা করছে। হীরে অবশ্যই কোথাও পালিয়েছে। দেখলে ধরা পড়লে জেলে যেতে হবে, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তাই পালিয়েছে। পুনিয়া একলাই কাঁদছিল, 'কিছু বললে না কইলে না না জানি কোথায় চলে গেল।'

যেটুকু বাকী ছিল সন্ধ্যেবেলা দারোগা এসে পূরণ করে দিলেন। গ্রামের চৌকিদার কর্তব্যবশতঃ এই ঘটনার রিপোর্ট করলে দারোগাসাহেব নিজের কর্তব্য করতে এলেন। এখন গ্রামের লোককেও তাঁর সেবাযত্ন করে নিজের কর্তব্য পালন করতে হবে। দাতাদীন, ঝিঙুরী সিং, নোখেরাম তাঁর চারজন

* গঙ্গাজলী=গঙ্গাজল রাখার ধাতব পাত্র ** চৌরা=পবিত্র স্থান/মন্দির

*** লোটা কম্বল আর ডাণ্ডা=কারু কাছে এই তিনটি জিনিষ থাকলে মনে হত সে তীর্থ করতে বেরিয়েছে।

পেয়াদা, মগরু শাহ আর লালা পটেশ্বরী সবাই এসে দারোগার সামনে হাত-জোড় করে দাঁড়ালেন। হরিকে 'তলব' করা হলো। জীবনে এই প্রথম সে দারোগার সামনে এসে দাঁড়ালো। ধনিয়াকে পেটবার সময় তার এক-এক অঙ্গ যেন লাফিয়ে উঠছিল আর এখন দারোগার সামনে কচ্ছপের মতো হাত-পা পেটের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। দারোগা তাকে সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখেই তার মনের ছবি স্পষ্ট দেখতে পেলেন। মানুষ চেনা তাঁর বহুদিনের অভ্যাস। বুঝতে পারলো আজ দিন ভালো যাবে। হরিকে ফাঁসীর আসামীর মতো মুখ করে থাকতে দেখে বুঝলেন একটা ধমকই তার পক্ষে যথেষ্ট।

দারোগা প্রশ্ন করলেন, "তোমার কাকে সন্দেহ হয়।"

হরি মাটি ছুঁয়ে হাতজোড় করে বললে, "আমার কাউকে সন্দ হয় না সরকার। বুড়ি গরু, আপনিই মরেচে।"

ধনিয়া পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তৎক্ষণাৎ বলে, "গরু মেরেচে তোমার ভাই হীরে। সরকার এত বোকা নয় যে তুমি যা খুশি বলবে আর উনি শুনবেন। খোঁজখবর পেয়েই এসেচেন।"

দারোগা বললেন, "এই মেয়েছেলেটা কে ?"

কয়েকজন দারোগার সঙ্গে একটু কথা বলবার খুব চেষ্টা করছিল, এখন একসঙ্গে উত্তর দেয়; মনে মনে কল্পনা করে সন্তোষ লাভ করে 'আমিই সবার আগে বলেছি'। সবাই বলে, "হরির বৌ সরকার।"

"তাহলে ওকেই ডাকো। আমি আগে ওর বয়ান লিখবো। সেই হীরা কোথায় ?"

বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একসঙ্গে বললেন, "সে তো আজ সকাল থেকেই পালিয়েচে সরকার !"

"আমি ওর বাড়ি তল্লাশী করবো।"

তল্লাশী! হরির বুক ধড়ফড় করতে থাকে। তার ভাইয়ের ঘর তল্লাশী হবে! তায় হীরা বাড়ি নেই, তাও আবার হরি বেঁচে থাকতে! তার চোখের সামনে এ কাজ হতে পারে না। ধনিয়ার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রইল না। যেখানে খুশি যাক। সে যখন হরির ইজ্জতের ওপর হাত দিতে পেরেছে তখন তার ঘরে থাকবে কেন? যখন পথে পথে ঠোক্কর খাবে, তখন বুঝবে।

গ্রামের প্রধানরা এই সংকট এড়াবার জন্যে কানাকানি করেন। দাতাদীন চুপি চুপি বললেন, "এসব টাকা আদায়ের ফন্দী। জিজ্ঞেস করো, হীরের ঘরে কি আচে ?"

পটেশ্বরী লালা খুব লম্বা তবে বোকা নয়। নিজের লম্বা কালো মুখটা আরো লম্বা করে বললে, "ও এখেনে এসেছে কেন ? যখনি আসে কিছু না নিয়ে নড়ে না।"

ঝিঙ্গুরী সিং হরিকে ডেকে কানে কানে বলে, "যা কিছু দিতে পারো, বার করো। এমনিতে গলার কাঁটা নামবে না।"

দারোগা এবার একটু গর্জন করে বললেন, "আমি হীরার ঘর তল্লাশী করবো।"

হরির মুখের রঙ নিমেষে উড়ে গেল। তল্লাশী তার ঘরেই হোক আর তার ভাইয়ের ঘরেই হোক, একই কথা। হীরা আলাদা হলেও দুনিয়া জানে সে হরির ভাই। এখন তার মুখে কথা সরলো না। তার কাছে থাকলে এক্ষুনি পঞ্চাশ টাকা দারোগার পায়ে ফেলে দিয়ে বলতো. "সরকার আমার মানইজ্জত সব আপনার হাতে।" কিন্তু তার কাছে বিষ কিনে খাওয়ারও একটা পয়সা নেই। ধনিয়ার কাছে হয়তো দু-চার টাকা আছে, তা ডাইনী কি দেবে? ফাঁসীর আসামীর মতো মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

দাতাদীন বললেন, "এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না হরি। টাকার জোগাড় করো।"

হরি ক্ষীণ স্বরে বলল, "আমি কি বলবো মহারাজ! এখনো তো আগেকার বোঝাই মাথা থেকে নামাতে পারিনি। আর কোন্ মুখে ধার চাইব? এই সংকট থেকে বাঁচাও। বেঁচে থাকি পাই-পাই চুকিয়ে দোব. মরে যাই গোবর তো রইলো।"

নেতারা পরামর্শ করেন। দারোগাকে কি দেওয়া যায়? দাতাদীন পঞ্চাশ টাকা দেবার প্রস্তাব করেন। ঝিঙ্গুরী সিং-এর অনুমান একশোর কমে রাজী করানো যাবে না। নোখেরামও একশো টাকার পক্ষে, আর হরির কাছে একশো ও পঞ্চাশের মধ্যে কোন ফারাক ছিল না। এই তল্লাশী সংকট মাথা থেকে নামাতে যত পুজো দিতে হয়, দেবে। মড়াকে একমণ কাঠেই জ্বালাও আর দশ মণ কাঠেই জ্বালাও, তার কাছে দুটোই সমান!

কিন্তু পটেশ্বরীর এতটা সহ্য হল না। কোন ডাকাতি হয়নি কেউ কোতল* করেনি কেবল তল্লশী হবার কথা। তার জন্যে কুড়ি টাকাই যথেষ্ট। নেতারা ধিক্কার দিলেন, "তুমিই তাহলে কথাবার্তা চালাও। আমরা মধ্যস্থ হতে পারবো না। কে দাবড়ি খেতে যাবে?"

হরি পটেশ্বরীর পায়ে মাথা খোঁড়ে, "দাদা আমায় উদ্ধার করো। যদ্দিন বাঁচবো তোমার তাঁবেদারি করবো।"

দারোগা আবার বাজখাঁই হাঁক ছাড়লেন, "কোথায় হীরার বাড়ি? আমি তল্লাশী করবো!"

পটেশ্বরী দারোগার কানে কানে বলে, "তল্লাশী নিয়ে কি করবেন হুজুর, ওর ভাই তাঁবেদারীর জন্যে হাজির আছে।"

দুজনে একটু দূরে গিয়ে কথাবার্তা চালায়।

"কেমন লোক?"

"বড্ড গরীব হুজুর। খেতেই পায় না।"

"সত্যি?"

* কোতল=খুন

"হ্যাঁ হুজুর, ধম্মসাক্ষী, সত্যি বলচি।"

"আরে পঞ্চাশটা টাকাও দিতে পারবে না?"

"কত বললেন হুজুর! পঞ্চাশ! দশ টাকা যদি বার করে তো তাকে হাজার ভাববেন। পঞ্চাশ তো পঞ্চাশ জন্মেও দিতে পারবে না। যদি কোন মহাজন ওর জন্যে দাঁড়ায় তবে।"

দারোগা এক মিনিট ভেবে বললেন. "তাহলে আর ওকে জ্বালিয়ে কি হবে? মরার ওপর খাঁড়ার ঘা আমি মারি না।"

পটেশ্বরী বলে, "না হুজুর এমন করবেন না। তাহলে আমরা কোথায় যাবো? আমাদের কাছে আর কী আচে?"

"তুমি এই এলাকার পাটোয়ারী হয়ে কি বলছো হে?"

"যখন এমন সুযোগ আসে তখন আপনার দৌলতে আমরাও কিছু পাই। নয়তো আমাকে কেই-বা পোঁছে!"

"আচ্ছা যাও। তিরিশ টাকা পাইয়ে দাও। বিশ টাকা আমার দশটাকা তোমার।"

"চারজন মুখিয়া* রয়েছে যে।"

"তাহলে আধাআধি হোক। শীগগির ব্যবস্থা করো। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

পটেশ্বরী ঝিঙুরীকে বললে সে হরিকে ইশারায় ডেকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তিরিশ টাকা গুণে তার হাতে দিয়ে বলে, "আজই কাগজে সই করে দিও। তোমার মুখ দেখেই টাকা দিচ্ছি, তোমার ভালোমানষির জন্যে।"

হরি টাকা গামছায় বেঁধে প্রসন্নমুখে দারোগার দিকে এগোতেই ধনিয়া কোথা থেকে এসে চিলের মতো ছোঁ মেরে এক ঝটকায় তার হাত থেকে গামছাটা কেড়ে নেয়। গিঁঠটা শক্ত ছিল না, টান পড়তেই খুলে গিয়ে সব টাকা মাটিতে ছড়িয়ে পড়লো। নাগিনীর মতো ফুঁসে ওঠে ধনিয়া বললে, "এই টাকা কোথায় নিয়ে যাচ্চিস, বল! ভালো চাস তো সব টাকা ফিরিয়ে দে বলচি নয়তো কুরুক্ষেত্তর হবে। ঘরের লোকগুলো দিন দিন ধুঁকে মরছে, একটু খুদকুঁড়োর জন্যে হেদাচ্ছে, পরবার যুগ্যি একটুকরো কানি জোটে না আর উনি আজলা ভত্তি টাকা নিয়ে চলেছেন ইজ্জত বাঁচাতে। এত তোর মানইজ্জত! যার ঘরে ইঁদুরও খেতে পায় না সে আবার মানীলোক! দারোগা তল্লাশী নেবে তো নেবে। করুক যেখানে খুশি তল্লাশী! এক তো একশো টাকার গরু গেল তার ওপর এই বালাই! বাহ্! বলিহারী তোর ইজ্জত!"

হরি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সবাই স্তব্ধ। নেতাদের মাথা নীচু। আর দারোগা! তাঁর জীবনে এত বড়ো পরাজয় আগে কখনও হয়নি। কিন্তু তিনি এত সহজে হারবার পাত্র নন। রাগ দেখিয়ে বললেন, "আমার তো মনে হচ্ছে শয়তানের শালা, হীরাকে ফাঁসাবার জন্যে নিজেই গরুটাকে বিষ দিয়েছে।"

* মুখিয়া=মোড়ল

ধনিয়া আঙুল মটকে বলে, "হ্যাঁ দিইচি। নিজের গরু নিজেই মেরে ফেলেচি, বেশ করেচি। অন্য কারুর জানোয়ার তো মারিনি। তোমার যদি তাই মনে হয় তবে তাই লেখো। আমার হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দাও। দেখে নিলুম তোমার ন্যায়ধম্মের দৌড়। গরীবের গলা কাটা ছাড়া কাজ নেই। সেই বলে না 'দুধ কা দুধ পানি কা পানি'* সেটাই আসল কথা।"

হরি জ্বলন্ত চোখ করে আবার ধনিয়ার দিকে ছোটে কিন্তু গোবর বাধা দিয়ে উগ্রস্বরে বলে, "দ্যাখো বাবা, অনেক হয়েচে। পিছু হটে যাও নইলে আমি গলায় দড়ি দোব।"

হরি পেছিয়ে যায় আর ধনিয়া বাঘিনী হয়ে ওঠে. "তুই সরে যা গোবর, দেখি তো আমার কি করে? দারোগাবাবু বসে আচে দেখি ওর হিম্মত দেখি। ঘরে তল্লাশী হলে ওর মান যায় আর সারা গাঁয়ের লোকের সামনে নিজের বৌকে লাতাতে ওর ইজ্জত যায় না। এই তো বীরের ধম্ম! বাহাদুর যদি হোস তো কোন মরদের সঙ্গে গিয়ে লড়গে যা। যাকে হাত ধরে ঘরে এনিচিস তাকে মেরে আর ক্যাদ্দানী দেকাস না। তুই ভেবেচিস তুই আমাকে খাওয়াস পরাস। বেশ আজ থেকে নিজের ঘর তুই নিজে সামলা। দ্যাখ, এই গাঁয়ে তোর বুকে 'মুগ ডলে' থাকতে পারি কিনা। আরো ভালো খাবো-পরবো। ইচ্ছে থাকে তো দেকিস্।"

হরি পরাস্ত হলো। নারীর সামনে পুরুষ কত দুর্বল কত অসহায়!

নেতারা টাকাগুলো কুড়িয়ে দারোগাকে দেবার জন্যে ইশারা করতেই ধনিয়া আবার আসর জমালো, "যার টাকা নিয়েচিস, তাকে ফিরিয়ে দে বলচি। আমরা কারুর কাছে ধার নোব না। তবু যদি দিতে হয় তবে ওরাই দিক। আমি একটা কড়িও দোব না তাতে যদি আমাকে হাকিমের এজলাসে চড়তে হয় তো হোক। বাকী চোকাবার জন্যে পঁচিশটা টাকা কেউ দেয়নি আর এখন আঁজলাভরা টাকা ঠন্‌ঠন্ করে বার করে দিলেন। আমি সব জানি। সব ভাগবাঁটোয়ারার ব্যাপার। সব্বার মুখ মিষ্টি হবে। এই খুনেগুলো হচ্ছে গাঁয়ের মুখিয়া। গরীবের রক্ত চুষে খায়। দেড়া সুদ, সোয়াগুণ সুদ, দশ্‌শনী, সেলামী, ঘুষঘাষ যেমন করে হোক গরীবকে মারো। এই করে এরা সুরাজ** চায়। জেলে গেলে সুরাজ মিলবে না। সুরাজ আসে ধম্ম থেকে, ন্যায় থেকে।"

নেতাদের মুখ কালো হয়ে উঠলো। আর দারোগার মনে হলো তাঁর মুখে ঝাঁটার বাড়ি পড়েছে। হরি লজ্জা ঢাকতে ঘরে ঢুকে যায়। রাস্তায় নেমে দারোগা স্বীকার করলেন, "এই মেয়েছেলেটা তো বড্ডো ঝগরুটে।"

পটেশ্বরী বলে, "ভীষণ ঝগরুটে হুজুর, তেমনি কর্কশ স্বভাব। এমন মেয়েছেলেকে গুলি মেরে উড়িয়ে দিতে হয়।"

"তোমাদের তো খুব জ্বালালে দেখচি। ভাগের চার-চাব টাকা গেল।"

* 'দুধ কা দুধ পানি কা পানি'='যখন যেমন তখন তেমন'

** সুরাজ=স্বরাজ

"হুজুরেরও তো পনেরো টাকা গেল।"

"আমার যাবে কেন? ও দেবে না গাঁয়ের মুখিয়ারা দেবে। আর পনেরোর জায়গায় পুরো পঞ্চাশ। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করো।"

পটেশ্বরী হেসে ফেলে, "হুজুর খুব ঠাট্টা-তামাশা করতে পারেন।"

দাতাদীন বললেন, "বড়ো মানুষের লক্ষণই এই। এমন ভাগ্যবানের দর্শন মেলে কই?"

দারোগা কঠোর স্বরে বললেন, "এসব খোশামোদ পরে কোরো। এখন আমার পঞ্চাশ টাকা বার করো। আর এ নিয়ে যদি কানাকানি করেচো তাহলে তোমাদের চারজনের ঘরই খানাতল্লাশী করবো। বেশ বুঝতে পারছি, তোমরা হরি আর হীরাকে ফাঁসিয়ে ওদের কাছ থেকে একশো পঞ্চাশ না হোক কিছু হাতাবার জন্যে বজ্জাতি করছো।"

নেতারা তখনও ভাবছিলেন দারোগা তামাশা করছে। তাই ঝিঙুরী সিং চোখ পিটে বলে, "পঞ্চাশ টাকা বার করো পাটোয়ারী সায়েব।"

নোখেরাম সমর্থন জানালো, "পাটোয়ারী সায়েবের এলাকা যখন, আপনা-কেই তো খাতির করতে হবে।"

পণ্ডিত নোখেরামের চৌপাল* এসে গেল। দারোগা একটা 'চারপাই' দখল করে বসে বললেন, "তোমরা কি ঠিক করলে? টাকা দেবে না তল্লাসী করবো।"

দাতাদীন বললেন, "কিন্তু হুজুর . "

"আমি কিন্তু-টিন্তু শুনতে চাই না।"

ঝিঙুরী সিং সাহস করে বললেন, "সরকার এতো সরাসরি…"

"আমি পনেরো মিনিট সময় দিচ্ছি। যদি এই সময়ের মধ্যে পুরো পঞ্চাশ না আসে তাহলে তোমাদের ঘর তল্লাশী হবে। এই গণ্ডা সিংকে জানো তো! তার মার খাবার পর জল খেতেও চাইবে না।"

পটেশ্বরী দৃঢ় স্বরে বলে, "আপনার এক্তার** আছে, তল্লাশী নেবেন নিন। এ ভালো তামাশা হয়েছে। কে কাজ করে আর কে ধরা পড়ে।"

"আমি পঁচিশ বছর দারোগাগিরি করছি, তা জানো?"

"এমন ফ্যাসাদে তো কখনো পড়িনি।"

"তোমরা এখনো বিপদ কাকে বলে জানো না। বলো তো দেখিয়ে দিই। এক একজনকে পাঁচ বছরের জন্যে চালান করে দিই। এতো আমার বাঁ হাতের খেলা। ডাকাতির দায়ে সারা গাঁকে দীপান্তরে পাঠাতে পারি, তা জানো? ওসব চালাকি কোরো না।"

চার মুখিয়াই চৌপালের আড়ালে গিয়ে পরামর্শ করেন তারপর কি হলো কেউ জানে না। তবে হ্যাঁ দারোগাকে প্রসন্ন দেখাচ্ছিল, চারজনের মুখ যেন শুকিয়ে আমসি। দারোগার ঘোড়ার পেছনে চারজনই ছুটলেন তারপর ঘোড়া দূরে চলে গেলে চার মহান ব্যক্তি ফিরলেন মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তাঁরা কোন প্রিয়জনকে

* চৌপাল=চণ্ডীমণ্ডপ ** এক্তার=এখতিয়ার/অধিকার

শ্মশানে পুড়িয়ে ফিরছেন।

হঠাৎ দাতাদীন বললেন, "আমার শাপ না লাগে তো আর মুখ দেখবো না।"

নোখেরাম সমর্থন করেন, "এমন ধন কখনো থাকে না।"

পটেশ্বরী ভবিষ্যৎবাণী করলেন, "পাপের ধন প্রাচিত্তিরে যায়।"

ঝিঙুরী সিংয়ের আজ ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের ওপর সন্দেহ এসে গেল। এত পাপ দেখেও ভগবান পাপীকে দণ্ড দিতে নেমে এলেন না। সত্যি কথা বলতে কি, এসময় এই মাণ্যিগণ্যি মুখিয়াদের মুখের ভাব ছবি তোলার যোগ্য!

১০

হীরার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। দিন যায়। হরি যথাসাধ্য দৌড়-ঝাঁপ করেছে, তারপর হার মেনেছে। চাষবাশের দিকটাও তো দেখতে হবে। একলা মানুষ, কি করে? এখন তাকে নিজের ক্ষেতের চেয়েও বেশি ভাবতে হচ্ছে পুনিয়ার ক্ষেতের জন্যে। পুনিয়া একলা হয়ে আরো প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। হরি তো ওকে খোশামোদ করে চলে। হীরা মেরেধরে পুনিয়াকে দাবিয়ে রাখতো সে চলে গেলে পুনিয়ার কোন বাধা রইল না। হরির জমির অংশীদার হীরা। পুনিয়া মেয়েমানুষ, তার সঙ্গে কে দরাদরি করবে? পুনিয়াও হরির স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত বলে সুযোগ নিতে কসুর* করলো না। ভালোর মধ্যে এই হলো যে, গোমস্তা পুনিয়ার বকেয়া খাজনা উসুল করবার জন্যে কড়াকড়ি করলেন না। শুধু একটু প্রণামী নিয়েই তুষ্ট হলেন। নয় তো হরি নিজের বকেয়া খাজনার সঙ্গে পুনিয়ার বকেয়া চোকাবার জন্যেও ধার নিতে রাজী ছিল। শ্রাবণ মাসে ধান রোয়ার এমন ধুম পড়ে গেল যে হরি নিজের খেতে ধান বোনার জন্যে মজুরই পেলে না, কিন্তু পুনিয়ার ক্ষেতে ধান রোয়া হয়ে গেল। ফলে হরির আমন ফসল খুব কম হলো আর পুনিয়ার বখরা ধান রাখবার জায়গাই মেলে না।

হরি আর ধনিয়া সেই ঘটনার পর থেকে নিজের ইচ্ছে মতো ছাড়া ছাড়া হয়ে দিন কাটাচ্ছে। গোবরও কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়েছে। হরি এখন নিজগৃহে পরদেশী। দু নৌকোয় পা দিলে যে দুর্গতি হয় হরিরও তাই হয়েছে। গ্রামেও আর তার খাতির নেই। বরং ধনিয়া নিজের সাহস দেখিয়ে শুধু মেয়েদের নয়, পুরুষদেরও শ্রদ্ধা পেতে শুরু করেছে। মাসখানেক ধরে এই প্রসঙ্গের আলো-চলো হলো, অনেকে ধনিয়াকে দেখতেও এলো। রটে গেলো ধনিয়া অলৌকিক শক্তির অধিকারিনী। মা ভবানী তার ইষ্টদেবী "দারোগাবাবু যেমনি তার সোয়ামীর হাতে হাতকড়া লাগিয়েচে অমনি মা ভবানীকে সুমরণ** করে ধনিয়া হাতকড়ি ছিঁড়ে ফেলে দারোগার গোঁফ উবড়ে নিল।" এখন সেসব কথা পুরনো হয়ে গেলেও গ্রামে ধনিয়ার সম্মান বৃদ্ধি পেল।

* কসুর=ত্রুটি

** সুমরণ=স্মরণ

ধীরে ধীরে ধনিয়ারও পরিবর্তন হচ্ছিল। তাই হরিকে পুনিয়ার জন্যে খাটতে দেখলেও কিছু বলতো না। কারণটা হরির ওপর বিরক্তি নয় বরং পুনিয়ার জন্যে তার করুণা হতো। বাড়ি ঘর ছেড়ে হীরার পালিয়ে যাওয়াই তার প্রতিশোদ পরিতৃপ্তির পক্ষে যথেষ্ট।

এর মধ্যে হঠাৎ হরির জবর আসতে শুরু করে। গ্রামে চারদিকে টাইফয়েড হচ্ছিল হরিও তার আওতায় গিয়ে পড়লো। বহুবছর পরে ব্যাধি তার বকেয়া পাওনা ভালোভাবেই চুকিয়ে দেয়। হরি একমাস বিছানায় পড়ে রইল। এই ব্যামো হরিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে ধনিয়াকেও জয় করে নিল। স্বামী যখন মরছে তখন তার সঙ্গে আবার শত্রুতা কিসের? এমন দশায় শত্তুরও শত্রুতা করে না আর এতো তার স্বামী। যত খারাপই হোক ওর সঙ্গেই তো জীবনের পঁচিশটা বছর কেটেছে। সুখভোগ দুঃখভোগ যা কিছু করেছে সবই ওর সঙ্গে। এখন সে ভালো হোক, মন্দ হোক তার আপনজন। সে ভাবে, মিনসে সবার সামনে আমার গায়ে হাত তুলেচে। সারা গাঁয়ের সামনে আমার চোখের জল বার করে ছেড়েচে। কিন্তু তখন থেকে লজ্জায় আমার দিকে চাইতে পারে না। খেতে আসে মাথা নীচু করে, ভয় পায় পাছে আমি কিছু করে বসি। হরি যখন সুস্থ হলো তখন দাম্পত্য কলহ মিটমাট হয়ে গেছে।

একদিন ধনিয়া বলে, "তোমার অত রাগ হলো কেন বলো তো? তোমার ওপর যতই রাগ হোক আমার হাত উঠবে না।"

হরি লজ্জিত হয়ে বলে, "আর সেসব কথা বলিসনে ধনিয়া। আমাকে যেন ভূতে ভর করেছিল। পরে এ নিয়ে যে কত দুঃখু পেয়েচি সে শুধু আমিই জানি।"

"আমি যদি রাগের মাথায় ডুবে মরতুম।"

"আর আমি বুঝি কাঁদবার জন্যে বসে থাকতুম ভেবেচিস? আমার মড়াও তোর সঙ্গে এক চিতেয় উঠতো।"

"হয়েচে হয়েচে, আর বেয়াক্কেলে কথা বলতে হবে না।"

"গরু তো গেলই। এখন মাথায় নতুন বিপত্তি চাপলো। পুনিয়ার কথাও ভাবতে হচ্চে।"

"তাই তো বলে, ভগমান বাড়ির মধ্যে বড়ো কোরো না। ছোটকে নিয়ে কেউ হাসে না। দায়দায়িত্ব সব বড়োর ঘাড়ে পড়ে।"

মাঘ মাস। মেঘলা আকাশ। ঘোর অন্ধকার। একে শীতের রাত তায় মাঘের বর্ষা! মৃত্যুর মতো চারদিক ছেয়ে আছে। হরি খেয়েদেয়ে পুনিয়ার মটরক্ষেতের আলের পাশে নিজের চালায় শুয়ে শীত ভুলে ঘুমোবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু জিরেজিরে কম্বল আর ছেঁড়াফাটা মেরজাই আর শীতে স্যাঁৎস্যাঁতে ভিজে ভিজে ঘড়—এর মধ্যে ঘুমের আসতে সাহস হচ্ছিল না। আজ তামাকও পায়নি যে একটু ভুলে থাকবে। ঘুঁটে জেবলে এনেছিল, শীতে সেটাও নিভে গেছে। হিমে ফাটা পাদুটোকে পেটের কাছে গুটিয়ে এনে হাত দিয়ে হাঁটুদুটো জড়িয়ে ধরে কুকুর-কুণ্ডলী পেকে কম্বলে মুখটা ঢেকে হরি নিজের গরম নিঃশ্বাসে

নিজেকে গরম করে তোলার চেষ্টা করে। পাঁচ বছর আগে মেরজাইটা তৈরি করিয়েছে ধনিয়ার জোর-জবরদস্তীতে। আর কম্বলটা তার জন্মেরও আগে-কার। ছেলেবেলায় বাপের সঙ্গে সে এই কম্বলেই শুতো যৌবনে গোবরকে নিয়ে এই কম্বলেই শুয়েছে, আজ বুড়ো বয়সে সেই পুরনো কম্বলই তার সাথী।

জীবনে এমন দিন কখনো এলো না যখন খাজনা আর মহাজনদের পাওনা মিটিয়েও কিছু বাঁচে। এখন আবার উড়ো বিপদ ঘাড়ে চাপলো। না করো তো দুনিয়া হাসবে, করো তো ভাবনা লোকে কি বলবে। সবাই ভাবছে, সে সমস্ত ফসল নিজের ঘরে তুলছে। প্রশংসা হবে কি, উল্টে বদনাম লেগে থাকে। ওদিকে ভোলা কয়েকবার তাগাদা করেছে, কোন সাগুার* ব্যবস্থা করার জন্যে। শোভা তাকে কয়েকবার বলেছে, পুনিয়ার তার সম্বন্ধে ধারণা ভালো নেই। না থাক। পুনিয়ার সংসার তাকেই সামলাতে হবে, সে হেসে কেঁদে যে করেই হোক।

হরি-ভাবে, 'ধনিয়ার মন এখনও পরিস্কার হয়নি। সবার সামনে ওকে মারা আমার উচিত হয়নি। যার সঙ্গে পঁচিশটা বছর কেটেছে, তাকে মারা. তাও সবার সামনে, আমারই দোষ; ধনিয়াও তো আমার আবরু নস্যাৎ করতে ছাড়েনি আমার সামনে দিয়ে চলে যায়, যেন চেনে না। কোন কথা বলতে হলে সোনা রুপাকে দিয়ে বলায়। শাড়িটা ছিঁড়ে কানি হয়ে গেচে কিন্তু কাল আমাকে সোনার শাড়ির কথা বললো, নিজের নামও করলো না। সোনার শাড়িতে তালি মেরে এখনও দু তিন মাস পরা চলে। আর আমিই বা ওর সঙ্গে কি ভালো ব্যবহার করচি। দু-চারটে মন রাখা কথা বললে কি ছোট হয়ে যাবো? ব্যামো হলো তাই, না হলে কতদিন রাগ করে থাকতো কে জানে? আজ এতদিন পরে তাদের মধ্যে যে কথাবার্তা হলো সে যেন 'ভুখে কা ভোজন**. ধনিয়া মন থেকে বলল আর হরি গদ্‌গদ হয় শুনলো। তার ইচ্ছে করছিল ওর পায়ের কাছে মাথা নুইয়ে বলে 'আমি তোকে মেরেচি। এখন মাথা পাতচি. যত খুশি গাল দে।'

হঠাৎ তার চালার সামনে কাঁচের চুড়ির টুংটাং শোনা গেল। হরি কান পেতে শোনে। হ্যাঁ। কেউ এসেছে। পাটোয়ারীর মেয়ে কিংবা পণ্ডিতের বৌ। মটর তুলতে এসেছে। এদের নজর এত ছোট কেন রে বাবা! সারা গাঁয়ে সব-চেয়ে ভালো খায়, ভালো পরে, ঘরে হাজার হাজার টাকা পোঁতা আছে, লেন-দেন করে, দেড়া-সোয়া হিসেব কষে ঘুষ নেয়, দস্তুরী নেয় তবু স্বভাব দেখ! বাপ যেমন, সন্তানও তেমনি হবে তো! এক্ষুণি উঠে হাত চেপে ধরলে কি হবে? ছোটরা কথাতেই ছোট আর বড়োদের মন যে আরো ছোট তার খোঁজ কে রাখে? উপড়ে নে ভাই, যত তোর প্রাণ চায়, ভেবে নে. আমি নেই। বড়ো মানুষ নিজের লাজসরম না রাখলে ছোটলোককেই তার লাজ রাখতে হয়।

কিন্তু না, এতো ধনিয়া। তাকে ডাকছে, "শুয়ে পড়লে না জেগে আচো?"

হরি ঝটপট চালা থেকে বেরিয়ে আসে। আজ বুঝি দেবী প্রসন্ন হয়ে

* সাগুার=বিবাহের   ** ভুখে কা ভোজন=খিদের মুখে খাবার।

তাকে বর দিতে এসেছে। আবার ভয়ও করে, শীতের বাদলা রাতে ধনিয়া এলো কেন ? নিশ্চয় কিছু হয়েছে। বলে, "ঠাণ্ডার জ্বালায় ঘুম আসে নাকি ? তুই এত শীতে এখেনে এলি কেন ? সব ঠিক আচে তো ?"

"হ্যাঁ সব ঠিক আচে।"

"গোবরকে দিয়ে ডাকতে পাঠালেই পারতিস।"

ধনিয়া এ কথার উত্তর না দিয়ে চালায় ঢুকে ঘড়ের ওপর বসে বলে, "গোবর তো মুখে চুণকালি মাখালো। ওর কথা আর জিজ্ঞেস কোরো না। যা ভয় ছিল, তাই হয়েচে।"

"কী হলো কী ? মারপিট করেচে ?"

"কি করেচে আমি জানবো কি করে ? গিয়ে জিজ্ঞেস করোগে ওই রাঁড়টাকে।"

"কোন রাঁড়কে ? কি বলছিস তুই ? পাগল হোস্‌নি তো ?"

"হ্যাঁ, পাগল হতে আর বাকী থাকবে কেন ? এমন কথা শুনলে যে বুকের ছাতি দুগুণ ফুলে যায়।"

"সোজা কথা বল্‌বি তো ? কোন্‌ রাঁড়ের কথা বলছিস্‌ ?"

"ওই ঝুনিয়ার কথা। আর কে আচে ?"

"ঝুনিয়া কি এখেনে এসেচে ?"

"আর কোতায় যাবে ?"

"গোবর বাড়িতে নেই ?"

"গোবরের কোন খোঁজ নেই। কেজানে কোথায় ভেগেচে। ঝুনিয়া পাঁচ মাসের পেট নিয়ে এসেচে।"

হরি সব বুঝতে পারে। গোবরকে বারবার গয়লাপাড়ায় যেতে দেখে তার খটকা লেগেছিল ঠিকই তবে সে ছেলেকে এতটা খেলোয়াড় ভাবতে পারেনি। ছেলেছোকরারা একটু আধটু রঙ্গরসিকতা করেই সেটা নতুন নয় কিন্তু এমনটি হবে ভাবেনি। গোবর এত লম্পট ! সে অন্য কথা ভাবছিল না, শুধু ভাবছিল গোবরের কথা। ছেলেটা লাজুক, গোঁয়ার, আনাড়ী—শেষে কোন বোকামী না করে বসে। ভয় পেয়ে বলে, "ঝুনিয়া কিছু বলতে পারলো না ? গোবর কোতায় গেল ?"

ধনিয়া মুখ ঝামটে বলে, "তোমার বুদ্ধিতে কি ঘাস গজালো নাকি ? তার ভালোবাসার লোক তো এখেনে বসে আচে। পালিয়ে যাবে কোতায় ? এখেনেই কোতাও লুকিয়ে বসে আচে হয়তো। দুধ খায় নাকি যে হারিয়ে যাবে। আমি তো কালামুখী ঝুনিয়ার কতা ভাবছি, একে নিয়ে কি করি ? নিজের বাড়িতে আমি থাকতে দোব না তা বলে দিচ্ছি। যেদিন গরু আনতে গেছিল সেদিন থেকে দুজনের লটপট শুরু হয়েচে। পেটে বাচ্চা না এলে বলতো নাকি ? ঝুনিয়া ভয় পেয়ে যখন পালাতে চাইলো তখন থেকে গোবর শুধু টালবাহানা করচে। মেয়েছেলে নিয়ে যাবে কোথায় ? আজ ঝুনিয়া চেপে ধরতে তখন বলেচে তুই গে আমার ঘরে থাক, কেউ কিছু বলবে না। মাকে

মানিয়ে নোব। তাই শুনে এই গাধাও বেরিয়ে এলো। তারপর পাকা সড়ক ধরে কোন্ চুলোয় গেচে কে জানে? ঝুনিয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন রাত হয়ে গেল তখন নিজের বাড়ি না গিয়ে এখেনে এসেচে। আমি তো বলে দিইচি 'যেমন কম্ম করেচো তার ফলভোগ করোগে' ডাইনী আমার ছেলে-টাকেও চৌপাট করে দিল। তখন থেকে বসে বসে কাঁদচে। উঠচে না। বল্‌চে নিজের ঘরে কোন মুখে যাবো। ভগমান এমন ছেলে না দে বাঁজা করলেও যে ভালো ছিল। সকাল হলেই গাঁয়ের সব্বাই হৈহৈ করবে। মনে হচ্চে বিষ খেয়ে মরি। আমি তোমাকে পষ্ট করে বলে দিচ্চি বাড়িতে ওকে রাখবো না। গোবর রাখতে চায় তো নিজের মাথার ওপর রাখুক গে। ঘরে এমন 'ছাত্তিসী'-দের* ঠাঁই হবে না বলে দিচ্চি। যদি তুমি মাঝে পড়ে কথা কও তাহলে হয় তুমি থাকবে, নয় আমি।"

হরি বলে, "তোর সঙ্গে বনেনি। ওকে ঘরে ঢুকতে দিলি কেন?"

"সব কিছু বলে হার মেনেচি। একটা কথাও শুনচে না। ধন্না দিয়ে পড়ে আচে।"

"আচ্ছা চল্, দেখি কেমন না ওঠে। টেনে বার করে দোব।"

"ভোলা হতভাগা চুপ করে বসে বসে দেখছিল। বাপও এত বেহায়া হয়।"

"সে কি জানে? এরা কি খিচুড়ী পাকাচ্চে।"

"জানবে না কেন? গোবর রাতদিন ওখেনে পড়ে ছিল দেখেনি। তখন চোকবুজে বসেছিল নাকি? ভাবা উচিত ছিল ছোঁড়াটা দৌড়ে দৌড়ে এতবার আসে কেন।"

"চল্ আমি ঝুনিয়াকে জিজ্ঞেস করচি।" দুজনে চালা থেকে বেরিয়ে আসে। হরি বলে, "মাজ রাত হবে মনে হয়।"

"তবে নাতো কি? সব ঘুমিয়ে পড়েচে। কোন চোর এলে সারা গা লুটে নেবে।"

"চোর এসব গাঁয়ে আসে না। বড়োলোকদের বাড়ি যায়।"

ধনিয়া হরির হাতটা চেপে ধরে বলে, "দ্যাখো, শোরগোল কোরো না। সারা গাঁ জেগে যাবে। সব শুনবে।"

হরি কঠোর স্বরে বলে, "আমি ওসব জানি না। হাত ধবে হিঁচড়ে টেনে গাঁয়ের বার করে দোব। কথা তো রটবেই। আজ রটলেই বা কি হবে। ও আমার বাড়িতে এসেচে কেন? যাক যেখেনে খুশি, দেখুকগে কোথায় গোবর আচে। তার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করার সময় কি আমাদের জিজ্ঞেস করেছিল।"

ধনিয়া আবাব তাব হাত ধরে, "তুমি ওর হাত ধরলে ঠিক চেঁচাবে।"

"চেঁচাক্ গে।"

* ছাত্তিসী=কুলটা নারী

"মোদ্দা কথা এত রাত হয়ে গেল। নিশ্বতি রাত। কোতায় যাবে, সেকতা ভাবো।"

"যাবে যেখানে ওর জ্ঞাতগুষ্ঠিরা আছে। আমাদের ঘরে কি ?"

"তা ঠিক তবে এত রাতে ঘর থেকে বার করে দেওয়া উচিত নয়। পোয়াতি মানুষ। কোথাও ভয়টয় পেলে তো আরো বিপদ। এ সময় কাজকম্মও তো করতে পারবে না।"

"মরুক বাঁচুক আমাদের কী! যেখানে খুশি যাক। নিজের মুখে কালি লাগাতে যাবো কেন? গোবরকেও দূর করে দোব।"

ধনিয়া গভীরভাবে চিন্তা করে বলে, "কালি যা লাগবার লেগেচে। জেবন থাকতে যাবে না। গোবর ভরাডুবি করে ছেড়েচে।"

"গোবর নয়, এই ছুঁড়ি ডুবিয়েচে। গোবরটা ছেলেমানুষ, ওর পাল্লায় গিয়ে পড়লো।"

"যেই ডোবাক, ডুবলো তো।"

দুজনে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। ধনিয়া হঠাৎ দু হাতে হরির গলা জড়িয়ে ধরে ফিস্‌ফিস্ করে বলে, "দ্যাখো, আমার দিব্যি রইলো, ওর গায়ে হাত তুলো না। বেচারী তো নিজেই কেঁদে মরচে। কপাল মন্দ না হলে এমন হবে কেন?"

হরির চোখ সজল হয়ে ওঠে। ধনিয়ার এই মাতৃস্নেহ অন্ধকারেও প্রদীপের মতো ধনিয়ার চিন্তাজর্জর কৃশ তনুটিতে এক অপরূপ লাবণ্য এনে দিল। দুজনেরই অতীতের কথা মনে পড়ে যায়। হরি এই বিগত যৌবনার মধ্যে সেই নরমসরম বালিকাকে খুঁজে পায়, পঁচিশ বছর আগে যে তার জীবনে প্রবেশ করেছিল।

দুজনে বাড়ি এসে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে। কুলুংগীতে তেলের কুপী জ্বলছে আর সেই মিটমিটে আলোয় ঝুনিয়া হাঁটুতে মাথা রেখে মধুর স্বপ্ন দেখছিল। যে ক্ষণিক আনন্দ তাকে মোহিনীমায়া দেখিয়ে অন্তর্হিত হয়েছে তার কথাই সে ভাবছিল। তার সমস্ত সুখস্বপ্ন আলাদীনের রাজ-প্রাসাদের মতোই মিলিয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ ভয়ংকর দানব হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

দরজা খুলে হরিকে আসতে দেখেই সে ভয়ে কেঁপে উঠে হরির পায়ের ওপর পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, "বাবা, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। মারো কাটো যা খুশি করো তোমার দোর থেকে দূর করে দিও না বাবা।"

হরি তার পিঠে হাত রেখে কোমলকণ্ঠে বলে, "ভয় পাসনি বেটি, ভয় পাসনি। তোরই ঘর-দোর, তোরই সব। তোর যেমন খুশি থাক। তুই ভোলার যেমন মেয়ে, তেমনি আমারও মেয়ে। যতক্ষণ আচি কোন চিন্তা নেই। আমরা থাকতে কেউ তোর দিকে বাঁকা চোকেও চাইতে পারবে না। ভোজ-ভাত যা দিতে হয় সব আমি দোব। তুই চুপ করে থাক্।"

ঝুনিয়া সান্ত্বনা পেয়ে হরির পায়ের সংগে মিশে গিয়ে বলে, "এখন

তোমরাই আমার মা-বাপ। আমাকে একটু আশ্রয় দাও নয়তো আমার বাপ-দাদারা আমাকে কাঁচাই গিলে খাবে।”

ধনিয়া সদয়ভাব চাপতে না পেরে বলে, “তুই ঘরে গিয়ে বোস্। আমি দেখে নোব তোর বাপ-ভাইদের। এ দুনিয়াটা তাদের রাজত্বি নয় যে যা খুশি তাই করবে। বড়ো জোর তোর গায়ের গয়না কখানা কেড়ে নেবে। খুলে মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিস।”

একটু আগেই ধনিয়া রাগের মাথায় ঝুনিয়াকে কুল্টা, কলঙ্কিনী, কালা-মুখী আরো কত কী বলেছে। ঝাঁটা মেরে ঘর থেকে দূর করে দিতে চেয়েছে। এখন তাকে সদয় হতে দেখে ঝুনিয়া হরিকে ছেড়ে তার পায়ে গিয়ে পড়লো। আর সতীসাধ্বী ধনিয়া যে হরি ছাড়া কোন পুরুষের দিকে কখনো চোখ তুলেও তাকায়নি সে এই কুলটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেয়।

হরি ধনিয়াকে ইশারা করে ওকে কিছু খাইয়ে দিতে বলে ঝুনিয়াকে প্রশ্ন করে, “গোবর কোতায় গেল বলতে পারিস বেটি।”

ঝুনিয়া ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, “আমাকে তো কিছু বলেনি। আমার জন্যে তোমাদের ওপর...” তার স্বর কান্নায় ডুবে যায়।

হরি নিজের ব্যাকুলতা চাপতে না পেরে বলে, “আজ যখন দেখেছিলি তখন কি মনমরা হয়ে ছিল?”

“কথা তো হেসে হেসেই বললো। মনের কথা ভগমান জানেন।”

“তোর কি মনে হচ্ছে গাঁয়ে আচে না কোথাও গেচে।”

“আমার ভয় হচ্চে বাইরে কোথাও গেচে।”

“আমার মনও তাই বলচে। কী বোকা বল্তো? আমরা কি ওর শত্তুর? যখন ভালোমন্দ একটা কিছু হয়েই গেছে তখন মানিয়ে তো নিতেই হবে। পালিয়ে গে গোবর আমায় আরো বিপদে ফেললো।”

ধনিয়া ঝুনিয়ার হাত ধরে তাকে ঘরে নিয়ে যেতে যেতে বলে. “কাপুরুষ কোথাকার। যার হাত ধরেছিস তাকে দেখতে হবে না? মুখে কালি দে পালালেই হলো। এবার এলে ঘরে ঢুকতেই দোব না।”

হরি সেখানেই শুয়ে পড়ে। গোবরের চিন্তা তার হৃদয়-আকাশে পাখির মতো উড়ে বেড়ায়।

১১

এমন অসাধারণ কান্ড হলে গ্রামে যতখানি হৈচৈ হওয়া উচিত, তাই হলো, আর মাসখানেক ধরে তার জের চললো। ঝুনিয়ার দুই ভাই লাঠি নিয়ে গোবরকে খুঁজতে লাগলো আর ভোলা 'কসম' খেয়ে ঘোষণা করলো সে আর ঝুনিয়া মুখ দেখবে না, এই গাঁয়েরও না। হরিকে সে যে নিজের বিয়ে-সাঙার কথাবার্তা চালাতে বলেছিল, সেও ভেঙে গেল। এবার সে নিজের গরুর দাম নেবে তাও নগদে, দেরি হলে হরির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তার বাড়িঘর

নীলাম করিয়ে নেবে। গ্রামের লোক হরিকে 'একঘরে' করলো। কেউ তার বাড়িতে জল খায় না, হুঁকোও না। জলবন্ধের কথাও হয়েছিল কিন্তু ধনিয়ার রণচণ্ডীরূপের সঙ্গে সবার পরিচয় ছিল বলে সাহস হলো না।

ধনিয়া সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে দিয়েছে—"কেউ যদি তাকে জল ভরতে বাধা দিয়েচে তবে রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যাবে।" এই কথা শুনে সবার পিত্তি জল হয়ে গেছে। সবচেয়ে দুঃখ পেয়েছে ঝুনিয়া, যার জন্যে এ সব উপদ্রব সহ্য করতে হচ্ছে সেই গোবরের কোন খোঁজ না পেয়ে দুঃখ দারুণ হয়ে উঠেছে। বাইরে বেরোতে পায় না, চারপাশে ব্যঙ্গবান ঝলসে ওঠে। দিন-ভোর কাজ করে আর সময় পেলেই কেঁদে নেয়।

একদিন ধনিয়া হাট থেকে ফিরছে, রাস্তায় দাতাদীনের সঙ্গে দেখা। ধনিয়া মাথা নীচু করে এড়িয়ে যাচ্ছিল কিন্তু পণ্ডিত জ্বালাবার সুযোগ পেয়েছেন, ছাড়বেন কেন? বলেন, "গোবরের কোন খবর পেলি নাকি রে ধনিয়া? এমন কুপুত্তুরের জন্যে ঘরের মানইজ্জত সব গেল।"

ধনিয়া নিজেও তাই ভাবছিল। উদাস হয়ে বলে, "যখন খারাপ দিন আসে মহারাজ, তখন মানুষ যেন বদলে যায়। কি আর বলবো।"

"তোর ওই চলানী ছুঁড়িটাকে ঘরে ঠাঁই দেওয়া উচিত হয়নি। দুধে মাছি পড়লে লোকে মাছিটাই তুলে ফেলে দেয় আর দুধ খায়। ভেবে দ্যাখ, কত বদনাম আর লোক হাসানো হচ্চে। ওই ছুঁড়ি ঘরে না থাকলে এসব কিছুই হতো না। ছেলেরা এমন ভুলচুক করেই থাকে। যতক্ষণ না জ্ঞাতগুষ্টিকে ভাত খাওয়াচ্চিস কি বামুনদের ভোজ দিচ্চিস ততক্ষণ কি করে উদ্ধার হবে। ওকে ঘরে না রাখলে কিচ্ছু হতো না। হরিটা পাগল। তুই কি করে এত বড়ো ভুল করলি বল্ তো।"

দাতাদীনের ছেলে মাতাদীন একটা চামারনীর সঙ্গে ফেঁসে গিয়েছে, গ্রামের সকলেই তা জানে। কিন্তু সে তিলক লাগায়। পুঁথিপত্র পড়ে, কথা-ভাগবতও শোনায়, ধর্মীয় কাজকর্মও করে। ধনিয়া জানতো ঝুনিয়াকে আশ্রয় দিলে নানারকম বিপত্তি আসবে। কেমন যেন মায়া পড়ে গেল মেয়েটার ওপর। নয়তো সেই রাতেই ঝুনিয়াকে দূর করে দিলে কি লোকে হাসতে পারতো? তখন মনে হয়েছিল, ঝুনিয়ার কি গতি হবে? নদী বা কুঁয়োয় ঝাঁপ দিত হয়তো। একটা প্রাণের বিনিময়, একটা নয় দুটো—সে কি করে নিজের মর্যাদা রক্ষা করতো? আর ঝুনিয়ার গর্ভের সন্তান তো ধনিয়ার হৃদয়েরই একটা টুকরো! তাছাড়া ঝুনিয়ার নম্র স্বভাবও তাকে নিরস্ত করেছিল। সে জ্বলে পুড়ে ঘরে ফেরে কিন্তু যেই ঝুনিয়া এক ঘটি জল এগিয়ে দিয়ে তার পা টিপতে বসে তখনি তার রাগ জল হয়ে যায়। মরার ওপর খাঁড়ার ঘা মেরে লাভ কি? সে তীব্র স্বরে বলে, "আমাদের মানইজ্জতের ওপর এত টান নেই মহারাজ যে তার জন্যে জীব হত্যে করবো। বে হয়নি মানচি কিন্তু তার হাত ধরেচে তো আমারই ছেলে। কোন্ মুখে দূর করে দোব। একই কাজ বড়ো-ঘরের কেউ করলে বদনাম হয় না আর ছোটরা করলেই নাক কাটা যায়। তা

যাক আমাদের নাকের ওপর অত টান নেই।"

দাতাদীন হার মানার লোক নন। তিনি হচ্ছেন গ্রামের নারদ। এর কথা ওকে, ওর কথা তাকে লাগানোই তাঁর কাজ। প্রাণের ভয়ে নিজে চুরি করেন না তবে চোরাই মাল ভাগবাঁটোয়ারার সময় সেখানে পোঁছে যান। জমিদারের খাজনা দেন না, নীলামের কথা উঠলে কুঁয়োয় ঝাঁপ দিতে যান। নোখেরামের কোন কৌশলই খাটে না। মহাজনী কারবার করেন। ঘটকালী করেন। আবার ওষুধবিষুধও করেন, ঝাড়ফুঁকও করেন। খুব রগুড়ে আড্ডাবাজ—ছেলের সঙ্গে ছেলে, বুড়োর সঙ্গে বুড়ো। চোরেরও বন্ধু সজ্জনেরও বন্ধু। গ্রামের একটা লোকও তাঁকে বিশ্বাস করে না অথচ তাঁর মিঠে কথায় ভুলে তাঁরই শরণ নেয়।

মাথা আর দাড়ি নেড়ে দাতাদীন বলে, "এটা তুই ঠিকই বলিচিস্ ধনিয়া। এটাই ধম্ম কিন্তু লোক-লৌকিকতাও তো মানতে হবে।"

এইভাবে একদিন লালা পটেশ্বরীও হরিকে ধরে। সে গ্রামের নাম করা পুণ্যাত্মা, প্রতি পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণের কথা শোনে। তবে পাটোয়ারী হবার দরুণ বেগার ধরে নিজের কাজ করিয়ে নেয়। মহাজনীর ফলাও কারবার। এই এলাকায় তার দারুণ প্রভাব। একমাত্র দারোগা গণ্ডা সিং তার কাছে হারেনি। পরোপকারও করে। ম্যালেরিয়ার সময় সরকারী কুইনিন বিলি করে, কারুর অসুখ হলে দেখতে যায়, ছোটখাটো ঝগড়াবিবাদে মধ্যস্থতা করে আবার বিয়েসাদীর সময় নিজের পালকি, গালচে তাকিয়া বিনা পয়সায় ধার দেয়। সুযোগ পেলে ছাড়ে না তবে যার খায়, তার জন্যে করে। বলে, "এ কি রোগ পুষলে হরি?"

হরি পেছন ফিরে বললো, "তুমি কি কিছু বললে লালা, আমি শুনতে পাইনি।"

পটেশ্বরী পিছিয়ে এসে বলে, "এই বলছিলুম ধনিয়ার সঙ্গে কি তোমারও বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েচে? ঝুনিয়াকে তার বাপের ঘরে পাঠাচ্চো না কেন? কে জানে কার ছেলে পেটে ধরে এসে হাজির হলো আর তুমিও ঘরে নিলে। এখ'না তোমার দু-দুটো মেয়ের বে বাকী। তাদের পার করবে কি করে?"

হরি ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে, "আমি সবই বুজি লালা। কি করবো বলো। আমি ঝুনিয়াকে বার করে দিলে ভোলা কি তাকে ঘরে নেবে? নিলে আজই ঝুনিয়াকে তার ঘরে পোঁছে দোব। তুমি পারো তো তাকে রাজী করিয়ে দাও না লালা। জন্ম-জন্ম তোমার কেনা হয়ে থাকবো। সেখানে তো ভোলার ছেলেরা খুন করবার জন্যে তৈরি। এখন বলো কি করি? একে তো নালায়েক* সোয়ামী, তাও আবার দাগা দে গেচে। আমি বার করে দিলে এ সময় কোতায় যাবে? মেহনত-মজুরীও করতে পারবে না। শেষে ডুবে মরলে কার পাপ

* নালায়েক=নাবালক

লাগবে? মেয়েদের বে ভগমানের হাতে। আমাদের বেরাদরীতে তো কোন মেয়ে আইবুড়ো বসে থাকেনি। জ্ঞাতগুষ্টির ভয়ে তো খুন করা যায় না।"

হরি নিরীহ ভালোমানুষ! সর্বদা মাথা নীচু করে চলে। হীরা ছাড়া কেউ তার মন্দ চায়নি। কিন্তু সমাজ এত বড়ো অনর্থ কি করে সহ্য করবে? আর তার বেয়ারাপনাও দেখ, বোঝালে বোঝে না। স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই সমাজকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে দেখিয়ে দিচ্ছে দেখি আমাদের কে কি করতে পারে। সমাজও দেখিয়ে দেবে তার মানমর্যাদা ক্ষুন্ন করে কেউ সুখে নিদ্রা যেতে পারে না। সেই রাত্রেই গ্রামবিধাতাদের বৈঠক ডাকা হলো।

দাতাদীন বললেন, "কারুর নিন্দে করা আমার স্বভাব নয়। সংসারে কত কুকাজই তো হচ্চে। কিন্তু ওই মাগী, ধনিয়া তো আমার সংগে লড়বার জন্যে তৈরি হয়ে আচে। ভাইদের ভাগ মেরে হাতে চারটে পয়সা এসেচে তো এখন কুপথ ধরবে না তো কী। ওই হচ্চে ছোটলোকের মরণ, পেট ভরে রুটি খেলেই ব্যাঁকা পথে চলতে শুরু করে। তাইতো শাস্তরে বলেছে "নীচে জাত লতিয়ায়ে আচ্ছা"*।

পটেশ্বরী নারকেলের ছড়ি হাঁকড়ে বলে, "এই তো এদের দোষ, চারটে পয়সা হলেই ধরাকে সরা দেখে। আজ হরি এমন মেজাজ দেখালে যে আমি ছোট মুখ করে পালিয়ে এলুম। নিজেকে কি ভাবে কে জানে। এখন ভাবো এই দুর্নীতির প্রভাব গাঁয়ে কিভাবে পড়বে? ঝুনিয়াকে দেখে অন্য বিধবারা মনে সাহস পাবে কি না বলো? আজ ভোলার ঘরে হয়েচে কাল আমাদের ঘরেও হবে। সমাজ তো ভয়ের ওপরেই চলে। আজ ভয় কেটে গেলে কি অনর্থ হবে ভাবো।"

ঝিঙুরী সিংয়ের দুই স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী পাঁচটা ছেলেমেয়ে রেখে মারা গেলে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে আবার বিয়ে করে। সেই স্ত্রীর সন্তান না হওয়ায় আবার বিয়ে করেছে। এখন তার বয়স পঞ্চাশ, ঘরে দুই যুবতী স্ত্রী। তাদের নামে নানারকম গুজব শোনা যায়, কিন্তু ঠাকুরসাহেবের ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারে না। বলার উপায় কী? স্বামীকে সামনে রেখে যাই করো না কেন সাত খুন মাফ! ঝিঙুরী সিং স্ত্রীদের কড়া শাসনে রাখে আর অহংকার করে বলে তার স্ত্রীদের ঘোমটা ছাড়া কেউ কিছু দেখতে পায় না। কিন্তু ঘোমটার আড়ালে কি হচ্ছে সে খবর কি ঝিঙুরী সিং পায়।

সে বলে, "এমন মেয়েছেলের মাথা কেটে ফেলা উচিত। হরি এই কুল-টাকে ঘরে ঢুকিয়ে সমাজে বিষবিরিক্ষ পুঁতেচে। ওকে গাঁয়ে রাখলে সারা গাঁ পতিত্ হবে। রায়সাহেবকে জানাতে হবে যদি গাঁয়ে এসব চলে তো কারুর ইজ্জত-আবরু থাকবে না।"

পণ্ডিত নোখেরাম গোমস্তাও কুলীন ব্রাহ্মণ। তাঁর দাদা কোন্ রাজার দেওয়ান ছিলেন। কিন্তু সব কিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছেন। এ'র

* নীচে জাত লতিয়ায়ে আচ্ছা=ছোট জাত লাথিতেই ভালো থাকে।

বাপও 'রাম রাম' করেই জীবন কাটিয়েছেন। নোখেরামও সেই ভক্তি পেয়েছেন। সকালে পূজো করতে বসে দশটা পর্যন্ত রামনাম লেখেন। কিন্তু ঠাকুরঘর ছেড়ে বেরোতে না বেরোতেই তাঁর ধর্মবোধ এই পরিবেশে বিষাক্ত হয়ে ওঠে। এই প্রস্তাবে তাঁর অধিকারবোধ খর্ব হচ্ছিল। ফোলা গালে ঢুকে যাওয়া চোখ দুটো বার করে বললেন "এতে রায়সাহেবকে জিজ্ঞেস করার কি আচে? আমি যা চাইবো, তাই হবে। লাগিয়ে দাও একশো টাকার জরিমানা। নিজেই গাঁ ছেড়ে ভাগবে। বেদখলীর মামলাও দায়ের করে দোব।

পটেশ্বরী বলে, "খাজনা চুকিয়ে দিয়েচে না?"

ঝিঙুরী সমর্থন করে বলে, হ্যাঁ, খাজনার জন্যেই আমার কাছে তিরিশ টাকা নিয়েচে।"

নোখেরাম সগর্বে বললেন, "কিন্তু এখনো রশীদ দিইনি। খাজনা শোধ করেচে তার প্রমাণ কি?"

সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হলো হরিকে একশো টাকা জরিমানা দিতে হবে। কেবল একদিন গ্রামের লোক ডেকে সবার সম্মতি নেবার অভিনয় করা প্রয়োজন। সম্ভব হলে আরো দু-চার দিন দেরি করা হতো কিন্তু ঝুনিয়া সেই দিনই একটি পুত্র প্রসব করায় পঞ্চায়েৎ বসলো। হরি আর ধনিয়াকে পঞ্চের রায় শোনবার জন্যে ডাকা হলো। চৌপালে প্রচণ্ড ভীড়, পঞ্চায়েতে স্থির হলো হরিকে একশো টাকা জরিমানা আর তিরিশ টাকার শস্য দিতে হবে।

ধনিয়া ভরা সভায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, "পঞ্চ, গরীবকে কষ্ট দিয়ে তোমরা সুখ পাবেনা এটুক জেনে রেখো। আমরা তো মরে যাবো, কে জানে গাঁয়ে থাকতে পারবো কি পারবো না; কিন্তু আমার শাপ তোমাদের ওপর পড়বে নিশ্চয়ই পড়বে। আমি আমার বেটার বৌকে ঘরে ঠাঁই দিয়েচি বলে এত জরিমানা হচ্চে। একে কি ন্যায় বলে?"

পটেশ্বরী বলে, "ও তোর বেটার বৌ নয়, বেশ্যা।"

হরি ধনিয়াকে ধমক দেয়, "তুই কথা বলচিস কেন ধনিয়া? পঞ্চে পরমেশ্বর থাকেন। তাঁর চোখের সামনে বিচার হয়। যদি ভগমানের ইচ্ছে হয় যে আমরা গাঁ ছেড়ে চলে যাই তো আমরা কি করবো?" তারপর পঞ্চায়েৎকে সম্বোধন করে বলে, "আমার যা কিছু আচে, সব গোলায় আচে, একটা দানাও ঘরে আনিনি। যত চাও, নাও। সব নিতে চাও, নাও। ভগমানই আমাদের মালিক। যদি তাতেও না কুলোয় আমার হেলে গরু দুটোকেও নাও।"

ধনিয়া দাঁত চিপে বলে, "আমি একটা দানাও দোব না। একটা কড়িও নয়। যার ক্ষ্যামতা আছে সে আমার কাচে এসে নিক। ভেবেচে জরিমানার নামে এর সব জমিজমা কেড়ে সেলামী নে অন্য কাউকে দেবে। ধনিয়া বেঁচে থাকতে তা হচ্চে না। তোমাদের লোভ তোমাদেরই থাকবে। আমরা সমাজে থাকবো না। সমাজ আমাদের কি দেবে শুনি? এখনো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাই তখনও তাই খাবো।"

হরি হাতজোড় করে বলে, "ধনিয়া তোর পায়ে পড়ি, চুপ কর্। আমরা

সবাই সমাজের চাকর, তার বাইরে যেতে পারি না। ওরা যে দণ্ড দেয়, মাথা নীচু করে মেনে নে। একঘরে হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে গলায় দড়ি দেয়া ভালো। আজ মরে যাই তো সমাজই এই দেহটার গতি করবে। সমাজ বাঁচালে বাঁচবো। তারপর আবার বলে, "পঞ্চ, আমার কাছে গোলার ফসল ছাড়া আর যদি কিছু থাকে তবে যেন আমি জোয়ান বেটার মুখ দেখতে না পাই। আমি সমাজকে দাগা দোব না। পঞ্চের যদি দয়া হয় তবে আমার বালবাচ্চাদের দেখবেন। আমাকে তো হুকুম তামিল করতেই হবে।"

ধনিয়া জ্বলে উঠে চলে যায় আর হরি এক প্রহর রাত পর্যন্ত গোলা থেকে শস্য বয়ে বয়ে ঝিঙুরী সিং-এর চৌপালে জমা করলো। কুড়ি মণ যব, পাঁচ মণ গম, কিছু মটর, সামান্য ছোলা আর তৈলবীজ! এসব যা কিছু হয়েছে সবই ধনিয়ার একক চেষ্টায়। ঝুনিয়া ঘরের কাজ করতো আর ধনিয়া মেয়ে দুটোকে নিয়ে ক্ষেতের কাজ করতো। দুজনেই ভেবেছিল গম আর তৈলবীজ দিয়ে খাজনার কিস্তি শোধ হবে আর কিছু সুদ দেবে। যবটা খাবার কাজে লাগবে। কোন রকমে পাঁচ ছটা মাস কেটে গেলে জোয়ার, ভুট্টা, সাঁওয়া* ও ধানের সময় এসে যাবে। সব আশা মাটিতে মিশে গেল। শস্য তো গেলই, একশো টাকার পুঁটুলি মাথার ভার হয়ে চেপে বসলো। গোবরের কি হলো ভগবান জানে "না হাল না হাওয়ালে**" মনে যদি এত কাঁটাই ছিল তো এমন কাজ করা কেন? যা হবেই তাকে এড়াবে কে? বিরাদ্‌রীর ভয়ে হরি নিজের মাথায় করে শস্য বয়ে দিয়ে আসছে। জমিদার, ভদ্রলোক, সরকার—কার এত শক্তি আছে? কাল বাচ্চাকাচ্চা কি খাবে ভেবে তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল অথচ সমাজের ভয় পিশাচের মতো অঙ্কুশ নিয়ে তাকে তাড়া করেছে। সমাজ ছাড়া জীবনকে সে কল্পনাই করতে পারতো না। বিয়ে-সাদি, মুণ্ডন-ছেদন, জন্ম-মৃত্যু সব কিছু সমাজের হাতে। সমাজ তার জীবনে বৃক্ষের মতো শেকড় বিছিয়ে শিরায়-শিরায় রোমে-রোমে তাকে বেঁধে রেখেছে। এখান থেকে বেরিয়ে গেলে তার জীবন বিশৃংখল হয়ে যাবে, টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

যখন গোলায় আর মাত্র দেড়-দুমণ ধান রয়েছে, ধনিয়া তখন ছুটে এসে তার হাত ধরে ফেলে, "এবার থাক। বিরাদ্‌রীর লাজ রক্ষে হয়েছে তো। বাচ্চা-দের জন্যেও কিছু রাখ। সব কি সমাজের ভাঁড়ারে তুলে দিয়ে আসবে? আমি তোমার কাচে হার মানছি। আমার ভাগ্যেই কি তোমার মতো বুদ্ধুর সঙ্গে বে লিখেছিল?"

হরি নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, "তা হবে না ধনিয়া, পঞ্চকে ফাঁকি দিয়ে একটা দানাও রাখা বেইমানী। আমি সব ওখেনে জমা করে দিচ্ছি, তার-পর পঞ্চের দয়া হলে আমার বালবাচ্চার জন্যে কিছু দেবে। নয়তো ভগমানই মালিক।

ধনিয়া তিড়বিড়িয়ে বলে, "এ পঞ্চ নয়, রাক্ষস, পাককা রাক্ষস! সব্বাই

* সাঁওয়া=এক প্রকার শস্য ** না হাল না হাওয়াল=ঠিক ঠিকানা নেই

আমাদের জায়গা জমি কেড়ে নিয়ে শুকিয়ে মারতে চায়। জরিমানা তো শুধু বাহানা। এত বোঝাই তবু তোমার চোক খোলে না। তুমি এই পিশেচগুলোর কাচে দয়ামায়া আশা করো? ভাবচো পাঁচ-দশ মণ তোমাকে দয়া করে ছেড়ে দেবে? হাত ধুয়ে বসে থাকো।"

যখন হরি কথা না বাড়িয়ে টুকরিটা মাথায় তোলে তখন ধনিয়া দু-হাতে শক্ত করে টুকরিটা ধরে ফেলে বলে, "এটা আমি নিয়ে যেতে দোব না। তুমি আমাকে খুন করে ফেললেও নয়। মরতে মরতে আমরা খেটেচি, এক পহর রাত অব্দি জল সেঁচেচি, পাহারা দিইচি, সেকি পঞ্চের লোকেরা গোঁফ তা দে ভোগ করবে বলে? আর আমার বাচ্চারা কটা দানার জন্যে হেদিয়ে মরবে? তুমি একলাই সব কিছু করোনি। আমিও আমার মেয়েদের নে কষ্ট করেচি। সোজা কথায়, টুকরি নামিয়ে রাখো বলচি। নয়তো চেরকালের মতো সম্পক্ক শেষ বলে দিলুম।"

হরি দোটানায় পড়লো। ধনিয়া সত্যি কথাই বলেছে। তার নিজের বাচ্চা-কাচ্চাদের পরিশ্রমের ফসল কেড়ে নিয়ে জরিমানা দেবার কি অধিকার আছে? সে ঘরের কর্তা, সবাইকে পালন করা তার কর্তব্য, তার বদলে তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে বিরাদ্‌রীর চোখে সৎ হবার জন্যে নয়। তার হাত থেকে টুকরিটা পড়ে গেল। বললে, "তুই ঠিকই বলিচিস ধনিয়া। পরের ভাগের ওপর আমার কোন অধিকার নেই। যা বেঁচেচে নে যা, আমি পঞ্চকে বলে দিচ্চি।"

ধনিয়া যবের টুকরি ঘরে রেখে দুই মেয়ের সঙ্গে গলা চিরে সোহর* গাইতে বসে, যাতে সারা গাঁয়ের লোক শুনতে পায়। আঁতুড় থেকে ঝুনিয়া বলে পাঠিয়েছিল যে 'সোহর' গেয়ে কাজ নেই, কিন্তু ধনিয়া শুনবে কেন? সমাজকে সে দেখিয়ে দেবে কিছুতেই তার কিছু এসে যায় না।

সেই সময় হরি ঝিঙুরী সিংয়ের কাছে নিজের বাড়িটা আশী টাকায় বাঁধা দিচ্ছিল। জরিমানার টাকা এভাবে ছাড়া আর কোনভাবে দেবার ক্ষমতা তার ছিল না। কুড়ি টাকা গম, মটর আর তৈলবীজের জন্যে গেল বাকীটার জন্যে ঘর বাঁধা দিতে হলো। নোখেরাম বলদ দুটোই বেচার পক্ষে ছিলেন কিন্তু পটেশ্বরী ও দাতাদীন বিরোধিতা করলে। বলদ বিক্রী করলে হরি চাষবাস করবে কি করে? সমাজ জরিমানা করতে পারে, গ্রাম ছাড়া করতে পারে না। তাই বলদ দুটো বেঁচে গেল।

হরি রাত এগারোটা নাগাদ ফিরলে ধনিয়া বলে, "এত রাত অব্দি ওখেনে কি করছিলে?"

হরি যাকে বলে "জুলাহে কা গুসসা দাড়ি পর"** দেখায়, "কী আবার করবো? ওই ছোঁড়ার কাজ করতে হলো আর কী। হতভাগা আগুন লাগিয়ে

*সোহর=নবজাতকের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়

** 'জুলাহে কা গুস্‌সা দাড়ি পর'=একের রাগ অপরের ওপর/তাঁতীর রাগ দাড়ির ওপর

কেটে পড়লো, এখন আমাকে নেভাতে হচ্চে। আশী টাকায় বাড়িটা বাঁধা দিতে হলো। কি করবো। যাক এখন হুঁকো খুলেছে। বিরাদরী সব মাফ করে দিয়েচে।"

ধনিয়া ঠোঁট চিবিয়ে বলে, "হুঁকো না খুললেই বা কী ক্ষেতি হতো? চার-পাঁচ মাস কারুর হুঁকো খাওনি বলে কি ছোট হয়ে গেচো? আচ্ছা, তুমি এত বোকা কেন? আমার সামনে তো খুব বুদ্ধির বড়াই করো। বাইরে তোমার মুখ বন্ধ হয়ে যায় কি করে? বাপ্-দাদার একরত্তি কুঁড়েটা ছিল সেটাও ঘোচালে। এই করে যে তিন-চার বিঘে জমি আচে তাও কাল লিখে দিও তারপর দোরে-দোরে ভিক্ষে মেংগো। পঞ্চকে জিজ্ঞেস করতে পারলে না, তোমরা কোন্ ধম্মপুত্তুর যে আমার ওপর দণ্ড লাগাচ্চো, তোমাদের মুখ দেখাও পাপ।"

হরি বকে, "চুপ কর। অত চড়া গলায় চেঁচাসনি। বিরাদরীর চক্করে কখনো পড়িসনি তাই, নইলে কথা বেরুতো না।"

ধনিয়া উত্তেজিত হয়ে বলে, "কোন্ পাপ করেচি যে সমাজকে ভয় করতে যাবো? কারুর চুরি করেচি না গাঁট কেটেছি? মেয়েছেলে রাখা পাপ নয়, হাঁ রেখে ছেড়ে দেওয়া পাপ নয়। মানুষের খুব সাদাসিধে হওয়াও খারাপ। তার ভালোমানুষির ফল এই হয় যে, কুকুরেও মুখ চাটতে আসে। আজ ওখেনে তোমার বাহ-বাহ হচ্চে আর এখেনে আমার কপাল পুড়লো। তোমার হাতে পড়ে কোনদিন সুখের মুখ দেখতে পেলুম না।"

"আমি কি তোর বাপের পায়ে পড়তে গিয়েছিলুম? সেই তো তোকে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিল।"

"বুদ্ধিতে পাথর চাপা পড়েছিল আর কী! নইলে কি বলবো? কি দেখে যে ভালো লেগেছিল কে জানে? এমন কিছু ভালো দেখতেও তো ছিলে না কোনকালে।"

দুঃখ সুখে রূপান্তরিত হয়। আশী টাকা গেছে, যাক্ লাখটাকার নাতি পাওয়া গেল। তাকে তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। গোবর ফিরে আসুক, ধনিয়া কুঁড়ে ঘরেও সুখে থাকবে।

হরি বলে, "ছেলেটা কার মতো হয়েচে?"

ধনিয়া প্রসন্ন মুখে বলে, "এক্কেবারে গোবরের মতো। সত্যি বলচি।"

"রিষ্টপুষ্ট হয়েচে তো।"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ভালো আচে।"

১২

ঝুনিয়া যখন গোবরের সঙ্গে রওনা হলো তখন গোবর ভয়ে কাঁপছিল। ঝুনিয়াকে দেখলেই সারা গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। ধনিয়া কত গালাগাল দেবে এসব ভেবে-ভেবে তার পা পিছিয়ে পড়ছিল। হরিকে সে ভয় করে না, একবার

চেঁচামেচি করেই শান্ত হয়ে যাবে। ভয় ছিল ধনিয়াকে, বিষ খাবে কি গলায় দড়ি দেবে কে জানে। না, এখন সে ঝুনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি যেতে পারবে না।

কিন্তু ধনিয়া যদি ঝুনিয়াকে ঘরেই না ঢুকতে দেয় তাহলে কি হবে? আর যদি ঝাঁটা নিয়ে মারতে ছোটে তাহলে ও বেচারী কোথায় যাবে? নিজের ঘরেও ফিরতে পারবে না। কার শরণ নেবে? গোবর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। যদিও মা এত নির্দয় নয় যে মারতে ছুটবে। রাগের চোটে দু-চারটে গাল দেবে ঠিকই কিন্তু ঝুনিয়া যখন তার পা ধরে কাঁদবে তখন নিশ্চয় দয়া হবে। ততক্ষণ সে কোথাও লুকিয়ে থাকবে। উপদ্রব শান্ত হলে একদিন ফিরে আসবে।

ঝুনিয়া বলে, "আমার বুক ধড়ফড় করছে। আমি কি জানতুম তুমি আমার গলায় এই বিপত্তি ঝুলিয়ে দেবে। কি কুক্ষণে যে তোমাকে দেখেছিলুম। তুমি গরু নিতে না এলে কিছুই হতো না। তুমি আগে আগে যাও আর যা কিছু কথাবার্তা সেরে নাও। আমি পরে যাবো।"

গোবর বলে, "না না, আগে তুমি যাও আর বোলো আমি বাজারে জিনিষ বেচে ঘরে ফিরছিলুম। রাত হয়ে গেচে। কি করে ফিরবো। ততক্ষণে আমিও এসে পড়বো।"

ঝুনিয়া চিন্তিত স্বরে বলে, "তোমার মা বড্ড রাগী। আমার তো ভয়ে বুক কাঁপছে। আমায় মারতে শুরু করলে কি করবো?"

গোবর সাহস দেয়, "না না মা ওরকম নয়। আমাদের তো কোনদিন একটা চড় চাপড়ও মারেনি। তোমাকে মারবে কি? যা বলার আমাকে বলবে। তুমি যাও।"

"তুমি দেরি কোরো না।"

"না না, এক মিনিট পরেই যাচ্চি। তুমি যাও না।"

"আমার কেমন যেন ভয় করচে। তুমি যেন কী!"

"তুমি এত ভয় পাচ্চো কেন? আমি তো রয়েচি।"

"এর চেয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যাওয়াই ভালো ছিল।"

"যখন নিজের ঘর আচে তখন পালাবো কেন? তুমি নাহক ভয় পাচ্চো।"

"তাড়াতাড়ি আসবে তো?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ এক্ষুণি আসচি।"

"আমাকে দাগা দিচ্চো না তো। অন্য কোথাও পালাবে না?"

"আমি এত নীচ নই রে ঝুনিয়া। যখন তোর হাত ধরেচি তখন মরণকাল অব্দি তোর সাথেই থাকবে।"

ঝুনিয়া বাড়ির দিকে যায়। গোবর কাল্পনিক নেত্রে তার ভয়ংকর নির্যাতন কল্পনা করে শিউরে ওঠে। সত্যি যদি মা মারতে ছুটে আসে, তাহলে কি হবে? তার পা যেন ওঠে না। ঝুনিয়ার কালো ছায়াটা ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে তার জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো যেন অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে। তার মনে হয় মা ঝুনিয়াকে গালমন্দ করছে। দেহের সমস্ত রক্ত শুকিয়ে আসে। একটু পরেই দেখে ধনিয়া

ঘর থেকে বেরিয়ে কোথায় যাচ্ছে। বাবার কাছে বোধহয়, সে ভাবে। সে-ও মটর ক্ষেতের দিকে যায়। ওই তো বাবার চালা। সে পা টিপে টিপে চালার পেছনে এসে বসে পড়ে। তার অনুমানই ঠিক। সে ধনিয়ার কথা শুনতে পেল। ওহ! তাজ্জব ব্যাপার! মা এত কঠোর! একটা অনাথ মেয়ের ওপর একটুও দয়ামায়া হচ্ছে না! আর আমি যদি সামনে গিয়ে বলি ঝুনিয়াকে এসব কথা শোনাবার অধিকার নেই। তাহলে? বাবাও বিগড়ে যাচ্ছে। মাটির ঢেলার এত তেজ। বাবাও যে ওখানে যাচ্ছে। যদি ওরা ঝুনিয়াকে মারধোর করে তাহলে আমি সইতে পারবো না। ভগবান তুমিই ভরসা। আমি বুঝতেই পারিনি, এত বিপদে পড়বো। ঝুনিয়া আমাকে না জানি কি ভাবছে। ওরা ওকে মারবে কেন? বাড়িতে কি আমার কোন ভাগ নেই? ঝুনিয়ার গায়ে হাত তুললে মহাভারত হয়ে যাবে। মা-বাবা যতক্ষণ ছেলেদের বাঁচায় ততক্ষণই মা-বাপ। যখন ছেলের জন্যে তাদের মায়া-মমতা নেই তখন আবার কিসের মা-বাপ!

হরি চালা থেকে বেরোলে গোবরও পিছু নেয় কিন্তু দরজায় আলোর রেখা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে, যেতে সাহস হলো না। হায়! বেচারী, ঝুনিয়ার ওপর বিনাদোষে এরা বকাবকি করছে। সে খেলতে খেলতে ভুল করে একটা আগুনের ফুলকি ছুঁড়ে ফেলেছিল। সেই আগুনের কণা যে আগুন হয়ে উঠবে বুঝতেও পারেনি। "আমি একাজ করেছি" বলে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস-টুকুও আর অবশিষ্ট নেই। গোবর শতখানেক পা হাঁটে। ঝুনিয়ার সঙ্গে তার ভাব-ভালোবাসার কথা মনে পড়ে যায়। ঝুনিয়া বিরহী পাখির মতো তার কোটরে বসে ছিল। গোবর তার নিভৃত বাসায় ঢুকে তাকে আনন্দ দিতে পেরেছে কি না কে জানে তবে তাকে বিপদে ফেলে দিয়েছে। গোবর সামলে যায়। আবার ফিরে আসে।

দরজা বন্ধ। গোবর ফুটোয় চোখ রাখে। ধনিয়া আর ঝুনিয়া বসে ছিল, হরি দাঁড়িয়ে। ঝুনিয়া ফোঁপাচ্ছে আর ধনিয়া বোঝাচ্ছে, "বেটী ঘরে গে বোস। আমি তোর বাপ-দাদাদের দেখে নোব। যতক্ষণ আমরা রয়েছি কিচ্ছু ভাবিস নে।" গোবর আনন্দে গদগদ হয়ে গেল। আজ সে 'লায়েক'* হলে বাবা আর মাকে সোনায় মুড়ে দিত। বলতো, "তোমাদের কিছু করতে হবে না। আরাম করে খাও-দাও আর দান-পুণ্য করো।" ঝুনিয়ার জন্যে আর চিন্তা নেই। সে যদি তাকে দাগাবাজ ভাবে তো ভাবুক, আশ্রয় তো পেয়েছে। যখন অনেক রোজগার করতে পারবে তখন, শুধু তখনই গোবর বাড়ি ফিরবে। আর বাপ-মা তাকে কুলাঙ্গার না বলে কুলপ্রদীপ ভাববে।

মানুষের মন গভীর আঘাত খেয়ে যখন জাগে তখন তার প্রতিক্রিয়াও তীব্র হয়। এই অপকীর্তির কলঙ্ক গোবরের অন্তর মন্থন করে এমন রত্ন খুঁজে বার করলো, এতদিন যার হদিশ মেলেনি। আজ সে নিজের দায়িত্ব অনুভব করে। মা-বাপের উদারতা আর ক্ষমা তার অন্ধকার মনে আলো জেলে ছিল।

*লায়েক=উপযুক্ত

হরির পরিত্যক্ত চালায় গিয়ে শুয়ে পড়ে গোবর ভবিষ্যতের চিন্তায় ডুবে যায়।

শহরে মজুররা পাঁচ ছ আনা রোজ পায়। বাইরে সে যদি ছ আনা পায় আর এক আনায় দিন কাটাতে পারে তাহলে পাঁচ আনা করে বাঁচবে। একমাস জমলে দশ টাকা আর সারা বছর হলে সোয়াশো টাকা। সে সোয়াশোর থলি হাতে ফিরলে কার সাধ্য তাকে কিছু বলে। এই দাতাদীন পটেশ্বরীরা তার কথায় 'হ্যাঁ হ্যাঁ' করবে। ঝুনিয়ার বুক গর্বে ফুলে উঠবে। দু চার বছর এরকম রোজগার করলে ঘরের অবস্থাই বদলে যাবে। শুধু লোকে বলবে মজুর। তা বলুক গে। মজুরী তো খারাপ কাজ নয়। আর সবসময় ছ' আনাই পাবে তার ঠিক কি? কাজে হুঁশিয়ার হলে মজুরী বাড়বে। তখন সে বাবাকে বলবে, এবার তুমি ঘরে বসে ভগমানের নাম করো।' সবার আগে সে একটা পছিয়া গরু আনবে আর বলবে, "তুমি গোমাতার সেবা করো। তোমায় ইহকাল-পরকাল দুইয়েরই কাজ হবে।"

আর কী? এক আনায় তার ভালো চলবে না? ঘরদোর নিয়ে কি করবে? কারুর বারান্দায় পড়ে থাকবে। কত মন্দির আছে, ধরমশালা আছে। আর যেখানে মজুরী করবে সেখানেও কি থাকার জায়গা পাবে না। টাকায় দশ সের আটা পাওয়া যায়, এক আনায় আড়াই পো। এক আনার আটা তো সেই খেয়ে ফেলবে। কাঠ, ডাল, নুন. শাক এসব কোত্থেকে আসবে? দুবেলা পেট-ভরা আটা তো চাই। ওহ্! খাবার নিয়ে কিছু ভেবে কাজ নেই। একমুঠো ছোলা খেয়েও কাজ চলতে পারে আবার হালুয়া পুরি খেয়েও চলতে পারে। যখন যেমন তখন তেমন। সে আধসের আটা খেয়ে সারাদিন কাজ করতে পারবে। শুকনো গোবর কুড়িয়ে কাঠের কাজ চলে, কখনো এক পয়সার ডাল. কখনো আলু। পাতায় আটা মেখে ঘষি জেলে 'বাটি' সেঁকে আলু পুড়িয়ে আরাম করে খাবে। ঘরেই বা দুবেলা রুটি জোটে কই?

যদি কোনদিন মজুরী না পায় সেদিন কি হবে? আর পাবে নাই বা কেন? সে যখন প্রাণপণ কাজ করবে তখন একশোজন তাকে ডাকবে। কাজ সবাই পছন্দ করে। সব দিন তো সমান যায় না। এখানেও খরা হয়, শিশির পড়ে, আখে উই লাগে, যবে পোকা লাগে, সরষে শুকিয়ে যায়। সে যদি রাতে কোন কাজ পেয়ে যায় তো তাও ছাড়বে না। দিনভোর মজুরী করবে, রাতে চৌকিদারী পেলে তো ভালোই। রাতের কাজের জন্যে দুটো আনাও পেতে পারে। যখন ফিরবে সবার জনে শাড়ি নিয়ে যাবে। ঝুনিয়ার জন্যে কঙ্কণ তৈরি করাবে আর বাবার জন্যে একটা মুঁড়াসা*।

এইসব সুখকল্পনা করতে করতে সে শুয়ে পড়ে কিন্তু ঠাণ্ডায় ঘুম আসে না; কোনরকমে রাতটা কাটিয়ে ভোরে উঠেই লক্ষ্ণৌয়ের পথ ধরে। বিশ ক্রোশই তো। সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছে যাবে। একটু পশ্চাত্তাপ হচ্ছিল ঝুনিয়াকে বলে আসতে পারলো না বলে। কিন্তু সেকি তাহলে আসতে দিত। কাউকে

* মুঁড়াসা=পাগড়ি

ঠিকানা জানাবে না' তাহলেই বাবা সেখানে পেঁছে যাবে।

বেলা বাড়তে থাকে। রাতে কিছু খায়নি। খিদে পাচ্ছে। পা কাঁপতে শুরু করে। কোথাও বসে একটু দম নিতে ইচ্ছে করে। পেটে কিছু না পড়লে তো সে চলতে পারবে না। অথচ কাছে একটাও পয়সা নেই। পথের ধারে বুনো কুলের ঝাড় ছিল। সে কয়েকটা কুল তুলে নিয়ে খায়। এক গ্রামে গুড় তৈরির সুগন্ধ আসে। এবার আর মন মানে না। কাছে গিয়ে ঘটি আর দড়ি চেয়ে নিয়ে জল তুলে আঁজলা আঁজলা জলই খেতে বসে। এক চাষী বলে, "আরে ভাই শুধু জল খাবে? একটু মিঠা মুখে দাও না। যা পারো এবারই একটু রস খেয়ে নাও হে। সব আখ বিক্রী হয়ে যাবে। গুড় আর রসের দরে চিনি মিলবে। আমাদের গুড় আর কে খাবে বলো?" সে একটা বাটি করে কয়েকটা গুড়ের ড্যালা গোবরকে দেয়। গোবর গুড় খায়, জল খায়।

"তামাক খাও নাকি?"

গোবর মিথ্যে কথা বলে, "এখনো ছিলিম ধরিনি।"

"খুব ভালো কতা ভাই! বড্ড খারাপ রোগ। একবার ধরলে জীবনে আর ছাড়া যায় না।"

গোবরের ইঞ্জিন কয়লা আর জল পেয়ে গেছে, তাই চলার গতিও বাড়ে। শীতের দিন, কে জানে কখুন দুপুর হয়ে গেছে। এক জায়গায় দেখে, একটি যুবতী স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে গাছের নীচে বসে আছে। স্বামী বোঝাবার চেষ্টা করছে। দু-চারজন তামাশা দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ে। গোবরও দাঁড়ায়। মানভঞ্জনের চেয়ে মনোহর পালা জীবন নাটকে আর কী আছে?

যুবতী স্বামীর দিকে ঘুরে বলে, "আমি যাবো না, যাবো না, যাবো না।"

পুরুষ আলটিমেটাম দেয়, "যাবি না?"

"যাবো না।"

"যাবি না?"

"যাবো না।"

পুরুষটি তার চুল ধরে টানতে শুরু করে। যুবতী মাটিতে শুয়ে পড়ে। পুরুষ হার মেনে বলে, "আমি আবার বল্‌চি। উঠে চল্‌।"

"তোর ঘরে আমি সাত জন্মে যাবো না। মেরে ফেললেও না।"

"আমি তোর গলা কেটে নোব।"

"তাহলে ফাঁসী যাবি।"

পুরুষ এবার তার চুল ছেড়ে নিজের মাথায় হাত রেখে বসে। তার পৌরুষ চরম সীমায় পেঁছেচে। তার সামনে আর কোন উপায় নেই। পরাস্ত হয়ে বলে, "শেষমেষ তুই কি চাস বল্‌ তো?"

যুবতীও উঠে বসে বলে, "আমি চাই তুই আমাকে ছেড়ে দে।"

"কি হয়েচে বল্‌বি তো?"

"আমার বাপ-ভাইকে গালমন্দ করেচে।"

"কে তোর বাপ-ভাইকে কি বলেচে?"

"নিজের ঘরের লোকদের জিজ্ঞেস কর্‌গে।"

"ঘরে যাবি তবে তো জিজ্ঞেস করবো।"

"কি জিজ্ঞেস কর্‌বি? তোর সে সাহস আচে? মায়ের আঁচলের নীচে মুখ লুকিয়ে বসে থাক্‌গে। ও তোর মা হতে পারে আমার কেউ নয়। ওর গালাগাল তুই শোন্‌। আমি কেন শুনতে যাবো। একটা রুটি খাই তো চারটে রুটির কাজ করি। আমার বয়ে গেচে। তোর পেতলের আংটির খবরও আমি জানি না।"

পথিকেরা দাম্পত্য কলহ দেখে সুবিমল আনন্দ উপভোগ করছিল, কিন্তু শীঘ্র শেষ হবার আশা নেই দেখে যে যার নিজের পথে চলে যাচ্ছিল। পুরুষটির নির্দয়তা গোবরের ভালো লাগেনি। ভিড় ফাঁকা হতে বলে, "ভাই, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা বলা উচিত নয় তবে এত নির্দয় হওয়াও ভালো নয়।"

পুরুষটি কড়ির মতো চোখদুটো বার করে বলে, "তুমি কে?"

গোবর নিঃশঙ্কচিত্তে বলে, "যেই হই না কেন, অনুচিত কাজ দেখলেই খারাপ লাগে।"

পুরুষ মাথা নেড়ে বলে, "মনে হচ্চে এখনো ঘরে বৌ আসেনি, তাই এত দরদ।"

"বৌ এলেও তার ঝুঁটি ধরে টানবো না।"

আচ্ছা, এবার নিজের পথ দ্যাখো। আমার বৌকে আমি মারবো, কাটবো আমি যা খুশি করবো। তুমি বলবার কে হে? সোজা চলে যাও। এখেনে দাঁড়াবে না।"

গোবরের উষ্ণ রক্ত আরো উষ্ণ হলো। সে কেন যাবে? সরকারী সড়ক কারুর বাপের তো নয়! তার যতক্ষণ খুশী সে দাঁড়িয়ে থাকবে।"

পুরুষ ঠোঁট চিবিয়ে বলে, "তাহলে তুমি যাবে না, আমি যাবো?"

গোবর গামছাটা কোমরে বেঁধে বলে, "তুমি এসো আর নাই এসো। আমার যখন ইচ্ছে হবে তখন যাবো।"

"তাহলে মনে হচ্ছে, হাত-পা ভাঙবে।"

"কে জানে কার হাত-পা ভাঙবে।"

"তাহলে তুমি যাবে না?"

"না।"

পুরুষ ঘুঁষি পাকিয়ে গোবরের দিকে ঝাঁপাতেই যুবতী তার ধুতির খুঁট চেপে ধরে নিজের দিকে টেনে গোবরকে বললে, "তুমি কেন লড়াই-ঝগড়া করতে নামচো গা, নিজের পথে যাও না কেন? এখেনে কি তামাশা হচ্ছে? আমরা নিজে-দের মধ্যে ঝগড়া করচি। কখনো ও আমাকে মারে, কখনো আমি ওকে বকি। তোমার তাতে কি?"

এই ধিক্কার বাণী শুনে গোবর চলতে শুরু করে। মনে মনে বলে, "এ মাগীর মার খাওয়াই উচিত।"

গোবর চলে গেলে যুবতী স্বামীকে বকতে শুরু করে, "তুমি সবার সঙ্গে

লড়তে যাও কেন? ও কি এমন খারাপ কথা বলেচে যে তোমার চোট লাগলো। খারাপ কাজ করলে তো দুনিয়ার সকলে নিন্দে করবেই।' কিন্তু একে ভালো ঘরের ছেলে মনে হচ্ছে। দ্যাখো না, আমাদের জাতপাঁতের হলে তোমার বোনের সঙ্গে বে দেওয়া যায় কি না।"

স্বামী সন্দিগ্ধ সুরে বলে, "এখনো কি আইবুড়ো হয়ে বসে আচে?"

"জিজ্ঞেস করেই দ্যাখো না।"

পুরুষ দশ পা দৌড়ে হাঁক পেড়ে গোবরকে ডাকে আর হাত নেড়ে দাঁড়াতে বলে। গোবর ভাবলে, 'এর মাথা থেকে এখনও ভূত নামেনি। মার না খেয়ে যাবে না দেখচি 'অপনে গাঁও মে কুত্তা ভী শের' ঠিক আছে আসুক।'

কিন্তু পুরুষটির মুখে যুদ্ধের আহ্বান ছিল না, ছিল মৈত্রীর আহ্বান! সে তার নাম-ধাম জিজ্ঞেস করলে গোবর সত্যি কথাই বলে। পুরুষটির নাম কোদই। সে হেসে বলে, "আমাদের লড়াই হতে হতে বেঁচে গেচে। তুমি চলে এলে, ভাবলুম্ তুমি তো ঠিকই বলছিলে—আমি নাহক চটেচি। ঘরে জমিজমা আচে তো!"

গোবর জানায় তার মৌরুসী পাঁচ বিঘে জমি আছে একটা লাঙলেই চাষ হয়।

"আমি তোমাকে ভালোমন্দ যা বলিচি মাপ করে দাও ভাই! রাগলে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। আমার বৌ গুণে লক্ষ্মী কিন্তু মাঝে মাঝে যেন ঘাড়ে ভূত চাপে। এখন তুমিই বলো, মাকে আমি কি বললো? জন্ম দিয়েচে মা, পেলেপুষে বড়ো করেচে, কি বলি। কোন কথা উঠলে আমি বৌকে বলবো নাতো কাকে বলবো? তুমিই ভাবো, আমি কুকথা তো বলিনি। হাঁ মানচি, ঝুঁটি ধরে টানা উচিত হয়নি। কিন্তু মাগীর জাত মারধোর না করলে তো কাবু থাকে না। ও চায়, মায়ের কাচ থেকে আলাদা হয়ে যাই। সে আমি পারবো না। তাতে মাগী থাকুক আর নাই থাকুক।"

গোবরকেও মত বদলাতে হলো, "মাকে দেখাশোনা তো সকলেরই ধরম রে ভাই। মায়ের ধার কেউ শুধতে পারে?"

কোদই তাকে নিমন্ত্রণ জানায়। আজ সে কোনমতেই লক্ষ্ণৌ পেঁৗছোতে পারবে না। দু-এক ক্রোশ যেতে যেতেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে। রাতে কোথাও থাকতে হবেই। গোবর ঠাট্টা করে বলে, "বৌকে মানিয়ে নিয়েচো?"

"না মেনে উপায় আচে?"

"আমাকে যা বকেচে আমার যেতে লজ্জা করচে।"

"ও নিজেও পস্তাচ্চে। মাকেও একটু বুঝিয়ে দিও ভাই। মায়েরও তো বৌয়ের বাপ-ভাইকে গাল দেওয়া ঠিক নয়। আমারও বোন রয়েচে। দুদিন পরে তারও বে হবে। ওর শাশড়ীও তো আমাদের গাল দেবে। সব দোষ তো বৌয়ের নয়, মায়েরও দোষ আচে। সব কথায় মেয়ের পেশংসা করে বৌয়ের নিন্দে করলে রাগ তো হবেই। এ মাগীর একটা গুণ আচে। দ্যাখো না, রাগ করে ঘর থেকে চলে এসেচে গালাগালের জবাবে মুখ খারাপ করেনি।"

গোবরের রাতের জন্যে একটা আশ্রয় দরকার ছিল। কোদই থাকায় মিটে গেল। দুজনেই আবার সেই জায়গায় ফিরে আসে যেখানে যুবতী বসেছিল। এখন সে গৃহবধূ সেজে ঘোমটা টেনে বসে।

কোদই ঠাট্টা করে বলে, "ও তো আসছিল না। বলছিল অত বকুনি খেয়ে ও বাড়িতে কি করে যাবো?"

যুবতী ঘোমটার আড়ে হেসে বলে, "এটুকু বকুনি খেয়েই ভয় পেয়ে গেলে। বৌ এলে কোথায় পালাবে গা?"

গ্রাম এসে গেল। গ্রাম আর কি, পুবমুখো দশ-বারোটা ঘর দাঁড়িয়ে আছে, অর্ধেক খাপরার, অর্ধেক খড়ের। কোদই বাড়ি পেঁাছে খাটিয়া বার করে শতরঞ্চি পেতে দেয়, শরবৎ আনতে বলে ছিলিম সেজে আনে। একটু পরে কোদইয়ের বৌই শরবৎ নিয়ে এসে একছিটে জল গোবরকে ছুঁড়ে মারে। সে এখন তার নন্দাই হতে যাচ্ছে সুতরাং আগেই রঙ্গরসিকতা করে।

১৩

গোবর অন্ধকার থাকতেই উঠে পড়ে কোদইয়ের কাছে গিয়ে বিদায় চায়। সবাই জেনে গেছে গোবর বিবাহিত তাই সে ব্যাপারে কোন কথা হয়নি। তার ভদ্র ব্যবহারে বাড়ির সবাই মুগ্ধ। কোদইয়ের মা তো তার মিষ্টি কথা শুনে ভারি খুশি। গোবর বলে, "তোমার মন খুব বড়ো মা, তুমি তো দেবী। পুত্তুর মায়ের ঋণ শত জন্মেও শোধ করতে পারে না। লাখ জন্মেও শোধ করতে পারে না, কোটি জন্মেও না..."

বুড়ি এসব কথা শুনে গদগদ হয়ে যায়। এরপর গোবর যা বলে তাতে বুড়ি নিজের ভালোই দেখতে পায়। বৈদ্য একবার রোগীকে সারিয়ে দিলে রোগী তার হাত থেকে বিষও খেতে পারে। গোবর বলে, "আজই যেমন তোমার বৌ রাগ করে ঘর থেকে চলে গেল এতে কার মাথা নীচু হলো বলো। বৌকে কেই বা চেনে? কার মেয়ে কার নাতনী কে জানে? হয়তো তার বাপ একটা ঘেসেড়া *...

বুড়ি নিশ্চিত করে বলে, "ঘেসেড়াই তো, বাবা, পাক্কা ঘেসেড়া। সকালে ওর মুখ দেখলে সারাদিন জলও জুটবে না।"

"তা এই লোককে নিয়ে আর কে হাসবে বলো? হাসবে তোমাকে আর তোমার সোয়ামীকে নিয়ে। যে জিজ্ঞেস করবে, সেই তো বলবে 'কাদের বৌ?' আর ওতো এখনো ছেলেমানুষ, অবোধ, আনাড়ী। নীচ বাপ-মার মেয়ে তো, ভালো হবে কি করে? সেই বলে না, "বুড়ে তোতে কো রাম নাম পড়ানা"† তোমাকে তাই করতে হবে গো। তা মেরে ধরে তো হবে না ভালো করে

* ঘেসেড়া=যে ঘাস বিক্রী করে

† বুড়ে তোতে কো রাম নাম পড়ানা=বুড়ো পাখিকে রাম নাম শেখানো কষ্টকর কাজ

বোজাতে হবে। বোকো-ঝোকো তবে ঝগড়া কোরো না। ওর তো কিছু হবে না তোমারই অপমান হবে।"

গোবর যখন রওনা হলো তখন বুড়ি চিনির রস আর ছাতু মেখে খাবার বেঁধে দিল। গ্রামের আরো কয়েকজন মজুরীর খোঁজে শহরে যাচ্ছিল। সবাই বেলা নটা নাগাদ আমীনাবাদের বাজারে পেঁছোয়। এত মজুর কোথায় কাজ পাবে? গোবরের হাতে কোন যন্ত্রপাতি নেই। লোকে জানবে কি করে সে কি কাজ করে। এক এক করে মজুররা কাজ পায়। কয়েকজন হতাশ হয়ে পড়ে। বিশেষতঃ বুড়ো আর অকম্মারা পড়ে থাকে। এদের মধ্যে গোবরও আছে তবে আজ তার দুঃখ নেই, সঙ্গে খাবার আছে। হঠাৎ মির্জা খুরশেদ এই মজুর-দের মাঝখানে এসে চীৎকার করে বলতে থাকেন, "যে-যে ছ-আনা রোজ দরে কাজ করতে চাও আমার সঙ্গে এসো। সব্বাই ছ আনা করে পাবে। পাঁচটার সময় ছুটি।"

পাঁচ-দশজন রাজ মিস্ত্রী আর ছুতোর মিস্ত্রী ছাড়া সবাই তাঁর সাথে যাবার জন্যে তৈরি হলো। চারশো মজুরের বিরাট দল। সবার আগে মির্জা কাঁধে মোটা লাঠি নিয়ে, পিছনে ক্ষুধার্ত মানুষের লম্বা মিছিল, যেন গড্ডালিকা প্রবাহ! এক বুড়ো মির্জাকে বলে, "কাজ কি করতে হবে মালিক?"

মির্জা যে কাজ বললেন তাতে সবাই অবাক। শুধু এক কবাডি খেলা! এ কেমন লোক? যে কবাডি খেলার জন্যে ছ আনা রোজ দিচ্ছে। পাগল নয়তো? অনেক ধনসম্পত্তি পেয়ে মানুষ পাগল হয়ে যায়। সন্দেহ হয়, "মজা করচে নাতো? এখান থেকে নিয়ে গিয়ে বলবে 'কাজ নেই' তখন কি হবে? এমন পাগলা মানুষকে ভরসা কি?" গোবর ভয়ে ভয়ে বলে, "মালিক আমাদের কাছে খাবায় পয়সা নেই। পয়সা পেলে কিছু খেয়ে নিই।"

মির্জা তৎক্ষণাৎ তার হাতে ছ আনা পয়সা দিয়ে হেঁকে বললেন, "সবাইকে যেতে যেতে মজুরী দিয়ে দেওয়া হবে। এ নিয়ে ভেবো না।" শহরের বাইরে তাঁর খানিকটা জমি ছিল। মজুররা গিয়ে দেখে বড়ো হাতা ঘেরা একটা ছোট্ট খড়ের ছাউনিঘেরা বাড়ি, সেখানে তিন চারটে চেয়ার আর একটা টেবিল তার ওপর কয়েকটা বই। বাড়িটা ঘুঁইলতার ঘন আড়ালে ঢাকা পড়ে সুন্দর দেখাচ্ছে। হাতার একদিকে আম, লেবু আর পেয়ারার চারা লাগানো হয়েছে, অন্যদিকে কিছু ফুলগাছ। অনেকখানি অংশ ফাঁকা। মির্জা সবাইকে দাঁড় করিয়ে পয়সা দিয়ে দিলেন। তাঁর পাগলামী নিয়ে আর সন্দেহ রইল না।

গোবর আগেই পয়সা পেয়েছে। মির্জা তাকে ডেকে গাছে জল দেবার কাজে লাগিয়ে দিলেন। সে কবাডি খেলতে পাবে না। তার মন খারাপ হয়ে গেল। এই বুড়োগুলোকে তুলে তুলে পটকাতো। যাক, অনেক কবাডি খেলেছে সে পয়সা তো পেয়ে গেছে।

আজ বহুদিন পরে এই জরাগ্রস্ত মানুষগুলি কবাডি খেলার সুযোগ পেল। জীবনে কখনো খেলেছে সে কথাও অনেকের মনে ছিল না। সারাদিন শহরের মাড়াই কলে যেন পিষ্ট হয়ে এক প্রহর রাতে বাড়ি ফেরে, তারপর রুখো-শুখো

যা হোক কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ে। সকালে আবার সেই একই চরকীর কাজ শুরু হয়। জীবন নীরস, একঘেয়ে। আজ খেলতে পেয়ে বুড়োরাও যেন জোয়ান হয়ে উঠলো। সেই সব আধমরা বুড়োরা যাদের "মুহ মে দাঁত না পোমেং আঁত"* তারাও লাঠি ঠুকে, তাল ঠুকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। চটপট দল তৈরি করে দুজন দলপতি সঙ্গী নির্বাচন করে। বারোটা বাজতে না বাজতেই খেলা শুরু। শীতের ঠান্ডা রোদে এই খেলাই সবচেয়ে ভালো।

ওদিকে গেটের কাছে মির্জা দর্শকদের কাছে টিকিট বিক্রী করছিলেন। এরকম পাগলামী প্রায়ই তাঁকে ভর করে। এই বুড়ো-কবাডির বিজ্ঞাপন ক'দিন ধরেই দেওয়া হচ্ছিল, নোটিশও বিলি করা হয়েছে। টিকিটের হার দশ টাকা থেকে দু আনা পর্যন্ত আছে। তিনটে বাজতে না বাজতেই সারা মাঠ মটোর আর ফিটনে ভরে গেল। দু হাজারের কম লোক ছিল না। ধনীদের জন্যে চেয়ার ও বেঞ্চ পাতা হয়েছে আর সাধারণ দর্শকদের জন্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মাটি!

মালতী, মেহতা, খান্না, তংখা ও রায়সাহেব সকলেই এসেছেন। খেলা শুরু হলে মির্জা মেহতাকে বললেন, "আসুন ডক্টর সাহেব আপনাতে আমাতে এক ক্ষেপ হয়ে যাক।"

মালতী বললেন, "ফিলসফারের জুড়ি ফিলসফারই হতে পারে।"

মির্জা গোঁফে তা দিয়ে বললেন, "আপনি কি মনে করেন আমি ফিলসফার নই? আমার ডিগ্রী নেই তবু আমি একজন ফিলসফার। আপনি আমার পরীক্ষা নিতে পারেন মেহতাজী।"

মালতী প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা বলুন তো আপনি আইডিয়ালিস্ট না মেটি-রিয়ালিস্ট?"

"দুটোই।"

"কি রকম?"

"যখন যেমন সুযোগ পেয়েছি, তাই হয়ে গেছি।"

"তাহলে আপনার নিজস্ব মত নেই।"

"সে কথার সমাধান হয় নি, হবেও না কোনদিন, আমি তার সমাধান করবো কি করে? অন্য লোকেরা চোখ খুলে বই পড়ে যে অবস্থায় পেঁছোয় আমি সেখানে আগেই পেঁছে গেছি। আপনি বলতে পারেন, কোন ফিলসফার মাথা ধরানো ছাড়া আর কোন কাজ করেছে কি না?"

মেহতা আচকানের বোতাম খুলে বললেন, "তাহলে চলুন আপনার আমার খেলা হয়ে যাক। যে যাই মনে করুক আমি আপনাকে ফিলসফার বলেই মনে করি।"

মির্জা খান্নাকে বললেন, "আপনার জন্যেও জুড়ি ঠিক করে দেব নাকি?"

*মুহ মে দাঁত না পোমেং মে আঁত=খুব বুড়ো, যাদের মুখে দাঁত ও পেটে আঁত নেই অর্থাৎ হজমশক্তি নেই

মালতী মন্তব্য করেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ ওঁকে জুড়ে দিন মিস্টার তংখার সঙ্গে"।

খান্না লজ্জা পেয়ে বললেন, "আজ্ঞে না, ক্ষমা করুন।"

মির্জা রায়সাহেবকে বললেন, "আপনার জন্যে কোন জুড়ি আনবো?"

রায়সাহেব বললেন, "আমার জুড়ি তো ওংকারনাথ, কিন্তু তাকে তো আজ দেখছি না।"

মির্জা ও মহেতা নগ্ন দেহে শুধুমাত্র জাঙিয়া পরে মাঠে নামলেন। দুজন দুপক্ষে, খেলা শুরু হয়ে গেল।

জনসাধারণ বুড়োদের খেলা দেখে খুব হাসছিল, হাততালি দিচ্ছিল। "ওই বুড়োবাবাকে দ্যাখ! কেমন যাচ্ছে যেন সবশ্শইকে মেরে ফিরবে। আর এদিকে দ্যাখ যেন ওরই বড়ো ভাই বেরুলো। পাঁয়তাড়া কষছে দ্যাখ্ না। বুড়ো হাড়ে ভেল্কি খেলে বাবা, এরা যা ঘি খেয়েছে আমরা তত জলও খাঁইনি। এখনও বুড়োদের গায়ে ছোঁড়াদের তেজ রয়েছে।" চারদিকে হো হো হাসির ছটার সঙ্গে সঙ্গে করুণার বাষ্প মিশে আছে। কিন্তু বড়োলোকদের শামিয়ানার নীচে অন্য কথাবার্তা চলছিল।

খান্না জিঞ্জারের গ্লাস শেষ করে সিগারেট ধরিয়ে রায়সাহেবকে বললেন, "আমি আপনাকে বলে দিয়েছি ব্যাঙ্ক এর চেয়ে কম সুদে রাজী হবে না। এ ব্যবস্থাও করেছি আপনি ঘরের লোক বলে।"

রায়সাহেব গোঁফের ওপর হাসি ঝুলিয়ে বললেন, "আপনার নীতি তো ঘরের লোককেই উল্টে ছুরি মারা।"

"এসব আপনি কি বলছেন?"

"ঠিকই বলেছি, সূর্যপ্রতাপ সিং-এর কাছ থেকে আপনি শতকরা সাত নিয়েছেন আর আমার কাছে নয় চাইছেন। তাও আবার বলছেন দয়া করে? সত্যি কিনা বলুন।"

খান্না হো হো করে হেসে উঠলেন, "ঐ শর্তে আমি আপনার কাছ থেকেও ঐ দরে সুদ নেব কারণ আমি ওঁর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছি। আর কোনদিনই বোধহয় ঐ সম্পত্তি উনি ফেরৎ পাবেন না।"

"আমিও কোন জায়দাদ দিয়ে দেব। ন পারসেন্ট দেওয়ার চেয়ে তো ফালতু জায়দাদ ছেড়ে দেওয়াই ভালো। আমার জ্যাকসন রোডের বাড়িটা আপনি বিক্রী করিয়ে দিন। কমিশন পাবেন।"

"ওই বাড়িটা দাঁওএ বিক্রী করার অসুবিধে আছে। আপনি তো জানেন ওই জায়গা লোক বসতি থেকে কত দূরে। যাই হোক, চেষ্টা করবো। আপনি ওটার কত দাম আন্দাজ করে রেখেছেন?"

রায়সাহেব জানালেন এক লাখ পঁচিশ হাজার। পনেরো বিঘে জমিও তো আছে তার সঙ্গে। খান্না স্তম্ভিত হয়ে বললেন, "আপনি যে আজ থেকে পনেরো বছর আগেকার স্বপ্ন দেখছেন রায়সাহেব। এখন জায়গাজমির দাম যে ফিফ্‌টি পারসেন্ট কমে গেছে।

রায়সাহেব রূঢ় ভাবে বললেন, "আজ্ঞে না, পনেরো বছর আগে তার দাম দেড় লাখ টাকা ছিল।"

"আমি ক্রেতা খুঁজবো কিন্তু আপনার কাছে থেকে আমি পাঁচ পারসেন্ট কমিশন নেব।"

"আর অন্য তরফ থেকে দশ পারসেন্ট। কি করবেন এত টাকা নিয়ে?"

"আপনার যা খুশি তাই দেবেন। তাহলে রাজী তো! সুগারের শেয়ার এখনো আপনি কিনলেন না? সামান্য কটা শেয়ার পড়ে আছে। আপনি হাত কচলাতেই থাকুন। ইনসিয়োরেন্সের পলিসীও আপনি নিলেন না। আপনার টালবাহানা করার বিশ্রী স্বভাব আছে। যখন আপনি লাভের কথাতেই এত টালবাহানা করছেন তখন অন্যেরা আপনার কাছ থেকে কী লাভ করবে? এই জন্যেই বলে, 'রিয়াসত আদমী কী অক্‌ল্‌ চর জাতি হ্যায় *' আমার ক্ষমতা থাকলে তালুকদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতাম।"

মিস্টার তংখা মালতীর ওপর জাল বেচাচ্ছিলেন। মালতী পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন তিনি ইলেকসনের ঝামেলায় পড়তে চান না। তংখা এত সহজে হার মানার লোক নন। টেবিলে কনুই রেখে বললেন, "আপনি ওই ব্যাপারটা একটু ভাবুন। আমার মতে, এমন সুযোগ আপনি আর পাবেন না। আপনার তুলনায় রানীসাহেব চন্দার টাকায় এক আনা চান্সও নেই। আমার ইচ্ছে, কাউন্সিলে এমন কিছু মানুষ আসুন, যাঁরা জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন ও জনগণের সেবা করেছেন। যিনি ভোগবিলাস ছাড়া কিছুই জানেন না, জনতাকে চিরকাল মটোরের পেট্রল ভেবে আসছেন আর যাঁর সেবা গভর্নর ও সেক্রেটারীদের পার্টি দেওয়া ছাড়া কিছু নয় কাউন্সিলে তাঁর ঠাই হওয়া উচিত নয়। নতুন কাউন্সিলে প্রতিনিধিদের হাতে অনেক ক্ষমতা থাকবে। আমি চাই না তার অপব্যবহার হোক।"

মালতী তাঁকে এড়াবার জন্যে বললেন, "আমার কাছে ইলেকশনে খরচ করার মতো দশ-বিশ হাজার টাকা কোথায়? রানীসাহেবা তো দু চার লাখ খরচ করতে পারেন। আমি বছরে ওঁর কাছ থেকে পাঁচশো-হাজার টাকা পাই। এটাও হাতছাড়া হয়ে যাবে।"

"আগে আপনি বলুন আপনি যেতে চান কি না?"

"যেতে তো চাই, যদি ফ্রি-পাশ পাই।"

"তাহলে এটা আমার জিম্মায় রইল। আপনি ফ্রি-পাশ পাবেন।"

"আজ্ঞে না, মাফ করুন। আমি হারতে রাজী নই। যখন রানীসাহেবা টাকার থলি খুলে এক এক ভোটের জন্যে এক এক আশরফী দেবেন তখন আপনিও ওদিকেই ভোট দেবেন।"

"আপনি মনে করেন টাকার জোরে ইলেকশনে জেতা যায়?"

"আজ্ঞে না। ব্যক্তিবিশেষও জয়ী হতে পারেন কিন্তু আমি একবার জেলে

* রিয়াসত আদমী কী অক্‌ল্‌ চর জাতি হ্যায়—জমিদারী বুদ্ধি নাশ করে

যাওয়া ছাড়া আর কী জনসেবা করেছি? আর সত্যি কথা বলতে কি, আমিও কাজ হাসিল করবার জন্যেই জেলে গিয়েছিলাম। যেমন গিয়েছিলেন রায়সাহেব আর খান্না। আধুনিক সভ্যতার আধার হচ্ছে ধন। বিদ্যা-সেবা-জাত কুল সবই ধনের কাছে তুচ্ছ। কখনো-কখনো ধনকে আন্দোলনের চেয়ে গৌণ মনে হয় বটে কিন্তু সেটা বাজে কথা বলেই জানবেন। আমি আমার কথাই বলছি। কোন গরীব মেয়েছেলে ডাক্তারখানায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা এসে বসে থাকে, কথাও বলি না অথচ গাড়ি চড়ে কেউ এলে তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে খাতির করি। আমার সঙ্গে রানীসাহেবার কোন তুলনা হয় না। বর্তমান কাউন্সিলে তিনিই উপযুক্ত প্রতিনিধি।"

ওদিকে মাঠে মেহতার টীম দুর্বল হয়ে পড়ছিল। তাঁর অর্ধেকের বেশি খেলোয়াড় 'মার' গেছে। মেহতা জীবনে কবাডি খেলেন নি মির্জা এ খেলায় ওস্তাদ। মেহতা অবসর কাটান অভিনয় করে. মির্জার মন পড়ে থাকে পালোয়ানের আখড়ায়। মালতীর মন সেদিকেও ছিল। বললেন, "মেহতার পার্টি তো বিশ্রীভাবে হারছে।"

রায়সাহেব ও খান্না ইনসিয়োরেন্সের কথা বলছিলেন। মালতীর কথায় তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন. "তাই তো! মির্জা যে পাকা খেলোয়াড়।"

"মেহতা কী পাগলামী করছে? নিজেকে বোকা বানিয়ে লাভ কী?"

"এতে বোকামীর কি আছে? মজাই তো!"

"মেহতার দিক থেকে যে যাচ্ছে সেই 'মার' খাচ্ছে। আচ্ছা, এ খেলায় হাফ টাইম হয় না?"

খান্না ঠাট্টা করে বলেন, "উনি গেছেন মির্জার সঙ্গে লড়তে। ভাবছেন এও ফিলসফী!"

"আমি জিজ্ঞেস করছি এ খেলায় হাফটাইম হয় না?"

খান্না আরো রাগাতে চেষ্টা করেন, "এখন খেলাই শেষ হতে চলেছে। মজা তো হবে যখন মির্জা মেহতাকে চেপে ধরে 'চিঁ' বলাবে, তখন।"

"আমি আপনাকে বলিনি। রায়সাহেবকে বলছি।"

রায়সাহেব বললেন, "এই খেলায় হাফটাইম! একটা করে লোকই তো সামনে যাচ্ছে।"

"আচ্ছা, মেহতার আরো একটা লোক 'মার' গেল।"

খান্না বললেন, "আপনি দেখতেই থাকুন। এই করে সবাই মরবে। শেষে মরবে মেহতা নিজে।"

মালতী জ্বলে উঠলেন, "আপনার তো সাহস হলো না?"

"আমি গেঁয়োদের খেলা খেলি না। আমার জন্যে টেনিস আছে।"

"টেনিসে আমি আপনাকে একশোবার হারিয়েছি।"

"আপনাকে হারাবার চেষ্টা করেছি কবে?"

"যদি চেষ্টা করতে চান আমি রাজী।" মালতী তাঁকে ভর্ৎসনা করে নিজের জায়গায় এসে বসেন। মেহতার প্রতি কারুর সহানুভূতি নেই। কেউ বলছে

না যে খেলা বন্ধ করে দেওয়া হোক। মেহতাও আজব রকমের বুদ্ধু, কিছু চালাকি করছে না কেন? এক্ষুনি হেরে যাবে আর চারদিক থেকে হাততালি পড়বে। মেহতার পক্ষে মাত্র জনবিশেক লোক আছে, তাই সবাই কী খুশি!

খেলা যত শেষ হয়ে আসে মাঠের উত্তেজনা ততই বাড়ে। সবাই মাঠের দিকে এগোয়। দড়ির সীমানা ছিঁড়ে গেছে। স্বেচ্ছাসেবকরা কিছুই করতে পারছে না। খেলা শেষ পর্যায়ে এখন মেহতা একলা 'বেঁচে' আছেন। তিনি যদি বিপক্ষের মধ্যে গিয়ে ফিরে আসতে পারেন তাহলে তাঁর পক্ষ জিতবে নয়তো হারবেন। মেহতা শান্তভাবে এগোলেন, তাঁর সমস্ত মন খেলার ওপর। সবাই তাঁকে দেখছে। মেহতা শত্রুদলে ঢুকলেন। দল পেছনে সরছে। তাদের সংগঠন দৃঢ়, ধরবার ছোঁবার সুযোগ নেই। অনেকের আশা ছিল অন্ততঃ নিজের দলের পাঁচ-দশটা লোককে তিনি বাঁচাতে পারবেন। তারা হতাশ হলো।

হঠাৎ মির্জা এক লাফ মেরে মেহতার কোমর চেপে ধরলেন। মেহতা নিজেকে মুক্ত করার খুব চেষ্টা করছেন। সবাই উন্মত্ত। বোঝা কঠিন কে খেলোয়াড় আর কে দর্শক। মির্জা ও মেহতার মল্লযুদ্ধ চলছে। মির্জার পক্ষে কয়েকটা বুড়ো মেহতাকে চেপে ধরে মাটিতে ফেলে। মেহতা চুপচাপ পড়ে আছেন কোনরকমে আর দুহাত যেতে পারলে তাঁর দলের পঞ্চাশজন বেঁচে উঠবে কিন্তু এক ইঞ্চিও নড়তে পারছেন না। মির্জা তাঁর ঘাড়ের ওপর চেপে বসেছেন। মেহতার মুখ লাল, চোখ কপালে ওঠে। ঘাম ঝরে। মির্জার ভারে পিঠ ভেঙে আসে।

মালতী কাছে গিয়ে উত্তেজিত স্বরে বলে, "মির্জা খুরশেদ, 'ফেয়ার' হচ্ছে না। বাজি 'ড্র' হলো।"

মির্জা মেহতার ঘাড়ে ঘুষি মেরে বললেন, "যতক্ষণ না ইনি 'চি" বলবেন আমি ছাড়বো না। 'চি" বলছেন না কেন?"

মালতী আরো এগিয়ে আসেন, "'চি' বলার জন্যে আপনি এত জবরদস্তী করতে পারেন না।"

"আলবৎ পারি। আপনি ওঁকে বলুন 'চি' বললেই ছেড়ে দেব।" মেহতা ওঠার চেষ্টা করতেই মির্জা আবার তাঁর গলা টিপে ধরলেন।

মালতী তাঁর হাত ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করেন, "এ খেলা নয়, শত্রুতা হচ্ছে।"

"শত্রুতাই সই।"

"আপনি ছাড়বেন না?"

ঠিক সেই সময় যেন একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল। মির্জা মাটিতে পড়ে গেলেন আর মেহতা ছুটে গন্ডী পার হয়ে গেলেন। বাজীমাৎ। হাজার হাজার লোক টুপী পাগড়ী আর ছড়ি ঘোরাচ্ছিল। মির্জা মেহতাকে কোলে তুলে সামিয়ানায় নিয়ে এলেন। সবার মুখে এক কথা "ডক্টর সাহেব বাজীমাৎ করেছেন।" সবাই মেহতার শক্তি ও ধৈর্যের প্রশংসা করে। মজুরদের সবাইকে একটা করে কমলালেবু দিয়ে বিদায় করা হলো। অতিথিদের জন্যে চায়ের

ব্যবস্থা ছিল। একই টেবিলে মির্জা ও মেহতা সামনা-সামনি বসে আছেন। মালতী মেহতার পাশে।

মেহতা বললেন, "আজ আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা হলো। মহিলাদের সহানুভূতি হারকেও জিতিয়ে দিতে পারে।"

মির্জা মালতীর দিকে চেয়ে বললেন, "আচ্ছা, এই ব্যাপার। আমিও অবাক হচ্ছিলাম আপনি হঠাৎ জিতে গেলেন কি করে?"

মালতী লজ্জায় লাল, "আপনি বড়ো অসভ্য মির্জাজী, আজ বুঝলাম।"

"দোষ তো এঁর। কেন 'চিঁ' বললেন না?"

"আপনি আমাকে মেরে ফেললেও আমি চিঁ বলতাম না।"

বন্ধুরা কিছুক্ষণ পরে বিদায় নিলেন। মালতীও একটা রোগী দেখতে গেলেন। রইলেন মির্জা ও মেহতা। তাঁদের সর্বাঙ্গে মাটিমাখা স্নান করতে হবে। গোবর জল তোলে, দুই বন্ধু স্নান করেন। মির্জা প্রশ্ন করেন, "বিয়ে কবে হচ্ছে?"

"কার?"

"আপনার।"

"আমার বিয়ে। কার সঙ্গে?"

"বাহ্! আপনি এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন কিছু জানেন না। আরে এও কি লুকোবার কথা!"

"না-না, আমি সত্যি কথাই বলছি। আমি কিচ্ছু জানি না। সত্যিই আমার বিয়ে না কি?"

"আপনি কি বলুন তো? মালতী কি আপনার বান্ধবী হয়েই থাকবেন?"

মেহতা গম্ভীর হয়ে বললেন, "আপনার ধারণা একেবারে ভুল মির্জাজী। মালতী সুন্দরী, হাসি-খুশি, বুদ্ধিমতী, গুণবতী কিন্তু আমি নিজের জীবন-সঙ্গিনীর মধ্যে যা দেখতে চাই তাঁর মধ্যে তা নেই। আমার ধারনায়, নারী ত্যাগ-তিতিক্ষার মূর্তি, যে তার মৌন মূক আত্মদানে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করে দিয়ে স্বামীর আত্মার অংশ হয়ে যায় সেই স্ত্রী হবার উপযুক্ত। আপনি বলবেন পুরুষ কেন নিজেকে বিলীন করে দেয় না। নারীর কাছেই বা আশা করে কেন? কারণ পুরুষের সে ক্ষমতাই নেই। সে নিজেকে নিঃশেষে দিলে যে শূন্য হয়ে যাবে। তখন সংসার ত্যাগ করে গুহায় গিয়ে ঈশ্বরের সাধনা করবে। পুরুষের তেজ আছে, অহংকারে সে ঈশ্বরের মধ্যে লীন হবার কল্পনা করে। নারী শান্ত, সহিষ্ণু। পুরুষ যদি নারীর গুণ পেত তাহলে মহাত্মা হয়ে যেত আর নারী পুরুষের গুণ পেলে সে হয়ে ওঠে কুলটা। পুরুষ আকৃষ্ট হয় তার দিকে, যে সর্বাংশে নারী। মালতী এখনও আমায় আকৃষ্ট করে নি। আমি মনে করি সংসারে যা কিছু সুন্দর নারী তারই প্রতিমা। আমি যদি তাকে মেরেও ফেলি, তার চোখের সামনে অন্য মেয়েকে ভালোবাসি তবু হিংসেয় জ্বলে উঠবে না। এমন মেয়ে পেলে আমি তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে আত্মসমর্পণ করবো।"

"এমন মেয়ে আপনি সারা দুনিয়া খুঁজেও পাবেন না।"

"একটা নয় হাজারটা আছে, নইলে দুনিয়া মরুভূমি হয়ে যেত।"

"একটা উদাহরণ দিন তো।"

"মিসেস খান্নার কথাই ধরুন না।"

"কিন্তু খান্না?"

"খান্না একটি হতভাগা। সে হীরেকেও কাঁচের টুকরো ভাবছে। ভাবুন তো, কত ত্যাগ আর তার সঙ্গে প্রেম! খান্নার রূপাসক্ত মনে হয়তো তার জন্যে এক রতিও জায়গা নেই। কিন্তু খান্নার কোন বিপদ হলে তিনি ওঁর জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করবেন। আজ যদি খান্না অন্ধ হয়ে যান কি ওঁর কুষ্ঠ হয় তবু ওঁর স্ত্রী ওঁকে ভালোবাসবেন। আপনি দেখবেন এই খান্নাই একদিন ও'র কদর বুঝবেন। আমি এমন স্ত্রী চাই না যে আমার সঙ্গে আইনস্টাইনের ফরমুলা নিয়ে তর্ক করবে কিংবা সে আমার বইয়ের প্রুফ দেখবে। আমি চাই আমার স্ত্রী নিজের প্রেম ও ত্যাগ দিয়ে আমার জীবনকে পবিত্র আর উজ্জ্বল করে তুলবে।"

মির্জা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে যেন পুরনো কথা স্মরণ করে বলেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন মেহতাজী। এমন মেয়ে কোথাও পাওয়া গেলে আমিও শাদী করে ফেলবো। তবে মনে হয় না যে পাওয়া যাবে।"

মেহতা হেসে বলেন, "আপনিও খুঁজুন আমিও খুঁজি। হয়তো একদিন ভাগ্য খুলবে।"

"কিন্তু মালতী এত সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়।"

"এসব মেয়ের সঙ্গে গালগল্প করে সময় কাটাতে পারি, বিয়ে তো আত্ম-সমর্পণ!"

"তাহলে প্রেম কি?"

"প্রেম যখন আত্মসমর্পণের রূপ নেয় তখনই তা বিয়ে, তার আগে পর্যন্ত শুধু মনোবিলাস।"

মেহতা বিদায় নিলে মির্জা দেখলেন গোবর তখনও গাছে জল দিচ্ছে। খুশি হয়ে বললেন, "যা এবার তোর ছুটি। কাল আবার আসবি?"

গোবর কাতর সুরে বলে, "আমি একটা চাকরি করতে চাই, মালিক।"

"চাকরি করিস তো আমি তোকে রাখবো।"

"কত পাবো হুজুর?"

"তুই যত চাস।"

"আমি কি চাইব হুজুর, আপনি যা দেবেন।"

"আমি পনেরো টাকা দেব আর খুব খাটাবো।"

গোবর খাটতে ভয় পায় না। সে টাকা পেলে অষ্টপ্রহর কাজ করবে। পনেরো টাকা পেলে আর কথা কি? বলে, "একটা কুঠরী পেলে সেখেনেই পড়ে থাকবো।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। এই ঘরটার একদিকে তুইও থাকবি।"

গোবর যেন হাতে স্বর্গ পায়।

হরির সমস্ত শস্য জরিমানা দিতে গেছে। বৈশাখটা কোনরকমে কাটলেও জ্যৈষ্ঠ হতে না হতেই ঘরে একদানাও খাবার রইল না। খাবার জন্যে পাঁচ-পাঁচটা পেট আর ঘরে শস্য বাড়ন্ত। দু বেলা না জুটুক, একবেলা তো জোটা চাই। ভরপেট না হোক, আধ পেটা। অনাহারে কদিন চলবে? ধার দেবে কে? মজুরীই বা কোথায়? খালি পেটে মেহনতই বা করবে কি করে?

সন্ধ্যের দিকে বাচ্চাটাও কাঁদছিল। মা খেতে না পেলে দুধ হবে কি করে? সোনা অবস্থা বোঝে, রূপা 'রুটি রুটি' করে চেঁচাচ্ছিল। দিন ভোর কাঁচা আমের গুটি চিবিয়েছে, এখন তো কিছু চাই। হরি দুলারীর কাছে যব ধার করতে গিয়েছিল কিন্তু দুলারী তখন ঝাঁপ বন্ধ করে চলে গেছে। মগরুশাহ ধার তো দেয়ই নি, অপমান করেছে, "উঁঃ ধার নিতে এসেছেন, তিন বছর হয়ে গেল একটা পাই সুদ দেয় নি তার ওপর ধার দাও। এবার মলে তবে দোব। এই-ই হয়। ভগবানও এই অন্যায় সহ্য করতে পারেন না। গোমস্তার ধমকানি খেয়ে টাকা উগরে দেবার সময় মনে ছিল না। আমার টাকা যেন টাকা নয়। উপরন্তু বৌয়ের কি মেজাজ।"

ওখান থেকে ফিরে হরি উদাস হয়ে বসে আছে এমন সময় পুনিয়া আগুণ নিতে এলো। রান্নাঘরে অন্ধকার দেখে বলে, "আজ রুটি করবে না দিদি? বেলা যে পড়ে এলো।"

গোবর পালাবার পর থেকে ধনিয়া ও পুনিয়ার বাক্যালাপ শুরু হয়েছে। সে হরির মহত্বও স্বীকার করতে শুরু করেছিল। পুনিয়াই এখন হীরাকে গালমন্দ করে, "খুনে, গরু মেরে দেশান্তরী হলো। মুখে চুনকালি দে বাড়ি ফিরবে কোন্ মুখে? এলেও ঘরে পা রাখতে দেবে নাকি। গোহত্যে করতেও একটু লাজলজ্জা হলো না গো, ভালো হতো পুলিশে বেঁধে নে যেত, চাকী পেষাতো।"

ধনিয়া কোন বাহানা খুঁজে না পেয়ে বলে, "রুটি আর কোত্থেকে হবে বৌ, ঘরে একটা দানাও নেই। তোর মাহাতো বেরাদরীর পেট ভরাতে সর্বস্ব দে হাত ধুয়ে এলো, এখন বালবাচ্চা মরে কি বাঁচে সমাজের কেউ উঁকি মেরেও দেখে না।"

পুনিয়ার ফসল ভালো হয়েছিল। এর মূলে যে হরির শ্রম আছে তা সে জানতো। হীরা নিজেও কখনো এত ফসল ঘরে তোলে নি। সে বলে, "আমার ঘর থেকে নে এলে না কেন? ওগুলোও তো মাহাতোই খেটে-খুটে ফলিয়েছে, নাকি? সুখের দিন আসে তো ঝগড়া করো, দুখের দিন তো একসঙ্গেই কেঁদে কাটাতে হয়। আমি কি কালা যে মানুষের মন বুঝবো না। মাহাতো না দেখলে কোথায় দাঁড়াতুম বলো তো?"

সে তখনি বাড়ি ফিরে যায় সোনাকে নিয়ে। একটু পরে দুটো ডালায় শস্য ভরে উঠোনে এনে রাখে। যব দুমনের কম হবে না। ধনিয়া কিছু বলার

আগেই আবার ফিরে গিয়ে বড়ো এক টুকরি ভরে অড়র ডাল নিয়ে এসে বলে, "চলো আমি চুলো ধরিয়ে দিচ্ছি।"

ধনিয়া দেখে যবের ওপর একটা ছোট ডালায় চার-পাঁচ সের আটাও আছে। জীবনে প্রথমবার সে পরাস্ত হয়। চোখে প্রেম ও কৃতজ্ঞতার অশ্রু মুক্তোর মতো গাল বেয়ে নামে। বলে, "যা আছে সব নিয়ে এলি না ঘরে কিছু আছে? কোথাও পালিয়ে যাচ্ছি নাকি?"

উঠোনে বাচ্চাটা খাটুলিতে পড়ে পড়ে কাঁদছে। পুনিয়া তাকে কোলে তুলে দোলা দিতে দিতে বলে, "তোমার দয়ায় এখনো অনেক আছে দিদি। পনেরো মণ যব, দশ মণ গম, পাঁচ মণ মটর। তোমায় আর লুকোবো কি? দু বাড়ির কাজই চলবে। দু-তিন মাস পরে তো ভুট্টা উঠে যাবে। তারপর ভগমানের ইচ্ছে।"

ঝুনিয়া এসে ছোট শাশুড়ীর পায়ের ধুলো নেয়। পুনিয়া তাকে আশীর্বাদ করে। সোনা উনুন ধরায়, রূপা জল আনতে ছোটে। জীবনযাত্রার গতি এখন মন্থর হলেও মসৃন! পুনিয়া বলে, "মাহাতোর জরিমানা দেবার এত তাড়া কিসের বলো তো?"

"সমাজকে খুশি করবে কি করে?"

"দিদি কিছু যদি মনে না করো তো একটা কথা বলি।"

"বল্, মনে করবো কেন?"

"না বলবো না, তুমি রাগ করবে।"

"বল্চি কিছু বলবো না। বল্ না রে।"

"তোমার ঝুনিয়াকে ঘরে রাখা উচিত হয় নি।"

"তাহলে কি করতুম? ও ডুবে মরছিল যে।"

"আমার বাড়িতে রাখলেই পারতে। তাহলে কেউ কিছু বলতে পারতো না।"

"একথা আজ বলচিস। সেদিন পাঠালে ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসতিস।"

"এই খরচে গোবরের বেটাও হয়ে যেতো।"

"যা হবেই তাকে কে টালতে পারে রে পাগলী। এখনও তো শেষ হয় নি। ভোলা গরুর দাম চাইচে। তখন গরু দিয়ে বলেছিল আমার বে ঠিক করে দাও। এখন বলচে বে করবো না, আমার টাকা দাও। তার দু-দুটো জোয়ান ছেলে লাঠি হাতে চৌপ্পর ঘুরচে। আমাদের কে আছে যে লড়বে। ওই সর্বোনাশী গরু এসে সব চৌপাট করে দিলো।"

আরও দু-চারটে কথা বলে পুনিয়া আগুণ নিয়ে চলে গেলে হরি ভেতরে এসে বলে, "পুনিয়ার মনটি পোস্কার।" সে সবই দেখেছিল, শুনেছিল।

"হীরের মনটিও তো পোস্কার ছিল।" ধনিয়া যবের টুকরি নিতে বাধ্য হলেও লজ্জা ও অপমানে পুড়ে মরছিল। এত নীচু তাকে কখনো হতে হয়নি।

"তুই কারুর উপকার মানিস না। এই তোর দোষ।"

"উপকার মানবো কেন? আমার সোয়ামী ওর গেরস্তীর পেছনে জান দে

খাটে নি? আর আমি এমনি নিইচি নাকি? ওর সব জিনিষ দানাদানা গুণে ফেরৎ দোব।"

পুনিয়া বড়োজার মনোভাব বুঝতে পেরেও হরির ঋণ শোধ করে। যব ফুরিয়ে গেলে এক মণ দু-মণ করে দিয়ে যায়। কিন্তু শ্রাবণ মাসেও বর্ষা এলো না বলে সমস্যা জটিল হয়ে উঠলো। ঘূর্ণীঝড় বইছে, কুঁয়োয় জল নেই। আখ রোদের তাপে ঝলসে গেল। নদী থেকে একটু-আধটু জল পাওয়া যেত, সেখানেও বালি উঠছে। চারদিকে চুরি ডাকাতি আর হাহাকার। অবশেষে বর্ষা এলো ভাদ্র মাসে, তৃষ্ণার্ত পৃথিবী আর তৃষ্ণার্ত কৃষকেরা আত্মহারা হয়ে উঠলো। যেন জল নয় আশরফী বর্ষণ হচ্ছে। ক্ষেতের কাজ শুরু হয়েছে। যত পারো বীজ ছড়িয়ে নাও। বাচ্চারা ছুটে ছুটে জলে ডোবা পুকুরগুলো দেখে আসছে।

এখন যত জলই হোক না কেন আখ নষ্ট হয়ে গেছে। ভূট্টা, জোয়ার আর কোদো * থেকে কি খাজনা চুকবে? না মহাজনের পেট ভরবে? তবে গরীবরা প্রাণে বাঁচলো।

মাঘ মাস শেষ হয়ে এলো। ভোলা এখনও গরুর দাম পায় নি। একদিন রেগে-মেগে সে হরির বাড়িতে এসে ধমক দিয়ে বলল, "এই তোমার কথার দাম! এই মুখে তুমি না বলেছিলে আখ বেচে আমার টাকা শোধ করবে। এখন তো আখমাড়াই হয়ে গেচে। এবার টাকা দাও।"

হরি যখন দিনের সমস্ত বিপত্তির কথা শুনিয়ে সব রকম কাকুতি-মিনতি করে হার মানলো, তখন সে ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, "দ্যাখো, মাহাতো, এখন আমার কাছে টাকা নেই, কোথাও ধারও পাবো না। আমি কোত্থেকে দোব? খুদ-কুড়ো জোটাতেই প্রাণ বেরিয়ে গেল। বিশ্বাস না হয় ঘরে গিয়ে দ্যাখো গে। যদি কিছু পাও তাই তুলে নে যাও।"

ভোলা নির্মমভাবে বলে, "আমি তোমার ঘর তল্লাশী করতে যাবো কেন? তোমার কাছে টাকা আছে কি নেই আমি তার কি জানি? দরকারই বা কি? তুমি আখমাড়াই করে টাকা দেবে বলেছিলে। আখমাড়াই হয়ে গেছে। এখন আমার টাকা দাও।"

"তাহলে তুমিই বলো, কি করবো।"

"আমি কি বলবো?"

"আমি তোমার ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি।"

"আমি তোমার হেলে গরু দুটো খুলে নে যাবো।"

হরি তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, সে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর হতবুদ্ধি হয়ে মাথা নীচু করে। ভোলা কি তাকে পথের ভিখিরী করে তবে ছাড়বে? হেলে গরু দুটো যে তার দুটো হাতের

* কোদো=দরিদ্রের খাদ্য শস্য, এক প্রকারের আলু

সামিল। ক্ষীণ স্বরে বলে, "হেলে গরু দুটো নে গেলে যে আমার সর্বেনাশ হয়ে যাবে ভাই। যদি এই তোমার ধম্ম হয় তাহলে খুলে নে যাও।"

"তোমার ভালো মন্দে আমার কি? আমার টাকা চাই।"

"আমি যদি বলি আমি টাকা শোধ করে দিইচি।"

ভোলা দমে গেল। সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। হরি এতবড়ো বেইমানী করতে পারে? হতেই পারে না। উগ্র স্বরে বলে, "যদি তুমি গঙ্গাজল হাতে নে বলো তাহলে আমি মেনে নোব।"

"বলতে তো ইচ্ছে করচে। যে মরে সে কি না করে। কিন্তু থাক, বলবো না।"

"তুমি বলতেই পারবে না।"

"হ্যাঁ ভাই, আমি বলতেই পারি না। ঠাট্টা করছিলুম আর কি।" এক-মুহূর্ত দ্বিধা করে সে আবার বলে, "তুমি আমার সঙ্গে এমন করচো কেন ভোলা ভাই? আমি কি শত্তুর? ঝুনিয়া আমার ঘরে আসায় আমার কোন্ সগ্‌গো লাভহয়েছে বলো তো। ছেলেটা পালিয়ে গেল। দুশো টাকা জরিমানা দিতে হলো। আমার তো কিছুই নেই। আর তুমি আমার সঙ্গে এমন করছো? ভগমান জানেন, আমি কক্‌খনো জানতুম না ছোঁড়া কোথায় কি করে বেড়াচ্চে। ভাবতুম গান শুনতে যায়। জানলুম সেইদিন যেদিন ঝুনিয়া রাতদুপুরে বাড়িতে এসে ঢুকলো। তখন আমি ঘরে না নিলে কোতায় যেত বলো, কার কাচে থাকতো?"

ঝুনিয়া বারান্দায় দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। বাপকে সে এখন শত্রু মনে করে ভয় হয় হরি না বলদ দুটো দিয়ে দেয়। রূপাকে ডেকে বলে, "মাকে দৌড়ে ডেকে আন্‌তো, দৌড়ে যা। বল্‌বি 'দরকারী কাজ, শীগ্‌গীর এসো'।"

ধনিয়া মাঠে গোবর ফেলতে গিয়েছিল। খবর পেয়ে ফিরে এলো। বললে, "কেন ডেকেচিস বৌ, আমি তো ঘাবড়ে গিইছিলুম।"

"বাবা এসেচে, দেখেচো তো।"

"হুঁ দেখেচি, কসাইয়ের মতো দোর আগলে বসে আচে। আমি কথাও বলিনি।"

"বাবার কাচে আমাদের হেলে গরু দুটো চাইচে যে।"

ধনিয়ার হাত পা ভয়ে সিঁদিয়ে যায়, "হেলে গরু চাইচে?"

"হ্যাঁ বলচে হয় আমার টাকা দাও নয়তো হেলে গরু নে যাবো।"

"তোর শ্বশুর কি বললে?"

"বললেন তোমার ধম্ম বললে খুলে নে যাও।"

"খুলে নে যাও! নিয়ে এই দোরে এসে যদি ওকে ভিক্ষে করতে না হয় তো আমার নামে থুতু ফেলিস। আমাদের সর্বেনাশ করে যদি ওর পেরান জুড়োয় তো জুড়িয়ে নিক।" ক্রোধের বশে বাইরে এসে ধনিয়া হরিকে বলে, "মাহাতো হেলে গরু চাইচে। দে দাও। ওর পেট ভরুক। আমাদের ভগমান আচে।

হাতদুটো তো আর কেউ কেটে নিতে পারবে না। এ্যাদ্দিন নিজের জমিতে মজুরি করিচি, এখন পরের জমিতে মজুরি করবো। ভগমানের ইচ্ছে হলে আবার হেলে গরু জুটবে। আর মজুরি করলেই বা ক্ষেতি কি? বান-খরা-খাজনার বোজা তো থাকবে না। তখন তো আর জানতুম না ও আমাদের শত্তুর। তাহলে গরু নিতে যাবো কেন? অপয়া গরু যেদিন বাড়ি ঢুকলো সেদিন থেকে ঘরদোর তছনছ হয়ে গেল।"

ভোলা বুঝলো বলদ ছাড়া এদের আর কিছুই নেই। আর বলদ বাঁচাতে চাষা করতে পারে না এমন কাজ নেই। বলে, "তুমি যদি মনে করো, তুমি শান্তিতে ঘরে বসে থাকবে আর আমার মানইজ্জত সব যাবে তা হবে না। তুমি নিজের দুশো টাকার জন্যে কাঁদচো। আর আমার লাখ টাকার আবরু গেলো। তুমি যদি ঝুনিয়াকে বাড়ি থেকে দূর করে দাও তাহলে আমিও হেলে গরু চাইবো না। গরুর দামও না। ছুঁড়ি আমার নাক কেটেচে, আমিও ওকে দোরে দোরে ঠোকর খেতে দেখতে চাই। ও এখেনে রাণী সেজে বসে আচে আর আমরা মুখে চূণকালি মেখে কেঁদে মরচি। তা হবে না। ও আমার মেয়ে। পেলে পুষে বড়ো করেচি, কোলে করে খাইয়েচি। ভগমান সাক্ষী, ছেলেদের চেয়ে কম ভাবিনি। তবু আজ ওকে ভিক্ষে করতে দেখলে তবে ছাতি ঠান্ডা হবে। বাপ হয়ে আমি একথা বল্‌চি। তবেই বোঝো কতটা চোট লেগেচে। মুখপুড়ী সাতপুরুষের নাম ডোবালো আর তুমি তাকে ঘরে রেখেচো। একে 'ছাতী পর মুগ দল্‌না' * ছাড়া কী বলবো?"

ধনিয়া বলে, "তাহলে মাহাতো আমার কতাও শুনে রাখো। তুমি যা চাও তা হবে না। শতজন্মেও না। ঝুনিয়া আমাদের বুকের পাঁজর হয়ে গেচে। তুমি হেলে গরুদুটো নে যাবার কতাই তো বল্‌চো তাই নে যাও। এতে যদি তোমার কাটা নাক জোড়া লাগে তো জোড়োগে। চোদ্দপুরুষের আবরু রক্ষে হয় তো হোক। ঝুনিয়া মন্দ কাজ করেচে ঠিকই। আমিও পেরথম দিন ঝাঁটা মারতেই ছুটেছিলুম কিন্তু যখন কাঁদতে বসলো তখন মায়া পড়ে গেলো। কি বলবো মাহাতো, তুমি বুড়ো হয়েচো তবু বে-শাদীর নামে নেচে ওঠো আর ঝুনিয়া তো এখনো ছেলেমানুষ।"

ভোলা আবেদন করার ভঙ্গীতে হরিকে বলে, "শুনতে পাচ্চো হরি, এবার আমার দোষ নেই। আমি হেলে গরু না নে যাবো না।"

"নে যাও।"

"পরে কেঁদোনা।"

"কাঁদবো না।"

ভোলা যখন বলদের দড়ি খুলতে যাচ্ছে তখন ঝুনিয়া তার ছাপা শাড়িটা পরে ছেলে কোলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। কাঁপা গলায় বলে, "বাবা, আমি ঘর ছেড়ে চলে যাচ্চি। হলো তো। তোমার যা ইচ্ছে তাই হবে। আমি দোরে

* ছাতি পর মুগ দল্‌না=খারাপ ব্যবহার করা

দোরে ভিক্ষে মে'গে আমার আর আমার ছেলের পেট চালাবো, নয়তো ডুবে মরবো।"

ভোলা খি'চিয়ে ওঠে, "দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে ভগমান করুন আমাকে আর তোর মুখ না দেখতে হয়। কুলক্ষনা, কুলটা কোতাকার! তোর ডুবে মরাই উচিত।"

ঝুনিয়া তার বাপের দিকে তাকায়ও না। তুষের আগুনে তার অন্তর পুড়ছিল। ধরনী দ্বিধা হয়ে তাকে আশ্রয় দিতেন সে যেন নিজেকে ধন্য মনে করত। ঝুনিয়া দু চার পা যেতে না যেতেই ধনিয়া ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলে হিংস্র আনন্দে বলে, "তুই কোথায় যাচ্চিস বৌ, চল্ ঘরে চল্। এই তোর ঘর। আমরা বে'চে থাকলেও তোর আর মরে গেলেও তোর। নিজের মেয়ে যার শত্তুর ডুবে মরুক সে। এই ভালোমানুষের মুখে এ কথা বলতে লাজ লজ্জা হলো না একটুও। আমার ওপর তেজ দেখাচ্চে, নীচ কোতাকার। নে যা। হেলে-গরুর রক্ত খেয়ে..."

ঝুনিয়া কে'দে বলে, "মা, আমার নিজের বাপ যখন গালমন্দ করচে তখন আমাকে ডুবে মরতেই দাও। এই হতভাগীর জন্যেই তো তোমাদের যত দুঃখু। যবে থেকে এসিচি তোমার ঘর মাটির সঙ্গে মিশে যেতে বসেচে। তুমি আমাকে যত আদরযত্ন করেচো, আমার মাও তা করেনি। ভগমান করুন আসচে জন্মে যেন তোমার পেটে আমার জন্ম হয়।"

ধনিয়া তাকে নিজের দিকে টানতে টানতে বলে, "ও তোর বাপ নয়। তোর শত্তুর। খুনে। মা থাকলে আলবৎ তার দুঃখু হতো। বে করবেন। করগে যা আবার বে। বৌ এসে জুতো পেটা না করে তো বলিস।"

ঝুনিয়া শ্বাশুড়ীর সঙ্গে ঘরে চলে যায়। ভোলা বলদদুটো খুলে হাঁকাতে হাঁকাতে বাড়ির পথ ধরে, "অব করো খেতী আউর বাজাও বন্সী", * না হলে অপমান করা হচ্ছে, না জানি কবেকার শত্তুর, তা না হলে এমন মেয়েকে কেউ ঘরে রাখে। সবকটা বেহায়া, নিল্লজ্জ! ছোঁড়াটার বে হচ্ছিল না এইজন্যেই। আর রাঁঢ় ঝুনিয়ারই ঠ্যাঁটামী দ্যাখো না, আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। অন্য মেয়ে হলে মুখ দেখাতো না। আবার চোখের জল! সবাই বজ্জাত আর মুখ্যুও বটে। ভাবচে ঝুনিয়া আমাদের লোক হয়ে গেচে। আরে যে নিজের বাপের ঘরে রইল না সে কারুর ঘরে থাকে নাকি? সময় খারাপ তাই, নইলে ডাইনী ধনিয়ার ঝুঁটি ধরে বাজারের মধ্যে রগড়ে দিতুম। আমায় কত গাল দিল মাগী।' আবার বলদদুটোর দিকে তাকায়। কি রকম তাগড়া। ভালো জুড়ি। যেখানে ইচ্ছে একশো টাকায় বেচতে পারি। আশী টাকা নগদ আদায় হয়ে যাবে।

ভোলা গ্রামের বাইরে পা রেখেছে কি রাখেনি দেখে পেছন থেকে দাতাদীন, পটেশ্বরী, শোভা আর দশ বিশজন চাষা দৌড়ে আসছে। ভোলার রক্ত হিম হয়ে

* এবার খুব চাষ কর। আর বাঁশী বাজাও। অর্থাৎ "বুঝবে ঠ্যালা"

আসে। এবার ফৌজদারী। বলদও কেড়ে নেবে, দু ঘা পিঠেও পড়বে। সে কোমর বেঁধে দাঁড়ায়। মরতে হলে লড়েই মরবে।

দাতাদীন সামনে এসে বললেন, "এসব কি অনথ হচ্চে ভোলা? ওর হেলে গরু দুটো তুমি খুলে নে এলে। হরি কিছু বলে না বলেই তুমি বাঘ হয়ে উঠলে? সবাই নিজের নিজের কাজ করছিল বলে কেউ কিছু জানে না। না হলে হরি একটু ইশারা করলেই তোমার মাথার সব চুল ছিঁড়ে ফেলতো। ভালো চাও তো ফিরিয়ে দাও। একটু ভালোমানুষী নেই তোমার শরীরে।"

পটেশ্বরী বললেন, "এই হচ্চে হরির অতিরিক্ত ভালোমানষির ফল। তুমি ওর কাছ থেকে টাকা পাও তো দেওয়ানী মামলা করো, ডিগ্রী করাও। ওর গরু খুলে নে যাবার এক্তার নেই। এক্ষুনি ফৌজদারী ঠুকে দিলে তো বেঁধে নে যাবে।"

ভোলা দমে গিয়ে বলে, "লালাসাহেব, আমি কি জবরদস্তী নে যাচ্ছি? হরি নিজেই দিয়েচে।"

পটেশ্বরী শোভাকে বললেন, "তুমি হেলে গরু দুটোকে ফিরিয়ে দাও গে শোভা। চাষা নিজের হেলে গরু দে কি নিজের কাঁধে জোয়াল চাপাবে?"

ভোলা বলদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে, "আমার টাকা পাইয়ে দাও, হেলে গরু নে আমি কি করবো?"

"আমরা হেলে গরু নে যাচ্চি। তুমি টাকার জন্যে মামলা করো গে নয়তো মেরে পুঁতে দোব। টাকা কি তুমি নগদ দিয়েছিলে? একটা অপয়া গরু বেচারাকে গছিয়ে দিয়ে এখন তার হেলে নে যাচ্চো?"

ভোলা নড়ে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। পাটোয়ারীর সঙ্গে তর্ক করে সে কেমন করে জিতবে? দাতাদিন এক পা এগিয়ে এসে বললেন, "তোমরা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখচো কি? মেরে তাড়িয়ে দাও। আমাদের গাঁয়ের গরু নে যাবে কে?"

বংশী বলিষ্ঠ যুবক। সে ভোলাকে ধাক্কা মারে। ভোলা সামলাতে না পেরে পড়ে যায় বংশী আবার এক ঘুঁষি মারে। হরি দৌড়ে আসছিল। ভোলা তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে, "সত্যি কথা বলো হরি মাহাতো। আমি হেলে-গরু জোর করে খুলে এনেচি, বলো।"

দাতাদীন বললেন, "ও বলচে হরি নিজের ইচ্ছেয় হেলে গরু জোড়া দিয়েছে। বলে আমাদের "উল্লু" * বানাচ্চে।"

হরি সসংকোচে বলে, "ও আমাকে বলেছিল হয় ঝুনিয়াকে ঘর থেকে দূর করে দাও নয়তো আমি হেলে-গরু দুটো নে যাবো। আমি বললুম, ঘরের বৌকে আমি তাড়াতে পারবো না আমার হাতে টাকাও নেই। তোমার ধম্ম যা বলে তাই করো। ব্যস আমি ওর ধম্মের ওপর ছেড়ে দিতেই ও আমার হেলে গরু নে চলে এসেচে।"

* উল্লু=বোকা

পটেশ্বরী মুখ ভার করে বলে, "তুমি যখন ধম্মের ওপর ছেড়ে দিয়েচো তখন আর জবরদস্তী কিসের? ওর ধম্ম বলচে, ও তাই নে যাচ্চে। যাও ভাই, গরু তোমার।"

দাতাদীন বললেন, "হ্যাঁ যখন ধম্মের কথা এসে গেল তখন আর কি হবে।"

সবাই হরির দিকে ভর্ৎসনার চোখে তাকিয়ে পরাস্ত হয় আর বিজয়ী ভোলা মাথা উঁচু করে বলদ নিয়ে ঘরে ফেরে।

১৫

মালতী বাইরে প্রজাপতি, ভেতরে মৌমাছি। তাঁর জীবনে হাসি শুধুই হাসি নয়। তিনি হাসি তামাশায় মেতে থাকেন নিজের কর্তব্যভারকে হালকা করবার জন্যে। তাঁর বাবা নিজের মুখের জোরে লক্ষ টাকা উপার্জন করতে পারতেন। বড়ো বড়ো জমিদারদের সম্পত্তি বিক্রী, তাঁদের ধার পাইয়ে দেওয়া, তাঁদের মামলার তদ্বির করা, বড়ো বড়ো অফিসারদের সঙ্গে আপোষ করিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ। এককথায় তিনি ছিলেন দালাল। এই জাতীয় লোকেরা খুবই প্রতিভাবান হন। মিস্টার কাউল সেই ভাগ্যবানদেরই অন্যতম। তাঁর তিনটি মাত্র মেয়ে। ইচ্ছে ছিল তিনজনকেই ইংলণ্ডে পাঠিয়ে উচ্চশিক্ষা দেবেন। অন্যান্য ধনীদের মতো তিনিও ভাবতেন বিলেতে পড়ে মানুষ অন্য কিছু হয়ে যায় ; হয়তো ওখানকার জলবায়ুতেই বুদ্ধিকে শক্তিশালী করবার শক্তি আছে। যাইহোক তাঁর কামনা এক তৃতীয়াংশের বেশি পূর্ণ হয়নি।

মালতী যখন বিলেতে তখন তিনি প্যারালিসিসে অকর্মা হয়ে পড়েন। এখন কোনরকমে দুটি লোকের সাহায্যে উঠতে বসতে পারেন। কথা বন্ধ আর তাই আমদানীও বন্ধ। কিছু জমিয়েও রাখেননি। সে অভ্যেসও ছিল না। অনিয়মিত আয়ব্যয়ের ধাক্কায় তিনি নাজেহাল হয়ে পড়লেন। সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়লো মালতীর ওপর। চার-পাঁচশো টাকায় ভোগবিলাস আর ঠাটবাটের কি হবে! কোনরকমে মেয়েদুটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে ভদ্রভাবে জীবন কেটে যাচ্ছিল। মালতী সকাল থেকে একপ্রহর রাত পর্যন্ত ছুটোছুটি করেন। তিনি চান বাবা সাত্ত্বিকভাবে জীবন কাটান কিন্তু মিস্টার কাউল মদ-মাংস ছাড়তে পারেননি। কোথাও কিছু না পেলে, এক মহারাজকে বাড়ি বন্ধক দিয়ে হাজার দু-হাজার টাকা নিতেন। মহারাজ তাঁর সাহায্যে এক সময় লেনদেনের কারবারে লাখ লাখ টাকা পেয়েছেন। সেই কৃতজ্ঞতায় কিছু বলেন না। পঁচিশ হাজার টাকার দেনা, মহারাজ যখন খুশি নীলামে চড়াতে পারেন কিন্তু বন্ধুত্বের খাতিরে কিছু করেননি। স্বার্থপর মানুষের মধ্যে যে নির্লজ্জতা থাকে মিস্টার কাউলের মধ্যেও তা ছিল। মালতী অপব্যয় দেখে রাগঝাগ করতেন কিন্তু তার মা ছিলেন সাক্ষাৎ দেবীর মতোই পতিব্রতা সতী। তিনি স্বামীসেবাকেই নারীজীবনের প্রধান কর্তব্য মনে করতেন এবং মেয়েকে বোঝাতেন। গৃহযুদ্ধ হতে পেতো না।

সন্ধ্যেবেলা। হাওয়া এখনো গরম। আকাশে বিষণ্ণ ছায়া। মালতী আর

তাঁর দুই বোন বাংলোর সামনে ঘাসের ওপর বসে আছেন। জল না পড়ায় স্থানটি ঘাসহীন। মালতী প্রশ্ন করেন, "মালী কি জল দেয় না নাকি?"

মেজো বোন সরোজ বলে, "শুয়োরটা পড়ে পড়ে ঘুমোয়। যখনি বলো, বিশটা বাহানা খুঁজে বার করবে।" সরোজ বি. এ. পড়ে। লম্বা, একহারা, রুখোশুকো মেজাজের মেয়ে। কারুর কোন কথাই তার ভালো লাগে না। খুঁৎ-খুঁতে। ডাক্তাররা তাকে পাহাড়ী জায়গায় পাঠাতে বলেছিলেন কিন্তু বাড়ির এই অবস্থায় পাঠানো যায়নি।

সবার ছোট বরদা সরোজকে হিংসে করে কারণ বাড়ির সবাই সরোজকে যত্ন করে। যে অসুখে এত সুখ, সে অসুখ তার হয় না কেন? বরদা ফর্সা, অহংকারী, স্বাস্থ্যবতী, দুটি চপল হরিণচোখের অধিকারিণী। সরোজ ছাড়া আর সবার প্রতিই তার সহানুভূতি আছে। প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, "দিনভোর বাবা তাকে বাজার পাঠান, ফুরসৎ পায় কোথায় যে পড়ে পড়ে ঘুমোবে।"

সরোজ বকে ওঠে, "বাবা কখন ওকে বাজার পাঠান, মিথ্যুক!"

"রোজ পাঠায়, রোজ। এই তো আজও পাঠিয়েছিলেন। বলো তো ডেকে জিজ্ঞেস করি।"

"ডাক তবে।"

মালতী ভয় পেলেন। দুজনের ঝগড়া হলে বসে থাকাই মুস্কিল। কথা পাল্টে বলেন, "আচ্ছা হবে, যেতে দাও। আজ ডক্টর মেহতার তোমাদের ওখানে বক্তৃতা ছিল নাকি সরোজ?"

সরোজ নাক কুঁচকে বলে, "হ্যাঁ ছিল তো। কিন্তু কারুর ভালো লাগেনি। তিনি নিজেই ফরমান জারি করে বললেন, সংসারে নারীদের ক্ষেত্র পুরুষদের চেয়ে স্বতন্ত্র হবে। নারীদের পুরুষের ক্ষেত্রে আসা এ যুগের কলঙ্ক। সব মেয়ে হাততালি দিতে থাকলে বেচারা লজ্জা পেয়ে বসে পড়লেন। কেমন যেন আজব মানুষ! নিজের মনে বলে বসলেন প্রেম কেবল কবিদের কল্পনা। বাস্তব জীবনে এর কোন প্রমাণ নেই। লেডি হুক্কু তো তাঁকে নিয়ে খুব ঠাট্টা করেছেন।"

মালতী কটাক্ষ করলেন, "লেডি হুক্কু? এই বিষয় নিয়ে সেও কিছু বলবার সাহস রাখে? ডক্টর মেহতার বক্তৃতা তোমারও শোনা উচিত ছিল। উনি মেয়ে-দের কথা কি বললেন?"

"পুরো বক্তৃতা শোনবার সময় হলো কই? উনি তো কাটা ঘায়ে নুন ছিটোচ্ছিলেন।"

"তাহলে ওঁকে ডাকতে গেলে কেন? তাছাড়া মেয়েদের সঙ্গে তো ওঁর কোন শত্রুতা নেই। আমরা যা সত্যি মনে করি তাই তো বলি। মেয়েদের খুশি করবার জন্যে তাদের মনের মতো করে কথা বলার মতো মানুষ তিনি নন। কে বলতে পারে মেয়েরা এখন যে রাস্তায় চলেছে সেটাই ঠিক। শীগ্‌গিরই উই-মেন্‌স্ লীগের তরফ থেকে মিস্টার মেহতাকে বক্তৃতা দেবার জন্যে অনুরোধ করা হবে।"

সরোজ কৌতূহলী হয়ে বলে, "কিন্তু তুমিও তো বলতে নারী ও পুরুষের অধিকার সমান হওয়া উচিত।"

"এখনও বলছি কিন্তু বিপক্ষের লোকেরা কি বলে সেটাও তো শোনা উচিত। হয়তো আমাদেরই ভুল হচ্ছে।"

এই লীগ শহরের একটি নতুন সংস্থা আর সমস্ত শিক্ষিত মহিলা তাতে যোগদান করেন। মেহতার প্রথম বক্তৃতা মহিলাদের মধ্যে হৈচৈ বাঁধিয়ে দিয়েছিল। তাই লীগ স্থির করে উপযুক্ত উত্তর দিতে হবে। মালতীর ওপরেই ভার পড়লো। মালতী কয়েকদিন আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি খুঁজলেন, আরো কয়েকজন নিজের নিজের বক্তৃতা তৈরি করে ফেললেন। আর যেদিন সন্ধ্যায় মেহতা লীগের হল্-ঘরে এলেন সেদিন যেন হল্ ফেটে পড়ছিল। আজ মহিলারা সবাই সোনা আর সিল্কে নিজেদের ঢেকে ফেলেছেন। মেহতাকে হারাবার জন্যে আজ তাঁরা জমজমাট সাজসজ্জার বর্ম পরেছেন। আর মালতী তো আজকের জন্যেই একটা নতুন ফ্যাশানের শাড়ি বার করেছেন তার ওপর নতুন ডিজাইনের জাম্‌ফার। ফুল আর রঙ-টঙ মেখে তাঁকে দেখাচ্ছে বিয়ের কনের মতো। উইমেন্‌স্ লীগে এত সমারোহ আগে কখনও হয়নি। মেহতা একলা তবু মহিলাদের বুক কাঁপছিল। সত্যের একটি স্ফুলিঙ্গ মিথ্যের পাহাড়কে ধ্বসস্তূপে পরিণত করতে পারে। সবার পেছনে সোফায় মির্জা, খান্না আর ওঙ্কারনাথ বসে আছেন। বক্তৃতা শুরু হতেই রায়সাহেব তাঁদের পেছনে এসে দাঁড়ালেন। মির্জা বললেন, "আপনিও এখানে চলে আসুন। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন?"

"না ভাই, ওখানে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে।"

"তাহলে আমি দাঁড়াচ্ছি আপনি বসুন।"

রায়সাহেব তাঁর কাঁধ চেপে ধরে বললেন, "কোন অসুবিধে হচ্ছে না, বসুন। কষ্ট হলে বসবো। আচ্ছা মালতী সভানেত্রী হয়েছেন দেখছি। খান্নাজী কিছু বখ-শিশ্ দিন।"

খান্না কাঁদো কাঁদো মুখে বললেন, "এখন তো মিস্টার মেহতার ওপরেই নজর পড়েছে। আমি কোথায়?"

মিস্টার মেহতা বক্তৃতা শুরু করলেন, "সমবেত দেবীবৃন্দ, যখন আমি আপনাদের এই সম্বোধন করি তখন আপনাদের কোন খটকা লাগে না। আপনারা নিজেদের এই সম্মানের অধিকারী মনে করেন কিন্তু আপনারা কোন পুরুষের প্রতি দেবতা সম্বোধন করেন কি? আপনারা তাঁকে 'দেবতা' বললে তিনি ভাববেন আপনি তার ওপর দেবত্ব আরোপ করছেন? আপনাদের দয়া, শ্রদ্ধা, ও ত্যাগ আছে কিন্তু পুরুষের কাছে দেবার মতো কি আছে? সে দেবতা নয়, গ্রহীতা। সে অধিকারের জন্যে হিংসে করে, সংগ্রাম করে, কলহ করে..."

হাততালি পড়ে। রায়সাহেব বললেন,"মেয়েদের খুশি করবার এ এক আচ্ছা ঢঙ বার করেছে।"

ওঙ্কারনাথ বললেন, "কোন নতুন কথা নয়। আমি কতবার এসব কথা বলেছি।"

মেহতা বলছিলেন, "এই আমি যখন দেখি আমাদের উন্নত বিচার শক্তি-সম্পন্না দেবীরা সেই দয়া শ্রদ্ধা আর ত্যাগের জীবনে অসন্তুষ্ট হয়ে সংগ্রাম কলহ আর হিংসার জীবনের দিকে দৌড়ে যাচ্ছেন আর ভাবছেন এই হচ্ছে সুখের স্বর্গ তখন আমি তাঁদের ধন্যবাদ দিতে পারি না।"

মিসেস খান্না সগর্বে মালতীর দিকে তাকালেন। মালতীর মাথা হেঁট। মির্জা বললেন, "এবার কি দেখছেন? মেহতা মজার লোক। সত্যি কথা বলে তাও আবার মুখের ওপর।"

ওঙ্কারনাথ নাক সিঁটকোলেন, "এখন আর সেদিন নেই। ওঁদের অধিকার কেড়ে নিয়ে মুখে বলে যাও আপনি দেবী, লক্ষ্মী, জননী।"

মেহতা বলে যান, "নারীকে পুরুষের কাজ করতে দেখলে আমার কষ্ট হয়, যেমন হয় পুরুষকে নারীর কাজ করতে দেখলে। আমার মনে হয় এমন পুরুষকে আপনারা নিজের বিশ্বাস ও প্রেমের পাত্র মনে করেন না। আর বিশ্বাস করুন আমি বলছি এমন নারীও পুরুষের প্রেম ও শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে উঠতে পারে না।"

খান্নার মুখে খুশির হাসি ফোটে। রায়সাহেব মন্তব্য করেন, "আপনাকে যেন খুশি খুশি দেখছি মিস্টার খান্না?"

"মালতীর দেখা পেলে জিজ্ঞেস করবো 'এবার কেমন'?"

মেহতার বক্তৃতা এগোয়, "আমি প্রাণীদের বিকাশ বলতে নারীকে পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করি যেমন মনে করি হিংসা, কলহ ও সংগ্রামের চেয়ে প্রেম ত্যাগ ও শ্রদ্ধা অনেক বড়ো। যদি আমাদের দেবীরা সৃষ্টি আর পালনের দেবমন্দির থেকে হিংসা আর কলহের দানবক্ষেত্রে আসতে চান তাহলে সমাজের কল্যাণ হবে না। পুরুষ নিজের অভিমানে অহংকারে নিজের কীর্তিকে মহত্ব দেয়। সে নিজের ভাইয়ের রক্তপাত করে নিজেকে বিজয়ী ভাবে। যে শিশুদের মায়েরা আপন রক্তমাংস দিয়ে গড়ে তুলেছেন তাঁদের বোমা, মেশিনগান আর ট্যাঙ্কের শিকার বানিয়ে ছেলেরা বিজেতা সাজে। যখন আমাদের মা ছেলের কপালে কেসরের তিলক* পরিয়ে আশিসের কবচ মুড়ে তাকে হিংসাক্ষেত্রে পাঠান তখন তার হিংসাপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। আজ এই দানবভাব বৃদ্ধি পেয়ে সমস্ত সংসার ছেয়ে ফেলেছে, প্রাণীদের পিষে মারছে, শস্য শ্যামল ক্ষেতকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে, গুলজারবস্তীকে** শূন্য করে দিয়ে যাচ্ছে। দেবীবৃন্দ, আমি আপনাদের প্রশ্ন করি, আপনারা কি এই দানবলীলায় সহযোগিতা করে সংগ্রাম ক্ষেত্রে নেমে সংসারের অকল্যাণ করবেন? আমি আপনাদের কাছে মিনতি করছি, ধ্বংসকারী যা খুশি করুক, আপনারা নিজেদের ধর্ম পালন করুন।"

খান্না বললেন, "মালতীর মাথা যে উঠছেই না।"

* কেসরের তিলক=জাফরানের টিপ ** গুলজারবস্তি=জমজমাট বসতি

রায়সাহেব মেহতার কথা সমর্থন করে বলেন, "মেহতা ঠিকই বলেছেন।"

ওঙ্কারনাথ ক্রুদ্ধ হন, "কিন্তু কোন কথাই তো বলেন নি। নারী আন্দোলনের বিরোধীরা এইরকম উল্টোপাল্টা কথা বলছেন। আমি স্বীকারই করি না ত্যাগ আর প্রেমে সংসারের উন্নতি হয়। আসল উন্নতি হয় বল, বীর্য, বুদ্ধি ও পরাক্রমের সাহায্যে।"

মির্জা বললেন, "আচ্ছা, শুনতে দেবেন তো, না নিজেই কথা বলবেন?"

মেহতার বক্তৃতা, "দেবীবৃন্দ, যাঁরা বলেন নারী ও পুরুষের শক্তি ও প্রবৃত্তি সমান এবং এর মধ্যে কোন ভেদ নেই আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। এর চেয়ে ভয়ংকর মিথ্যা আমি কল্পনা করতে পারি না? এই অসত্য যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও অনুভবকে ঢাকা দিতে চায় ঠিক যেমন করে এক টুকরো কালো মেঘ সূর্যকে ঢেকে ফেলে। আপনারা এই ফাঁদে পড়বেন না। আলো যেমন অন্ধকারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, নারীও তেমনি পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মানুষের কাছে ক্ষমা ত্যাগ আর অহিংসা জীবনের উচ্চতম আদর্শ। নারী এই আদর্শ আগেই পেয়ে গেছে। পুরুষ ধর্ম, অধ্যাত্ম আর ঋষিদের সাহায্যে সেই লক্ষ্যে পেঁাছোবার জন্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী সাধনা করে চলেছে কিন্তু সমান হতে পারে নি। তার সমস্ত সাধনা ও যোগ একদিকে আর নারীর ত্যাগ আরেক দিকে।"

হাত তালি পড়ে। হল কেঁপে ওঠে। রায়সাহেব গদগদ হয়ে বলেন, "মেহতার মনে যা আসে তাই বলেন।"

ওঙ্কারনাথ ঠোকেন, "কিন্তু সব কথাই পুরনো। একবারে বস্তা পচা ছেঁদো কথা।"

"পুরনো কথাও আন্তরিক বিশ্বাস দিয়ে বললে নতুন হয়ে ওঠে।"

"যে এক হাজার টাকা মাইনে মেরে মজায় থাকে তার মধ্যে আর যাই থাকুক আত্মশক্তি নামক বস্তুটি থাকে না। এতো কেবল পুরনো কথা বলে মেয়ে-পুরুষকে খুশি করার একটা ঢঙ।"

খান্না মালতীকে দেখে বললেন, "ও আবার খুশিতে ফুলে উঠছে কেন? ওর তো লজ্জা পাওয়াই উচিত।"

মির্জা খান্নাকে তাতান, "এবার আপনিও একটা কিছু করুন মিস্টার খান্না। নয়তো মেহতা বাজীমাৎ করে দেবেন। আধখানা তো মেরে দিয়েছেন।"

খান্না চটে উঠলেন, "আমায় বলবেন না। আমি কত পাখিকে ফাঁসিয়ে ছেড়ে দিয়েছি।"

রায়সাহেব মির্জার দিকে চোখ টিপে বললেন, "আজকাল আপনি মহিলা সমাজের দিকে খুব ঘোরাঘুরি করছেন। সত্যি বলুন তো, কত চাঁদা দিয়েছেন?"

খান্না লজ্জিত হন, "যারা শিল্পকলার নাম করে দুরাচার ছড়ায় তাদের আমি চাঁদা দিই না।"

মেহতা বলে চলেছেন, "পুরুষ বলে, যত দার্শনিক আর বৈজ্ঞানিক আবি-

ষ্কারক আছেন তাঁরা সবাই পুরুষ। বড়ো বড়ো মহাত্মারাও সবাই পুরুষ। সব যোদ্ধা, রাজনৈতিক নেতা, বড়ো বড়ো নাবিক সবাই পুরুষ। কিন্তু এঁরা কি করলেন? বড়ো বড়ো রক্তনদী বহানো ছাড়া মহাত্মা আর ধর্মাত্মারা কি করেছেন? যোদ্ধারা ভাইয়ের গলা কাটা ছাড়া আর কোন মহৎ কীর্তি রেখে গেছেন? রাজনীতিজ্ঞের উদাহরণ তো শুধু লুপ্ত সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপে আবদ্ধ। আর আবিষ্কারকেরা মানুষকে যন্ত্রের দাস করে তুলেছেন। সমস্যার সমাধান হলো কই? পুরুষের রচা দুনিয়ায় শান্তি কোথায়? সহযোগ কোথায়?

ওঙ্কারনাথ চলে যাবার জন্যে উঠে পড়েন, "বিলাসী আয়েসীদের মুখে বড়ো বড়ো কথা শুনলে আমার গা জ্বলে যায়।"

মির্জা তাঁকে টেনে বসান, "ওঃ সম্পাদকজী আপনিও যেমন। আরে এই দুনিয়ায় যার যা মনে আসে বকে যায়। কিছু লোক শোনে কিছু হাত তালি দেয়। ব্যস, গল্প খতম। এমন অগুন্‌তি মেহতা আসবেন যাবেন, দুনিয়া নিজের রাস্তাতেই চলবে বেগড়াবার কথা ওঠে কেন?"

"মিথ্যে কথা শুনলে আমার গা জ্বলে যায়।"

রায়সাহেব ইন্ধন জোগান, "কুলটার মুখে সতীলক্ষ্মীর কথা শুনলে কার না গা জ্বলে।"

ওঙ্কারনাথ আবার বসে পড়েন।

মেহতা বলছেন, "আমি জিজ্ঞেস করি বাজপাখিকে শিকার করতে দেখে হাঁস যদি মানসরোবরের শান্ত শোভা ছেড়ে পাখি শিকার করতে আসে তা কি ভালো দেখাবে? না আপনি তার প্রশংসা করবেন? বাজপাখির মতো শক্ত ঠোঁট, শক্ত নখ, তীক্ষ্ন চোখ রক্তপিপাসা হাঁসের নেই। এই অস্ত্র সংগ্রহ করতে হাঁসের শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যাবে তবুও সে বাজপাখি হতে পারবে কি না সন্দেহ। কিন্তু বাজপাখি হতে পারুক আর না পারুক সেই জলে ডুব দিয়ে মুক্ত তোলা হাঁসটি আর থাকবে না।

মির্জা টিপ্পনী কাটেন, "এ তো শায়েরের যুক্তি। মাদী বাজও মদ্দা বাজের মতো শিকার করতে পারে।"

ওঙ্কারনাথ প্রসন্ন হলেন, "ওর ওপর আপনি ফিলসফার হতে চান? এই যুক্তি তর্কের জোরে..."

খান্না মনের ঝাল ঝাড়েন, "ফিলসফার না হাতি। ফিলসফার তো সেই যে..."

ওঙ্কারনাথ পুরণ করে বলেন, "যে সত্য থেকে বিচ্যুত হয় না।"

খান্নার একথা পছন্দ হয় না। বলেন, "আমি সত্য-টত্য জানি না। আমি তো ফিলসফার তাকেই বলি যে সত্যিই ফিলসফার।"

মির্জা ব্যঙ্গ করে বলে ওঠেন, "ফিলসফারকে আপনি তারিফ করলেন বটে। বাহ্‌ শোভন্‌আল্লাহ্‌! ফিলসফার হচ্ছে সে, যে হচ্ছে ফিলসফার। তাই না?"

মেহতার বক্তৃতা, "নারীর বিদ্যার প্রয়োজন নেই তা নয়। নিশ্চয় আছে

এবং পুরুষের চেয়ে বেশি প্রয়োজন। শক্তির ক্ষেত্রেও সেই কথা খাটে। কিন্তু যে বিদ্যা আর শক্তির সাহায্যে পুরুষ সংসারকে হিংসার ক্ষেত্র বানিয়ে তুলেছে সেই বিদ্যা আর শক্তি নয়। আপনারাও তা গ্রহণ করলে সংসার মরুভূমি হয়ে যাবে। আপনাদের শিক্ষা ও অধিকার হিংসার বিধ্বংসীলীলায় নেই, আছে সৃষ্টির পালনী শক্তির মধ্যে। আপনারা কি মনে করেন ভোট দিয়ে মানবজাতি উদ্ধার হয়ে যাবে কিংবা অফিসে আদালতে মুখের জোরে বা কলম চালিয়ে? এই অনুকরণ অপ্রাকৃতিক, ক্ষতিকর। ক্ষমতার লোভে আপনারা সেই অধিকার ছেড়ে দিতে চান, প্রকৃতি যা আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছে?"

সরোজ এতক্ষণ দিদির সম্মানের জন্যে মুখ বন্ধ করে বসেছিল আর পারলো না। বলল, "আমরা ভোট চাই, পুরুষের সমান সমান।" আরো কয়েকটি মেয়েও হাঁক দেয়, "ভোট! ভোট!"

ওঙ্কারনাথ দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, "নারী প্রগতি বিরোধীরা নিপাত যাক।"

মালতী টেবিল চাপড়ে বললেন, "শান্ত হোন। পক্ষে বিপক্ষে যাঁরা যা বলতে চাইবেন তাঁদের সময় দেওয়া হবে।"

মেহতা বলেন, "ভোট নবযুগের এক মায়াজাল, মরীচিকা, কলঙ্ক, ধোঁকা। তার ফাঁদে পড়ে আপনারা কোনদিকেই যেতে পারবেন না। কে বলতে পারে যে আপনাদের ক্ষেত্র সংকুচিত আর সেখানে আপনাদের বিকাশের অবকাশ নেই। আমরা প্রথমে সবাই মানুষ, তারপরে আর কিছু। আমাদের গৃহই আমাদের জীবন। সেখানে জীবনের সব ঘটনা ঘটে। যদি সেই ক্ষেত্র পরিমিত হয় তাহলে প্রসারিত ক্ষেত্র কোথায়? যেখানে মানুষ তৈরি হয় সেই কারখানা ছেড়ে আপনারা যেতে চান যুদ্ধ সংঘর্ষ আর সংগ্রামের ক্ষেত্রে?"

মির্জা টিপ্পনী কাটেন, "পুরুষের জুলুমই তো তাদের মধ্যে এই বিদ্রোহের স্পিরিট তৈরি করেছে।"

মেহতা বললেন, "নিশ্চয়ই, পুরুষ অন্যায় করেছে কিন্তু এই তার জবাব নয়। অন্যায়কে বিনাশ করুন, নিজেদের শেষ করে নয়।"

মালতী বললেন, "নারীরা অধিকার চান যাতে তাঁরা অধিকারের সদুপযোগ করতে পারেন আর সুযোগসন্ধানীকে বাধা দিতে পারেন।"

"সংসারে সবচেয়ে বড়ো অধিকার সেবা আর ত্যাগের দ্বারাই অর্জন করা সম্ভব আর সে অধিকার আপনারা পেয়েছেন। ওই অধিকারের সামনে ভোট কিছুই না। আমার দুঃখ এই যে, আমাদের বোনেরা পশ্চিমের সেই আদর্শ নিচ্ছেন, নারীরা নিজেদের পদ হারিয়ে, গৃহিনী পদ হারিয়ে, গৃহিনীর পরিবর্তে বিলাসের বস্তু হয়ে উঠেছেন। পশ্চিমী নারী স্বেচ্ছানির্ভর হতে চায় যাতে সে বিলাসের স্রোতে ভেসে যেতে পারে, আমাদের মায়েদের আদর্শে বিলাস নেই। তাঁরা সেবার অধিকারে সবসময় ঘরের কাজ করেন। পশ্চিমের যা ভালো, তা গ্রহণ করুন। সংস্কৃতির সবসময় আদান-প্রদান হয়, কিন্তু অন্ধ অনুকরণ তো মানসিক দুর্বলতার লক্ষণ। পশ্চিমী নারীকে ভোগের উদগ্র লালসা উচ্ছৃংখল করে তুলেছে। সে নিজের লজ্জা আর গৌরবকে চপল

আমোদ-প্রমোদের কাছে বলি দিয়েছে। নারীর এর চেয়ে অধঃপতন আর কী হতে পারে?"

রায়সাহেব হাততালি দিলেন। সমস্ত হল পট্‌কা ফাটার মতো হাত-তালির চটপটিতে ফেটে পড়লো।

মির্জা সম্পাদককে বলেন, "জবাব বোধহয় আপনার কাছেও নেই।"

ওঙ্কারনাথ বিরক্ত হয়ে বললেন, "সারা ব্যাখ্যানের মধ্যে উনি এই একটিমাত্র সত্যি কথা বলেছেন।"

"তাহলে আপনিও মেহতার শিষ্য হলেন?"

"আজ্ঞে না, আমাদের মতো লোক কারুর শিষ্য হয় না।। আমি এর জবাব খুঁজে বার করবো। 'বিজলী'তে দেখবেন।"

"তার মানে আপনি হককথার তল্লাস করবেন না, সেরেফ নিজের পক্ষের জন্যে লড়তে চাইছেন।"

রায়সাহেব বললেন, "এরই ওপর আপনার সত্য নিষ্ঠার অহংকার দাঁড়িয়ে আছে?"

ওঙ্কারনাথ অবিচলভাবে বললেন, "উকিলের কাজ নিজের মামলা জেতানো, সত্যি-মিথ্যে স্থির করা নয়।"

"আপনি তাহলে মহিলাদের উকিল?"

"যারা দুর্বল, অসহায়, নিপীড়িত—আমি তাদেরই উকিল।"

"বড্ড বেহায়া আপনি।"

মেহতা বলছিলেন, "আর এ হলো পুরুষের ষড়যন্ত্র। দেবীত্বের উঁচু শিখর থেকে তাঁদের টেনে নিজের সমান করার জন্যেই ওই পুরুষেরা, যাঁরা কাপুরুষ, যাঁদের বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব বইবার ক্ষমতা নেই তারাই অপরের ভরাভর্তি সবুজ ক্ষেত তছনছ করে নিজেদের কুৎসিত লালসাকে তৃপ্ত করতে চায়। পশ্চিমে এই ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে আর দেবীরাও প্রজাপতিতে পরিণত হয়েছে। আমার বলতে লজ্জা করছে যে এই ত্যাগ ও তপস্যার লীলাক্ষেত্র ভারতবর্ষেও এই হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বিশেষ করে আমাদের শিক্ষিতা বোনেরা এই জাদুর মোহিনী প্রভাবে গৃহিনীর আদর্শ ভুলে প্রজাপতির রঙ্গরসকে শ্রেয় মনে করতে শুরু করেছেন।"

সরোজ উত্তেজিত হয়ে বলে, "আমরা পুরুষের পরামর্শ চাই না। যদি তাঁরা নিজেদের স্বতন্ত্র মনে করেন তবে মেয়েরাও নিজেদের কথা নিজেরা ভাববে। আজকের মেয়েরা বিয়েকে পেশায় পরিণত করতে চায় না তারা শুধু প্রেমের ভিত্তিতেই বিয়ে করতে চায়।"

খুব হাততালি পড়ে। বিশেষতঃ প্রথম সারি থেকে, সেখানে শুধু মেয়েরাই ছিল।

মেহতা জবাব দিলেন, "যাকে তুমি প্রেম মনে করছো, তা হচ্ছে ফাঁকি, উদ্দিপ্ত লালসার বিকৃত রূপ। ঠিক যেমন ভিক্ষে মাঁগার সংস্কৃত রূপকে বলা হয় সন্ন্যাস। প্রেম যদি বিবাহিত জীবনে কম থাকে তো মুক্ত বিলাসে কিছু

নেই। সত্যিকারের আনন্দ, প্রকৃত শান্তি কেবল সেবাব্রতেই আছে। সেবাই হচ্ছে শক্তির আধার। সেবার সিমেন্টই দাম্পত্যজীবনকে স্নেহ আর সাহচর্য দিয়ে জুড়ে রাখে। যেখানে প্রেম নেই সেখানেই বিবাহ বিচ্ছেদ, পরিত্যাগ আর অবিশ্বাস বড়ো হয়ে ওঠে। তোমরাই পুরুষের জীবন তরনীর কাণ্ডারী। তাই দায়িত্বও বেশি। তোমরাই ইচ্ছে করলে ঝড়-তুফানের মধ্যেও নৌকাকে পারে পৌঁছে দিতে পারো। আর তোমাদের অসাবধানতায় নৌকো ডুবে যাবে, সাথে সাথে তোমরাও ডুববে।"

বক্তৃতা শেষ হলো। বিষয়টি জটিল এবং বিতর্কের বলে কয়েকজন মহিলা যথোপযুক্ত জবাব দেবার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে বলে মালতী মেহতাকে ধন্যবাদ দিয়ে সভাভঙ্গ করেন। সেইসঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হলো আগামী রবিবার এই বিষয় নিয়ে কয়েকজন মহিলা আলোচনা করবেন।

রায়সাহেব মেহতাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, "আপনি একেবারে মনের কথা বলেছেন মেহতাজী। আমি আপনার প্রতিটি কথাকে সমর্থন করি।"

মালতী হেসে বললেন, "আপনি তো ধন্যবাদ দেবেনই। চোরে চোরে মাসতুত ভাই যে! কিন্তু এই সমস্ত উপদেশ অবলাদের ওপরেই চাপানো হলো কেন? তাদের মাথাতেই কি আদর্শ, মর্যাদা, ত্যাগ সব কিছু দায়িত্ব চাপাতে হবে?"

মেহতা বললেন, "কারণ তারাই এ কথা বোঝে।"

খান্না মালতীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ডক্টর মেহতার কথা তো আমার কয়েকশো বছরের পুরোনো বোধ হলো।"

মালতী কটু কণ্ঠে বলেন, "কোন্ কথা?"

"এই সেবা কর্তব্য ইত্যাদি।"

"এসব কথা যদি আপনার বিচারে একশো বছরের পুরনো হয় তাহলে আপনি নতুন কিছু বলুন। দাম্পত্যজীবনে সুখী হবার নতুন ফরমুলা আপনার কাছে আছে নাকি"

খান্না চটে ওঠেন। কথাটা বলেছিলেন মালতীকে খুশি করার জন্যেই। ব্যঙ্গ করে বললেন, "এই ফরমুলা তো ডক্টর মেহতারই জানা থাকবে।"

"উনি তো বলেই দিয়েছেন আর আপনার মতে সেকথা বস্তাপচা পুরনো। তাহলে নতুন কথা আপনারই বলা উচিত। আপনি জানেন না দুনিয়াতে এমন অনেক কথা আছে যা কখনো পুরনো হয় না। সমাজে এ রকম সমস্যা চির-কালই আছে আর থাকবে।"

মিসেস খান্না বারান্দায় চলে গিয়েছিলেন। মেহতা তাঁর কাছে গিয়ে নমস্কার করে বললেন, "আমার বক্তৃতা সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?"

মিসেস খান্না চোখ নামিয়ে বললেন, "ভালো, খুব ভালো। কিন্তু এখনো আপনি অবিবাহিত, তাই আপনার কাছে নারীরা দেবী, শ্রেষ্ঠ আর কাণ্ডারী। বিয়ে করুন তারপর জিজ্ঞেস করবো মেয়েদের কি মনে হচ্ছে। আর বিয়ে তো

আপনাকে করতেই হবে কারণ যারা বিয়ের ঝামেলা এড়ায় তাদের আপনি কাপুরুষ বলেছেন।"

"তাই তো জমি তৈরি করছি।"

"মালতীর সঙ্গে আপনার জুড়ি ভালোই মানাবে।"

"শর্ত এই যে কিছুদিন তাকে আপনার পায়ের কাছে বসে নারীধর্ম শিখতে হবে।"

"সেই স্বার্থপর পুরুষের কথা। আপনি পুরুষের কর্তব্য শিখেছেন?"

"তাই তো ভাবছি, কার কাছে শিখবো।"

"মিস্টার খান্না আপনাকে খুব ভালো করে শেখাতে পারেন।"

মেহতা হো হো করে হেসে ওঠেন, "না, আমি পুরুষের কর্তব্যও আপনার কাছেই শিখবো।"

"ভালো কথা, আমার কাছেই শিখুন। প্রথম কথা এই যে, একথা ভুলে যান নারী শ্রেষ্ঠ আর তার ওপরই সমস্ত দায়দায়িত্ব রয়েছে। আসলে পুরুষই শ্রেষ্ঠ আর তার ওপরই ঘর-সংসারের সব ভার আছে। নারীর মধ্যে সেবা সংযম কর্তব্য সব কিছু সেই জাগাতে পারে। যদি তার মধ্যে এসব জিনিষের অভাব থাকে তবে নারীর মধ্যেও সে অভাব থাকবে। নারী যে আজ বিদ্রোহিনী তার প্রধান কারণ পুরুষ এসব গুণ হারিয়ে ফেলেছে।"

মির্জা এসে মেহতাকে একেবারে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, "মুবারক।" *

মেহতা প্রশ্নভরা চোখে চেয়ে বললেন, "আমার বক্তৃতা আপনার ভালো লেগেছে?"

"আপনার বক্তৃতা যেমনই হোক না কেন, খুব কাজের হয়েছে। আপনি তো কাজ হাসিল করে ফেলেছেন। আপনার ভাগ্য ভালো। উনিও এতক্ষণে আপনার কলমা ** পড়ছেন।"

মিসেস খান্না চাপা স্বরে বলেন, "যখন নেশা কেটে যাবে তখন বলবেন।"

মেহতা ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, "আমার মতো বইয়ের পোকাকে কোন মহিলা কি পছন্দ করে দেবীজী! আমি তো পাক্কা আদর্শবাদী।"

মিসেস খান্না স্বামীকে গাড়ির দিকে এগোতে দেখে সেদিকে চলে গেলেন। মির্জাও বেরিয়ে গেলে মেহতা নিজের ছড়িটি নিয়ে এগোতেই মালতী এসে তাঁর হাত ধরে ফেলে বলেন, "আপনি এখন যেতে পাবেন না। চলুন, বাবার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব। ওখানেই রাতের খাওয়া সারবেন।"

মেহতা নিজের কানে হাত রেখে বললেন, "না, আমাকে মাফ করুন। ওখানে সরোজ আমার প্রাণ বার করে দেবে। আমি এই মেয়েদের খুব ভয় পাই।"

"না, না আমি সে ভার নিচ্ছি। সে মুখ খুলবে না।"

* মুবারক=ধন্যবাদ ** কলমা=মুসলমান ধর্মে দীক্ষা দেওয়া

"আচ্ছা, আপনি যান। আমি পরে যাচ্ছি।"

"না তা হবে না। আমার গাড়ি সরোজকে নিয়ে চলে গেছে। আপনি আমাকে পৌঁছে দিন।"

দুজনে মেহতার গাড়িতে ওঠে। একটু পরে মেহতা বলেন, "আমি শুনেছি খান্নাজী নিজের স্ত্রীকে মারধোর করেন। তখন থেকে ওঁকে দেখলেই আমার ঘৃণা হয়। যে এত নির্দয় সে আবার নারীজাতির মস্ত হিতৈষী সাজতে এসেছে। আপনি ওঁকে কখনো বোঝান নি?"

"সব সময় দু হাতে তালি বাজে সে কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন?"

"স্বামী স্ত্রীকে কোন কারণে মারতে পারে একথা ভাবতেই পারি না।"

"স্ত্রী যতই কটুভাষিনী হোক?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি নতুন ধরণের মানুষ।"

"তাহলে স্বামী যদি বদ হয় তাকেও হান্টার পেটা উচিত। এই তো?"

"স্ত্রী যতটা সহ্য করতে পারে পুরুষ ততটা পারে না। এতো আপনারই কথা।"

"এই তাহলে মেয়েদের ক্ষমা ও ধৈর্যের পুরস্কার? আমার মনে হয় আপনি খান্নার সঙ্গে মেলামেশা করে ওকে আরোই উস্কে দিচ্ছেন। আপনাকে ও যে রকম খাতির যত্ন করে তাতে মনে হয় আপনি খুব সহজেই ওকে সিধে করতে পারেন। কিন্তু আপনি তার সাফাই গেয়ে নিজেই তার অপরাধের শরীক হয়ে উঠছেন।"

"আপনি বৃথাই এ প্রসঙ্গকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। আমি কারুর কোন ক্ষতি করতে চাই না। আপনি এখনও কামিনীকে* চিনতে পারেন নি। ওর শান্ত-শিষ্ট রূপ দেখে ধরে নিয়েছেন সে দেবী, কিন্তু আমি তাকে এত উঁচু স্থান দিতে রাজী নই। সে আমার পেছনে লেগে বদনাম রটাবার যত চেষ্টা করেছে সে সব বললে আপনার বিরক্তি আসবে। বুঝতে পারবেন তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত।"

"আপনার প্রতি তাঁর এত বিদ্বেষেরও নিশ্চয় কারণ আছে।"

"কারণ ওকে জিজ্ঞেস করুন গে। আমি কারুর মনের কথা জানি না।"

"ওঁকে জিজ্ঞেস না করেও অনুমান করা যায়। সেটা হলো এই যে যদি কোন পুরুষ কিংবা নারী আমার আর আমার স্ত্রীর মাঝখানে আসার সাহস করে তো আমি বা আমার স্ত্রী তাকে মেরে উড়িয়ে দেব তা না পারলে মনে মনে পিষে মারবো। আমি কোন মেয়েকে আমাদের মধ্যে আনলে আমার স্ত্রীও যা খুশি তাই করতে পারে। হতে পারে আমার মত অবৈজ্ঞানিক। এই মনোবৃত্তি

* কামিনী=যদিও বইয়ে এখান থেকে মিসেস খান্নার নাম গোবিন্দী বলা হয়েছে কিন্তু আমরা একটি নামকেই গ্রহণ করেছি এবং কামিনী নামেই গোবিন্দীকে ডেকেছি।

আমার বনচর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছি। আধুনিক লোকেরা হয়তো একে অসামাজিক ব্যবহারও বলবেন কিন্তু এ আমার নিজস্ব ব্যাপার।"

"কিন্তু আপনি কেমন করে ধরে নিলেন আমি খান্না আর কামিনীর মাঝ-খানে আসতে চাইছি। একথা বলে আপনি আমার অপমান করছেন। আমি খান্নাকে আমার জুতোর শুকতলাও মনে করি না।"

"এ আপনার মনের কথা নয় মালতী। আপনি কি সারা দুনিয়াকে বোকা মনে করেন? একথা সবাই বোঝে, মিসেস খান্নাও বোঝেন তাই তাঁকে দোষ দিতে পারি না।"

মালতী জ্বলে ওঠেন, "দুনিয়ার সবাই অপরের বদনাম করে মজা লোটে। এই তাদের স্বভাব। এ একেবারে ডাহা মিথ্যে। তবে হ্যাঁ আমি এত অভদ্র নই যে খান্নাকে আসতে দেখলেই দূর দূর করবো। আমার কাজই এমন যে সবাইকেই আদর আপ্যায়ন করতে হয়। যদি কেউ এর অন্য কোন অর্থ খুঁজতে চায় সে...সে... "মালতীর গলা ধরে আসে। তিনি মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছে বললেন, "অন্যদের সঙ্গে তুমিও আমাকে...আমাকে...এই দুঃখ দেবে... আমি ভাবতেও পারিনি।" তারপরই তিনি নিজের অধিকার সম্বন্ধে তীক্ষ্ন সচেতন হয়ে বলেন, "আমার জন্যে আপনার আক্ষেপ করবার কোন দরকার নেই। যারা কোন মেয়েকে পুরুষের সঙ্গে দেখলেই আঙুল দেখিয়ে হাসে আপনি তাদের একজন হয়ে খুশি মনে ঐ আচরণই করুন। আমার কিছু এসে যাবে না। যদি কোন মেয়ে আপনাকে দেবতা ভেবে আপনার পায়ে বারবার এসে পড়ে তবে আমি নিশ্চিত বলতে পারি আপনিও তাকে উপেক্ষা করতে পারবেন না। পারলে আপনি মানুষ নন। উপেক্ষা দূরে থাক আপনি সেই মেয়ের পা ধোয়া জল খাবেন আর দুদিন যেতে না যেতেই সে আপনার হৃদয়েশ্বরী হয়ে উঠবে। আমি হাতজোড় করছি খান্নার নাম আমার সামনে করবেন না।"

মেহতা এই বহ্নিদাহে হাত সেঁকতে সেঁকতে বললেন, "শর্ত এই যে, আমি যেন খান্নার সঙ্গে আপনাকে আর না দেখি।"

"আমি তা পারবো না। সে এলে তাকে দূর দূর করবো কি করে?"

"তাকে বলবেন নিজের স্ত্রীকে নিয়ে ভদ্রভাবে আসতে।"

"আমি কারুর ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলাই না। উচিতও নয়। আমার সে অধিকারও নেই।"

"তাহলে আপনিও কারুর মুখ বন্ধ করতে পারবেন না।"

মালতীর বাংলো এসে গিয়েছিল। তিনি নেমে মেহতাকে কোন সম্ভাষণ না করেই চলে গেলেন। মেহতাকে যে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছেন সে কথাও ভুলে গেলেন। এখন নির্জনে গিয়ে খুব খানিকটা কাঁদা প্রয়োজন। কামিনী আগেও তাঁকে আঘাত করছেন কিন্তু আজকের আঘাত বড়ো গভীর বড়ো তীব্র বড়ো মর্মভেদী।

রায়সাহেব খবর পেলেন তাঁর জমিদারীতে একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেছে এবং হরির কাছ থেকে গ্রামের পঞ্চায়েত জরিমানা উসুল করে নিয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ নোখেরামকে ডেকে কৈফিয়ৎ চাইলেন—কেন তাঁকে এত্তেলা দেওয়া হয়নি। তাঁর দরবারে এইসব নেমকহারাম দাগাবাজ লোকের জায়গা হবে না।

নোখেরাম অনেক বকুনি খেয়ে ঈষৎ গরম হয়ে বলেন, "আমি একলা ছিলুম নাকি? গাঁয়ের আরো পাঁচজনও তো ছিল। আমি কি করবো।"

"বাজে বোকো না। তোমার সেই সময়ই বলা উচিত ছিল যে যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারকে এত্তেলা দেওয়া না হয় আমি পঞ্চায়েতের জরিমানা উসুল করতে দোব না। আমার আর আমার প্রজার মধ্যে পঞ্চায়েতের নাক গলাবার কি আছে? এই দণ্ড জরিমানা ছাড়া জমিদারীতে আর কোন্ আমদানী আছে। উসুলী সরকারের ঘরে গেল বকেয়া প্রজারা চেপে রাখলো। তবে আমি কোথায় যাবো? কি খাবো, তোমার মাথা? সারা বছরের এই লাখ টাকার খরচ আসবে কোত্থেকে শুনি? দুঃখের বিষয় এই যে, দু পুরুষ ধরে গোমস্তাগিরি করার পরেও আজ তোমাকে এ কথা বলে দিতে হচ্ছে। হরির কাছ থেকে কত টাকা উসুল করেছো?"

নোখেরাম ছটফটিয়ে বলেন, "আশী টাকা।"

"নগদ?"

"নগদ সে কোত্থেকে পাবে হুজুর। কিছু শস্য দিয়েচে আর বাকী নিজের ঘর বাঁধা দিয়ে পেয়েচে।"

রায়সাহেব নিজের স্বার্থ ছেড়ে হরির পক্ষ নিলেন, "আচ্ছা, তাহলে তুমি আর বকধার্মিক পঞ্চায়েৎ মিলে আমার এক মাতব্বর প্রজাকে পথে বসিয়েছ। আমার জমিদারীতে আমাকে এত্তেলা না দিয়ে আমার প্রজার কছ থেকে জরিমানা নেবার অধিকার তোমাদের কে দিল? এই নিয়েই আমি তোমাকে ঐ জালিয়াৎ পাটোয়ারী আর বজ্জাত পণ্ডিতটার সঙ্গে সাত বছর জেলে পাঠাতে পারি তা জানো। তুমি ভেবেছো, তুমিই ও এলাকার সর্বেসর্বা। আজ সন্ধ্যের মধ্যে জরিমানার পুরো টাকা আমার কাছে পেঁৗছোনো চাই-ই চাই না হলে সবাইকে আমি চাকি পিষিয়ে ছাড়বো। যাও, হরি আর হরির ছেলেকেও আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।"

নোখেরাম মৃদুস্বরে বললেন, "তার ছেলে তো গাঁ ছেড়ে আগেই পালিয়েচে।"

"মিছে কথা বোলো না। মিথ্যে কথা শুনলে আমার গা জ্বলে যায়। আমি আজ পর্যন্ত শুনিনি যে কোন জোয়ান ছোঁড়া কাউকে ভাগিয়ে এনে নিজের ঘরে রেখে পালিয়ে যায়। যদি তার পালাবার মতলবই থাকবে তাহলে সে মেয়েটাকে আনবে কেন? এখানেও তোমাদের হাত আছে। তুমি এক গল্প

গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে নিজের সাফাই গাইলেও আমি বিশ্বাস করবো না। সমাজের মানইজ্জত রাখতে তোমরা ওকে ধমকেছো নিশ্চয়। বেচারা না পালিয়ে করবে কী।"

নোখেরাম এ কথার প্রতিবাদ করতে পারেন না। সবই সত্যি কথা। প্রতিবাদ করে বলতেও সাহস হয় না যে, 'আপনি নিজে গিয়ে সত্যিমিথ্যে যাচাই করে নিন' বড়ো মানুষের ক্রোধ পুরোপুরি আত্মসমর্পণ চায়। নিজের বিরুদ্ধে একটি শব্দও শুনতে চায় না।

পঞ্চায়েৎ রায়সাহেবের রায় শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসলো। শস্য এখনও যেমন কে তেমন পড়ে আছে কিন্তু টাকা কবে অদৃশ্য হয়ে গেছে। হরির বাড়ি বন্ধক আছে বটে তবে গ্রামে ওই কুঁড়ের কি দাম আছে। হিন্দু নারী যেমন স্বামীর গৃহে থাকলে ঘরের গিন্নী হয়, স্বামী ত্যাগ করলে কোথাও ঠাই পায় না তেমনি এই ঘরও হরির কাছে লাখটাকার সম্পত্তি হলেও আসলে তার কোন দাম নেই। রায়সাহেবও টাকা না নিয়ে ছাড়বেন না। হরিই কেঁদেকেটে বলে এসেছে বোধহয়। পটেশ্বরীর ভয় বেশি, তার চাকরী না যায়। চারজনই ভাবে আর ঝগড়া করে।

পটেশ্বরী বলে, "আমি মানা করেছিলুম যে হরির মামলায় আমাদের চুপচাপ থাকাই ভালো। গরুর ব্যাপারে সবাইকে জরিমানা দিতে হলো, এবার চাকরীও যাবে। তোমরা টাকার লোভে পড়ে রইলে। বিশ টাকা করে বার করো এখন। রায়সাহেব 'রিপোর্ট' করলে তো কোমরে দড়ি পড়বে।"

দাতাদীন বললেন, "আমার কাছে বিশ টাকা দূরে থাক বিশটা পয়সাও নেই। বামুনদের ভোজ দিতে হয়েচে, হোম হয়েচে। এতে খরচ নেই, রায়-সাহেব পারবেন আমাকে জেলে পাঠাতে। ব্রহ্মশাপে ঘর-দোর ধ্বংশ করে দোব। এখনও ওঁর ওপর কোন বামুনের অভিশাপ পড়েনি।"

ঝিঙুরী সিংও এই ধরণের কিছু কথা বলে। সে রায়সাহেবের চাকর নয়। তারা হরিকে মারে নি, ধরে নি, জোরজবরদস্তী করে নি। হরি যখন প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছে তার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এজন্যে কেউ দোষী করতে পারে না। তবে নোখেরাম এত সহজে ছাড়া পাবেন না। এখানে সুখে রাজত্ব করতেন। বেতন দশ টাকার বেশি নয় কিন্তু মাসে আমদানী হাজার টাকা। শতখানেক লোক তাঁর হুকুম শোনে। চার চারটে পেয়াদা সর্বদা হাজির, বেগাররা সব কাজ করে দেয়। দারোগা পর্যন্ত বসতে চেয়ার দেয় এত সুখ আর কোথায় পাবেন? আর পটেশ্বরী তো চাকরীর জোরেই মহাজন সেজে বসে আছে। দু-তিন দিন ভেবে তারা একটা উপায় বের করে। কাছারীতে কখনো সখনো দৈনিক 'বিজলী' দেখেছে তারা। তার সম্পাদকের দপ্তরে যদি একটা নামহীন চিঠি পাঠিয়ে জমিদারের জরিমানা আদায়ের কথা জানাতে পারলে বাঁচবার একটা উপায় মিলতে পারে। নোখেরামও একমত হয়ে দুজনে মিলে কোন রকমে একটা চিঠি 'বিজলী' অফিসে পাঠিয়ে দেয়।

সম্পাদক ওঙ্কারনাথ তো এসব চিঠির দিকেই থাকেন। চিঠি পেয়েই

তৎক্ষণাৎ রায়সাহেবকে জানালেন। তিনি এমন এক খবর পেয়েছিলেন, যা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে না করলেও সংবাদদাতার অকাট্য প্রমাণ দেখে অবিশ্বাস করাও শক্ত। সত্যিই কি রায়সাহেব এক প্রজার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করেছেন? সম্পাদকের কর্তব্য এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে সত্য প্রকাশ করা। রায়সাহেবের কোন বক্তব্য থাকলে তাও তিনি প্রকাশ করবেন। ওঙ্কারনাথ মন থেকে চান সংবাদটা মিথ্যে হোক কিন্তু কিছু সত্য থাকলে তা তিনি প্রকাশ করতে বাধ্য। বন্ধুত্ব তাঁকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারবে না।

রায়সাহেব এই খবর পেয়ে কপাল চাপড়াতে লাগলেন। প্রথমেই মনে হলো ওঙ্কারনাথকে গুণে গুণে পঞ্চাশ ঘা হান্টার মেরে বলেন যেখানে ঐ চিঠি ছাপবে সেখানে এই খবরও ছেপে দিও। কিন্তু পরিণামের কথা চিন্তা করে মনকে শান্ত করে দেখা করতে চলে গেলেন। দেরি করলে যদি ওঙ্কারনাথ খবরটা ছেপে দেয় তাহলে তো সর্বনাশ।

ওঙ্কারনাথ বেড়িয়ে ফিরে চিঠিখানা নিয়ে সম্পাদকীয় কলম লেখার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু মনটা এখনও উত্তপ্ত পাখির মতো চঞ্চল। তাঁর স্ত্রী রাত্রে তাঁকে এমন কিছু কথা বলেছিলেন যা এখনো কাঁটার মতো বিঁধে আছে। তাঁকে কেউ গরীব কিংবা হতভাগা বা বোকা বুদ্ধু বললে তিনি কিছুই মনে করতেন না কিন্তু তাঁর পৌরুষ নেই একথা শুনে অবধি অসহ্য মনে হচ্ছে। তাও কিনা আবার নিজের স্ত্রীর মুখে শুনতে হলো। তাঁরই বা একথা বলার অধিকার কোথায়? বরং কেউ এ জাতীয় আক্ষেপ করলে সেই বক্তার মুখ বন্ধ করে দিতে পারে। একথা ঠিক যে তিনি এমন কোন খবর ছাপেন না বা মন্তব্য করেন না যা তাঁর বিপদের কারণ হতে পারে। তাঁকে মেপে-মেপে পা ফেলতে হয়। এছাড়া তিনি আর কীই-বা করতে পারেন। কিন্তু তিনি কোন সাপের গর্তে হাত ঢোকান না। যাতে তাঁর স্ত্রীকে কোন কষ্টে না পড়তে হয়। আর সেই সহিষ্ণুতার এই পুরস্কার! অন্ধ নাকি? তাঁর কাছে টাকা নেই, বেনারসী শাড়ি কিনে দেবেন কি করে? ডাক্তার শেঠ, প্রফেসার ভাটিয়া আরো কার কার স্ত্রী বেনারসী পরে। তা তিনি কি করবেন? তাঁর স্ত্রী ঐ শাড়িধারিনীদের সামনে নিজের খদ্দরের শাড়ি দেখিয়ে লজ্জা দিতে পারেন না? তাঁর স্ত্রীর তাঁর মতো আত্মাভিমান নেই কেন? পরের ঠাটবাট দেখে কেন যে বিচলিত হন কে জানে? তাঁর বোঝা উচিত তিনি একজন দেশভক্তের স্ত্রী। দেশভক্তের কাছে নিজের ভক্তি ছাড়া আর কী আছে। ঐটাকেই আজকের লেখার প্রধান বিষয় বানাবার কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর মন রায়সাহেবের ব্যাপারে এসে পেঁীছোলো। রায়সাহেব কি উত্তর পাঠান দেখতে হবে। যদি তিনি নিজের সাফাই ভালোভাবে দিতে পারেন তাহলে ঠিক আছে কিন্তু যদি ভেবে থাকেন যে ওঙ্কারনাথ ভয় এবং ভদ্রতার খাতিরে নিজের কর্তব্যচ্যুত হবে তাহলে তিনি ভুল করেছেন। সুযোগ পেলে তিনি এই নিয়ম কানুনের ডাকাতদের হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিতে পারেন। রায়সাহেব প্রভাবশালী ব্যক্তি, কাউন্সিলের মেম্বার, নিজের গুন্ডা দিয়ে রাস্তায় পেটাতেও পারেন। কিন্তু ওঙ্কারনাথ ভয় পান না

যতক্ষণ ধড়ে প্রাণ আছে, তিনি আততায়ীদের খবর নেবেন। হঠাৎ বাইরে মোটরের শব্দ শুনে তিনি চমকে উঠে লেখায় মনোনিবেশ করলেন। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন স্বয়ং রায়সাহেব। ওঙ্কারনাথ তাঁর স্বাগতও করলেন না, কুশল প্রশ্নও করলেন না, চেয়ারও দিলেন না। শুধু বললেন, "আপনি আমার চিরকুট পেয়েছিলেন? আমি ঐ চিঠি লিখতে বাধ্য না হলেও আমার কর্তব্য সবটা খতিয়ে দেখা, ভদ্রতার কাছে কিছু না কিছু নতিস্বীকার করতেই হয়। ওই খবরটা কি সত্যি?"

রায়সাহেব অস্বীকার করলেন না। যদিও তিনি জরিমানার টাকা পাননি এবং পেলেও অস্বীকার করতে পারতেন তবু দেখতে চাইলেন ওঙ্কারনাথ কি বলেন?

"তবে তো আমার পক্ষে ঐ খবর ছাপা ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই। আপনি আমার পরম হিতৈষী বন্ধু কিন্তু কর্তব্যের চেয়ে বড়ো কিছু নেই। সম্পাদক নিজের কর্তব্য সম্পাদন করতে না পারলে তো তার এই আসনে বসবার কোন হক নেই।"

রায়সাহেব পানের খিলি মুখে পুরে বললেন, "কিন্তু এতে আপনার ভালো হবে না। আমার যা কিছু হবার সে পরে হবে, আপনি তৎক্ষণাৎ সাজা পাবেন। আপনি বন্ধুত্বের পরোয়া না করলে আমিও করবো না।"

ওঙ্কারনাথ শহীদের মতো বললেন, "এ ভয় আমার কোনদিনই হয়নি। যে দিন আমি কাগজ সম্পাদনার ভার নিয়েছি সেদিন থেকেই প্রাণের মোহ ত্যাগ করেছি। আর আমার কাছে এক সম্পাদকের সবচেয়ে গৌরবময় মৃত্যু হলো ন্যায় ও সত্য রক্ষা করে আত্মদান করা।"

"ভালো কথা। আমি আপনার অভিযোগ স্বীকার করছি। আমি এতদিন আপনাকে বন্ধু বলেই মনে করতাম কিন্তু আপনি যখন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত তখন যুদ্ধই হোক। আমি আপনার কাগজকে পাঁচগুণ চাঁদা দিই কেন? শুধু তাকে আমার গোলাম বানিয়ে রাখার জন্যে। আমায় ভগবান ধনী করেছেন। পঁচাত্তর টাকা দিই শুধু আপনার মুখ বন্ধ করার জন্যে। যখন আপনি অভাবের কাঁদুনী কাঁদেন তখন আমিই আপনাকে কিছু না কিছু দিয়ে সাহায্য করি। কেন? দেওয়ালী, দশহারা, হোলীতে আপনার বাড়িতে মিঠাই পাঠানো হয় আর আপনাকে পঁচিশবার নিমন্ত্রণ করি। কেন বলতে পারেন? আপনি ঘুষ নিয়ে কর্তব্যপালন করতে পারেন না। দুটো একসঙ্গে হয় না।"

ওঙ্কারনাথ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আমি কখনো ঘুষ নিই নি।"

রায়সাহেব ব্যঙ্গ করে বললেন, "এই আচরণ যদি ঘুষ না হয় তাহলে ঘুষ নেওয়া কাকে বলে বুঝিয়ে দিন। আপনি কি মনে করেন আপনি ছাড়া আর সবাই গাধা, যে নিঃস্বার্থভাবে আপনার লোকসান পুষিয়ে যাবে। বার করুন আপনার হিসেবের খাতা, বলুন আজ পর্যন্ত আমার জমিদারী থেকে কত পেয়েছেন। আমার বিশ্বাস, হাজার টাকার মতন হবে। আপনি যদি 'স্বদেশী স্বদেশী' বলে চেঁচিয়ে বিলিতি ওষুধ আর জিনিষের বিজ্ঞাপন ছাপতে লজ্জা

না পান তাহলে আমিও আমার প্রজাদের কাছ থেকে জরিমানা নিতে লজ্জা পাবো কেন? একথা ভাববেন না যে আপনিই শুধু চাষাদের হিত করবার ধুয়ো তুলেছেন। আমাকে চাষাদের সঙ্গে জ্বলে পুড়ে মরতে হয়। আমার চেয়ে বড়ো হিতৈষী তাদের কেউ নেই। কিন্তু আমার চলবে কি করে? অফিসার-দের নিমন্ত্রণ করবো, সরকারী চাঁদা দেব, শতখানেক লোকের চাহিদা মেটাবো, কি করে? আমার কি টাকার গাছ আছে? আসবে তো প্রজার ঘর থেকেই। আপনি ভাবেন জমিদার আর তালুকদার সারা সংসারের সুখ ভোগ করে। তাদের আসল অবস্থার কথা আপনি জানেন না। ধর্মাত্মা বনলে তার বেঁচে থাকাই মুস্কিল। গরীবের গলা টিপে বড়োলোকরা সুখ পায় না কিন্তু মান-মর্যাদার কথা তো ভাবতেই হয়। আপনি যেমন আমার বড়োমানুষীর সুযোগ নিতে চান তেমনি সকলেই আমাকে সোনার মুরগী ঠাউরে বসে আছে। কেউ কাশ্মীর থেকে শাল-দোশালা নিয়ে আসে, কেউ আতর-তামাকের এজেন্ট, কেউ বই-পত্র, কেউ গ্রামাফোন, কেউ জীবন বীমা কিংবা আরো কিছু নিয়ে হাজির হয়। চাঁদাওয়ালা তো অগুন্তি। সবার সামনে কি দুঃখের পাঁচালী গাইবো। এরা দুঃখের কথা শুনতে আসে না, আসে আমাকে 'উল্লু' বানিয়ে কিছু হাতিয়ে নিতে। সরকারী অফিসারদের ভেট না চড়ালে আসামী হয়ে যাবো। তখন আপনি লিখে রক্ষা করবেন? কংগ্রেসী করার জরিমানা আজো দিয়ে যাচ্ছি। কালো খাতায় নাম উঠে গেল। কত ধার মাথার ওপর তা জানেন? সব মহা-জন ডিক্রী জারি করলে হাতের আংটিটি পর্যন্ত বিকিয়ে যাবে যে! বলবেন তবু বাবুয়ানী করি কেন? সাত পুরুষ ধরে যে পরিবেশে মানুষ হয়েছি সে অভ্যাস বদলানো অসম্ভব। আমি ঘাস ছিলতে পারবো না। আপনার জমি-জায়দাদ নেই আপনি নির্ভীক হতে পারেন কিন্তু আপনিও লেজ গুটিয়ে বসে আছেন। আপনি খবর রাখেন আদালতে কত মামলা চলছে, কত গরীব খুন হচ্ছে, কত সতী নারী ভ্রষ্টা হচ্ছেন। সাহস আছে লেখার। খবর আমি দিচ্ছি, প্রমাণ শুদ্ধু।"

ওঙ্কারনাথ নরম হয়ে বলেন, "যখনই সময় এসেছে আমি পেছু হটিনি।"

রায়সাহেবও নরম হয়ে বললেন, "হ্যাঁ আমি স্বীকার করি দু একটা ক্ষেত্রে আপনি সাহস দেখিয়েছেন কিন্তু আপনার চোখ সবসময় নিজের লাভের দিকেই থাকে পরের হিতের দিকে নয়। রাগ করবেন না, যখনই আপনি মাঠে এসেছেন তার ফল এই হয়েছে যে, আপনার সম্মান, প্রভাব ও আমদানীর ক্রমোন্নতি। যদি আপনি আমার সঙ্গেও এই চাল চালেন তাহলে আপনার খাতির করতে রাজী আছি। টাকা দেব না। কেন না সেটা ঘুষ। আপনার স্ত্রীর জন্যে কোনো গয়না গড়িয়ে দেব। রাজী? আমি আপনাকে সত্যি বলছি, আপনি যে খবর পেয়েছেন তা ভুল। তবে আমিও অন্যান্য জমিদারদের মতো জরিমানা নিই বছরে এই বাবদ পাঁচ দশ হাজার টাকা আসে। আপনি যদি আমার মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিতে চান তাহলে ঠকবেন। আপনিও সংসারে সুখে থাকতে চান, আমিও চাই। ন্যায় আর কর্তব্যের ঢং করে আমাকে এবং নিজেকে জের-

বার করে লাভ কী? মনের কথা খুলে বলুন। আমি আপনার শত্রু নই। কতবার একটেবিলে বসে খানা খেয়েছি। আমি জানি আপনি কত অসুবিধের মধ্যে আছেন। আপনার অবস্থা বোধহয় আমার চেয়েও খারাপ। তবে হ্যাঁ আপনি যদি হরিশ্চন্দ্র হবার কসম খেয়ে থাকেন তো সে আপনার খুশি। আমি চললাম।"

রায়সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। ওঙ্কারনাথ তাঁর হাত ধরে সন্ধির সুরে বললেন, "না-না এখন আপনাকে বসতে হবে। আমি আপনার পোজিশন পরিষ্কার করে দিতে চাই। আপনি আমার জন্যে যা করেছেন সেজন্যে আমি ঋণী। কিন্তু এখানে আদর্শের কথা উঠেছিল। আপনি জানেন, আদর্শ প্রাণের চেয়েও প্রিয় হয়।"

রায়সাহেব চেয়ারে বসে মিষ্টি সুরে বলেন, "আচ্ছা ভাই, যা ইচ্ছে লিখুন। আমি আপনার আদর্শ নষ্ট করতে চাই না। একটু না হয় বদনাম হবে। কত আর নামের পেছনে দৌড়োবো। কে এমন তালুকদার আছে যে প্রজাদের একটু আধটু জ্বালায় না। আরে 'কুত্তা হাড্ডি কী রখওয়ালী' * হলে খাবে কী? আমি শুধু বলতে চাই যে, পরে আপনি এরকম খবর আর পাবেন না। আমার ওপর একটুও বিশ্বাস থাকলে আমায় ক্ষমা করুন। কোন অন্য সম্পাদককে আমি এরকম খোশামোদ করতাম না, তাকে খোলা বাজারে পেটাতাম কিন্তু আপনি আমার বন্ধু তাই নীচু হচ্ছি। এখন খবরের কাগজের যুগ। সরকারও তাদের ভয় পায়। তখন আমি কে? আপনার যা খুশি করুন। কেমন চলছে কাগজ? গ্রাহক-টাহক বাড়লো?"

ওঙ্কারনাথ অনিচ্ছার সুরে বললেন, "কোন বকমে চলে যাচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি এর চেয়ে বেশি আশাও করি না। কোনরকম ভোগের লালসা আমার নেই তাই এ নিয়ে কোন অভিযোগও করি না। আমি জনতার সেবা করতে এসেছি, করেও যাচ্ছি। রাষ্ট্রের কল্যাণই আমার কামনা, একটা মানুষের সুখদুঃখ আমার কাছে মূল্যহীন।"

রায়সাহেব আরো সহৃদয়তার সুরে বলেন, "সবই ঠিক ভাই কিন্তু সেবা করার জন্যেও বেঁচে থাকতে হয়। অর্থচিন্তা আপনাকে একাগ্র চিত্তে সেবা করতে দেবে না। গ্রাহক সংখ্যা কি বাড়ছে না?"

"আসল কথা হচ্ছে আমি পত্রিকার মান নামাতে রাজী নই। আজ যদি আমি ফিল্ম স্টারদের ছবি আর জীবনী ছাপি তাহলে কাগজের গ্রাহক বাড়তে পারে কিন্তু সে আমার নীতি নয়। এরকম আরো কত কী আছে।"

"তাই তো আপনি এত সম্মান পেয়েছেন। আমি বলি কি, আমার তরফ থেকে একশো জনকে গ্রাহক করে নিন, টাকা আমি দিয়ে দেব।"

ওঙ্কারনাথ কৃতজ্ঞ হয়ে মাথা নীচু করে বলেন, "অনেক ধন্যবাদ। দুঃখ

* কুত্তা হাড্ডি কী রখওয়ালী=কুকুরের কাজ হাড় খাওয়া, সেই হাড়ের পাহারাদার হলে এই মন্তব্য করা হয়।

এই যে কাগজের জন্যে কেউ ভাবে না। জনসাধারণ উদাসীন। স্কুল-কলেজ-মন্দিরের জন্যে অর্থের অভাব হয় না কিন্তু খবরের কাগজ প্রচারের জন্যে দাতা পাওয়া যাবে না। অথচ জনশিক্ষার ব্যাপারে খবরের কাগজ যত কম খরচে কাজ করতে পারে আর কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়। কাগজওয়ালারা যদি নানা সংস্থার সাহায্য পেতো তাহলে বেচারাদের বিজ্ঞাপনের জন্যে ছুটে বেড়াতে হতো না। আমি আপনার অনেক অনুগ্রহ পেয়েছি।"

রায়সাহেব বিদায় নিলেন। ওঙ্কারনাথের মুখে প্রসন্নতার লেশমাত্র ছিল না। রায়সাহেব কোন রকম শর্ত আরোপ করেননি। কোন বন্ধনও না। কিন্তু ওঙ্কারনাথ আজ এত তীব্র ভর্ৎসনা সহ্য করেও এই দান অস্বীকার করতে পারলেন না। প্রেসের কর্মচারীদের তিনমাসের বেতন বাকী। কাগজওয়ালা এক হাজার টাকা পায়। তাঁকে কারুর কাছে হাত পাততে হলো না। এই বা কম কী?

তাঁর স্ত্রী গোমতী এসে বিদ্রোহের সুরে বললেন, "এখনও খাবার সময় হয়নি নাকি? না কোন নিয়ম আছে যে যতক্ষণ না একটা বাজবে ততক্ষণ জায়গা ছেড়ে উঠবে না? আর কতক্ষণ উনুনপাড়ে বসে থাকবো?"

ওঙ্কারনাথ করুণ নেত্রে স্ত্রীর দিকে তাকাতে গোমতীর রাগ জল হয়ে গেল। তিনি স্বামীর অসুবিধের কথা বোঝেন। অন্যান্য মেয়েদের মতো শাড়ি-গয়না দেখে কখনো কখনো তাঁর চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হলে তিনি স্বামীকে দু চার কথা শুনিয়ে দিতেন বটে তবে বাস্তবে তিনি স্বামীর ওপর রাগ করতেন না। তাঁর রাগ হতো নিজের দুর্ভাগ্যের ওপর তারই একটু আধটু আঁচ এসে ওঙ্কার-নাথের গায়ে লাগতো। তিনি স্বামীকে একটু ছিটগ্রস্ত ভাবতেন। তাঁর উদাস মুখ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "অমন করে বসে আছো কেন? পেটের গোলমাল হচ্ছে নাকি?"

ওঙ্কারনাথকে হাসতে হলো, "কে উদাস হয়ে বসে আছে? আমি? আমার তো আজ যত আনন্দ হয়েছে, বিয়ের দিনও তত হয়নি। কোন ভাগ্যবানের মুখ দেখেছিলাম বোধহয়। আজ পনেরো শো বউনী হয়েছে।"

গোমতীর বিশ্বাস হলো না। বললেন, "মিথ্যেবাদী! তুমি পনেরো শো কোত্থেকে পাবে? পনেরো টাকা বলো তো বিশ্বাস করতে পারি।"

"না-না, তোমার মাথার দিব্যি পনেরো শো পেয়েছি। এখনি রায়সাহেব এসেছিলেন। নিজের তরফ থেকে একশো গ্রাহকের চাঁদা দেবার কথা দিয়ে গেছেন।"

গোমতীর চেহারা বদলে গেল, "তাহলে পেয়ে গেছ?"

"না, রায়সাহেব পাকা কথার লোক।"

"আমি কোন তালুকদারকে পাকা কথা বলতে দেখিনি। আমার বাবা এক তালুকদারের কাছে চাকরি করতেন। বছরের পর বছর মাইনে পেতেন না। তাকে ছেড়ে অন্য এক জায়গায় চাকরি নিলেন সেখানেও একটা পাই আদায়

করতে পারলেন না। বাবা রেগে উঠলে সে মেরে তাড়িয়ে দিল। এদের কথার কোন দাম নেই।"

"আমি আজই বিল পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"পাঠাও। বলে দেবে, কাল আসবেন। কাল নিজের জমিদারী দেখতে চলে যাবে। তিন মাস পরে ফিরবে।"

ওঙ্কারনাথ দোটানায় পড়লেন। সত্যিই তো রায়সাহেব যদি পেছন থেকে সরে পড়েন তাহলে তিনি কীই বা করতে পারেন। মন শক্ত করে বললেন, "হতেই পারে না। রায়সাহেব ধোঁকাবাজ নন। ওঁর কাছে আমার কোন পাওনা বাকী নেই।"

গোমতী তাঁর দিকে সন্দিগ্ধ ভাবে চেয়ে বললেন, "এই জন্যে তো আমি তোমাকে বুদ্ধু বলি। কেউ একটু সহানুভূতি দেখালেই তুমি একেবারে ফুলে ওঠো। শাঁসালো বড়লোক। এদের পেটে এরকম কত প্রতিজ্ঞা হজম হয়ে যায়। সব কথা রাখতে হলে তো ওদের ভিক্ষে করে খেতে হতো, আমাদের গ্রামের ঠাকুরসাহেব তো দু তিন বছর ধরে বেনের হিসেব চুকোতেন না, চাকরদের মাইনে দিতেন না, চাইতে গেলে মেরে তাড়িয়ে দিতেন। কয়েকবার তো এইরকম 'দেব-দেব' করায় স্কুল থেকে ছেলেদের নাম কাটা গেল। একবার তো রেলের টিকিটও ধারে কিনতে চেয়েছিলেন। এই রায়সাহেবও তো ওঁরই মতো। চলো খেয়ে নাও আর চাকি পেষো, যা তোমার ভাগ্যে লেখা আছে। এই বড়োলোকরা তোমাকে কিছু না দেয় সে বরং ভালো। কারণ এরা তোমাকে এক পয়সা দিলে তার চার গুণ নিজের গরীব প্রজাদের কাছ থেকে উসুল করে নেবে। এখন তাদের বিষয়ে যা চাও তাই লেখো, নাহলে মোসাহেবী করতে হবে।"

ওঙ্কারনাথ খেতে বসেন কিন্তু খাবারের গ্রাস গলা দিয়ে নামে না। শেষে মনের বোঝা হাল্কা না করে পারলেন না। বললেন, "যদি টাকা না দেয় তাহলে এমন খবর জোগাড় করবো যে মনে রাখতে হবে। ওঁর টিকি আমার হাতে বাঁধা। গ্রামের লোক মিথ্যে খবর দেয় না। সত্যি খবর দিতেই তাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয় মিথ্যে খবর দেবে কী? রায়সাহেবের একটা এমন খবর আমার কাছে এসেছে যা ছেপে দিলে বাছাধনের ঘর থেকে বেরোনো মুস্কিল হয়ে যাবে। আমাকে দান খয়রাত করছেন না দায়ে ঠেকে এই রাস্তা ধরেছেন। প্রথমে ধমক লাগাচ্ছিলেন। কাজ হবে না দেখে এই চার ফেললেন। আমিও ভাবলুম উনি একলা শোধরালে তো দেশের সব কাজ হবে না। তবে কেন ওঁর দান অস্বীকার করি? আমি আমার আদর্শ থেকে অনেক নীচে নেমে গেছি কিন্তু এরপরও রায়সাহেব দাগা দিলে আমি সত্যিই বজ্জাতি করবো। যে গরীবকে মারে, তাকে মারবার জন্যে আমাকে বিবেকের সামনে দাঁড়াতে হবে না।"

১৭

গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়লো রায়সাহেব পঞ্চায়েৎকে ডেকে কষে ধমক লাগিয়ে সব টাকা উসুল করে নিয়েছেন। ওদের জেলেই দিতেন কিন্তু অনেক হাতে পায়ে ধরে তবে রেহাই পেয়েছে। ধনিয়ার কল্জে ঠান্ডা হলো। গ্রামে ঘুরে

ঘুরে পাঁচজনকে শুনিয়ে বেড়ায়—গরীবের দুঃখু মানুষ না শুনুক ভগমান শুনেছেন। লোকেরা ভেবেছিল ওকে দন্ড দিয়ে মজা করে খুব ফুলুরি খাবো। এমন চড় গালে পড়লো যে ফুলুরি খাওয়া বেরিয়ে গেলো। এক একজনকে দু গুণ করে দিতে হলো। এখন মরো আমার কুঁড়ে ঘর নিয়ে।"

কিন্তু বলদ না হলে চাষের কাজ কেমন করে হবে? গ্রামে ধান রোয়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে। কার্তিক মাসে চাষার বলদ যাওয়া হাত কাটা যাওয়ার সামিল। হরির দুটো হাতই কাটা গেছে। আর সবাই ক্ষেত চষছে। বীজ ছড়াচ্ছে। কোথাও দু-চার কলি গানের আভাস, শুধু হরির ক্ষেত অনাথা-অবলার মতো হা-হা করছে। পুনিয়ার কাছেও বলদ আছে, শোভারও কিন্তু নিজের ক্ষেতের কাজ সেরে হরির ক্ষেতে বীজ বোনবার ফুরসৎ তাদের কোথায়? হরি দিনভোর এদিক-ওদিক ঘুরে মরে। কখনো এর ক্ষেতে গিয়ে বসে, কখনো বীজ বুনে দেয়। তাতে কিছু কিছু যব ঘরে আসে। ধনিয়া, রূপা, সোনা সবাই অপরের ক্ষেতে মজুরী করে তাই যতদিন বীজ বোনার কাজ ছিল তত-দিন তেমন কষ্ট হয়নি। মনোবেদনা থাকলেও অন্ন জুটতো। রাতে কর্তা-গিন্নীর একটু আধটু ঝগড়া লেগেই থাকে।

কার্তিক মাস কেটে গেলে গ্রামে মজুরের কাজ পাওয়াও বেশ কঠিন হয়ে উঠলো। এখন সব ভরসা আখের ওপর, তারা এখনো ক্ষেতের উপর শির উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শীতের রাত। হরির ঘরে দাঁতে কাটবার কুটোটিও নেই। দিনের বেলা একটু ছোলামটর ভাজা জুটেছিল কিন্তু রাতে আর উনুনে আঁচ পড়েনি। রূপা খিদের জ্বালায় আকুল হয়ে দরজার সামনে বসে কাঁদছিল। ঘরে যখন এক কণা শস্য নেই তখন কার কাছে কি চাইবে? যখন অসহ্য বোধ হলো তখন আগুন চাইবার অছিলায় পায়ে পায়ে পুনিয়ার বাড়ি গেল। পুনিয়া বাজরার রুটি আর বাথুয়া শাক রাঁধছে। সুগন্ধে রূপার জিভে জল এসে গেল।

পুনিয়া প্রশ্ন করে, "এখনো তোদের চুলোয় আঁচ পড়েনি কেন রে?"

রূপা করুণ সুরে বলে, "ঘরে যে কিচ্ছু নেই। আঁচ দে কি হবে?"

"তাহলে আগুন চাইতে এসেছিস কেন?"

"বাবা তামাক খাবে।"

পুনিয়া একটা ঘুঁটে আগুন থেকে তুলে ছুঁড়ে দেয় কিন্তু রূপা সেটা তোলে না বরং আরো কাছে গিয়ে বসে বলে, "তোমার রুটির খুব ভালো গন্ধ বেরোচ্চে গো কাকী, আমার না বজরার রুটি বড্ড ভালো লাগে।"

"খাবি?"

"মা বকবে যে।"

"তোর মাকে বলতে যাচ্চে কে?"

রূপা পেট ভরে রুটি খেয়ে এঁটো মুখেই দৌড়ে পালায়।

হরি মনমরা হয়েই বসেছিল হঠাৎ পন্ডিত দাতাদীনের ডাক শুনে চমকে

ওঠে। বুক ঢিপ ঢিপ করে। আবার কি নতুন বিপত্তি এলো? উঠে এসে গড় করে আগুনের কৌড়ার পাশে বসতে একটা মাচা এগিয়ে দেয়।

দাতাদিন সদয়ভাবে বললেন, "এবার তোমার ক্ষেত যে পড়ে রইলো হরি। তুমি গাঁয়ের কাউকে কিছু বললে না নইলে ভোলার সাধ্য কি তোমার দোর থেকে হেলে গরু খুলে নে যায়। এখেনেই তার লাশ পড়ে যেতো। আমি পৈতে ছুঁয়ে বলছি আমি তোমার ওপর জরিমানা লাগাইনি। ধনিয়া শুধু শুধু আমার বদনাম করে বেড়াচ্চে। এসব লালা পটেশ্বরী আর ঝিঙুরী সিংয়ের বজ্জাতি। আমি তো শুধু লোকের কথায় পঞ্চায়েতে বসেচি। ওরা তো আরো জরিমানা চাপাতে চাইছিল আমি বলে কয়ে কমালুম। এখন সব্বাই মাথায় হাত দিয়ে কাঁদচে। ভেবেছিল ওরাই রাজত্ব করবে আরে দেশের রাজা যে ভেন্ন লোক। তা এখন নিজের ক্ষেতে চাষের কি ব্যবস্থা করেচো?"

"কি বলবো মহারাজ পড়েই থাকবে।"

"পড়ে থাকবে? তাহলে তো ঘোর অনথ্য।"

"ভগমানের তাই যদি ইচ্ছে হয় আমি কি করবো?"

"আমি থাকতে তোমার ক্ষেত পড়ে থাকবে? কালই আমি তোমায় বীজ ধান বার করে দোব। এখনো ক্ষেত ভিজে আচে। ফসল না হয় দিন দশেক পরেই হবে। আমার আর তোমার আধাআধি বখরা। এতে তোমার কোন ক্ষেতি নেই আমারও হবে না। বসে বসে ভাবছিলুম তৈরি ক্ষেত পড়ে থাকলে বড়ো কষ্ট হয়।"

হরি দোটানায় পড়ে গেল। চার মাস ধরে এই ক্ষেতে সে সার দিয়েছে, মাটি তৈরি করেছে, আর আজ শুধু বীজ ধানের বিনিময়ে অর্ধেক বখরা দিতে হবে। এর চেয়ে যে ক্ষেত না চষাও ভালো। আর কিচ্ছু পাওয়া যাবে না তবে খাজনাটা বেরিয়ে আসবে। এবার ধার শোধ না করতে পারলে আবার বেদ-খলির ঝুট ঝামেলা এসে পড়বে। সে এই প্রস্তাব স্বীকার করে নেয়।

দাতাদীন প্রসন্ন হয়ে বললেন, তাহলে বলো আমি এক্ষুনি ধান মেপে দিচ্চি। যাতে সকালে না ঝঞ্ঝাট হয়। রুটি খেয়েচো তো?

হরি লজ্জিত হয়ে জানায় আজ তার ঘরের চুলোয় আঁচ পড়েনি।

দাতাদীন নম্রমধুর ভর্ৎসনা করে বললেন, "তোমার ঘরে চুলো জ্বলেনি আর তুমি আমাকে বললেও না। আমি তো শত্রুর নই। এইজন্যে তোমার ওপর রাগ হয়। আরে ভালোমানুষের পো, এতে লজ্জাসরমের কি আচে? আমরা সকলেই তো এক। তুমি শুদ্দুর আর আমি বামুন এইতো—তাতে কি হয়েচে, আসলে তো সবাই একই ঘরের মানুষ। সবার দিন সমান যায় না। কে জানে, কাল আমারই যদি কোন বিপদ আপদ হয় আমি তোমার কাচে বলবো নাতো কাকে বলতে যাবো? এখন চলো, বীজধানের সঙ্গে একমণ-দুমণ যবও মেপে দোবখন।"

আধঘন্টার মধ্যে হরি মণখানেক যবভর্তি টুকরি মাথায় নিয়ে বাড়ি ফেরে।

অল্প পরেই তার ঘরে জাঁতার শব্দ শোনা যায়। ধনিয়া চোখ মুছতে মুছতে শক্ত হাতে যব পেষে। ভগবান কোন্ কুকর্মের শাস্তি দিচ্ছেন কে জানে?

পরদিন থেকে বীজবোনার কাজ শুরু হলো। হরির সারা পরিবার এমন ভাবে কাজের মধ্যে ডুবে গেল যেন্ সব কিছুই তাঁদের নিজস্ব। কয়েকদিন পরে একইভাবে জলসেচের কাজও শেষ হলো। মাঝ থেকে দাতাদীন বিনি পয়সার মজুর পেয়ে গেলেন। তাঁর ছেলে মাতাদীনও এ বাড়িতে যাতায়াত শুরু করে। জোয়ান মানুষ, সুরসিক, বাকপটু। দাতাদীন যা কিছু লুটেপুটে আনেন সবই সে ভাঙসিদ্ধি খেয়ে উড়িয়ে দেয়। এক চামারণীর সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠায় এখনো বিয়ে হয়নি। তার চামারণী রক্ষিতার কথা সবাই জানলেও কেউ কিছু বলে না কারণ আমাদের ধর্মাধর্ম সবই খাবার ছোঁয়াছুঁয়ির মধ্যে। খাদ্য দ্রব্য পবিত্র থাকলে ধর্মের গায়ে কোন আঁচড় পড়ে না। রুটি একেবারে ঢালের মতো অধর্মের রাস্তায় রুখে দাঁড়ায়।

এখন ভাগচাষ হওয়াতে মাতাদীন ঝুনিয়ার সঙ্গে কথাবার্তা বলার অবকাশ পায়। সে দাঁও বুঝে এমন সময় আসে যখন ঘরে ঝুনিয়া ছাড়া আর কেউ থাকে না; কখনো একটা ছুতো নিয়ে কখনো আবার অন্য বাহানা। ঝুনিয়া রূপসী নয় কিন্তু যুবতী এবং তার চামারণী-প্রেমিকার চেয়ে ভালো। কিছুদিন শহরে ছিল, তাই ভালো করে কাপড়-চোপড় পরতে পারে, কথাবার্তা বলতেও জানে। আবার লাজুকও, লজ্জাই তো নারীর ভূষণ! মাতাদীন মাঝে মাঝে তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আদর করে তাকে খুশি করতো। একদিন সে ঝুনিয়াকে বলল, "তুমি কি দেখে গোবরের সঙ্গে বেরিয়ে এলে ঝুনা?"

ঝুনিয়া লজ্জা পায়, "ভাগ্য টেনে এনেচে মহারাজ, আর কি বলবো?"

মাতাদীন দুঃখিত স্বরে বলে, "বড্ডো বেইমান। তোমার মতো লক্ষ্মী মেয়েকে ছেড়ে না জানি কোতায় ঘুরে মরচে। চপল মতি, তাই ভয় হয় আবার না কোতাও ফেঁসে সে থাকে। এমন মানুষকে গুলি মেরে উড়িয়ে দেওয়া উচিত। মানুষের ধম্ম হলো যার হাত ধরেচো তাকে নিয়েই থাকো। একজনের জীবনটা নে ছিনিমিনি খেলে আবার অন্য লোকের ঘরে উঁকি ঝুঁকি মারা কি ভালো?"

ঝুনিয়া কেঁদে ফেলে। মাতাদীন এদিক ওদিক দেখে তার হাত ধরে বোঝাবার ভান করে, "তুমি ওর জন্যে ভেবে মরো কেন ঝুনা? চলে গেচে, যেতে দাও। তোমার কি নেই? টাকা-পয়সা কাপড়-গয়না যা চাও আমি সব দোবখন।"

ঝুনিয়া ধীরে ধীরে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পিছু হটে গিয়ে বলে, "সবই তোমার দয়া মহারাজ! আমি তো কোথাও নেই। আমার একুলও গেল ওকুলও গেল 'না মায়া মিলী না রাম হি হাত আয়ে'*। দুনিয়ার রঙ-ঢঙ জানতুম না। ওর মিঠে মিঠে কথা শুনে জালে ফেঁসে গিয়েচি।"

*না মায়া মিলী না রাম হি হাত আয়ে=মায়াও পেলাম না রামও পেলাম না অর্থাৎ 'একুল ওকুল দুকুল গেল'

মাতাদীন গোবরের নিন্দে শুরু করে, "ওটা তো একেবারে বাউন্ডুলে 'না ঘরকা না ঘাটকা'*। যখনি দেখ মা বাপের সঙ্গে ঝগড়া করচে। কোথাও পয়সা পেলো তো তক্ষুণি জুয়ো খেলতে বসে গেল। চরস-গাঁজা খেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে হ্যা-হ্যা করে ঘোরা আর যত বৌ-ঝিদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করাই তার কাজ ছিল। দারোগাসায়েব তো বজ্জাতির জন্যে চালান করতে চাইছিলেন আমরাই খোশামোদ করে ছাড়িয়ে নিয়েসিচি। পরের গোলা থেকে চুরি করতো, কতবার ধরা পড়েচে। লোকেরা বুজিয়ে-সুজিয়ে ছেড়ে দিত।"

সোনা বাইরে এসে বলে, "বৌদি, মা বলচে যবগুলো রোদে দাও। নয়তো বড্ড চোকর বেরোবে। পন্ডিত যেন গোলায় জল ঢেলে রেখেচে।"

মাতাদীন নিজের সাফাই গায়, "মনে হচ্চে, তোদের ঘরে বর্ষা হয়নি। চৌমাসায়** কাঠ পর্যন্ত ভিজে যায় আর এতো যব।" বলতে বলতে সে বেরিয়ে যায়। সোনা আসায় তার নষ্টামীর খেলায় ছেদ পড়ে।

সোনা ঝুনিয়াকে বলে, "মাতাদীন কী করতে এসছিল?"

"গরুর দড়ি চাইছিল। আমি বলে দিইচি এখানে দড়ি-টড়ি নেই।"

"সব বজ্জাতি। বড্ড মন্দ লোক ঐ মাতাদীন।"

"আমার তো খুব ভালো লোক মনে হলো। কী করেচে শুনি?"

"তুমি জানো না? সিলিয়া চামারণীকে রেখেচে।"

"তাতেই মন্দলোক হয়ে গেল?"

"আবার কাকে মন্দ বলে বলো তো?"

"তোমার দাদাও তো আমাকে এখানে এনচে। সেও তাহলে মন্দলোক।"

সোনা এ কথার জবাব না দিয়ে বলে, "আমাদের এখেনে আবার কোনদিন এলে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দোব।"

"আর যদি ওর সঙ্গে তোমার বে হয়।"

সোনা লজ্জা পায়, "তুমি না বৌদি, তুমিও এত মন্দকথা বলচো?"

"কেন এতে গালমন্দ করার কী হলো?"

"আমার সঙ্গে কথা বললে মুখে নুড়ো জেবলে দোব।"

"তাহলে কি তোমার বে কোন দেব্‌তার সঙ্গে হবে? গাঁয়ে এমন শক্ত সমত্থ জোয়ান মানুষ আর কে আচে বলো তো?"

"তুমি তাহলে চলে যাও ওর সঙ্গে, সিলিয়ার চেয়ে তুমি লাখ গুণে ভালো।"

"আমি কেন যাবো? আমি তো একজনের সঙ্গে চলে এসেচি। তা সে ভালো মন্দ যাই হোক।"

"তাহলে আমিও যার সঙ্গে বে হবে তার সঙ্গে চলে যাবো, সে ভালোমন্দ যাই হোক।"

"আর যদি কোন বুড়োর সঙ্গে বে হয়?"

*না ঘরকা না ঘাটকা=ছন্নছাড়া, ভবঘুরে। **চৌমাসা=বর্ষার চার মাস।

সোনা হেসে ফেলে, "আমি তার জন্যে নরম-নরম রুটি বানাবো, কেটে-বেটে ওষুধ দোব, হাত ধরে টেনে তুলবো আর যখন ঘরে যাবো তখন মুখ ঢেকে কাঁদতে বসবো।"

"আর যদি জোয়ান ছেলের সঙ্গে বে হয়?"

"তখন তোমার মাথা-ভালো হবে না বলচি।"

"আচ্ছা তোমার বুড়ো বর পছন্দ না জোয়ান বর?"

"ভগমান না করুন, তোমার বে যদি কোন বুড়োর সঙ্গে হয় তখন দেখবো তুমি কেমন তাকে ভালোবাসো। তখন শুধু ভাববে এই হতচ্ছাড়াটা মলে বাঁচি, কোন জোয়ান পুরুষকে নে থাকি।"

"আমার তো ঐ বুড়োর ওপর দয়া হবে।"

এবছর এদিকে একটা সুগার মিল খোলা হয়েছে। তার গোমস্তা আর দালাল গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি আখ কিনে নিচ্ছে। এ হচ্ছে সেই চিনিকল মিস্টার খান্না যেটি খোলার কথা বলছিলেন। একদিন তাঁর গোমস্তা এই গ্রামেও এলো। চাষীরা তার সঙ্গে দর দাম করে বুঝলো গুড় বানিয়ে কোন লাভ হবে না। যখন ঘরে আখ মাড়াই করেও একই দাম পাওয়া যাবে তখন মেহনত করে কী হবে? সারা গ্রাম আখ বিক্রী করবার জন্যে তৈরি হলো। একটু কম পাওয়া গেলেও ক্ষতি নেই। এখনই তো মিলবে। কারুর হেলে গরু কেনা দরকার, কেউ বাকী খাজনা চোকাবে, কেউ মহাজনের হাত থেকে গলা ছাড়াতে চায়। হরি একজোড়া বলদ কিনবে। এবার আখ ভালো হয়নি। তাই ভয় ছিল জিনিষ তেমন বিক্রী হবে না। আর যখন গুড়ের দামে চিনি পাওয়া যাবে তখন গুড় নেবেই বা কে? সবাই রাজী হলো। হরি কমপক্ষে একশো টাকা আশা করছিল। এতে একজোড়া মামুলী বলদ হয়ে যাবে। কিন্তু মহাজনের কি হবে! দাতাদীন, মগরু, দুলারী, ঝিঙুরী সিং সব্বাই তো খেয়ে ফেলবে। আর যদি মহাজনদের দিতে যায় তাহলে একশো টাকায় তো সুদটুকুও শোধ হবে না। আখের টাকা হাতে আসার কোন উপায় পাওয়া যাচ্ছিল না। বলদজোড়া এসে গেলে তখন আর কে কী করবে? এ ভালোই হলো। তবে সারা গ্রামের লোক দেখবেই। হয়তো মগরু আর দাতাদীন সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে। টাকা পেলেই ঘাড় ধরে আদায় করে নেবে।

সন্ধ্যেবেলা গিরধারী জিজ্ঞেস করে, "তোমার আখ কবে নাগাদ যাবে হরি কাকা?"

হরি মিথ্যে কথা বলে, "এখনো তো কিছু ঠিক হয়নি ভাই। তুমি কবে নাগাদ পাঠাবে?"

গিরধারীও মিথ্যে বলে, "আমারো কিছু ঠিক হয়নি কাকা।"

অন্যান্যরাও এরকম উল্টোপাল্টা কথা বলে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। ঝিঙুরী সিংয়ের কাছে সবাই ঋণী। সবারই ইচ্ছে ঝিঙুরীর হাতে যেন টাকা না পড়ে তাহলেই সে সব হজম করে ফেলবে। নয়ত, দ্বিতীয় দিন যখন

আবার প্রজারা টাকা ধার চাইতে যাবে তখন সেই নতুন কাগজ, নতুন নজরাণা, নতুন লেখার খরচ।

পরের দিন শোভা এসে বলে, "দাদা এমন কোন উপায় বাৎলাও যাতে ঝিঙুরী সিং ওলাউঠো হয়ে মরে।"

হরি হেসে বলে, "কেন? তার বাচ্চাকাচ্চা নেই বুজি?"

"তার বাচ্চাকাচ্চা দেখবো না নিজের ছেলেপুলে দেখবো। ও তো দু দুটো বৌকে আরাম করে পুসচে। এখেনে একটুকরো শুকনো রুটিও বাড়তি হয় না। সব নিয়ে নেবে একটা পয়সাও ঘরে আনতে দেবে না।"

"আমার হাল তো আরো মন্দ রে ভাই, যদি এ টাকাটা হাত থেকে বেরিয়ে যায় তো মরে যাবো। হেলে গরু ছাড়া তো কাজ চলবে না।"

"এখন তো দু তিনদিন আখ বইতেই যাবে। যেই সব আখ পেঁাছে যাবে অমনি জমাদারকে বলবো ভাই কিছু নিতে হয় নাও কিন্তু চটপট মেপে দাও, দাম পরে দিও। ওদিকে ঝিঙুরী সিংকে বলবো এখনো টাকা পাইনি।"

"ঝিঙুরী সিং তোমার আমার চেয়ে অনেক সেয়ানা। মুনীমের* সঙ্গে দেখা করে ওখেন থেকেই টাকা নেবে। তুমি আমি মুখ তাকাতেই থাকবো। যে খান্নাসাব এই মিল খুলেছেন তাঁর আবার মহাজনী কারবারও আছে। দুজনেই এক।"

"জানি না এই মহাজনদের হাত থেকে কোনদিন গলা ছাড়াতে পারবো কি না?"

"এ জন্মে তো কোন আশা নেই ভাই। আমরা রাজ্য চাই না, ভোগবিলাস চাই না, খালি খেয়ে পরে থাকতে চাই। সেটুকুও মেলে না।"

"আমি তো এবার সব্বাইকে ধোঁকা দোব। জমাদারকে কিছু দিয়ে রাজী করিয়ে নোব, যাতে আমায় খুব ঘোরায়। ঝিঙুরী কত আর ঘুরবে?"

"এসব কিছুই হবে না রে ভাই। বরং ঝিঙুরী সিংএর হাতে পায়ে ধরলে ভালো হবে। আমরা জালে পড়ে আচি, যত ধড়ফড় করবো ততই আগে মরবো।"

"দাদা, তুমি যে বুড়োদের মতো কথা বলচো। খাঁচায় ঢুকে বসে থাকা কি পুরুষের কাজ? ফাঁদে পড়ি সেও ভালো তবু বাঁচার চেষ্টা করতেই হবে। ঝিঙুরী ঘর-দোর নীলেম করিয়ে নেবে এই তো! করুক গে নীলেম। আমি উপোষ করি, লাথি খাই, ধার না পাই সেও ভালো, পয়সাওলারা ধার না দিলে সুদ পাবে কোত্থেকে বলো তো? একজন আমার ওপর চড়াও হয় তো অন্যজন কম সুদে টাকা দিয়ে আমাকে ফাঁসায়। মোটকথা ঝিঙুরী যেদিন কোতাও যাবে আমি সেদিন টাকা আনতে যাবো।"

হরিও মনে মনে বিচলিত হয়, "হ্যাঁ ঠিক কথা।"

"আখ তুলিয়ে দোব। তারপর দাঁও বুঝে টাকা আনবো।"

"ব্যস ব্যস এই চালই ভালো।"

পরদিন সকালে গ্রামের কয়েকজন আখ কাটতে শুরু করে। হরিও নিজের

* মুনীম=কর্মচারী।

ক্ষেতে গাঁড়াশী* নিয়ে পেঁাছে গেল। ওদিক থেকে শোভাও এলো সাহায্য করতে। পনিয়া, ঝনিয়া, ধনিয়া, সোনা সবাই মাঠে হাজির। কেউ আখ কাটছে, কেউ পাতা ছিলছে, কেউ আঁটি বাঁধছে। চাষীদের আখ কাটতে দেখে মহাজনদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। একদিক থেকে দুলারী দৌড়োয় তো অপরদিকে মগরু শাহ ছোটে। তৃতীয় দিক থেকে আসে মাতাদীন, পাটশ্বরী আর ঝিঙুরী সিংএর পেয়াদারা। দুলারী হাতে পায়ে মোটাসোটা রুপোর বালা পরে, কানে সোনার ঝুমকো, চোখে কাজল, পড়ন্ত যৌবন রঙে রাঙাতে রাঙাতে এসে বলে, "আগে আমার টাকা দাও তবে আখ কাটতে দোব। আমি যত ভালোমানষি করি ততই তোমার দাপট বাড়চে, না? দুবছর হয়ে গেচে একটা আধলা সুদ দাওনি, আমার সুদই পঞ্চাশ টাকা হয়ে গেচে।"

হরি ইনিয়ে বিনিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করে বলে, "বোঠান, আখটা কাটতে দাও। তারপর যতটা পারি তোমাকেও দোব। গাঁ ছেড়ে পালাচ্চি না আর শীগগির মরেও যাচ্চি নে। ক্ষেতে আখ পড়ে থাকলে তো আর টাকা আসবে না।"

দুলারী তার হাত থেকে গাঁড়াশী ছিনিয়ে নিয়ে বলে, "তোমাদের স্বভাব এত মন্দ যে বিশ্বেস হয় না।"

আজ পাঁচ বছর হলো হরি দুলারীর কাছ থেকে তিরিশ টাকা ধার নিয়েছিল। তিন বছরে সেটা একশো টাকায় পরিণত হলে স্ট্যাম্পমারা কাগজে লেখাপড়া হয়। আরো দুবছরে তার ওপর পঞ্চাশ টাকা সুদ চড়েছে। হরি বলে, "বোঠান, স্বভাব চরিত্তির কখনো মন্দ করিনি গো, ভগমান চাইলে তোমাকে তোমাদের পাই পাই চুকিয়ে দোব। তবে হ্যাঁ, আজকাল ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েচি। যা খুশি বলে যাও।"

দুলারী যেতে না যেতেই মগরু শাহ পেঁাছে গেল। কালো রঙ বিরাট ভুঁড়ি, দুটো গজ দাঁত যেন কামড়ে দেবার জন্যে বেরিয়ে এসেছে। মাথায় টুপী, গলায় চাদর, বয়স পঞ্চাশের বেশি নয়, পায়ে গেঁটে বাত বলে লাঠি নিয়ে হাঁটে। মুখে খক্‌খক্‌ কাশি। লাঠি ঠুকে হরিকে দাবড়ে বলে, "আগে আমার টাকা দাও হরি তারপর আখ কাটো। আমি টাকা ধার দিয়েচি, খয়রাত করিনি। তিন-তিনটে বছর কেটে গেল না সুদ, না আসল। ভেবো না তুমি আমার টাকা হজম করতে পারবে। আমি মড়ার কাছ থেকেও টাকা উসুল করে নোব।"

শোভা হেসে বলে, "তবে আর ঘাবড়াচ্চো কেন সাহুজী এটাও মড়ার কাছ থেকেই উসুল করে নিওখন। নয়তো, দু এক বছর আগে পরে দুজনেই তো স্বগ্‌গে পেঁাছোবে। সেখেনে ভগমানের সামনেই নিজে হিসেব চুকিয়ে নিও।"

মগরু শোভাকে গালমন্দ করে, "জোচ্চোর, বেইমান। নেবার সময় তো খুব ল্যাজ নাড়ো আর দেবার সময় যখন আসে তখন গর্‌গর্‌ করো। বাড়ি বিক্রী করিয়ে নোব। হাল-গরু নীলেম করিয়ে ছাড়বো।"

শোভা বলে, "আচ্ছা সত্যি করে বলো তো সাহুজী, কত টাকা দিয়েছিলে

* গাঁড়াশী=কাটারী

যে এখন তিনশো টাকা হয়ে গেচে।”

“তুমি বছরের পর বছর সুদ না দিলে তো বাড়বেই।”

“পেরথমে কত দিয়েছিলে, পঞ্চাশই তো?”

“কদ্দিন হয়ে গেল সেটা দ্যাখো।”

“পাঁচ-ছ বছর হবে।”

“দশ পুরে এগারো চলচে।”

“পঞ্চাশ টাকা দিয়ে তিনশো নিতে তোমার লজ্জা করচে না।”

“লজ্জা কিসের, টাকা দিইচি না খয়রাত চাইচি।”

হরি একেও কাকুতি মিনতি করে বিদায় দিল। দাতাদীন হরির সঙ্গে ভাগচাষ করেছেন। বীজ দিয়ে অর্ধেক ফসল পাবে তাই এসময় কিছু বললেন না। ঝিঙুরী মিল ম্যানেজারের সঙ্গে আগেই সব কিছু ঠিকঠাক করে রেখেছিল। তার পেয়াদারাই গাড়িতে আখ লাদাই করে নৌকো করে পৌঁছে দিচ্ছিল। নদী গ্রাম থেকে আধমাইল দূরে। একটা গাড়ি সারাদিন সাত-আট চক্কর দিচ্ছে, আর নৌকো এক এক ক্ষেপে পঞ্চাশ গাড়ির বোঝা নিয়ে যাচ্ছে। এই ব্যবস্থা করে ঝিঙুরী সবার কৃতজ্ঞতা পেল।

মাপ শুরু হতেই ঝিঙুরী সিং মিলের ফটকের সামনে জমিয়ে বসে সবার আখ ওজন করে, দামের স্লিপ নিয়ে খাজাঞ্চীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিজের পাওনা কেটে নিয়ে চাষীদের বাকী টাকা দিল। চাষীরা অনেক কাঁদাকাটা করলো কিন্তু তাদের হাতে টাকা এলো না। কারণ ‘মালিকের হুকুম’। তার আর কথা কী?

হরি একশো বিশ টাকা পেল। ঝিঙুরী নিজের পুরো টাকা সুদ সমেত কেটে নিয়ে হরিকে মাত্র পঁচিশটা টাকা দিলো। হরি টাকাকটার দিকে উদাস হয়ে চেয়ে বলে, “আমি আর এ নিয়ে কি করবো ঠাকুর, তুমি রেখে দাও। আমার জন্যে মজুরী আছে।”

ঝিঙুরী পঁচিশটাকা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, “নাও কিংবা ফেলে দাও, তোমার যা খুশি করো গে। তোমার জন্যে মালিকের কাছে গালাগাল খেয়েছি। এখনও রায়সাহেবের হুকুম জরিমানার টাকা আদায় করো। তুমি গরীব বলে দয়া করেই এ টাকাটা দিচ্ছি নয়তো একটা পাইও দিতুম না। যদি রায়সাহেব আরো ঝামেলা করেন তো উল্টে ঘর থেকে দিতে হবে।”

হরি ধীরে ধীরে টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে আসতেই নোখেরাম হাঁক পাড়ে। হরি একটা কথাও না বলে পঁচিশটা টাকাই তার হাতে তুলে দিয়ে চলে যায়। তার মাথা ঘুরছিল। শোভাও এত টাকা পেয়েছে সে বেরোতেই পটেশ্বরী তাকে ধরলো। শোভা বলে, “আমার কাছে টাকা নেই, তোমার যা খুশি করতে পারো।”

পটেশ্বরী গরম হয়ে বলে, “আখ বেচেচো কি না?”

“হ্যাঁ বেচেচি।”

“তুমি না বলেছিলে আখ বেচে টাকা দেবে?”

"হ্যাঁ বলেছিলুম।"

"তবে? আর সবাইকে দিয়েচো?"

"হ্যাঁ দিইচি।"

"তাহলে আমাকে দিচ্চো না কেন?"

"আমার কাছে যেটুকু আচে সেটুকু বালবাচ্চার পেট ভরাতেই শেষ হয়ে যাবে যে।"

পটেশ্বরী রেগে উঠে বলে, "তোমাকে টাকা দিতেই হবে শোভা, আর আজই, হাতজোড় করে দিতে হবে। এখন যত খুশি বলে নাও। এক 'রিপোর্টে' ছমাস জেল হয়ে যাবে, পুরো ছমাস একদিনও কম নয়। এই যে নিত্য জুয়ো খেল তাও এক 'রিপোর্টে' বেরিয়ে যাবে। আমি জমিদার কি মহাজনের চাকর নই, আমি সরকার বাহাদুরের লোক। সারা দুনিয়ায় যার রাজত্ব চলচে। আর তোমার যে জমিদার আর মহাজন আচে তাদেরও মালিক সরকার বাহাদুর।"

পটেশ্বরী এগোয়। হরি-শোভা দুজনেই চুপচাপ হাঁটে। এই ধিক্কার তাদের যেন বাক্যহীন করে দিয়েছে। তারপর হরি বলে, "শোভা ওর টাকা দিয়ে দাও গে। ধরে নাও আখে আগুন লেগে গেছিল। আমিও একথাই মনকে বুজিয়েচি।"

শোভা আহত কণ্ঠে বলে, "হ্যাঁ দোব দাদা, না দিলে যাবো কোতায়?"

সামনের দিকে গিরধারী তাড়ি খেয়ে আসছিল। দুজনকে দেখে বলে, "ঝিঙুরীয়া সবুার স-ব কেড়ে নিলে হরি কা-কা। ছোলাভাজা কেনবার জন্যে একটাও পয়সা দিলে না। খুনী কোতাকার। ক-ত কান্নাকাটি করলুম, পায়ে ধরলুম. পাপীটার একটু দয়া হলো না গো।"

শোভা বলে, "তাড়ি গিলেচো তো। তবু বলচো একটা পয়সাও দ্যায়নি।"

গিরধারী পেট দেখিয়ে বলে, "সন্ধ্যে হয়ে গেল। গলা দে এক ফোঁটা জল অব্দি নামেনি। একটা আনী মুখে লুকিয়ে রেখেছিলুম। তাতেই তাড়ি খেইচি। ভাবলুম, সারাবছর গা-গতরে ঘাম ঝরেচে, একটা দিন তাড়ি খাই। এক আনায় আর কী নেশা হবে? সত্যি বলচি, নেশা হয়নি। লোকদেকানো মাতলামী করচি যাতে লোকে ভাবে খুব তা-ড়ি খেয়েচে। ভালো হয়েচে কাকা খুব ভালো। বেবাক সব কেড়ে নিলে। বিশ টাকা নিইছিলুম তাই একশো ষাট টাকা হয়ে গেল ওঃ।"

হরি বাড়ি পেঁাছোলে রূপা জল নিয়ে এলো, সোনা ছিলিম সেজে দিল। ধনিয়া ছোলা ভাজা আর নুন সামনে রাখে। ঝুনিয়াও চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে। সবার চোখে ঝিকমিকে আশার আলো। হরি উদাস হয়ে বসে পড়ে। কি করে সে মুখ হাত ধোবে, কি করেই-বা ছোলা ভাজা চিবোবে? সর্বাঙ্গে লজ্জা ও গ্লানির ছাপ। ধনিয়া বলে, "কতোয় বেচলে গো?"

"একশো বিশ টাকা পেয়েছিলুম। সব সেখানেই লুঠ হয়ে গেল, একটা পাইও বাঁচেনি।"

ধনিয়ার মাথা থেকে পা পর্যন্ত জ্বলে উঠলো। মনে হলো নিজের গালে

মুখে চড় মারে। বলে, "তোমার মতো বোকার হদ্দ পুরুষ মানুষকে ভগমান যে তৈরি করলেন কেন একবার দেখা পেলে জিজ্ঞেস করে নিতুম। তোমার সঙ্গে থেকে সারাটা জীবন তেতো হয়ে গেল। ভগমান মরণও দেয় না যে মরে হাড় জুড়োই। সব টাকা উনি বোনাইদের হাতে দে এলেন। এখন হেলে গরু আসবে কোত্থেকে শুনি? হালে কি এবার আমায় জুতবে, না নিজেকে? বুড়ো হয়ে গেলে আর এটুকু বুদ্ধি হলো না। গরু কেনার টাকাটা সরিয়ে রাখতে পারলে না? কেউ কি তোমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতো? পোষ মাসের ঠান্ডায় কারুর গায়ে একগাছি সুতো নেই। যাও সবুাইকে নদীতে ডুবিয়ে দাওগে। একটু একটু করে মরার চেয়ে একদিনে মরাই ভালো। কদ্দিন খড়ের মধ্যে ঢুকে রাত কাটাবে? আর খড় খেয়ে তো থাকতে পারবে না। তোমার ইচ্ছে হয় তো তুমি ঘাস খেয়ে থাকো গে যাও আমরা পারবো না।" বলতে বলতে সে হেসে ফেলে। এতক্ষণে সে বুঝেছে চাষীর হাতে টাকা এলে মহাজনরা যেভাবে চড়াও হয় তা থেকে কেউ বাঁচতে পারে না।

হরি মাথা নীচু করে নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে কাঁদছিল। ধনিয়ার হাসি সে দেখতে পায়নি। বলে, "মজুরী তো পাওয়া যাবে, মজুরী করে খাবো।"

"এ গাঁয়ে মজুরী পাবে কোতায়? আর কোন্ মুখে মজুরী করবে? সবাই মাহাতো বলে ডাকে, না!"

হরি ছিলিমে টান মেরে বলে, "মজুরী করা পাপ নয়। মজুরের অবস্থা ভালো হলে চাষা হয়। চাষার অবস্থা পড়লে মজুর হতে হয়। মজুরী করা ভাগ্যে না থাকলে এসব হবে কেন? কেন গরু মরবে? আর নালায়েক ছেলে বাড়ি ছেড়ে পালাবেই বা কেন?"

ধনিয়া মেয়ে-বৌএর দিকে চেয়ে বলে, "তোমরা সবাই দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও, নিজের নিজের কাজে যাও। অন্যেরা সব হাট বাজার করে ফিরচে, ছেলে দের জন্যে দু-চার পয়সার জিনিষ আনচে। আর এখেনে টাকা ভাঙাতে হলেই গেল। কমে যাবে না। তাই তো ওঁর রোজগার হলেও কোন লাভ হয় না। যে খরচ করে সে পায়। যে খেতে পরতে পায় না সে টাকা পায় কেন? পুঁতে রাখার জন্যে?"

হরি হেসে বলে, "কোতায় আচে তোর পোঁতা টাকা?"

"যেখেনে রেখেচো ওখেনেই আছে। কেঁদে মরচি, একথা জেনেও হেদিয়ে মরচো বলে। চার পয়সার কিছু এনে বাচ্চাদের হাতে দিলে তো আর জলে পড়তে না। ঝিঙুরীকে যদি বলতে একটা টাকা আমায় দাও নইলে আমি তোমায় একটা পয়সাও দোব না তাহলে নিশ্চই দিত।"

হরি লজ্জা পায়? সে যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে নোখেরামকে পঁচিশটাকা না দিত তাহলে নোখেরাম কিই বা করতো? বড়ো জোর বকেয়ার ওপর দু চার আনা সুদ নিত। এখন তো সব শেষ!

ঝুনিয়া ঘরে গিয়ে সোনাকে বলে, "আমার তো বাবার জন্যে বড্ড কষ্ট হচ্চে।

বেচারা দিনভোর হাঁপিয়ে-ঝাঁপিয়ে ঘরে এলো তো মা খংড়তে বসলেন। মহাজনের কাছে গলা অব্দি ধার। বেচারা কি করবে?"

"তাহলে হেলে-গরু আসবে কোত্থেকে?"

"মহাজন নিজের টাকা চায়। তোমার ঘরের দুঃখের সংগে তার সম্পর্ক কি?"

"মা ওখেনে থাকলে মহাজনদের মজা বার করে দিত। বাবা তো শুধু কেঁদেই মরে।"

ঝুনিয়া ঠাট্টা করে বলে, "তা এখেনেই বা টাকা কম কোতায়? তুমি মহাজনের সংগে একটু হেসে কথা বললেও দেখবে টাকা আসে কিনা। সত্যি বলচি, বাবার সব দুঃখু দূর হয়ে যাবে।"

সোনা দুহাতে তার মুখ টিপে ধরে বললে, "ব্যস, চুপ করো। নয়তো এক্ষুনি গে মাকে মাতাদীনের সব বজ্জাতির কতা বলে দোব আর তখন কাঁদতে বসবে।"

ঝুনিয়া প্রশ্ন করে, "কি বলবে তুমি? বল্‌বার মতো কতা থাকলে তবে তো। মাতাদীন যখন কোন ছলচাতুরি করে ঘরে চলে আসে তখন কি বলবো, বেরিয়ে যাও। আমার কাছে তো কিছু নিতে আসে না বরং নিজের কিছু দে যেতে চায়। তার বদলে দুটো মিঠে কতা ছাড়া ঝুনিয়া তাকে কিছু দ্যায় না। আমি মিঠে কতাকে চড়া দামে বেচতে জানি গো। এত আনাড়ি নই যে কারুর পাল্লায় গিয়ে পড়বো। তবে হ্যাঁ যদি জানতে পারি তোমার দাদা ওখেনে অন্য কাউকে রেখেচে তখনকার কতা আলাদা। তখন আমার ওপর কারুর জোর খাটবে না। এখনো আমি বিশ্বেস করি সে আসবে, সে আমার জন্যেই লোকের দোরে দোরে পথে-পথে ঠোকর খেয়ে বেড়াচ্চে। ঠাট্টাঠুট্টির কতা আলাদা। আমি তোমার দাদার সঙ্গে বেইমানী করবো না। যে একজনের ছেড়ে দুজনের হয়, শেষ পর্যন্ত সে কারুরই থাকে না।"

শোভা এসে হরিকে ডেকে বলে, "দাদা তুমি এই টাকাটা লালাকে দিয়েসো। আমার তখন যেন কি হয়ে গেছিল।"

হরি টাকাটা নিয়ে উঠতে যাবে এমন সময় শাঁখের শব্দ কানে এলো। গ্রামের ওমাথায় ধ্যানসিং নামে এক ঠাকুরের বাস। পল্টনে চাকরি করতো। দশবছর বাদে অনুমতি নিয়ে কদ্দিন হলো ফিরে এসেছে। বাগদাদ, এডেন, সিঙাপুর, বর্মা—সব ঘুরেছে। এখন বিয়ে করবার তালে পুজোপাঠ করে বামুনদের খুশি রাখার চেষ্টা করছে।

হরি বলে, "মনে হচ্চে সাত কান্ড পুরো হয়ে গেল। আরতি হচ্চে।"

"তাইতো মনে হচ্চে। চলো দাদা, আরতির তাপ নে আসি।"

"তুমি যাও। আমি একটু পরে আসচি।"

ধ্যানসিং যেদিন এসেছিল সেদিন সবার ঘরে ঘরে সের-সের মিষ্টি পাঠিয়েছিল। হরির সঙ্গে পথে-ঘাটে দেখা হলেও কুশল প্রশ্ন করে। তার কথার আসরে গিয়ে কিছু না দেওয়া যে অভদ্রতা।

আরতির থালা হয়তো হাতেই থাকবে তার সামনে হরি কি করে খালি হাতে তাপ নেবে। তার চেয়ে না যাওয়াই ভালো। কেউ কি আর খোঁজ রাখবে? সে খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে। বুকটা মুচড়ে উঠছিল। তার কাছে একটা পয়সাও নেই। একটা তামার পয়সা! আরতির পুণ্য ও মাহাত্ম্যের ওপর তার একটুও আস্থা ছিল না কিন্তু লৌকিকতা? ঠাকুরকে তো সে কেবল শ্রদ্ধা নিয়েই প্রণাম করতে পারতো। মান মর্যাদা ছাড়ে কি করে? সবার সামনে মাথা হেঁট হবে যে!

হঠাৎ সে উঠে বসে। মর্যাদার গোলামী করে আরতির পুণ্য ছাড়বে কেন? লোকে হাসবে, হাসুক। ভগবান তাকে অকাজ-কুকাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আর সে কিছু চায় না। হরি পায়ে-পায়ে ঠাকুরবাড়ির দিকে এগোয়।

১৮

খান্নার সঙ্গে কামিনীর বনিবনা হয় না। কেন হয় না বলা কঠিন। জ্যোতিষের হিসেবে তাদের গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে কোন বিরোধ নেই বরং বিয়ের সময় রাজযোটকের মিলমিশ হয়েছিল। কামশাস্ত্রের হিসেবে অন্য কোন রহস্য থাকতে পারে, মনোবিজ্ঞানীরাও আরো কিছু কারণ খুঁজে বার করতে পারেন। আমরা শুধু দেখতে পাচ্ছি ওঁদের বনিবনা হয় না। খান্না ধনী রসিক, সামাজিক, সুদর্শন, বিদ্বান, শহরের এক বিশিষ্ট নাগরিক। কামিনী অপ্সরা না হলেও নিঃসন্দেহে রূপসী। পাকা গমের মতো রঙ, লজ্জানত দুটি চোখ, গাল দুটি লাল না হলেও চিকন পেলব, রমনীয় দেহলতা, সুডোল-সুন্দর চেহারায় আভিজাত্য মেশানো সামান্য গর্ব। যেন সংসারের সব কিছুই তাঁর কাছে তুচ্ছ।

খান্নার কাছে বিলাসের উপকরণের অভাব ছিল না। সবচেয়ে ভালো বাড়ি-গাড়ি-ফারনিচার-অপার ধন। কিন্তু কামিনীর চোখে এসবের কোন দাম নেই। এই ঐশ্বর্য সমুদ্রেও তৃষ্ণায় তাঁর বুক ফাটে। ছেলেদের দেখা শোনা আর সংসারের ছোটখাটো কাজই তাঁর কাছে সব। আকর্ষণ কি জিনিষ, কেমন করে তা জাগাতে হয় কামিনী তা ভাবেন না। তিনি পুরুষের হাতের খেলনা নন, তাদের ভোগের জিনিষও নন তাহলে তাদের মনোহরণের চেষ্টা করতে যাবেন কেন? যদি খান্না তাঁর প্রকৃত সৌন্দর্য দেখতে না পেয়ে মেয়েদের পেছন পেছন ঘোরেন, সে তাঁর দুর্ভাগ্য। কামিনী প্রেম আর নিষ্ঠা নিয়ে স্বামী সেবা করেন, যেন ঈর্ষা কিংবা মোহের মতো ক্ষুদ্র রিপুগুলোকে তিনি জয় করে ফেলেছেন। এই বিশাল সম্পত্তির আড়ম্বর থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তাঁর মন উদগ্রীব হয়ে থাকে। নিজের সহজ-সরল স্বাভাবিক জীবনে তিনি কত সুখী হতে পারতেন, সেই স্বপ্নই দেখেন। তবু কেন মালতী এসে পথের বাধা হয়ে দাঁড়ান? কেন বাঈজীদের মুজরো* হয়? সন্দেহ, অশান্তি আর কৃত্রিমতা তাঁর জীবনকে

* মুজরো=নাচ, গান

বিষিয়ে তোলে কেন কামিনী বুঝতে পারেন না। অনেক আগে তিনি যখন মেয়েদের স্কুলে পড়তেন তখনি তাঁকে কবিতার রোগ ধরেছিল। এখনও কবিতা লেখেন কিন্তু শোনাবেন কাকে? তাঁর কবিতা শুধু মনের একটি বিশেষ ভাবকে ধরে রাখা নয় তার প্রতিটি শব্দে তাঁর জীবনের ব্যথা ও কঠিন শীতল অশ্রু-মুক্তোর সন্ধান পাওয়া যায়। খান্না তাঁর কবিতা দেখলে তাঁকে ঠাট্টা করেন আবার কখনও কখনও ছিঁড়েও ফেলে দেন।

এই রুপোর দেওয়াল দিন-দিন খান্না দম্পতির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করতে লাগলো। খান্না নিজের ব্যবসার কাজে লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তায় যত নম্র আর মধুর; ঘরে ঠিক তার উল্টো, যেমন কঠোর তেমনি কটুভাষী। শিষ্টতা তাঁর কাছে লোকঠকানোর কৌশলমাত্র, মনের দিক থেকে তাঁর ভদ্র হবার সংস্কার ছিল না। সুতরাং কামিনী কটুকথা শুনে নিজের ঘরে বসে বসে কাঁদেন আর খান্না 'দেওয়ানখানা'য় গিয়ে বাঈজীর মুজরো শোনেন কিংবা ক্লাবে গিয়ে মদ খান। তা সত্ত্বেও খান্নাই ছিলেন কামিনীর সর্বস্ব। শত অপমানেও তিনি খান্নারই দাসী। তিনি যুঝবেন, জ্বলবেন, কেঁদে মরবেন কিন্তু খান্নার সঙ্গেই থাকবেন। পৃথক জীবন তাঁর কল্পনার অতীত।

আজ মিস্টার খান্না কার মুখ দেখে উঠেছিলেন কে জানে। সকালে চিঠি খুলেই দেখলেন তাঁর কয়েকটা স্টকের দর পড়ে গেছে, ফলে কয়েক হাজার টাকার ক্ষতি হতে পারে। চিনিকলের মজুররা হরতাল করেছে আর দাঙ্গা বাঁধাবার জন্যেও তৈরি হয়ে আছে। লাভের আশায় রুপো কিনেছিলেন, তার দর আরও নেমেছে। রায়সাহেবের যে সম্পত্তি কেনার কথা ছিল যাতে খান্নার চড়া কমিশন লাভের আশা ছিল তাতেও তিনি টালবাহনা করছেন জানা গেল। রাতে প্রচুর মদ খেয়ে শরীর ম্যাজম্যাজ করছে। এদিকে শোফার গাড়ির ইঞ্জিনে গন্ডগোল পাকিয়েছে ওদিকে লাহোরে তাঁর ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে একজন দেওয়ানী মামলা ঠুকে দিয়েছে। বিরক্ত মনে বসে আছেন ঠিক সেই সময় কামিনী এসে বললেন, "ভীষ্মের জ্বর আজও ছাড়লো না। কোন ডাক্তারকে ডাকো।"

ভীষ্ম খান্নার ছোট ছেলে, জন্ম থেকেই দুর্বল, রোজ একটা না একটা অসুখ লেগেই আছে। আজ কাশি তো কাল জ্বর, কখনো বুকের ব্যামো, কখনো পাতলা দাস্ত। দশমাস বয়স হলো, দেখায় পাঁচ-ছ মাসের বাচ্চার মতো। খান্নার ধারণা ছেলেটা বাঁচবে না, তাই তিনি তার সম্বন্ধে উদাসীন কিন্তু কামিনীর স্নেহ তাকেই সবচেয়ে বেশি ঘিরে আছে।

খান্না পিতৃসুলভ স্নেহের ভাব দেখিয়ে বলেন, "বাচ্চাদের ওষুধের আড়ৎ বানানো উচিত নয়। আর ওষুধ খাওয়ানোই তোমার বাতিক। একটু কিছু হলেই ডাক্তার ডাকো। মোটে তো তিনদিন, আর একটা দিন দ্যাখো। হয়তো আজ আপনিই কমে যাবে।"

কামিনী জোর করে বলেন, "তিন দিন ধরে জ্বর নামছে না। ঘরোয়া ওষুধ করে হার মেনেছি।"

"ভালোকথা, ডেকে দিচ্ছি, কাকে ডাকবো?"

"ডাক্তার নাগকে ডাকো।"

"বেশ ওঁকেই ডাকছি কিন্তু নাম হলেই কেউ ভালো ডাক্তার হয় না। নাগ যতই ফীজ নিক ওর ওষুধ খেয়ে কেউ ভালো হয় শুনিনি। সে তো রুগীদের স্বর্গে পাঠাবার একখানি।"

"তাহলে যাকে খুশি ডাকো। আমি নাগের কথা বলছিলুম উনি এখানে কয়েকবার এসেছেন বলে।"

"মিস মালতীকে ডাকি না কেন? ফীজও কম আর বাচ্চাদের অবস্থা লেডি ডাক্তার যত ভালো বুঝবে কোন পুরুষ তত ভালো বোঝে না।"

কামিনী জ্বলে উঠে বললেন, "আমি মালতীকে ডাক্তার বলেই মনে করি না।"

খান্না ক্রুদ্ধ হয়ে চোখ বার করে বললেন, "তাহলে সে ইংলণ্ডে ঘাস কাটতে গিয়েছিল নাকি? আর সে যে হাজার হাজার লোককে আজ বাঁচাচ্ছে। তা কি কিছু নয়?"

"হবে। ওঁর ওপর আমার ভরসা নেই। সে পুরুষদের মনের চিকিৎসা করতে পারে। আর কোন ওষুধ দিতে পারে না।"

ব্যস লেগে গেল। খান্নার গর্জন আর কামিনীর বর্ষণ একসাথেই শুরু হলো। ওঁদের মধ্যে মালতীর নাম এসে যাওয়াই ছিল দাম্পত্যকলহের আল্টিমেটাম।

খান্না সমস্ত কাগজ মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে বলে, "তোমার সঙ্গে থেকে জীবনটা তেতো হয়ে গেলো।"

কামিনী তীক্ষ্ন স্বরে বললেন, "তাহলে মালতীকে বিয়ে করে ফেলো। অবশ্য সেখানে যদি ডাল গলে।"

"তুমি আমাকে কি ভাবো?"

"মালতী তোমার মতো লোকেদের গোলাম বানিয়ে রাখতে চায়, বিয়ে করে না।"

"তোমার চোখে আমি তাহলে এতই খারাপ?" তারপর তিনি প্রমাণ দেবার চেষ্টা করেন যে মালতী তাঁকে কত সমাদর করেন, আদর-যত্ন করেন। রায়সাহেব আর রাজাসাহেবের মুখের দিকেও তাকান না অথচ তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা না হলে অভিযোগ করে বলেন......।

কামিনী এসব প্রমাণকে ফুঃ দিয়ে উড়িয়ে বলেন, "করে কারণ সে তোমাকেই সবচেয়ে বোকা মনে করে। অন্যদের এত সহজে বোকা বানানো যায় না।"

খান্না ডিঙ মারেন। তিনি ইচ্ছে করলে আজই মালতীকে বিয়ে করতে পারেন, এক্ষুণি......।

"তুমি সাত জন্ম ধরে নাকখত দিলেও সে তোমাকে বিয়ে করবে না। তুমি হচ্ছো তার টাট্টু ঘোড়া, তোমাকে ঘাস-পাতা খাইয়ে গায়ে-মাথায় হাত বুলোবে

কারণ তোমার পিঠের ওপর চড়তে হবে। তোমার মতো হাজারটা বুদ্ধু তার পকেটে পোরা আছে।"

কামিনী আজ খুব রেগে গেছেন। মনে হচ্ছে আজ তিনি খান্নার সঙ্গে ঝগড়া কববার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছেন, ডাক্তার ডাকা অছিলামাত্র। খান্না নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা আর পৌরুষের এত বড়ো অপমান কী করে সইবেন!

"তোমার মতে আমি বোকা বুদ্ধু তাহলে হাজার হাজার লোক আমার দরজায় নাকখত দেবে কেন? কোন রাজা কি তালুকদার আমায় দণ্ডবৎ করে না? শয়ে শয়ে লোককে বোকা বানিয়ে ছেড়েছি।"

"সেই তো মালতীর বৈশিষ্ট্য। যে অপরকে সোজা রাস্তায় বোকা বানায় সেও উল্টোদিক দিয়ে তার কাছে বোকা বনে।"

"তুমি মালতীর যতই নিন্দে করো না কেন তুমি তার পায়ের ধুলোর যোগ্য নও।"

"আমার চোখে মালতী বেশ্যাদের চেয়েও খারাপ। সে পর্দার আড়াল থেকে শিকার করে।

দুজনেই নিজের-নিজের অগ্নিবাণ ছেড়ে দিল। খান্না এর চেয়েও রূঢ় কথা বললে কামিনীর তত খারাপ লাগতো না কিন্তু ঘৃণ্য মালতীর সঙ্গে তাঁর তুলনা সমস্ত সহিষ্ণুতার বাঁধ ভেঙে দিল। কামিনীও খান্নাকে অন্য কোন কথা বললে তাঁর এত খারাপ লাগতো না। কিন্তু মালতীর এই অপমান খান্নারও সহ্য হলো না। দুজনেই একে অপরের মনের দুর্বল স্থানটিকে চিনতেন, সেখানেই অব্যর্থ বাণ ছুঁড়লেন। খান্নার চোখ লাল ও কামিনীর মুখ লাল হয়ে উঠলো। শেষে খান্না ক্রোধে অন্ধ হয়ে কামিনীর দুই কান কষে মলে দিয়ে গালে-মুখে তিন চড় কষালেন। কামিনী কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে গেলেন।

একটু পরে ডাক্তার নাগ, সিভিল সার্জেন মিস্টার টড, কবিরাজ নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী সবাই এলেন কিন্তু কামিনী বাচ্চা কোলে নিজের ঘরে বসে রইলেন। কে কি বললো, কী রোগ নির্ণয় করলো, তিনি কিছুই জানেন না। যে বিপত্তি তিনি আশংকা করছিলেন আজ তাই খড়্গ হয়ে নেমে এলো। খান্না যেভাবে তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করলেন তাতে মনে হচ্ছিল তিনি যেন কামিনীকে বাড়ি থেকে বার করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। যার ছায়া পর্যন্ত কামিনী নিজের জীবনে পড়তে দিতে চান না সেই কিনা তাঁর ওপর পরোক্ষ শাসন করবে? তা হবে না। খান্না তাঁর স্বামী তাঁকে বোঝাবার অধিকার খান্নার আছে, এমনকি খান্নার মারধোরও শিরোধার্য করতে পারেন কিন্তু মালতীর শাসন? অসম্ভব। বাচ্চার জ্বর না ছাড়লে তিনি কিছু করতে পারবেন না। অভিমানকেও কর্তব্যের সামনে মাথা নোয়াতে হয়।

দ্বিতীয় দিন বাচ্চার জ্বর ছাড়লে কামিনী একটা টাঙ্গা ডেকে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। যেখানে তাঁর এত অনাদর সেখানে তিনি থাকতে পারবেন না। বাচ্চাদের প্রতি স্নেহও তাঁকে বাঁধতে পারবে না। তাদের প্রতি যা কর্তব্য তা তিনি করেছেন। শেষ যা বাকী আছে খান্নার ধর্ম। কোলের ছেলেকে তিনি

ছাড়তে পারবেন না। সে তাঁর প্রাণ। এই ঘর থেকে তিনি শুধু প্রাণটুকুই নিয়ে যাবেন। 'উনি ভাবেন আমি খাওয়াই-পরাই', কামিনী দেখিয়ে দেবেন তিনি খান্নার আশ্রয় থেকে বেরিয়ে গিয়েও বাঁচতে পারেন। তিনটি শিশু খেলতে গেছে, কামিনীর ইচ্ছে ছিল ওদের ডেকে একটু আদর করার কিন্তু তিনি তো আর পালিয়ে যাচ্ছেন না। ওদের ইচ্ছে হলে ওরা তাঁর কাছে আসবে, খেলবে। দরকার বুঝলে তিনি নিজেই দেখতে আসবেন। শুধু খান্নার আশ্রয়ে থাকবেন না।

সন্ধ্যেবেলা। পার্কে হৈচৈ লেগে আছে। লোকে সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে হাওয়া খাচ্ছে। কামিনী হজরতগঞ্জ হয়ে পাখিঘরের দিকে ঘুরতেই গাড়ি করে খান্না ও মালতীকে আসতে দেখলেন। তাঁর মনে হলো খান্না তাঁর দিকে ইশারা করে কিছু বললেন আর মালতী হাসলেন। হয়তো তাঁরই ভুল। খান্না মালতীর কাছে তাঁর নিন্দে করবেন না। কিন্তু কী নির্লজ্জ! তিনি শুনেছেন, 'মালতী ভালো প্র্যাকটিস করে, ভালো ঘরের মেয়ে তবুও নিজেকে খেলো করে ফেলেছে। কে জানে কেন বিয়ে করেনি। ওকে বিয়ে করবেই বা কে? না, একথা ঠিক নয়। এমন অনেক পুরুষ আছে যারা মালতীকে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করবে। কিন্তু মালতীর নিজের পছন্দও তো আছে। বিয়ের মধ্যেই বা কী সুখ আছে? ভালোই করেছে বিয়ে না করে। এখন সবাই তার গোলাম আর তখন সেই এক-জনের বাঁদী হয়ে থাকবে। বেশ করেছে। এখন তো উনিও খুব পা চাটছেন। যদি ওঁকে বিয়ে করে ফেলে তখন উল্টে শাসন করবে। মালতী ওঁকে বিয়ে করতে যাবেই-বা কেন? সমাজে আরও এরকম দু চারটে মেয়ে তৈরি হলেই ভালো, পুরুষদের কান গরম করতে তো পারে।'

আজ কামিনীর মনে মালতীর প্রতি প্রবল সহানুভূতি জাগলো। তিনি মালতীর ওপর রাগ করে অন্যায় করেছেন। 'আমার দশা দেখেও কি তার চোখ খোলেনি? বিবাহিত জীবনের দুঃখদুর্দশা দেখে সে যদি এই ফাঁদে না পড়ে তবে তাকে দোষ দিয়ে লাভ কী?'

পাখিঘরের চারদিকে সন্ধ্যের গাঢ় ছায়া। কামিনী টাঙ্গা থেকে নেমে বাচ্চা কোলে নিয়ে সবুজ লনের দিকে এগোয়। দু-চার পা যেতেই চটি ভিজে ওঠে। ঘাসে জল দেওয়া হয়েছে। ঘাসের নীচে জল। কামিনী পেছন না ফিরে দুপা এগোতেই কাদায় পা ডুবে গেল। এখন পা ধোবার জল পান কোথায়? তিনি সমস্ত মনোবেদনা ভুলে পা ধোবার চিন্তা করতে লাগলেন। জল না পেলে কি হবে?

হঠাৎ একটা পাইপ নজরে পড়লো। তিনি কাছে গিয়ে পা ধুলেন, মুখ-হাত ধুলেন তারপর এক আঁজলা জল খেয়ে ওপারের শুকনো জায়গায় গিয়ে বসলেন। উদাস মনে মৃত্যুর চিন্তা এলো। যদি তিনি বসে বসে মরে যান তো কি হবে? টাঙ্গাওয়ালা খান্নাকে খবর দিলে তিনি খুশি হয়ে লোক দেখানো ভড়ং করে চোখে রুমাল চেপে ধরবেন। বাচ্চাদের কাছে খেলনা আর আমোদ-আহ্লাদ মায়ের চেয়েও প্রিয়। এই তো জীবন। তাঁর জন্যে দুফোঁটা চোখের

জল ফেলবারও কেউ নেই। তারপর তাঁর পুরনো দিনের কথা মনে পড়লো যখন শ্বাশুড়ী বেঁচে ছিলেন আর খান্নার উড়ুউড়ু স্বভাব হয়নি। তখন কথায়-কথায় শ্বাশুড়ীর রাগ ভালো লাগতো না, আজ সেই ক্রোধের মধ্যে স্নেহের মিশেলটাই চোখে পড়ছে। শ্বাশুড়ী কত আদর করে তাঁর মান ভাঙাতেন। আর এখন তিনি মাসের পর মাস অভিমানে গুমরে মরেন। কার কী আসে যায়?

একটু পরে তাঁর নিজের মায়ের কথা মনে পড়লো। হায়! আজ মা থাকলে কি তাঁর এ দুর্দশা হতো! মায়ের কাছে আর কিছু না থাক বুক ভরা স্নেহ তো ছিল। কিন্তু না তিনি কাঁদবেন না, মা যতদূর সাধ্য করেছেন. তাঁকে কামিনী স্বর্গেও দুঃখী দেখতে চান না। তাঁর জন্যে মা দায়ী নন। আর তিনিই বা কাঁদবেন কেন? আজ থেকে তিনি স্বাধীন। কালই গান্ধী আশ্রম থেকে জিনিষ-পত্র নিয়ে তিনি বিক্রীবাটা শুরু করে দেবেন। লজ্জা কিসের? বড়োজোর লোকে বলবে, ঐ যে খান্নাজীর বিবি চলেছে। এ শহরেই বা থাকবেন কেন? অন্যত্র চলে যাবেন যেখানে কেউ তাঁকে চেনে না। দশ-বিশটাকা রোজগার করা কি এমন কাজ। নিজে খেটে খাবো, কারুর মেজাজ সহ্য করবো না।

হঠাৎ তিনি মেহতাকে তাঁর দিকে আসতে দেখলেন। মনটা উতলা হয়ে উঠলো। এসময় তিনি সম্পূর্ণ একা থাকতে চান। কিন্তু ভদ্রলোককে এড়ানো গেল না তার ওপর বাচ্চাটাও কাঁদছে।

মেহতা বিস্মিত হয়ে বললেন, "আপনি এসময় এখানে?"

"আপনি যেমন এসে পড়েছেন ঠিক সেইভাবে।"

"আমার কথা বলবেন না। আমি হচ্ছি 'ধোবী কা কুত্তা না ঘরকা না ঘাটকা'*। দিন, আপনার বাচ্চাকে থামিয়ে দিচ্ছি।"

"এই বিদ্যেটি আবার কবে শিখলেন?"

"অভ্যেস করতে চাই। এরপর পরীক্ষা হবে।"

"বেশ! পরীক্ষার দিন এসে গেছে বুঝি?"

"সেতো আমার প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করছে। যখন তৈরি হয়ে যাবো তখন পরীক্ষায় বসবো। ছোট ছোট পরীক্ষার জন্যে আমরা পড়ে পড়ে চোখ খারাপ করে ফেলি আর এতো জীবনের পরীক্ষা।"

"ভালো কথা আমিও দেখবো আপনি কোন গ্রেডে পাশ করেন।" বলতে বলতে কামিনী বাচ্চাকে মেহতার কোলে দিলেন এবং মেহতা কয়েকবার দুলিয়ে-টুলিয়ে বাচ্চাকে চুপ করিয়ে ছোটদের মতো গর্ব করে বললেন, "দেখে-ছেন কেমন মন্ত্রের জোরে চুপ করিয়ে দিলাম। এবার আমিও কোথাও থেকে বাচ্চা যোগাড় করে আনবো।"

"বাচ্চাই আনবেন, না তার মাকেও।"

* ধোপার কুকুর ঘরেরও নয় ঘাটেরও নয়।

মেহতা কপট নিরাশায় মাথা নেড়ে বললেন, "এমন মহিলার সন্ধান তো কোথাও পেলাম না।"

"কেন মিস মালতী নেই? সুন্দরী, শিক্ষিতা, গুণবতী, মনোহারিণী আপনি আর কি চান?"

"মালতীর মধ্যে এমন একটা জিনিষও নেই, যা আমি আমার স্ত্রীর মধ্যে দেখতে চাই।"

কামিনী এই কুৎসায় সানন্দে অংশ নিয়ে বললেন, "তার মধ্যে কি মন্দ আছে শুনি? ভোমরারা তো সবসময় তাকে ঘিরে থাকে। আমি শুনেছি আজকাল পুরুষেরা এইরকম মেয়েই পছন্দ করে।"

মেহতা শিশুর হাত থেকে গোঁফজোড়া বাঁচাতে বাঁচাতে বললেন, "আমার স্ত্রী একটু অন্যরকম হবে। সে এমন হবে, যাতে আমি তাকে পুজো করতে পারি।"

কামিনী কৌতুক অনুভব করে, "তাহলে আপনি স্ত্রী নয়, কোন প্রতিমা চান। এমন স্ত্রী পাওয়া যায় না।"

"আজ্ঞে না, এমন এক দেবী এই শহরেই আছে।"

"সত্যি? তাহলে আমিও তাঁকে দর্শন করে তাঁর মতো হবার চেষ্টা করতে পারি।"

"আপনি তাঁকে ভালো করেই চেনেন। তিনি এক লাখপতির স্ত্রী কিন্তু বিলাসিতাকে তুচ্ছ মনে করেন। উপেক্ষা আর অনাদরেও বিচলিত হন না। মাতৃত্বের বেদীতে আত্মবলি দান করেন। আমার তো মনে হয় তাঁকেই প্রতিমার মতো পুজা করা যায়।"

কামিনীর মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি বুঝেও না বোঝার ভান করে বললেন, "আপনি যাঁর তারিফ করছেন কিন্তু আমার মনে হয় তিনি দয়ার পাত্রী। তিনি আদর্শ নারী আর যিনি আদর্শ নারী তিনি আদর্শ স্ত্রী হতে পারেন না।"

মেহতা আশ্চর্য হয়ে বললেন, "আপনি তাঁকে অপমান করছেন?"

"সে আদর্শ এ যুগে-যে অচল।"

"সেই আদর্শ সনাতন ও অমর। মানুষ তাকে বিকৃত করে নিজের সর্ব-নাশ করছে।"

কামিনী মন আবেগে বাষ্পায়িত হয়। এত খুশি তিনি অনেকদিন হন-নি। যত লোককে তিনি চেনেন তাঁদের মধ্যে মেহতাকে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর মুখ থেকে এ কথা শুনে তিনি যেন মাতাল হয়ে উঠলেন, "তাহলে চলুন আমাকে তাঁর দর্শন পাইয়ে দিন।"

মেহতা শিশুর গালে মুখ ঘষে বললেন, "তিনি তো এখানেই বসে আছেন।"

"কই আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।"

"সেই দেবীর সঙ্গেই কথা বলছি।"

কামিনী হেসে উঠলেন, "আজ কি আপনি আমাকে বোকা বানাবেন ঠিক করেছেন। কেন?"

মেহতা শ্রদ্ধানত হয়ে বললেন, "আপনি আজ আমার ওপর অবিচার করছেন কামিনী দেবী আর আমার চেয়েও নিজের সঙ্গে ছলনা করছেন অনেক বেশি। সংসারে আমি খুব কম প্রাণীকেই শ্রদ্ধা করি। আপনি তাদের মধ্যে একজন। আপনার ধৈর্য, ত্যাগ ও প্রেম অতুলনীয়। আপনার মতো দেবীর পদসেবা করাই আমার কল্পনায় সবচেয়ে বড়ো সুখ। যে নারীত্বকে আমি আদর্শ মনে করি আপনি তার সজীব প্রতিমা।"

কামিনীর চোখ থেকে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ে। এই শ্রদ্ধাকবচ পরে তিনি কোন্ বিপদের সম্মুখীন হতে পারবেন না? বললেন, "আপনি দার্শনিক কেন হলেন মিস্টার মেহতা? আপনার তো কবি হওয়া উচিত ছিল।"

"আপনি কি মনে করেন দার্শনিক না হয়েও কেউ কবি হতে পারে? দর্শন তো শুধু মধ্যবর্তী যোগসূত্র।"

"আপনি এখন কবিত্বের রাস্তায় পা বাড়িয়েছেন। কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানেন, কবি কখনো সুখী হয় না।"

"সংসারের কাছে যা দুঃখ কবির কাছে তাই সুখ। ধন, রূপ, শক্তি, বিদ্যা, বুদ্ধির বিভূতি সবাইকে যতই মোহিত করুক না কেন কবির কাছে এসব একটুও আকর্ষনীয় নয়। পুরনো স্মৃতি আর বুকভাঙা বেদনার অশ্রুই তাকে প্রেরণা যোগায়। যেদিন এসব জিনিষের ওপর তাঁর আকর্ষণ কমে যাবে সেদিন সে আর কবি থাকবে না। দর্শন জীবনের রহস্য নিয়ে শুধু খেলা করে কবি তার মধ্যে লয় হয়ে যায়। আমি আপনার দু-চারটে কবতা পড়েছি, তাতে যা আনন্দ পেয়েছি বোঝাতে পারবো না। প্রকৃতি আমার সাথে খুব অন্যায় করেছে, আপনার মতো দেবী আর একটিও সৃষ্টি করেনি।"

"না মিষ্টার মেহতা এ আপনার ভুল। এমন মেয়ে আপনি অলিতে গলিতে খুঁজে পাবেন। আর আমি তো তাদের তুলনায় কিছুই নয়। যে স্ত্রী নিজের স্বামীকে সুখী করতে পারে না, নিজেকে তার মনের মতো করে তুলতে পারে না তাকে কি নারী বলা চলে? আমি তো কখনো কখনো ভাবি মালতীর কাছে এই বিদ্যা শিখে নিই। যেখানে আমি ব্যর্থ সেখানে সে অতিমাত্রায় সফল। আমি নিজের মানুষকেই আপন করতে পারিনি আর সে পরকেও আপন করে নিয়েছে। এ কী তার শ্রেষ্ঠত্ব নয়?"

"মদ যদি মানুষকে পাগল করে দেয় তাহলে কি মদকে জলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলতে হবে? জল তৃষ্ণা মেটায়, জীবন দেয়।"

"যাই হোক, আমি তো দেখি জল পড়ে থাকে আর মদের জন্যে ঘর বাড়ি বিকিয়ে যায়। আর যে মদে যত নেশা হয় ততই ভালো। শুনেছি, আপনারও এ অভ্যাস আছে।"

কামিনীর হতাশ হৃদয় মানুষকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না। কিন্তু মেহতার কানে তাঁর শেষ কথাগুলো তীক্ষ্ণ শলাকার মতো প্রবেশ করে। পানাসক্তির জন্যে তাঁর আজ যত লজ্জা ও ক্ষোভ হলো বড়ো বড়ো উপদেশ শুনেও তা হয়নি। তর্কের উত্তর তাঁর কাছে ছিল কিন্তু এই মধুর ব্যঙ্গের কোন জবাব

তিনি খুঁজে পেলেন না। তাঁর অনুশোচনা হচ্ছিল মদের উপমা দেবার জন্যে। তিনি মালতীর সঙ্গে মদের তুলনা করেছিলেন। এখন তা নিজের মাথায় ফিরে এলো। লজ্জিত হয়ে বললেন, "কামিনী দেবী, আমি স্বীকার করছি আমি পানাসক্ত। আমি এর উত্তেজক গুণ সম্বন্ধে কোন ওজর দেব না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, এর পরে মদের একটি বিন্দুও আমার গলা দিয়ে নামবে না।"

"এ আপনি কি বলছেন মিস্টার মেহতা। আমি ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি একথা আমি বলতে চাইনি। আমি দুঃখিত।"

"না আপনার খুশি হওয়া উচিত কারণ আপনি একটি মানুষকে উদ্ধার করলেন।"

"আমি উদ্ধার করলাম? আমি তো নিজের উদ্ধারের জন্যে আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।"

"আমার কাছে? কী সৌভাগ্য।"

"আপনি ছাড়া আর কেউ নেই যাকে আমার সব কথা বলতে পারি। দেখুন, আর কেউ যেন একথা জানতে না পারে আশা করি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। এই জীবন আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমার পক্ষে যতটা সহ্য করা সম্ভব, করেছি কিন্তু আর পরছি না। মালতী আমার সর্বনাশ করছে। আমি আমার কোন অস্ত্র দিয়েই জয়ী হতে পারছি না। তার ওপর আপনার প্রভাব আছে। সে আপনাকে যত শ্রদ্ধা করে সম্ভবতঃ আর কোন পুরুষকে তা করে না। যদি কোন উপায়ে তার হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে পারেন তবে সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। আমি আজ ঘর ছেড়ে চলে এসেছি, আর ফিরবো না। সমস্ত মায়ার বন্ধনও ছেঁড়ার চেষ্টা করছি কিন্তু মেয়েদের মন বড়ো দুর্বল। মোহই তাদের প্রাণ। আমি এতদিন নিজের ব্যথা নিজের মনেই লুকিয়ে রেখেছিলাম। আজ আঁচল বিছিয়ে আপনার কাছে ভিক্ষে চাইছি, এই মায়াবিনীর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন। আমি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি...।"

তাঁর স্বর কান্নায় ডুবে যায়। আর মেহতার নিজেকেও কোনদিন এত মূল্যবান মনে হয়নি। এমনকি ফ্রেঞ্চ একাডেমী যখন তাঁর রচনাকে এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে তাঁকে সম্মান জানিয়েছিল তখনও নয়। যে দেবীপ্রতিমাকে তিনি সত্যিই শ্রদ্ধা করতেন, ইষ্টদেবী বলে ভাবতেন সেই দেবী কিনা আজ তাঁর দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী! মনে হলো, তিনি ইচ্ছে করলে বুঝি সব কিছু করতে পারেন, পাহাড় ভেঙে ফেলতে পারেন, সাঁতরে সমুদ্র পার হতে পারেন। ছোট ছেলের মতো প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, "আমি জানতাম না আপনি ওর কাছ থেকে এত দুঃখ পেয়েছেন। আমারই বুদ্ধির দোষ, নাহলে আপনাকে এত দুঃখ সইতে হবে কেন?" এরজন্যে তাঁকে যে অসাধ্যসাধন করতে হবে সে কথা তাঁর মনেই রইল না, এর জন্যে নিজের আদর্শ কতটা ক্ষুণ্ণ করতে হবে সে কথাও না।

"কিন্তু সিংহীর মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে আনা সহজ নয়, জানেন তো?"

"নারী হৃদয় পৃথিবীর মতো। সেখানে মিষ্টিও আছে, তেতোও আছে। যেমন বীজ পড়ে তেমনি গাছ হয়।"

"আপনি নিশ্চয় ভাবছেন কোত্থেকে আজ এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।"

"আমি যদি বলি আজই প্রকৃত আনন্দ পেয়েছি তাহলে আপনার হয়তো বিশ্বাস হবে না।"

"আমি আপনার ওপর বিরাট বোঝা চাপিয়ে দিলাম।"

"আপনি আমাকে লজ্জা দেবেন না। আমি বলেছি, আমি আপনার সেবক। আপনার হিতের জন্যে আমার প্রাণ গেলেও আমি ধন্য মনে করবো। একে কবিত্বের ভাবাবেশ ভাববেন না এ আমার জীবনের আদর্শ। আমি প্রকৃতির পূজারী আর মানুষকেও তার স্বরূপেই দেখতে চাই। আমার জীবনে কৃত্রিমতার স্থান নেই। আমি অতীতের চিন্তা করি না, ভবিষ্যতেরও না। আমার কাছে বর্তমানই সব। ঈশ্বর আর মোক্ষের ব্যাপার স্যাপার দেখে তো আমার হাসি পায়। যেখানে জীবন আছে, প্রেম আছে, হৈচৈ আছে সেখানেই ঈশ্বর আছেন। জীবনকে সুখী করাই তো উপাসনা। জ্ঞানীরা বলবেন ঠোঁটে যেন হাসি না আসে, চোখে যেন জল না ঝরে। আমি বলি, তুমি যদি হাসতে কাঁদতে না পারো তাহলে তুমি মানুষ নও, পাথর। যে জ্ঞান মানবতাকে পিষে মারে সে জ্ঞান নয়, কলুর ঘানি। ক্ষমা করুন, আমি তো বিরাট স্পীচ ঝাড়লাম। চলুন আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। বাচ্চাও আমার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে।"

"আমি তো টাঙ্গা এনেছি।"

"টাঙ্গা এখান থেকেই বিদায় করে দিচ্ছি।" তিনি টাঙ্গাওয়ালার পয়সা দিয়ে ফিরে এলে কামিনী বললেন, "কিন্তু আপনি আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন?"

"কেন? আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেব।"

"সে আর আমার বাড়ি নয়, মিস্টার মেহতা।"

"তবে কি মিস্টার খান্নার বাড়ি?"

"এও কি জিজ্ঞেস করবার মতো কথা? যেখানে শুধু অপমান আর ধিক্কারই পেয়েছি তাকে আর আমি নিজের বাড়ি ভাবতেও পারি না।"

"না কামিনী দেবী। আপনারই বাড়ি আর চিরকাল আপনারই থাকবে। ওই ঘর, ঘরের প্রাণী সবই আপনার সৃষ্টি। আপনি ওই ঘরের প্রাণ। প্রাণ চলে গেলে দেহের কি হবে? মাতৃত্ব মহান গৌরবের পদ কামিনীদেবী। আর গৌরবের জন্যে অপমান, ধিক্কার পায়নি কে? মায়ের কাজ হলো জীবন দেওয়া। তা যে পারে সে কেন ভাবতে যাবে কে রাগলো আর কে কি করলো। আমি আর আপনাকে ধর্ম আর ত্যাগের কি উপদেশ দেব, আপনি তো তার সজীব প্রতিমা। আমি তো শুধু বলবো...।"

"কিন্তু আমি তো শুধু মা নই, নারীও।"

"হ্যাঁ তা ঠিক। কিন্তু আমি মনে করি নারী শুধুই মা। তার অতিরিক্ত

যা কিছু সবই মাতৃত্বের উপক্রম মাত্র। মাতৃত্ব সংসারের সবচেয়ে বড়ো সাধনা, সবচেয়ে বড়ো তপস্যা, সবচেয়ে বড়ো ত্যাগ আর জয়। একটি শব্দের মধ্যেই জীবন, ব্যক্তিত্ব আর নারীত্বের লয় হয়। শুধু ধরে নিন, মিস্টার খান্নার কোন হুঁস নেই। তিনি যা করেছেন এবং করছেন তা পাগলামী। কিন্তু তাঁর ভুল একদিন ভাঙবে। সেদিন তিনি আপনাকে ইষ্টদেবী মনে করবেন।"

কামিনী এর কোন উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ির দিকে এগিয়ে যান। মেহতা দরজা খুলে দিলেন। দুজনেই চুপচাপ। কামিনী যখন নিজের বাড়ি ফিরে আসেন তখন মেহতা দেখলেন তাঁর দুচোখ অশ্রুসজল।

বাচ্চারা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মা-মা বলে তাঁকে জড়িয়ে ধরলে কামিনীর মুখে মাতৃত্বের উজ্জ্বল জ্যোতি ফুটে উঠলো। মেহতাকে বললেন, "এত কষ্টের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।" বলেই তিনি মুখ নামিয়ে নিলে এক বিন্দু অশ্রু তাঁর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো। মেহতার চোখও সজল হয়ে ওঠে. এত ঐশ্বর্য আর বিলাসের মধ্যে বাস করেও এই মহিলা কত দুঃখী!

১৯

মির্জা খুরশেদের হাতাকে ক্লাব, কাছারী, আখড়া যা খুশি তাই বলা যায়। দিনভোর জমজমাট। পাড়ায় আখড়ার জন্যে জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না, মির্জা একটা চালা তুলে আখড়া বানিয়ে দিলেন। সেখানে নিত্য শতখানেক লড়িয়ে এসে জোটে। মির্জাও তাদের সঙ্গে জোর বাড়ান। এ তল্লাটে পঞ্চায়েৎ-ও এখানেই বসে আর মিয়া-বিবির কাজিয়া থেকে শুরু করে শ্বাশুড়ী-বৌয়ের ঝগড়া কিংবা ভাই-ভাইয়ের বিবাদেরও বিচার হয়। পাড়ার সামাজিক জীবন ও রাজনৈতিক আন্দোলনের এই একটাই কেন্দ্র। প্রায়ই সভা-টভা হয়। এখানেই সেচ্ছাসেবক ঠিক হয়, নগরের রাজনৈতিক কাজকর্মও চলে। গত জলসায় মালতী নগর-কংগ্রেস-কমিটির সভানেত্রী হয়েছিলেন। তখন থেকে এই জায়গার আকর্ষন আরও যেন বেড়ে গেছে।

গোবর এখানে বছর খানেক ধরে রয়েছে। এখন আর সে সাদাসিধে গ্রাম্য যুবক নয়। সে দুনিয়ার অনেক কিছু দেখে ফেলেছে আর সংসারের রঙ-ঢঙ বুঝতে শিখেছে। আসলে অবশ্য সে এখনও গ্রাম্য—পয়সাকে দাঁত দিয়ে ধরে, স্বার্থ ছাড়ে না, খুব খাটে, সাহস হারায় না ; কিন্তু শহরের হাওয়া তারও গায়ে লেগেছিল, সে একটা মাস মজুরী করে আর আধপেটা খেয়ে সামান্য টাকা বাঁচালো। তারপর সে খোঁচা নিয়ে আলুকাবলি, মটর আর দৈবড়া নিয়ে বসতে লাগলো। এদিকে বেশি লাভ দেখে সে চাকরি ছেড়ে দেয়। গরমকালে বরফ আর শরবৎ-এর দোকানও খুললো। টাকা পয়সার লেনদেনে সৎ বলে তার দোকান অচিরেই জমে উঠলো। শীত এলে গোবর শরবতের বদলে চায়ের দোকান দিল। এখন তার দৈনিক আয় আড়াই থেকে তিন টাকা।

এরপর সে বিলিতি ফ্যাশানে চুল ছাঁটলো, মিহি ধুতি আর পাম্পশু পরা

ধরলো। একটা লাল চাদর কিনে নিয়ে পান বিড়িও টানতে শুরু করলো। সভায় আসা যাওয়া করায় কিছু কিছু রাজনৈতিক জ্ঞানও হয়েছে। সামাজিক প্রতিষ্ঠা আর লোকনিন্দার ভয়ও আর রইল না। যে জন্যে সে ঘর থেকে পালিয়ে এসে এতদূরে মুখ লুকিয়ে পড়ে আছে সেরকম কি তার চেয়েও নিন্দনীয় ঘটনা এখানে নিত্য ঘটচ্ছে, আর তাতে কেউ পালায় না। তারই বা ভয় কিসের?

এতদিন সে ঘরে একটাও পয়সা পাঠায়নি। তার মা-বাবাও টাকা পয়সার ব্যাপারে চালাক-চতুর নয়। সে জানে, ওরা টাকা পেলেই আকাশে উড়বে। বাবা ছুটবে 'গয়া' করতে আর মা গড়াবে গয়না। এসব বাজে কাজের জন্যে সে টাকা খরচ করবে না। এখানে সে ছোটখাটো মহাজন হয়ে গেছে। প্রতিবেশী এক্কাওয়ালা, গাড়োয়ান আর ধোবাদের কাছে সুদ নিয়ে টাকা ধার দেয়। এই দশ-বারো মাসেই সে শক্তি, বুদ্ধি আর পুরুষকারের জোরে নিজের একটা স্থান করে নিলো। তারপর ঝুনিয়াকে নিয়ে আসার কথা ভাবতে বসলো।

বেলা তৃতীয় প্রহর। গোবর রাস্তার কলে স্নান করে এসে সন্ধ্যের জন্যে আলু সেদ্ধ করছে এমন সময় মির্জা তার দরজায় এসে দাঁড়ালেন। গোবর এখন আর তাঁর চাকর নয়। কিন্তু গোবর এখন আগের মতোই খাতির-যত্ন করে। সে দরজার কাছে গিয়ে সসম্ভ্রমে বলে, "কি হুকুম সরকার?"

মির্জা বললেন, "তোমার কাছে কিছু টাকা থাকলে আমাকে দাও না। আজ তিন দিন ধরে বোতল খালি, শরীরটা আনচান করছে।"

গোবর এর আগেও মির্জাকে দু তিনবার টাকা দিয়েছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত উসুল করতে পারেনি। দাবি করতে ভয় পেত আর মির্জা শোধ দিতে জানতেন না। তাঁর হাতে টাকা থাকতোই না। এধার দিয়ে এলে ওধার দিয়ে বেরিয়ে যায়। গোবর একথা বলতে পারলো না যে, আমার কাছে টাকা নেই কিংবা টাকা দেব না। তার বদলে মদের নিন্দে শুরু করলো, "আপনি এ সব্বোনেশে জিনিষ ছেড়ে দিচ্চেন না কেন সরকার? এ বিষ খেয়ে কি লাভ হবে?"

মির্জা কুঠরীর ভেতরে খাটের ওপর বসে পড়ে বললেন, "তুমি ভাবো, আমি ছাড়তে চাই না, শখ করে খাই। আমি এ ছাড়া বাঁচতেই পারি না। তুমি নিজের টাকার জন্যে ভয় পেয়ো না। এক এক কড়ি দিয়ে দেব।"

আমি সত্যি বলচি মালিক, "আমার কাছে এখন টাকা থাকলে কি আপনাকে দিতুম না?"

"দুটো টাকাও দিতে পারবে না?"

"এসময় নয়।"

"আমার আংটিটা বাঁধা রাখো।"

গোবর লুব্ধ হলো কিন্তু কথা পাল্টায় কি করে? বলে, "এ আপনি কি বলচেন মালিক, টাকা থাকলে আপনাকে দিতুম, আংটির কথা উঠছে কেন?"

"আমি আর কোনদিন তোমার কাছে কিছু চাইব না গোবর! আর দাঁড়াতে পারছি না। এই মদের জন্যে আমি লাখ টাকার কারবার নষ্ট করে

ভিখিরি হয়ে গেছি। আজ আমারও জিদ চড়ে গেছে। ভিক্ষে করে খেতে হলেও আমি মদ ছাড়বো না।"

গোবর যখন এবারও অস্বীকার করলো তখন মির্জা হতাশ হয়ে চলে গেলেন। শহরে তাঁর হাজার পরিচিত ব্যক্তি আছে। কতোজন তাঁর দৌলতে ধনী হয়েছে, কতোজন বিপদে সাহায্য পেয়েছে, ইচ্ছে করলে টাকার পাহাড় জমাতে পারতেন কিন্তু পয়সার কোন দাম তাঁর কাছে ছিল না।

গোবর আলু ছাড়ায়। এক বছরে সে এত ধূর্ত ও কৌশলী হয়ে উঠেছে যে আশ্চর্য হতে হয়। যে ঘরে সে থাকে সেটা মির্জারই ঘর। এই কুঠরী আর বারান্দার ভাড়া খুব সহজেই পাঁচ টাকা হতে পারে। গোবর প্রায় বছর-খানেক ধরে সেখানে আছে কিন্তু মির্জা কোনদিন ভাড়া চাননি, সেও দেয়নি। মির্জা বোধহয় জানতেনও না যে এই ঘরের কিছু ভাড়া পাওয়া যেতে পারে।

একটু পরে এক এক্কাওয়ালা টাকা চাইতে এলো। তার নাম আলাদীন, এলোমেলো চুলদাড়ি, কানা! তার মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিল। পাঁচটা টাকা দরকার। গোবর টাকায় এক আনা সুদ হিসেবে টাকা ধার দিল।

আলাদীন ধন্যবাদ দিয়ে বলে, "ভাই এবার বালবাচ্চাদের নিয়েসো। কদ্দিন আর হাত পুড়িয়ে খাবে?"

"এই আমদানীতে সংসার চলবে কি করে?"

আলাদীন বিড়ি ধরিয়ে বলে, "খরচ আল্লা যোগাবেন ভাই! ভাবো কত আরামে থাকবে। আমি বলচি দেখে নিও। তুমি একলা যত খরচ করো তাতেই গেরস্থালী চলে যাবে। মেয়েদের হাতে সৌভাগ্য থাকে। খোদাকসম! যখন আমি একলা এখেনে থাকতুম তখন যতই রোজগার করি না কেন খেয়ে-দেয়ে সব খরচ হয়ে যেত। বিড়ি-তামাকের পয়সাও থাকতো না। তার ওপর হয়রানী। খেটে-খুটে এসে ঘোড়াকে খাওয়াও, বেড়াও। আবার নানবাঈয়ের দোকানে দৌড়োও। নাকে দম হয়ে গেছিলো। যখন গিন্নী এসে গেলো তখন থেকে সেই রোজগারেই রুটিও খাচ্চি, আরামও পাচ্চি। আর লোকে তো আরামের জন্যেই খাটে, না কি? খেটেখুটে আরাম না পেলে জেবনটা নরক হয়ে যায়। তোমার রোজগার বেড়ে যাবে দেখো। যত সময় আলু-মটর সেদ্ধ করতে যাচ্ছে সে সময় দু চার কাপ চা বেচতে পারবে। এখন তো চা বারোমাস চলে। রাতে যখন শোবে তখন গিন্নী পা টিপে দিলে সব কষ্ট চলে যাবে।"

কথাটা গোবরের মনে ধরলো। এবার সে ঝুনিয়াকে আনবেই। আলু উনুনেই রয়ে গেল; সে বাড়ির জন্যে তৈরি হতে থাকে। হোলি আসছে, তার জিনিষপত্রও নিয়ে যাবে। কৃপণদের উৎসবের দিনে প্রাণ খুলে খরচ করার যে প্রবৃত্তি থাকে, গোবরেরও তা ছিল। এই দিনটির জন্যেই তো সে একটি একটি করে পয়সা জমিয়েছে। সে মা আর ঝুনিয়ার জন্যে একজোড়া করে শাড়ি নিয়ে যাবে, বাবার জন্যে ধুতি আর চাদর। সোনার জন্যে তেলের শিশি আর চটি জুতো, রুপার জন্যে জাপানী চুড়ি আর ঝুনিয়ার জন্যে একটা তেল-সিঁদুর-আয়নাওয়ালা পমেটম্ বাক্সো। বাচ্চার জন্যে নিয়ে যাবে

রেডিমেড টুপী আর জামা। সে টাকা বার করে বাজারে যায়। দুপুরের মধ্যে জিনিষপত্র এসে গেল। বিছানা বাঁধা হয়ে গেলে পড়শীরা খবর পেল গোবর দেশে যাচ্ছে। কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ তাকে বিদায় দিতে এলো। গোবর তাদের হাতে নিজের ঘরের ভার দিয়ে বললে, "তোমাদের ভরসাতেই ছেড়ে যাচ্ছি। ভগমানের ইচ্ছে হলে হোলির পরদিন ফিরবো।"

একটি যুবতী হেসে বলে, "বৌকে না নে এলে ঘরে ঢুকতে দোব না।"

দ্বিতীয়া প্রৌঢ়া শিক্ষা দেয়, "হ্যাঁ, অনেক দিন তো হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেয়েচো। ঘরে ফিরে ঠিক সময়ে রুটি তো পাবে।"

গোবর সবাইকে রাম-রাম করে বিদায় নিল। হিন্দ-মুসলমান দুই সেখানে মিত্র ভাবে, একে অপরের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে আছে। কেউ রোজা রাখে, কেউ একাদশী করে আবার কখনও ঠাঁট্টাঠুট্টিও করে। গোবর আলাদীনের নমাজ করাকে বলে ওঠবোস করা, আর আলাদীন অশ্বত্থতলার শিবলিঙ্গগুলোকে বলে নোড়ানুড়ি। কিন্তু এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছিল না। গোবরকে সবাই হাসিমুখে বিদায় দেয়।

এরমধ্যে ভুরে এক্কা নিয়ে এলো। সারাদিন টোটো করে ঘুরে এসেছে। গোবর যাবে শুনেই এক্কা ফিরিয়ে আনলো। ঘোড়ারা আপত্তি জানালে কয়েকবার চাবুক হাঁকড়ায়। গোবর জিনিষপত্র নিয়ে এক্কায় চাপে। গোবর ঘরে যাবার আনন্দে মত্ত, ভুরে তাকে পৌঁছে দেবার খুশিতে মশগুল। স্টেশন এসে গেলে গোবর ট্যাঁক থেকে একটা টাকা বার করে ভুরেকে বলে, "যাবার সময় ঘরের লোকের জন্যে মেঠাই নে যেও।"

ভুরে মিষ্টি ভর্ৎসনা করে বলে, "তুমি আমাকে পর ভাবো ভাই। একদিন একটু এক্কায় বসেচো বলে আমি তোমার কাচে বকশিশ নোব। এত ছোট মন আমাদের নয়। আর যদি বা নিই, বৌকি তাহলে আমায় আস্ত রাখবে নাকি?"

গোবর কিছু বলতে পারে না। লজ্জিত হয়ে জিনিষপত্র নামিয়ে টিকিট কিনতে যায়।

২০

ফাল্গুন যেন নবজীবনের বিভূতি নিয়ে হাজির হয়েছে। আমগাছে দু-হাতে বকুলের সুগন্ধ ঢেলে দিয়ে কোকিলের কণ্ঠে সুধা ভরে দিয়েছে।

গ্রামে আখ রোয়া শুরু হয়ে গেছে। এখনো রোদ ওঠেনি কিন্তু হরি ক্ষেতে পৌঁছে গেছে। ধনিয়া, সোনা, রূপা তিনজনেই পুকুর থেকে ভিজে আখের গাঁঠ বার করে আনছে। আর হরি গাঁড়াশি দিয়ে আখ টুকরো করছে। এখন সে দাতাদীনের মজুর। চাষী নয়, মজুর। দাতাদীনের সঙ্গে এখন তার পুরুত-যজমানের সম্পর্ক নয়, মালিক-মজুরের সম্বন্ধ।

দাতাদীন এসে ধমক লাগান, "আরো তাড়াতাড়ি হাত চালাও হরি। এভাবে কাটলে তো সারাদিনেও শেষ হবে না।"

হরি আহত অভিমানে বলে, "চালাচ্ছি তো মহারাজ! বসে তো নেই।"

দাতাদীন মজুরদের নিঙড়ে কাজ নিতেন, তাই তাঁর কাছে কোন মজুর টিঁকতো না। হরিও তাঁর স্বভাব জানে কিন্তু কোথায় যাবে? দাতাদীন তার সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, "হাত চালানো অনেক রকমের হয়। একভাবে চালালে এক ঘন্টায় সব কাজ হয় আরেকভাবে চালালে সারাদিনেও এক বোঝা আখ কাটা হয় না।"

হরি নিঃশব্দে আরো জোরে হাত চালাতে চেষ্টা করে। এদিকে কয়েকমাস ধরে সে ভরপেট খেতে পায়নি। একবেলা ছোলা ভাজা চিবিয়ে কাটায়। আরেক-বেলা কখনো আধপেটা জোটে কখনো উপোষী থাকে। জোরে হাত চালাবার চেষ্টা করলেও হাত যেন জবাব দিতে বসেছে তায় আবার দাতাদীন তাড়া দিচ্ছেন। একটু দম নিতে পারলেও যেন তাজা হয়ে উঠতে পারতো। দম নেবে কি করে? তাড়ার ওপর তাড়া।

ধনিয়া ও দুই মেয়ে আখের গাঁঠ নিয়ে ভিজে কাদামাখা শাড়ি লটপট করতে করতে বোঝা মাটিতে ফেলে দম নেবার জন্যে একটু দাঁড়াতেই দাতাদীন ডাঁট দেখিয়ে বললেন, "কী তামাশা দেকচিস ধনিয়া? নিজের কাজ করগে যা। পয়সা অমনি আসে না। এক পহর ধরে তুই আখ আনচিস। এই হিসেবে তো সারাদিনেও কাজ শেষ হবে না।"

ধনিয়া চটে উঠে বলে, "একটু দম নিতেও দেবে না নাকি মহারাজ! আমরাও তো মানুষ। তোমার মজুরী করচি বলে হেলেগরু হয়ে যাইনি। একবার মাথায় করে একটা গাঁঠরি নিয়েসে দ্যাখো না, তাহলে বুজবে।"

"পয়সা দিই কাজ করবার জন্যে, দম নেবার জন্যে নয়। দম নিতে হয় তো বাড়ি গে দম নিগে যা।"

হরি ধনিয়াকে ধমক লাগায়, "কেন ঝামেলা বাড়াচ্চিস ধনিয়া? তুই যা না।"

ধনিয়া বিঁড়েটা মাথায় তুলতে তুলতে বলে, "যাচ্চি তো। চলন্ত বলদের গায়ে খোঁচা মারতে নেই।"

দাতাদীন চোখ লাল করে বললেন, "মনে হচ্চে এখনও মেজাজ ঠাণ্ডা হয়নি 'দানে দানে কা মোহতাজ'* হলেও নয়।"

"তোমার দোরে তো আর ভিক্ষে মাঁগতে যাইনি।"

"এই অবস্থা হলে ভিক্ষেও মাঁগতে হবে।"

ধনিয়ার জবাব তৈরি ছিল কিন্তু সোনা তাকে পুকুরের কাছে টেনে নিয়ে গেল, নয়তো কথায় কথা বেড়ে যেত। কানে-শোনা দূরত্ব পার হতেই তার মনের জ্বালা আত্মপ্রকাশ করে, "ভিক্ষে করো গে তুমি। যারা ভিক্ষে মাঁগার জাত। আমরা তো মজুর, যেখেনে কাজ করবো সেখেনেই চারটে পয়সা পাবো।"

সোনা তিরস্কার করে, "আঃ মা, যেতে দাও। তুমিও তো সময়-অসময় না দেখে কতায় কতায় ঝগড়া করতে বসো।"

* দানে দানে কা মোহতাজ=খুদকুঁড়োর জন্যে লালায়িত

হরি উন্মত্তের মতো গাঁড়াশী চালাতে শুরু করলো। একটা অলৌকিক শক্তি যেন তাকে যন্ত্রে পরিণত করেছে। যেটুকু জোর ছিল তা বাষ্প হয়ে কাজ করার শক্তি যোগাচ্ছে। দু চোখে অন্ধকার! মাথায় যেন করাত চলছে তবু তার হাত থামে না। হঠাৎ তার চোখের সামনে নিবিড় আঁধার নেমে এলে শূন্যে হাত তুলে সামলাবার চেষ্টা করে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়লো।

ঠিক সেই সময় ধনিয়া আখের বোঝা নিয়ে এসে দেখে কয়েকজন হরিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আর একজন চাষা দাতাদীনকে বলছে, "মালিক এমন কতা তোমার বলা উচিত হয়নি। যদি মানুষটা মরে যায়।"

ধনিয়া আখের গাঁঠ ফেলে পাগলের মতো ছুটে গিয়ে হরির মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিয়ে চীৎকার করে বিলাপ শুরু করে, "তুমি আমায় ছেড়ে কোতায় যাচ্চো গো? ওরে সোনা, ছুটে জল নে আয়। শোভাকে বল্‌গে দাদার কি হয়ে গেল। হায় ভগমান! আমি কোতায় যাবো গো। আমি কার কাছে থাকবো, কে আমায় ধনিয়া বলে ডাকবে গো...।"

লালা পটেশ্বরী ছুটে এসে কোমল কণ্ঠে ভর্ৎসনা করে, "কি করছিস রে ধনিয়া চুপ কর্। হরির কিচ্চু হয়নি। গরমে মুচ্ছো গেচে। এক্ষুনি হুঁস ফিরে আসবে। এত উতলা হলে চলে নাকি?"

ধনিয়া পটেশ্বরীর পা ধরে কাঁদতে থাকে, "কি করবো লালাজী। মন মানেনা। ভগমান সব কিছু কেড়ে নিলেন। আমি অনেক ধৈরজ ধরেচি। আর যে পারচি নেগো। হায় রে আমার হীরা..."

সোনা জল আনে। পটেশ্বরী হরির মুখে জল ছিটিয়ে দেয়। কয়েকজন গামছা দিয়ে হাওয়া করছিল। হরির দেহ ঠান্ডা হয়ে গেছে। পটেশ্বরীরও চিন্তা হচ্ছিল তবু ধনিয়াকে সে সাহস যোগায়।

ধনিয়া অধীর হয়ে বলে, "এমনটি আগে কখনো হয়নি লালাজী, কক্‌খনো না।"

পটেশ্বরী প্রশ্ন করে, "রাতে কিছু খেয়েছিল?"

"হ্যাঁ, রুটি করেছিলুম। এদানীং আমাদের দিনকাল যে কেমন কাটচে সে তো আর তোমার কাচে লুকোনো নেই। কদ্দিন যে পেটভরা রুটি জোটেনি বলার কতা নয়। কত বোজাই, পেরানটা বাঁচিয়ে কাজ করো, আরাম তো আর আমাদের ভাগ্যে নেই।"

হঠাৎ হরি চোখ মেলে উদভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক তাকায়। ধনিয়া যেন প্রাণ ফিরে পায়। বিহ্বল হয়ে হরির গলা জড়িয়ে ধরে বলে, "এখন কেমন লাগচে গো? আমার তো ভয়ে হাত পা পেটের মধ্যে ঢুকে গেছলো।"

হরি কাতর স্বরে বলে, "ভালো আচি। কি জানি কেন মাথাটা ঘুরে উঠলো।"

ধনিয়া কোমল-মধুর ভর্ৎসনা করে, "ধড়ে তো আর দম্ নেই। কাজ করো একেবারে জান পেরান খুইয়ে। ছেলেদের ভাগ্যি ভালো নইলে তুমি সব্বাইকে নিয়ে একেবারে ডুবতে।"

পটেশ্বরী হেসে বলল, "ধনিয়া তো বুক চাপড়ে কাঁদতে বসেছিল।"

হরি কাতর হয়ে বলে, "সত্যিই তুই কাঁদছিলি রে ধনিয়া?"

ধনিয়া পটেশ্বরীকে ঠেলে দিয়ে বলে, "ওকে বকতে দাও। বরং জিজ্ঞেস করো ও কেন কাগজ ছেড়ে ঘর থেকে ছুটে এসেচে।"

পটেশ্বরী রাগায়, "তোমাকে হীরা হীরা বলে কাঁদছিল আর বুক চাপড়াচ্ছিল। এখন লজ্জায় স্বীকার করচে না।"

হরি ধনিয়ার দিকে সজল চোখে চায়, "পাগলী আর কাকে বলে। আর কোন্ সুখের আশায় আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাস?"

দুজন তাকে ধরে ধরে ঘরে এনে খাটিয়ায় শুইয়ে দেয়। দাতাদীন খুঁড়ছিলেন তাঁর আখ বোনার কাজে দেরী হচ্ছে বলে কিন্তু মাতাদীন ততটা হৃদয়হীন নয়। সে দৌড়ে বাড়ি থেকে গরম দুধ আর এক শিশি গোলাপজল নিয়ে আসে। দুধটা খেয়ে হরি যেন প্রাণ ফিরে পেলো।

ঠিক সেই সময় এক মজুরের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে গোবরকে আসতে দেখা গেল। গ্রামের কুকুররা প্রথমে চীৎকার করে তেড়ে এলো তারপর চিনতে পেরে ল্যাজ নাড়তে লাগলো। রূপা "দাদা আসচে" "দাদা আসচে" বলে হাততালি দিয়ে ছুটে এলো। সোনাও দু পা এগিয়ে ছিল অবশেষে ও নিজের উচ্ছ্বাস নিজের মধ্যে চেপে রাখলো। ঝুনিয়াও ঘোমটা টেনে দরজায় এসে দাঁড়ায়।

গোবর মা-বাপকে প্রণাম করে রূপাকে কোলে নিয়ে আদর করে। ধনিয়া তাকে আশীর্বাদ করে মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরে পুত্র গর্বে ফুলে ওঠে। আজ তো সে রাণী। এই দুরবস্থার মধ্যেও রাণী! তার গোবর কত বড়ো হয়েছে। জামাকাপড় পরে ভদ্দরলোক হয়েছে। ধনিয়ার চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। কিন্তু হরি মুখ ফিরিয়ে নিল।

গোবর বলে, "বাবার কি হয়েচে মা?"

ধনিয়া ঘরের কথা বলে তাকে দুঃখ দিতে চাইল না। বললে, "কিছু হয়নি বাবা, মাতা ধরেচে। চলো, জামাকাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধোও। কোতায় ছিলে এতদিন? এমন করে কেউ ঘর ছেড়ে পালায় বুজি? একটা চিঠিও লিখতে নেই? তোমার পথ চেয়ে চেয়ে চোক ফেটে গেল। কোতায় ছিলে এ্যাদ্দিন?"

গোবর লজ্জিত হয়ে বলে, "দূরে কোতাও না মা, এই লক্ষ্নৌ-এই ছিলুম।"

"এত কাচে থেকেও একটা চিঠি লিখলে না?"

ওদিকে সোনা আর রূপা গোবরের জিনিষপত্র খুলে ভাগ বাঁটোয়ারা করছিল। কিন্তু ঝুনিয়া দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মুখে আজ আনন্দ ও অভিমানের বিচিত্র আলোছায়া। আজ সে গোবরের ব্যবহারের শোধ নেবে। তার ছেলে ছুটে এসে সব জিনিষ মুখে পুরতে চাইছিল কিন্তু ঝুনিয়া তাকে কোল থেকে নামতেই দিচ্ছিল না। সোনা বলে, "দাদা তোমার জন্যে আরশী-চিরুনী এনেচে বৌদি।"

"আমার আরশী-চিরুনী চাই না। নিজের কাচে রাখুক গে।"

রূপা চকমকে টুপীটা বার করে "ও হোঃ এতো চুন্নুর টুপী" বলে তার মাথায় পরিয়ে দিতেই ঝুনিয়া ছেলের মাথা থেকে টুপী খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গোবরকে আসতে দেখে নিজের ঘরে চলে গেল। গোবর দেখে তার সব জিনিষ ছড়ানো ছিটোনো। ইচ্ছে করছিল প্রথমে ঝুনিয়ার সঙ্গে দেখা করে তার কাছে ক্ষমা চাইতে কিন্তু এখনি ঘরে ঢোকার সাহস হয় না। সেখানে বসে জিনিষপত্র বার করে সবাইকে দেয়। রূপা রাগে ফুলে ওঠে তার জন্যে চটী আসেনি বলে। সোনা তাকে ক্ষ্যাপায়, "তুই চটি কি করবি? পুতুলের সঙ্গে খেলা কর্। আমি কি তোর পুতুল দেখে কাঁদচি? তুই কেন আমার চটী দেখে কাঁদচিস?"

মিঠাই বিলোবার ভারটা ধনিয়া নিলো। এতদিন পর ছেলে ভালোভাবে ফিরেছে। সে সারা গ্রামে মিঠাই বিলোবে। কিন্তু একটা কালো জাম তো রূপার কাছে "উট কে মুহ মেঁ জীরা"*। সে গোটা হাড়িটা পেলে খুশী হতো।

এরপর বাক্‌স খুলতে শাড়ি বেরোলো। সুন্দর পাড়ওয়ালা মিহি শাড়ি যেমন পটেশ্বরী লালার বাড়ির মেয়েরা পরে। এত পাতলা শাড়ি কদিন চলবে? বড়ো লোকেরা যত খুশি মিহি শাড়ি পরুক। ওদের মেয়েদের শোয়া-বসা ছাড়া কাজ কী? আরে! হরির জন্যেও ধুতি আর চাদর এসেছে। ধনিয়া খুশি হয়ে বলে, "এটা তুমি খুব ভালো করেচো বাবা। ওর চাদরটা একেবারে ছিঁড়ে কুটিকুটি হয়ে গেচে।"

গোবর ততক্ষণে ঘরের অবস্থার কথা জেনে ফেলেছে। ধনিয়ার শাড়িতে কত গেরো, সোনার শাড়িটা মাথার কাছে পুরো ছেঁড়া আর রূপার ধুতিটাতে চারদিকে শুধু ঝালরের মতো আটকে রয়েছে। সবার চেহারা রুখোশুকো. চামড়ায় জেল্লা নেই। যেদিকে তাকাও অভাবের করাল ছায়া!

মেয়েরা শাড়ি নিয়ে মগ্ন। ধনিয়া ছেলের খাবারের কথা ভাবে। ঘরে একটু আটা ওবেলার জন্যে রাখা আছে। এখন তো ছোলাভাজা চিবোনোর পালা। কিন্তু গোবর কি আর সে গোবর আছে? সে কি যবের আটা খেতে পারবে? ওখানে কি খেতো কে জানে? সে গিয়ে দুলারীর দোকান থেকে আটা, চাল আর ঘি ধার করে নিয়ে আসে। এদানীং মুদীবৌ তাকে ধারে জিনিষ দেয় না, তবে আজ সে কবে পয়সা পাবে জানতেও চাইল না। বলল, "গোবর অনেক টাকাকড়ি কামিয়ে ফিরেচে, না?"

"এখনো তো কিছু খুলে বলেনি দিদি। আমিও এখনি কিছু জানতে চাইনি। তবে হাঁ, সব্বার জন্যে পাড়ওয়ালা শাড়ি এনেচে। তোমার আশীর্বাদে ভালোভাবে ফিরেচে এই ঢের।"

দুলারী আশীর্বাদ করে বলে, "আহা ভগমান করুন যেখেনে থাকে যেন

* "উ'ট কে মুহ মে জীরে কে সমান"=উটের মুখে জীরের মতো ছোট্ট জিনিষ অর্থাৎ 'কিছুই না'।

ভালো থাকে। মা বাপের আর কী চাই? বুঝদার ছেলে, পয়সা ওড়ায় না। আমার টাকাটা দিতে না পারো সুদটা দিও। দিনদিন বাড়চে তো।"

এদিকে সোনা চুন্নুকে জামা জুতো আর টুপী পরিয়ে রাজা সাজাচ্ছিল। চুন্নু অবশ্য পরার চেয়ে জিনিষগুলো মুখে পোরায় উৎসাহী। ঘরে তখন গোবর আর ঝুনিয়ার মানভঞ্জন পালা চলছে।

ঝুনিয়া তিরস্কার করে, "আমাকে এখানে রেখে নিজে বিদেশে পালিয়ে গেলে। একটা খোঁজ খবর করলে না বেঁচে আচি না মরে গেচি। এক বছর পরে তোমার মনে পড়লো। উঃ কী মিথ্যুক তুমি। আমি ভাবচি তুমি আসচো আর তুমি ফিরলে এক বছর পর। পুরুষ মানুষকে বিশেষ কি? অন্য আবার কাউকে মনে ধরেচে বুজি? ভেবেচো, ঘরে তো একটা আচেই, বাইরেও না হয় একটা থাক।"

"ভগমান সাক্ষী আচেন ঝুনিয়া আমি কারুর দিকে চোক তুলে চাইনি। লজ্জায় ভয়ে ঘর থেকে পালিয়েছিলুম ঠিকই কিন্তু তোকে একটুও ভুলিনি। বিশ্বেস কর্ ঠিক করেচি তোকেও নে যাবো। তাই তো এসেচি। তোর বাড়ির লোকেরা খুব রাগমাগ করেচে তো।"

"বাবা তো আমাকে মেরে ফেলতেই এসেছিল।"

"সত্যি?"

"তিনজন মিলে চড়াও হয়ে এসেছিল। মা বকাঝকা করায় মুখ কালো করে চলে গেল। আমাদের হেলে গরু দুটোকেও নে গেচে।"

"জবরদস্তী? বাবা কিছু বলল না?"

"বাবা একলা কার কার সংগে লড়বে! গাঁয়ের লোকে তো নে যেতে দিচ্ছিল না। বাবা ভালোমানুষি করে দিল, অন্যেরা আর কি করবে?"

"আজকাল চাষবাস হচ্চে কি করে?"

"চাষবাস সব গেচে। একটুখানি মহারাজের সংগে ভাগচাষে আচে আখ রোয়াই হয়নি।

গোবরের ট্যাঁকে এখন দুশো টাকা ছিল, তার গরম কম নয়। একথা শুনে তার মাথায় আগুন ধরে গেল। বললে, "তাহলে আমি ওকে বুজিয়ে দে আসচি। সাহস তো কম নয়। আমার দোরগোড়া থেকে হেলে গরু খুলে নে যায়। এতো ডাকাতি, খোলা ডাকাতি। তিন তিন বছরের জন্যে চলে যাবে তিন-জনেই। এমনি না দ্যায় তো আদালত যাবো। সব তেজ ভেঙে দোব।"

সে তক্ষুণি যেতে চাইছিল। ঝুনিয়া ধরে ফেলে বলে, "যেও এখন। তাড়া কিসের? একটু জিরিয়ে খেয়ে-দেয়ে তবে যাও। সারা দিন তো পড়েই আচে। এখেনে বড়ো বড়ো পঞ্চায়েৎ বসলো। আশী টাকা জরিমানা হয়ে গেল তার ওপর তিন মণ ফসল। সেইজন্যিই তো আরো সব্বোনাশ হয়ে গেল।"

সোনা চুন্নুকে জামা-জুতো পরিয়ে নিয়ে এলো। যেন সত্যিকারের রাজ-পুত্তুর! গোবর তাকে কোলে তুলে নিলো কিন্তু এখন তার এসব ভালো লাগছে না। ট্যাঁকে গোঁজা টাকার গরমে রক্ত যেন টগবগ করে ফুটছে। 'সে

সব্বাইকে দেখে নেবে। পঞ্চায়েতের জরিমানা করার কি অধিকার আছে? তাদের মধ্যে কথা বলবার পঞ্চায়েত কে, সে একটা মেয়েকে রেখেছে তো পঞ্চায়েতের বাপের কী? সে যদি ফৌজদারী ঠুকে দেয় তাহলে? ওদের হাতে হাতকড়ি পরবে, গেরস্থালী তছনছ হয়ে যাবে। কী ভেবেছে ওরা?'

চুন্নু তার কোলে উঠে একটু হেসেই চীৎকার করে কাঁদে ঝুনিয়া ছেলেকে তার কোল থেকে নিয়ে বলে, "এখন চানটান করে নাও। কী ভাবচো বলো তো? এখেনে সবার সঙ্গে লড়তে বসলে একদিনও জিরুতে পাবে না। যার পয়সা আচে, সেই বড়োলোক, সেই ভালোমানুষ। যার পয়সা নেই সবাই তার ওপর তেজ দেখায়।"

"আমি পালিয়েই গাধার মতো কাজ করিচি। নয়তো দেখতুম কে কি করে এক পাই জরিমানা নেয়।"

"শহরের হাওয়া খেয়ে এসেচো তো তাই। তখন যদি একথা বুজতে তাহলে পালাতে না।"

"ইচ্ছে করচে পটেশ্বরী, দাতাদীন, ঝিঙুরী সব শালাকে পিটিয়ে ছাতু করে দে পেট থেকে টাকা বার করে নিই।"

"টাকার খুব গরম হয়েচে বুঝি? দেখি বার করো, এ্যাদ্দিনে কত রোজগার করেচো দেখি।"

সে গোবরের কশি ধরে টানে। গোবর উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "এখন কি রোজগার হয়েচে এবার তুমি যাবে, তখন রোজগার হবে। একবছর তো শহরের রঙ-ঢঙ চিনতেই চলে গেল।"

"মা যেতে দেয়, তবে তো!"

"মা কেন যেতে দেবে না, তার সঙ্গে দরকার কি?"

"বাহ! আমি মায়ের হুকুম না নে যাবো নাকি? তুমি তো ছেড়ে দে চলে গেলে। আমার কে ছিল এখেনে? মা যদি ঘরে না ঢুকতে দিতো তাহলে আমি কোতায় যেতুম? যদ্দিন বাঁচবো ওঁর যশ গাইবো। আর তুমিই চেরটা কাল পরদেশে থাকবে নাকি?"

"এখেনে থেকেই বা করবো কি? একটু বুদ্ধি থাকলে আর গতর খাটাতে পারলে মানুষ ওখেনে উপোষ করে মরে না। এখেনে তো বুদ্ধির দরকার নেই। বাবা মুখ ভার করে আচে কেন?"

"শুধু মুখ ভার করে থাকলে নিজেকে ভাগ্যিমন্ত মনে করো। তুমি যা করেছিলে তা মনে পড়লেই বাবার মুখ লাল হয়ে যায়।"

"তাহলে তোমায় খুব গালমন্দ করে তো।"

"কক্‌খনো না। ভুলেও করেনি। মা তো পেরথমে রাগমাগ করলো কিন্তু বাবা কক্‌খনো কিছু বলেনি। যখনি ডাকে আদর করে ডাকে। আমার একটু মাতা ধরলেই অস্থির হয়ে ওঠে। নিজের বাপের সঙ্গে তুলনা করে আমি তোমার বাবাকে দেবতা ভাবি। মাকে বোজায় বৌকে কিছু বোল না। তোমার ওপর রাগ করে, 'একে ফেলে কোতায় গেল' বলে। আজকাল বড্ড চিন্তা-ভাবনা

করচে টাকার জন্যে। আখের টাকা বাইরে থেকেই উড়ে গেল। এখন তো মজুরী করতে হয়। আজ বেচারা ক্ষেতের মধ্যেই বেহুঁস হয়ে পড়েছিলো। কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছিল। তখন থেকে পড়ে আচে।"

মুখ-হাত ধুয়ে খুব করে চুল আঁচড়ে টেরি কেটে গোবর গ্রামের দিগ্বিজয়ে বেরোয়। দুই কাকার ঘরে 'রাম রাম' বলে কুশন প্রশ্ন করে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে। গ্রাম বদলায়নি। শুধু পটেশ্বরীর নতুন বৈঠকখানা হয়েছে আর ঝিঙুরী সিং দরজার কাছে কুঁয়ো খুঁড়িয়েছে। গোবরের মনে বিদ্রোহ ধুঁইয়ে ওঠে। যার সঙ্গে দেখা হয় সেই তাকে আদর করে আর তাকে নিজের হিরো বানিয়ে নিয়ে লক্ষ্ণৌ যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়। এক বছরের মধ্যে সে কি থেকে কি হয়ে গেল। ঝিঙুরী সিংকে কুঁয়োর কাছে স্নান করতে দেখা গেল। গোবর দেখলো কিন্তু সেলাম করলো না বা কথা বললো না। ঝিঙুরী সিং বললে. "কবে এলে গোবর? ভালো আচো তো? লক্ষ্ণৌএ চাকরি করছিলে নাকি?

গোবর তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, "লক্ষ্ণৌ-এ গোলামী করতে যাইনি। চাকরিও তো গোলামী। আমি ব্যবসা করি।"

"রোজ কত করে পাও?"

"এই রোজ আড়াই টাকা তিন টাকা হয়। বেশি হলে চার টাকা। তার বেশি হয় না।"

ঝিঙুরী অনেক ফন্দী ফিকির খাটিয়েও মাসে পঁচিশ তিরিশ টাকার বেশি উপার্জন করে না। আর এই গ্রাম্য যুবক এক শ টাকা রোজগার করছে। তার মাথা নীচু হয়ে গেল। সে উঁচু জাতের লোক বটে কিন্তু ওকে তেজ দেখাবার সময় এটা নয়। বরং ওকে বুজিয়ে-বাজিয়ে কিছু কাজে লাগানো যায় কিনা ভেবে বলে, "এত রোজগার কম নয় বাবা খরচ করলেও পুষিয়ে যাবে। গাঁয়ে তো তিন আনাও মেলে না তা ভবনিয়াকেও* কোন কাজ পাইয়ে দাও না, তাহলে পাঠিয়ে দিই? না লেখা না পড়া একটা না একটা উপদ্রপ করেই যাচ্চে। কোতাও খাজাঞ্চীর কাজ খালি থাকলে বোলো. নয়তো সঙ্গেই নে যাও না। তোমারই তো বন্ধু। মাইনে কম হলেও ক্ষেতি নেই। যদি চার পয়সা উপরি লাভ হয়।"

গোবর হেসে বলে. "এই উপরি আমদানীর লোভই মানুষকে মন্দ করে দ্যায় ঠাকুর। কিন্তু আমাদের স্বভাব এত খারাপ হয়ে গেচে যে যতক্ষণ বেইমানী না করবো ততক্ষণ পেট ভরবে না। লক্ষ্ণৌ-এ মুনীমের কাজ পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সব মহাজনই বিশ্বেসী চৌকস লোক চায়। আমি ভবানীকে কারুর গলায় বেঁধে দিতে পারি কিন্তু পরে সে যদি হাতের খেলা দেখায় তখন সে তো আমার গলা ধরে টানবে। সংসারে জ্ঞানের কদর নেই. বিশ্বেসের দাম আচে।"

চড়টি মেরে গোবর এগোয়। ঝিঙুরী মনে মনে চটে চুপ করে থাকে।

* ভবনিয়া (ভবানি)=ঝিঙুরীর বড়ো ছেলে

ছোঁড়া কি অহংকারীর মতো কথা বলছে। যেন ধর্মাবতার! এভাবে গোবর দাতাদীনের ওপরেও এক হাত নিল। দাতাদীন গোবরকে দেখে প্রসন্ন হয়ে বললেন, "ভালো আছো তো গোবর? শুনেচি, ওখানে বেশ ভালো জায়গায় ঢুকে পড়েচো। মাতাদীনকেও কোথাও ঢুকিয়ে দাও না। ভাঙ খেয়ে পড়ে থাকা ছাড়া এখেনে ওর কাজ কী।"

"তোমার ঘরে কিসের অভাব মহারাজ? যে যজমানের দোরে গিয়ে দাঁড়াও তার তো কিছু না কিছু মারবেই। জন্মালে নাও, মরলে নাও, বিয়েতে নাও, দুঃখে নাও, আবার চাষ করো, মহাজনী কারবার করো, দালালী করো, কারুর কোন ভুলচুক হলে জরিমানা করে তার ঘর লুঠ করো এততেও পেট ভরে না? এত কি করবে? গলায় বেঁধে সঙ্গে নে যাবার উপায় বের করেচো নাকি?"

গোবরের বজ্জাতি দেখে দাতাদীন থ। আদব-কায়দা ভুলে গেছে যেন। জানে না বোধহয় বাপ আমার কাছে গোলামী করে। তবু সব অপমান হজম করে বলে, "লক্ষ্মৌ-এর হাওয়া খেয়ে তুমি খুব চালাক হয়ে উঠেচো গোবর। কি রোজগার করে আনলে, বার করো এবার। তোমার কথা খুব মনে পড়তো। তা থাকবে তো কিছুদিন?"

"হাঁ এখন কিছুদিন তো থাকবোই। ওই পঞ্চায়েতের ওপর দাবি করতে হবে। যারা জরিমানার নামে আমাদের দেড়শো টাকা হজম করেচে। দেখবো, কে আমার হুঁকো-জল বন্ধ করে একঘরে করে।"

এই ভয় দেখিয়ে গোবর এগোয়। তার রোক-ঝোঁক দেখে যুবকরা ভক্ত হয়ে উঠলো। একজন বলে, "নালিশ ঠুকে দাও গোবর। বুড়োটা কালসাপ যাকে কামড়ায় সে মরে। তুমি বেশ করেচো। পটেশ্বরীর কানটাও গরম করে দাও। বড্ড বজ্জাত লোক রে দাদা! বাপ-বেটার মধ্যে আগুন লাগায়, ভাই-ভাইকে ভেন্ন করে। গোমস্তার সঙ্গে চাষীদের গলা কাটে। নিজের ক্ষেত রেখে ওর ক্ষেত চষে দাও।"

গোবর গোঁফে তা দিয়ে বলে, "আমায় আর কি বলবে ভাই। বছর খানেকের মধ্যে সব কি ভুলে গেচি নাকি? এখানে তো আমি থাকবো না নয়তো সব্বাইকে নাচিয়ে ছাড়তুম। এবার হোলিতে খুব ধুমধাম করো আর সঙ তৈরি করে ওদের নকল করো।"

হোলির প্রস্তুতি শুরু হয়। খুব ভাঙ ঘোঁটা হয় দুধ আর নুন দিয়ে। রঙের সাথে কালিও তৈরি হলো যাতে মোড়লদের মুখে ভালো করে কালি মাখানো যায়। হোলিতে কে আর কি বলবে? তারপর সঙ বেরোবে, তারা পঞ্চায়েতের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করবে। টাকা-পয়সার চিন্তা নেই। গোবর উপার্জন করে ফিরেছে।

খেয়েদেয়ে গোবর ভোলার সঙ্গে দেখা করতে গেল। যতক্ষণ না বলদজোড়া এনে বাড়ির সামনে বাঁধছে ততক্ষণ স্বস্তি নেই। হরি কাতর স্বরে বলে, "বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না গোবর। ভোলা হেলে গরুগুলো নে গেলো। ভগমান তার ভালো করুক। সে তো টাকা পেতোই।"

"বাবা তুমি মাঝখানে কতা বলতে এসো না। ওর গরুর দাম ছিল পঞ্চাশ টাকা আর আমাদের হেলে জোড়ার দাম দেড়শো টাকা। তিন বছর লাঙল টেনেচে তাও একশো টাকা তো হবেই। সে নিজের টাকার জন্যে ডিগ্রী করুক, মামলা করুক, যা খুশি করুক; আমার দোর থেকে গরু খুলে নে যাবে কেন? আর তোমাকে কি বলবো? এদিকে হেলে গরু দুটো খোয়ালে ওদিকে দেড়শো টাকা জরিমানা দিলে। আমার সামনে দে গরু নে যেতো তো বুঝতুম। তিন-জনকে মাটিতে শুইয়ে দিতুম। পঞ্চায়েতের সঙ্গে কতাও বলতুম না। দেখতুম কে কি করে। তুমি বসে বসেই রয়ে গেলে।"

হরি অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে কিন্তু ধনিয়া চুপ করে থাকতে না পেরে বলে, "বাবা তুমিও অন্ধের মতো কতা বলচো। হুঁকো-জল বন্ধ হয়ে গেলে গাঁয়ে থাকতুম কি করে? জোয়ান মেয়ে ঘরে বসে আচে তারও তো ব্যবস্থা করতে হবে না কি? জেবনে-মরণে মানুষের বেরাদরী . ।"

গোবর কথা কেড়ে নিয়ে বলে, "হুঁকো-জল সবই তো ছিল। জ্ঞাতগুষ্ঠির আদরও ছিল। তবে আমার বে হয়নি কেন? বলো। হয়নি ঘরে রুটি ছিল না বলে। টাকা থাকলে হুঁকো-জলের দরকার নেই। ভাই বেরাদরীরও দরকার নেই। দুনিয়া টাকার বশ।"

ধনিয়া চুন্নুর কান্না শুনে উঠে গেলে গোবরও বেরিয়ে পড়ে। হরি চুপ করে থাকে। ছেলেটার বুদ্ধি যেন খুলে গেছে। তার বাকবুদ্ধি হরির ধর্ম তার নীতিবোধের কাছে পরাস্ত হয়। হঠাৎ সে বলে, "আমিও যাবো।"

"আমি লড়তে যাচ্ছি না বাবা, ভেবো না। আমার আরো নিয়ম কানুন আচে আমি কেন খামোখা লড়তে যাবো।"

"আমি গেলে ক্ষেতি হবে না কি?"

"হ্যাঁ হবে। তুমি তৈরি ঘুঁটি কাঁচিয়ে দেবে।"

হরি চুপ করে থাকে। গোবর চলে যায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ধনিয়া চুন্নুকে কোলে নিয়ে এসে বলে, "গোবর চলে গেচে? একলা? ওঃ ভগমান তোমাকে কবে বুদ্ধি দেবেন বলো তো? তিনজনে যে ওকে বাজের মতো ছিঁড়ে খাবে। ভগমান এ কী করলে? এখন কাকে বলি দৌড়ে গোবরকে ধরে আন্। তোমাকে তো বলা বিরথা।"

হরি লাঠিটা নিয়ে ছোটে। গ্রামের বাইরে এসে দেখে দিগন্তে একটা ক্ষীণ রেখা মিলিয়ে যাচ্ছে। এত অল্প সময়ে গোবর ওখানে চলে গেল! হরি নিজেকে ধিক্কার দেয়। সে যদি ধমকে বলতো ভোলার কাছে যেতে হবে না। তাহলে গোবর কক্‌খনো যেত না। এখন ছুটতেও পারবে না। সেখানে বসে পড়ে শুধু বলে, "ওকে রক্ষে কর মহাপ্রভু।"

গোবর ভোলার গ্রামে পেঁৗছে দেখে, কয়েকজন লোক বট গাছের ছায়ায় বসে জুয়া খেলছে। তাকে দেখে সবাই পুলিশের লোক ভেবে পালায়। তাদের মধ্যে জঙ্গী তাকে দেখে বলে ওঠে, "আরে এযে গোবর্ধন।"

গোবর দেখলে জঙ্গী ভয় পেয়ে গাছের আড়াল থেকে উঁকি মারছে। বলে,

"ভয় পেয়ো না জঙ্গী ভাই, আমি। রাম-রাম! আজই ফিরেচি। ভাবলুম, যাই সব্বার সঙ্গে দেখা করে আসি। আবার কবে আসবো কে জানে। তোমাদের আশীব্বাদে ভালোই আচি। যে রাজার ওখেনে কাজ করি তিনি বলেচেন চৌকীদার হবার মতো দু চারটে লোক পেলে এনো। আমি বলেচি সরকার এমন লোক দোব যে ভয় পায় না। ইচ্ছে হয় তো আমার সঙ্গে চলো ভালো জায়গা।"

জঙ্গী গোবরের ঠাট-বাট দেখে অবাক। সে চামারের তৈরি একজোড়া জুতোও কখনো পরতে পায়নি আর গোবর চকচকে বুট জুতো পরে হাঁটছে। পরিষ্কার ডোরা কাটা শার্ট, পরিপাটি আঁচড়ানো চুল, যেন পুরো বাবুসাহেব। আগেকার ছন্নছাড়া গোবর আর বাবু-গোবরের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। হিংসে ভাব সময়ের ব্যবধানে ম্লান হয়ে এসেছে। সে একে জুয়াড়ী তায় গাঁজাখোর। ঘর থেকে অনেক কষ্টে পয়সা পায়। তাই লোভে পড়ে বলে, "কেন যাবো না। এখেনে তো পড়ে পড়ে মাচি মারচি। কত টাকা পাওয়া যাবে।"

"সেসব ভাবতে হবে না। সব তো নিজের হাতেই রয়েচে। যা চাইবে তাই হবে। আমি ভাবলুম ঘরেই যখন লোক আচে তখন বাইরের লোক নোব কেন বলো।"

"কি কাজ করতে হবে?"

"কাজ হয় চৌকিদারী করো কিংবা তাগাদা করতে যাও। তাগাদার কাজ সবচেয়ে ভালো। চাষীর সঙ্গে জমে গেলো তো এসে মালিককে বলে দিলে 'ঘরে নেই'। চাইলে রোজ টাকাটা আধুলিটা পেতে পারো।"

"থাকবার জায়গা পাবো?"

"জায়গার অভাব কি? কত জায়গা পড়ে আচে। কলের জল, বিজলী বাতি। কিছুর অভাব নেই। কামতা এখেনে আচে না কোতাও গেচে?"

"দুধ নে গেচে। আমাকে কেউ বাজারে যেতে দেয় না। বলে তুমি তো গাঁজা খাও। আমি এখন খুব কম গাঁজা খাই ভাই, কিন্তু রোজ দুটো পয়সাও তো চাই। তুমি কামতাকে কিছু বোলো না। আমি তোমার সঙ্গে যাবো।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ নিশ্চিন্ত মনে চলো। হোলির পরে।"

"তাহলে পাকা তো।"

দুজনে কথা বলতে বলতে ভোলার দরজায় এসে দাঁড়ায়। ভোলা বসে সুতো কাটছিল। গোবর লাফিয়ে এসে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে ধরা ধরা গলায় বলে, "বাবা, আমার যে ভুলচুক হয়ে গেচে, মাফ করো।"

ভোলা সুতো কাটা বন্ধ করে পাথুরে গলায় বলে, "এমন কাজ তুমি করেচো গোবর যে তোমার মাতাটা কেটে নিলেও পাপ হবে না। কিন্তু আমার দোরে এসে দাঁড়িয়েচো। কি আর বলবো, যাও, আমার সঙ্গে যা করেচো ভগমান তার সাজা দেবেন। কবে এসচো?"

গোবর খুব রসিয়ে রসিয়ে তার ভাগ্যোন্নতির বৃত্তান্ত শুনিয়ে জঙ্গীকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুমতি চায়। ভোলা যেন না চাইতেই বর পেলো।

জঙ্গী ঘরে একটা না একটা উপদ্রব করেই থাকে। বাইরে গেলে তো চারটে পয়সা রোজগার করবে। কাউকে কিছু না দিক নিজের বোঝা তো বইতে পারবে।

গোবর বলে, "না বাবা, ভগমানের ইচ্ছে হলে আর ও নিজে করতে চাইলে বছরখানেকের মধ্যেই মানুষ হয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ, ইচ্ছে থাকলে তবে তো।"

"মাতায় এসে পড়লে মানুষ নিজেকে সামলে নেয়।"

"তাহলে কবে যাওয়া ঠিক হলো?"

"হোলির পর। এখেনে চাষবাসের ব্যবস্থা করে দে চলে যাবো।"

"হরিকে বোলো এবার ঘরে বসে রাম-রাম করতে।"

"বলচি তো, বাবা বসে থাকবে কি?"

"ওখেনে কোন বদ্দ্যির সঙ্গে তোমার চেনাশোনা আচে নাকি? কাশিটা বড্ড জ্বালাচ্ছে। পারো তো একটু ওষুধ পাঠিয়ে দিয়ো।"

"একজন নামকরা বদ্যি তো আমার পড়শী। ওঁকে ব্যামোর কতা বলে ওষুদ পাঠিয়ে দোবখন। কাশিটা রাতে বাড়ে না দিনে?"

"না বাবা, রাতে বাড়ে। চোক বুজতে পারিনে। ওখেনে কোন সুবিধে হলে আমিও চলে যাবো। এখেনে তো কিছু পড়তা পোষাচ্ছে না।"

"রোজগারের মজা তো শহরে বাবা! এখেনে কি হবে? এখেনে তো টাকায় দশ সের দুধও কেউ চায় না, ময়রাদের ধরতে হয়। ওখেনে টাকায় পাঁচ-ছ সের দরে এক ঘণ্টায় যত খুশি মণ-মণ দুধ ব্যাচো।"

জঙ্গী গোবরের জন্যে দুধের শরবৎ বানাতে গিয়েছিল। ভোলা কেউ নেই দেখে বলে, "আরে ভাই! এই জঞ্জাল নিয়ে জেবন জেরবার হয়ে গেল। জঙ্গীর অবস্থা তো দেখচোই। কামতা গেচে দুধ নিয়ে। গরুর দেখাশোনা, খোলজাব দেওয়া, খোলা-বাঁধা সব আমাকেই করতে হয়। এখন তো ইচ্ছে করে একটু সুখে থাকি। কত আর হায়-হায় করবো। রোজ লড়াই-ঝগড়া। কার পায়ে ত্যালাবো। কাশি আসে, রাতে উঠতে পারি না কিন্তু কেউ এক ঘটি জলও এগিয়ে দ্যায় না। দ্যাখো না, খোঁটাগুলো ভেঙে গেছে কারুর ওদিকে নজর নেই। আমি তৈরি করবো তবে হবে।"

"বাবা, তুমি বরং লক্ষ্ণৌ চলো। পাঁচ সের দরে দুধ বেচো, নগদ! কত বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে আমার চেনা আছে। রোজ মণখানেক দুধ বেচার দায় আমি নোব। আমার চায়ের দোকনও আছে, দশ সের দুধ তো আমিই নিই। তোমার কোন কষ্ট হবে না।"

জঙ্গী দুধের শরবৎ এনে দেয়। গোবর শরবৎ খেয়ে বলে, "তুমি শুধু সকাল-সন্ধ্যে চায়ের দোকানে বোসো তাহলে এ টাকাটাও যাবে না।"

ভোলা মিনিটখানেক চুপ করে থেকে সসংকোচে বলে, "রাগে মানুষ অন্ধ হয়ে যায় বাবা। আমি তোমাদের হেলে গরু জোড়া খুলে এনেছিলুম। ওদের নে যাও। এখন চাষবাসের কি হচ্ছে?"

"আমি তো একজোড়া নতুন হেলে-গরু ঠিক করে নিয়েচি, বাবা।"

"না-না, নতুন হেলে-গরু কি হবে? এদের নে যাও।"

"তাহলে আমি টাকা পাঠিয়ে দোব।"

"টাকা কি বাইরে গেচে? ঘরেই তো আচে বাবা। জ্ঞাত গুষ্ঠির ভণ্ডামী আচে তো নইলে তোমাতে-আমাতে ভেদ কিসের? সত্যি কথা বলতে কি আমার তো খুশি হওয়াই উচিত। ঝুনিয়া ভালো ঘরে আচে, সুখে আচে। আর আমি কিনা তাকে খুন করতে ছুটেছিলুম।"

সন্ধ্যেবেলা গোবর যখন রওনা হয় তখন বলদজোড়াও তার সংগী হলো। আর দুহাঁড়ি দৈ নিয়ে পেছন পেছন জংগীও এলো।

২১

গ্রামাঞ্চলে বছরের ছমাস কোন-না-কোন উৎসবের ঢোল-খঞ্জনি বাজে। হোলির একমাস আগে থেকে একমাস পর পর্যন্ত ফাগ উড়তে থাকে। আষাঢ় শুরু হলেই "আল্‌হা"* শুরু হয় আর শ্রাবণ-ভাদ্রে হয় "কাজ্‌লী"** 'কাজ্‌লী'র পরে হয় "রামায়ণ" গান। সেমরী গ্রামেও এসব বাদ যায় না। মহাজন আর গোমস্তার চোখ রাঙানি এসব সমারোহে কোন বাধা সৃষ্টি করে না। ঘরে শস্য নেই, গায়ে কাপড় নেই, ট্যাঁকে পয়সা নেই তবু "কুছ পরোয়া নেই"। না হেসে কি বাঁচা যায়?

হোলির গান-বাজনা হয় নোখেরামের চৌপালে। ওখানেই ভাঙ গোলা হয়, রঙ ওড়ে, নাচ হয়। এই উৎসবে গোমস্তারও পাঁচ-দশ টাকা খরচ হয়ে যায়। নিজের দরজায় জলসা বসাবার সামর্থ আর কারই-বা আছে? কিন্তু এবার গোবর গ্রামের ছেলে-ছোকরাদের নিজের দরজায় টেনে এনেছে তাই নোখেরামের চৌপাল খালি। গোবরের দরজায় ভাঙ ঘোঁটা হচ্ছে, পানের খিলি তৈরি হচ্ছে, রঙ গোলা হচ্ছে, ফরাস বিছোনো রয়েছে, গান চলছে। ওদিকে চৌপালে অন্ধকার ছায়া। ভাঙ আছে, কে পিষবে? ঢোল-করতাল সব মজুত, গায় কে? সবাই গোবরের ঘরের দিকে ছুটছে। এখানকার ভাঙে কেশর, গোলাপজল আর বাদাম পড়েছে। গোবরই তো একসের বাদাম এনেছে। খেলেই শরীর ঠিক হয়ে যায়, চোখ খুলে যায়। খাস 'বিসওঁয়া'র খামীর তামাক এনেছে। রঙেও ক্যাওড়া মিশিয়েছে। টাকা রোজগার করতে জানে আবার খরচ করতেও জানে। পুঁতে রাখলে কে দেখে? ধনের শোভা তো খরচের মধ্যে। শুধু ভাঙ কেন, যারা গায়ক তারা নিমন্ত্রণও পেয়েছে। আর গ্রামে তো নাচিয়ে-গাইয়ে কম নেই। শোভা খোঁড়ার নকল সুন্দর করতে পারে। গিরধারীরও জুড়ি মেলা ভার। উকিল, দারোগা, পাটোয়ারী, চাপরাসী সব সাজতে পারে তবে তার সাজবার ভালো জিনিষ নেই। অবশ্য এবার গোবর তার জন্যে সব কিছু এনে দিয়েছে। এখন তার হাস্যকৌতুক দেখবার মতো।

* আল্‌হা =চারণ গান ** কাজ্‌লী—বর্ষার গান

এ খবর ছড়িয়ে পড়লে সন্ধ্যে থেকেই আশপাশের গ্রাম থেকে লোকে তামাশা দেখতে ছুটে এলো। রাত দশটা নাগাদ তিন চার হাজার লোক জমে গেল। গিরধর ঝিঙুরী সিং সেজে নিজের দলবলের সঙ্গে এগোয়। ঠিক সেইরকম টেকো মাথা, ইয়া গোঁফ আর ভুঁড়ি!

প্রথম দৃশ্য। ঠাকুর খেতে বসেছে আর বড়ো ঠাকরুন বসে হাওয়া করছে। ঠাকুর ঠাকরুণকে রসিয়ে রসিয়ে বলে, "এখনো তোমার সেই যৈবন আচে গো, দেকলে জোয়ান জোয়ান ছেলেরাও হড়পে মরবে।" ঠাকরুণ গাল ফুলিয়ে বলে, "তাই তো নতুন বৌ এনেচো।"

"ওকে তো এনেচি তোমার সেবা করার জন্যে। তোমার সঙ্গে ওর তুলনা?"

ছোট্ ঠাকরুণ আড়াল থেকে শুনে মুখ ফুলিয়ে যায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য। ঠাকুর খাটে শুয়ে আর ছোট্ ঠাকরুণ মুখ ভার করে মাটিতে বসে আছে। ঠাকুর বারবার তার মুখটা নিজের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করে বলে, "আমার ওপর রাগ করেচো কেন আদুরী।" ছোট্ ঠাকরুণ মুখ-ঝামটা দেয়, "তোমার আদুরী যেখেনে আচে সেখেনে যাও। আমি তো ঝি, সেবা করতে এয়েচি।" "তুমি আমার রানী। তোমার সেবা করবার জন্যে তো ঐ বুড়ি আচে।"

বড়ো ঠাকরুণ সে কথা শুনে আড়াল থেকে বেরিয়ে ঠাকুরের পিঠে কয়েক ঘা ঝাঁটা কষায়। ঠাকুর পালাতে পথ পায় না।

আর একটা নক্শায় দেখানো হলো ঠাকুর দশ টাকার দস্তাবেজ লিখে পাঁচ টাকা দিচ্ছে আর পাঁচ টাকা নজরানা, দস্তুরী ও সুদের জন্যে কেটে নিচ্ছে।

চাষা এসে ঠাকুরের পা ধরে কাঁদতে শুরু করে। অনেক কষ্টে ঠাকুর টাকা দিতে রাজী হলো। পাঁচ টাকা হাতে পেয়ে চমকে উঠে বলে—

"এ তো পাঁচ টাকা মালিক।"

"পাঁচ নয় দশ। ঘরে গে গোণ গে যা।"

"না সরকার। পাঁচ রয়েচে।"

"একটাকা নজরানা দিয়েচো কিনা?"

"হ্যাঁ সরকার।"

"একটাকা লেখার জন্যে?"

"হ্যাঁ সরকার।"

"একটাকা কাগজের জন্যে?"

"হ্যাঁ সরকার।"

"একটাকা দস্তুরির জন্যে?"

"হ্যাঁ সরকার।"

"একটাকা সুদের জন্যে?"

"হ্যাঁ সরকার।"

"পাঁচ নগদ, দশ হলো কি না?"

"হ্যাঁ সরকার। এখন এই পাঁচটাও আমার তরফ থেকে রেখে দিন।"

"কি পাগলামী হচ্ছে?"

"না সরকার, একটাকা ছোট্ ঠাকুরানীর নজর, একটাকা বড়ো ঠাকুরানীর। একটাকা ছোট্ ঠাকুরনীর পান খাবার, একটাকা বড়ো ঠাকুরনীর। বাকী রইল এক, ওটা আপনার ক্রিয়াকম্মের জন্যে থাক।"

এইভাবে নোখেরাম, পটেশ্বরী আর দাতাদীনের অনুকরণ করা হলো। নতুনত্ব না থাক, অনুকরণ যতই পুরনো হোক তবু গিরধারীর হাসিঠাট্টা-অঙ্গ-ভঙ্গী এত সুন্দর হয়েছিল যে সরলমতি দর্শকরা হেসে লুটোপাটি খাচ্ছিল। রাতভোর ভাঁড়ামী দেখে দুঃখী মানুষগুলো কাল্পনিক প্রতিশোধ নিতে পেরে প্রসন্ন হয়ে ওঠে। প্রহসন যখন শেষ হয় তখন কাক ডাকছে।

সকালে সবার মুখেই রাতের প্রসঙ্গ। মোড়লরা তামাশার পাত্র হয়ে গেছে। যেদিকে যায় সেদিকেই দু চারজন তাদের নিয়ে হাসে। ঝিঙুরী সিং হুল্লোড়ে মানুষ, এসব হাসিঠাট্টা মজা করেই নিল। কিন্তু পটেশ্বরীর রাগ মারাত্মক আর পণ্ডিত দাতাদীনের তো মেজাজ তুঙ্গে উঠে গেল। তিনিই সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি, রায়সাহেবও তাঁকে খাতির করেন। আর তাঁকে নিয়েই কিনা এত হাসি মস্করা! তাঁর অসহ্য মনে হচ্ছিল। ব্রহ্মশাপের তেজ নেই তাই কলি-যুগের হাতিয়ার বের করে হরির দরজায় এসে দাঁড়ালেন। তারপর চোখ বার করে বললেন, "আজও কি তুমি কাজে যাবে না হরি? এখন তো ভালো হয়ে গেচো। আমার যে কত ক্ষেতি হচ্চে তা কেউ ভাবচো না।"

গোবর দেরীতে শুয়েছিল। সবেমাত্র উঠে চোখ ডলতে ডলতে বাইরে আসছে তখনি দাতাদীনের কথাগুলো কানে পেঁাছোলো। আপ্যায়ন করা দূরে থাকুক উল্টে বলে, "বাবা আর তোমার মজুরী করবে না। আমাদের নিজেদের আখ রুইতে হবে।"

দাতাদীন মুখে খৈনী ফেলে বললেন, "কাজ করবে না কী? বছরের মধ্যে কাজ ছাড়তে পারো না। জষ্টিতে ছাড়তে হয় ছাড়বে, করতে হয় করবে। তার আগে ছাড়তে পাবে না।"

গোবর হাই তুলে আলস্যের ভঙ্গী করে বলে, "বাবা তোমার গোলামী করার দাসখৎ লিখে দেয়নি। যদ্দিন ইচ্ছে, কাজ করেচে। এখন ইচ্ছে নেই, করবে না। এনিয়ে জবরদস্তী চলবে না।"

"তাহলে হরি কাজ করবে না?"

"না।"

"তাহলে আমার টাকা সুদ শুদ্ধু ফেরৎ দাও। তিন বছরের সুদ একশো টাকা। আসল মিলিয়ে দুশো টাকা। ভেবেছিলুম, মাইনের বিশ টাকা সুদে কেটে যাবে, তোমাদের ইচ্ছে না হয় কোরো না। আমার টাকা দাও। ধন্না শেঠ বনেচো, ধন্না শেঠের কাজ করো।"

হরি দাতাদীনকে বলে, "তোমার চাকরি কবে করবো না বলেচি মহারাজ, কিন্তু আমারও তো আখ রুইতে হবে।"

গোবর বাপকে ধমক দেয়, "কিসের চাকরি আর কার চাকরি? এখেনে কেউ কারুর গোলাম নয়। সব্বাই সমান। আচ্ছা মজা চলচে তো। কাউকে একশো টাকা ধার দে তার সুদে সারা জেবন কাজ করে চলেচে তবু আসল যে কে সেই। এতো মহাজনী নয়, রক্ত চোষা হচ্চে।"

"তাহলে টাকাটা দাও না ভাই, ঝগড়া কিসের? আমি টাকায় আনা সুদ নিই। গাঁয়ের লোক বলে আধ আনা সুদ দরে দিইচি।"

"আমি তো শতকরা এক টাকা দোব। এক কড়িও বেশি নয়। তোমার নিতে হয় নাও নয়তো আদালত করো গে। শতকরা এক টাকা সুদ কম নয়।"

"মনে হচ্চে টাকার গরম হয়েচে।"

"গরম তাদের হয় যারা এক থেকে দশ করে। আমরা তো মজুর। আমার মনে আছে তুমি হেলেগরুর জন্যে তিরিশ টাকা দিইছিলে। তাই বেড়ে একশো হয়ে গেল আর এখন একশো বেড়ে দুশো হয়ে গেল। এভাবেই তোমরা চাষীদের লুটে পুটে মজুর করে দিয়ে তার জমির মালিক হয়ে বসচো। তিরিশ থেকে দুশো? কদ্দিন হোলো বাবা।"

হরি কাতর স্বরে বলে, "এই আট ন বছর হবে।"

"এই ন বছরে তিরিশ থেকে দুশো? এক টাকা হিসেবে কত হয়?" সে মাটির ওপরে একটা ঢ্যালা দিয়ে নিজেই হিসেব করে বলে, "দশ বছরে ছত্রিশ টাকা হয়, আসল মিলিয়ে ছেষট্টি। সত্তর টাকাই নাও। এর ওপর একটি কড়িও পাবে না।"

দাতাদীন হরিকে মধ্যস্থ খাড়া করে বললেন, "শুনচো হরি, গোবরের বিচারে হয় আমাকে সত্তর টাকা নিতে হবে নয়তো আদালতে যেতে হবে। এমন করলে সংসার কদ্দিন চলবে? আর তুমি বসে বসে শুনচো। আমিও বামুন, আমার টাকা হজম করে তুমি শান্তি পাবে না। আমি এই সত্তর টাকাও ছেড়ে দিচ্ছি আদালতেও যাবো না, যাও। যদি বামুন হই তাহলে এই দুশো টাকা বার করে তবে ছাড়বো। আর তুমি আমার দোরে হাতজোড় করে দে যাবে।"

দাতাদীন রাগ দেখিয়ে ফেরার জন্যে পা বাড়ালে গোবর বসেই থাকে কিন্তু হরির ধর্মবোধ প্রবল। ঠাকুর বা বেনের টাকা হলে কথা ছিল না, বামুনের টাকা। তার একটা পয়সাও মারা গেলে হাড় ভেঙে বার করে নেবে। বামুনের কোপ তার বংশে পড়লে বাতি দেবার, এক গণ্ডুষ জল দেবার কেউ থাকবে না যে। সে ছুটে গিয়ে দাতাদীনের পায়ে পড়লো, "মহারাজ, আমি যতোক্ষণ আচি, পাই পয়সা চুকিয়ে দোব। ছেলের কথা শুনে চলে যেও না। মামলা তো তোমার আমার মধ্যে। ও কে?"

দাতাদীন একটু নরম হয়ে বলে, "ও জবরদস্তী বলচে দুশো টাকার বদলে সত্তর টাকা নাও নয়তো আদালতে যাও। এখনো আদালতের হাওয়া খায়নি তো, তাই। একবার কারুর পাল্লায় পড়লে আর এই তেজ থাকবে না। ভারি তানাশাহ* বনে গেচে।"

* তানাশাহ=কেউকেটা

"আমি তো বলেচি মহারাজ পাই পয়সা চুকিয়ে দোব।"

"তাহলে কাল থেকে আমার ওখেনে কাজ করতে আসতে হবে।"

"নিজের আখ রুইতে হবে মহারাজ, নয়তো তোমার কাজই করতুম।"

দাতাদীন চলে গেলে গোবর তিরস্কারের সুরে বলে, "গেছিলেন দেবতাকে পটাতে। তোমরাই সব লোককে মাতায় তোল। তিরিশ টাকা দিয়ে দুশো টাকা নেবে, আবার ডাঁট দেখাবে, মজুরি করাবে। কাজ করাতে করাতেই মেরে ফেলবে।"

"নীতিভেরেষ্ট হওয়া কি ভালো বাবা, নিজের নিজের কাজ সংগে যাবে। আমি যে সুদে টাকা ধার নিইচি সেতো দিতেই হবে। তায় আবার বামুন। ওঁর পয়সা আমরা হজম করতে পারবো? এসব জিনিষ ওঁরাই পারেন।"

"নীতি ছাড়তে কে বলেচে? আর কেই বা বলচে বামুনের পয়সা মেরে দিতে। আমি শুধু বলিচি এত সুদ দোব না। ব্যাঙ্কওয়ালারা বারো আনা সুদ নেয়, তুমি একটাকাই নাও। নয়তো কি কারুর সর্বশ্ব লুটেপুটে নিতে হবে।"

"উনি যে দুঃখ পাবেন।"

"পাকগে। ওর জন্যে আমরা আমাদের কবর খুঁড়তে যাবো কেন?"

"আমি যতক্ষণ বেঁচে আচি, আমাকে নিজের রাস্তায় চলতে দাও বাবা। যখন আমি থাকবো না তোমার যা ইচ্ছে তাই কোরো।"

"তাহলে তুমিই শুধো। আমি নিজের হাতে নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে পারবো না। তোমাদের মধ্যে কথা কওয়াই ঝকমারি—তুমি খেয়েচো তুমিই শোদ কোরো। আমি কেন শুধুমুদু আমার পেরানটা দোব?" একথা বলে গোবর ঘরের মধ্যে চলে গেলে ঝুনিয়া বলে, "আজ সকাল সকাল বাবার সংগে ঝগড়া করছিলে কেন?"

গোবর সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়ে শেষে বলে, "বাবার ওপর ধারের বোজা আপনিই বেড়ে যাবে। আমি আর কত দোব। বাবা রোজগার করে করে অপরের ঘর ভরবে। আমি কেন ওর খোঁড়া খানাখন্দে পড়তে যাবো। আমাকে জিজ্ঞেস করে তো আর টাকা ধার নেয়নি। আমার জন্যেও নেয়নি।"

ওদিকে মোড়লেরা গোবরকে জব্দ করার ষড়যন্ত্র করতে বসে। 'এই ছোঁড়াকে কোন প্যাঁচে ফেলতে না পারলে তো সারা গাঁয়ে হৈচৈ পড়ে যাবে'। পেয়াদা থেকে উজীর হয়েচে তো, বাঁকা পথে তো চলবেই। কে জানে কোত্থেকে এত আইন-কানুন শিখে এসেচে। সারা গাঁয়ের ছোঁড়ারা জুটে কী অনত্থটাই না করলে। কিন্তু মোড়লদের মধ্যেও ঈর্ষার অভাব ছিল না, সবাই নিজের সমমর্যাদার লোকেদের নিয়ে হাসাহাসি করায় খুশি হয়েছে। পটেশ্বরী ও নোখেরামের মধ্যে কথা হচ্ছিল। পটেশ্বরী বলে, "সবার ঘরের সব খবর যেন নখদর্পণে। ঝিঙুরী সিং-কে নিয়ে সবাই যা হাসালো বলার কথা নয়। দুই ঠাকরুণের কতা শুনে তো লোকে হেসে কুটিপাটি হলো।"

নোখেরাম ঠাট্টা করে, "নকলটা ঠিকই করেচে। আমি কয়েকবার ওঁর ছোট বেগমকে দোরে দাঁড়িয়ে ছোঁড়াদের সংগে হাসি মস্করা করতে দেখেচি।"

"আর বড়ো রানী তো আলতা সিঁদুর কাজল পরে ছুঁড়ি সেজে বসে থাকে।"

"দুজনের মধ্যে রাতদিন ঝগড়া। ঝিঙুরীটা পাক্কা বেহায়া। আর কেউ হলে পাগল হয়ে যেত।"

"শুনিচি তোমারও বিচ্ছিরি নকল করেচে। চামারের ঘরে বন্ধ করে পিটিয়েচে।"

"আমি তো বাছার কাছে বকেয়া খাজনা দাবি করবো ঠিক করিচি। সেও বুজবে কার পাল্লায় পড়েচি।"

"খাজনা তো মিটিয়ে দিয়েচে।"

"আমি তো এখনো রসিদ দিইনি। প্রমাণ কি যে খাজনা চুকিয়ে দিয়েচে। এখেনে কে আর হিসেব-কিতেব দ্যাখে? আজই প্যায়দা পাঠিয়ে ডাকাচ্চি।"

হরি আর গোবর আখ রোয়ার জন্যে জল সেচ করছিল। এবারে আশাই ছিল না তাই ক্ষেত এমনিই পড়েছিল। এখন বলদ এসে গেছে তাহলে আর আখ রোয়া হবে না কেন?

কিন্তু দুজনে যেন কেউ কাউকে চেনে না। কথা বলে না, তাকায় না। হরি বলদ হাঁকাচ্ছিল আর গোবর মোট বইছিল। সোনা আর রূপা দুজনেই ক্ষেতে জল দিচ্ছিল বটে তবে তাদের ঝগড়া চলছিল। ঝগড়ার বিষয়, ঝিঙুরী সিংয়ের ছোট্ ঠাকুরনী আগে নিজে খায়, না স্বামীকে খেতে দেয়। সোনার মতে, আগে ঠাকুরনী খায় রূপা বিরুদ্ধ মত পোষণ করে, তাহলে ঠাকুরনী মোটা হয়নি কেন? ঠাকুর অনেক মোটা। ঠাকুরনীর ঘাড়ের ওপর পড়লে তো সে পিষে যাবে। সোনা প্রতিবাদ করে, "তুই ভাবিস ভালো খেলে লোকে মোটা হয়? দূর বোকা, ভালো খেলে শক্তি বাড়ে। মোটা হয় না। মোটা হয়, ঘাস পাতা খেলে।"

"তাহলে ঠাকুরনী ঠাকুরের চেয়ে বলবান?"

"নাতো কি! এই তো সিদিন দুজনের লড়াই হলো। ঠাকুরনী এমন ঠ্যালা মারলো যে ঠাকুর পড়ে গিয়ে কোমর ভাঙলো।"

"তাহলে তুইও আগে নিজে খেয়ে তবে বরকে খাওয়াবি?"

"আর কি?"

"মা তো আগে বাবাকে খাওয়ায়।"

"তাইতো যখনি দেখি বাবা মাকে বকে। আমি নিজের মরদকে কাবু করে রাখবো। তোর মরদ তোকে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে ছাতু করে দেবে।"

"কেন মারবে? আমি মার খাবার কাজই করবো না।"

"তবু মারবে। তোকে ধরে ঠ্যাঙতে ঠ্যাঙাতে চামড়া খুলে নেবে।"

রূপা রেগে সোনার শাড়ি দাঁত দিয়ে ছেঁড়ার চেষ্টা করে, না পেরে জ্বালায়।

সোনা আরো রাগায়, তোর নাকও কেটে নেবে।"

একথা শুনে রূপা সোনার হাতে কামড়ে দেয়। রক্ত বেরোতে সোনা তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে কেঁদে ওঠে। রূপাও পড়ে গিয়ে কাঁদে।

ওদের চীৎকার শুনে গোবর চটে গিয়ে দুজনের পিঠেই গুম গুম করে কিল

বসিয়ে দিলে তারা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে যায়। সেচের কাজ বন্ধ হলো এবং বাপ-বেটায় একচোট ঝগড়া হয়ে গেল।

হরি বলল,"জল কে দেবে? দৌড়ে গিয়ে যে দুজনকে ভাগিয়ে দিলে, এখন মানিয়ে ডেকে আনো গে।"

"তোমার দোষেই এরা বিগড়ে গেচে।"

"এমন করে মারলে আরো বেহায়া হয়ে উঠবে।"

"দুটো বেলা খেতে না দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

"আমি ওদের বাপ, কসাই নই।"

পায়ে একবার ঠোকর খেলে চলতে ফিরতে সেখানেই বাজে, আর এভাবেই ক্ষতটা পেকে উঠে মাসখানেক ভোগায়। বাপ-বেটার সদ্ভাব আজ সেভাবেই একটি চোট খেলো আর এই নিয়ে তিনবার হলো।

গোবর ঘরে গিয়ে ঝুনিয়াকে ক্ষেতে জল দেবার জন্যে নিয়ে গেলো। ধনিয়া আর তার দুই মেয়ের অবাক চোখের সামনে দিয়ে ঝুনিয়া ছেলে-কোলে ক্ষেতে কাজ করতে গেল। ধনিয়ারও গোবরের এত বাড়াবাড়ি ভালো লাগেনি। রূপাকে নাহয় মেরেছে, কিন্তু সোনা যুবতী মেয়ে, তাকে ধরে মারা তার পক্ষেও অসহ্য বোধ হলো।

আজ রাতেই গোবর স্থির করে সে লক্ষ্ণৌ ফিরে যাবে। এখানে সে থাকতে পারে না। বোনেদের একটু মেরেছে তো কি? সে কি বাইরের লোক? তাহলে এই সরাইখানায় সে থাকবে কেন?

দুজনে খেয়ে উঠে বাইরে আসছে এমন সময় নোখেরামের পেয়াদা এসে ডাকে, "চলো, গোমস্তা সায়েব ডেকেচেন।"

হরি গর্ব করে বলে, "রাতে কেন ডেকেচেন; আমি তো বাকি চুকিয়ে দিয়েচি।"

"আমায় শুধু তোমায় ডাকার হুকুম হয়েচে, ওখেনে গে যা বলবার বলোগে।"

হরির ইচ্ছে ছিল না কিন্তু যেতেই হলো। গোবর বিরক্ত হয়ে বসে থাকে। আধঘন্টা পরে হরি ফিরে যখন তামাক সেজে ছিলিম টানতে বসে তখন আর থাকতে না পেরে গোবর বলে, "কেন ডেকেছিল?"

হরি বিপন্ন কণ্ঠে বলে, "আমি সমস্ত খাজনা পাই-পাই করে চুকিয়ে দিয়েচি তবু বলচে তোমার দুবছরের খাজনা বাকী আচে। এই সেদিন আখ বেচে ওখেনেই আমি পঁচিশটা টাকা ওর হাতে দিয়েচি, আর আজ বলচে দুবছরের খাজনা বাকী আচে। বলেচি, আমি এক পয়সাও দোব না।"

"তোমার কাছে রসীদ থাকবে তো।"

"রসিদ দেয় কই?"

"বিনা রসিদে তুমি টাকা দাও কেন?"

"আমি কি জানতুম ওরা বেইমানী করবে। এসব তোমার জন্যে হলো। তুমি রাতে ওদের নে হাসি তামাশা করবে, এ তারই দন্ড। জলে বাস করে

কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা যায় না। সুদ লাগিয়ে সত্তর টাকা বাকী দেখিয়েচে। এ টাকা আসবে কোত্থেকে শুনি?"

"তুমি রসিদ নিলে আমি হাজারবার তামাশা করলেও তোমায় ছুঁতে পারতো না। বুজতে পারি না, লেনদেনের ব্যাপারে তুমি সাবধান হয়ে কাজ করো না কেন? ও যদি রসিদ না দেয় তবে ডাকে পাঠাও। এক-আধটাকা মাশুল দিতে হবে, এরকম ধাঁধায় তো পড়বে না।"

"তুমি এই ঝামেলা না পাকালে কিছুই হতো না। এখন সব মোড়ল বিগড়ে বেদখলীর ভয় দেখাচ্চে। ভগমান জানেন, কি করে এ ঝামেলা মিটবে।"

"আমি গে জিজ্ঞেস করচি।"

"তুমি আরো আগুন লাগিয়ে আসবে।"

"যদি আগুন দিতে হয় তো তাও দোব। ও দখল নিতে যাচ্চে, নিক। আদালতে আমি ওকে গঙ্গাজল নে দিব্যি দেওয়াবো। তুমি ন্যাজ গুটিয়ে ঘরে বসে থাকো। আমি জান্ দিয়ে লড়বো। আমি কারুর এক পয়সা খেতেও চাই না, নিজের এক পয়সা খোয়াতেও চাই না।"

সে তৎক্ষণাৎ চৌপালে গিয়ে হাজির হলো। দেখে সব মোড়লদের বৈঠক বসেছে। গোবরকে দেখে সবাই সতর্ক হয়ে ওঠে। গোবর উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, "এসব কি শুনচি গোমস্তাসায়েব, বাবা তোমাকে সব খাজনা চুকিয়ে দেবার পর এখনও আমাদের খাজনা বাকী আছে বলচেন। এ কী রকম গোলমেলে কতা?"

নোখেরাম আরাম করে শুয়ে রোয়াব দেখিয়ে বলে, "যতক্ষণ হরি আচে আমি তোমার সঙ্গে লেনদেনের কতা বলবো না।"

"কেন? আমি ঘরের কেউ নই?"

"তোমার নিজের ঘরে তুমিই সব কিছু হতে পারো এখেনে কিছু নও।"

"ভালো কথা। তুমি দখলী দায়ের করো। আমি আদালতে তোমাকে গঙ্গাজল স্পর্শ করে দিব্যি দিইয়ে তবে টাকা দোব। এই গাঁয়েরই শত্‌খানেক সাক্ষী জোগাড় করে দেখিয়ে দোব তুমি টাকা নাও, রসিদ দাও না। সাদাসিধে চাষা, কিছু বলি না বলে তোমরা ভেবে নিয়েচো আমরা সবাই বোকাবাঁদর, তাই না। রায়সায়েব ওখেনেই থাকেন, যেখেনে আমি থাকি। গাঁয়ের লোক ওঁকে জুজুর মতো ভয় করতে পারে, আমি করি না। একটি একটি করে সব কতা তাঁকে বলবো আর দেখবো তুমি কেমন করে আমার কাছ থেকে দুবার টাকা উসুল করো।"

তার কথায় সত্যের জোর ছিল। ভীরু প্রাণীর ভেতরে সত্যও বোবা হয়ে যায়। একই সিমেন্ট ইঁটের ওপর পড়ে পাথর আর মাটির ওপর পড়ে মাটি হয়ে যায়। গোবরের নির্ভীক সত্যবাদিতা নোখেরামের দুর্বল প্রাণকে বিদ্ধ করলো। সে কিছু মনে করবার চেষ্টা করে বলে, "তুমি এত গরম হচ্চো কেন? এত রাগের কি আচে? হরি যদি টাকা দিয়ে থাকে নিশ্চয় কোথাও না কোথাও লেখা আচে। আমি কাল কাগজপত্র বার করে দেখবোখন। এখন আমার একটু একটু মনে পড়চে হরি টাকা দিয়েছিল বটে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো টাকা যদি

এখেনে এসে থাকে, কোত্থাও যাবে না। সামান্য টাকার জন্যে তুমি মিথ্যে বলবে কেন? আর আমিই বা কটা টাকা নে বড়োলোক হয়ে যাবো নাকি?"

গোবর চৌপাল থেকে ফিরে হরিকে অকথ্য ভাষায় হেনস্তা করে। বেচারা স্বার্থভীরু বুড়ো কোণঠাসা হয়ে পড়ে। গোবর বলে, "তুমি তো সবার অধম তাই বেড়ালের মিউ-মিউ শুনেও চেঁচাও। কোঁথায় কোথায় তোমাকে রক্ষে করবো। আমি তোমাকে সত্তর টাকা দে যাচ্চি। দাতাদীন নেয় তো রশিদ লিখে তবে দিও। এর ওপর তুমি একটা পয়সা দিলে পরে আমার কাছ থেকে আর একটি পয়সাও পাবে না বলে দিচ্চি। তুমি নিজেকে বিলিয়ে দেবে আর আমি বিদেশ বিভুঁই-এ পড়ে থেকে রোজগার করে তা শোধ করবো। তা হবে না। আমি কাল চলে যাবো। শুধু বলে যাচ্চি, কারুর কাছ থেকে এক পয়সা ধার নিও না, কিছু দিও-ও না। মগরু, দুলারী, দাতাদীন—সব্বাইকে এক টাকা সুদে দিতে হবে।"

ধনিয়া খেয়েদেয়ে বাইরে এসেছিল। বলে, "এখনি কেন যাচ্চো বাবা, দু-চারদিন আরো থেকে আখটা রুয়ে নিয়ে, দেনাপাওনার হিসেবটা ঠিক করে নে তবে যাও।"

গোবর ওজন রেখে বলে, "আমার রোজ দু-তিন টাকা ক্ষেতি হচ্ছে। তা তো বোজো! এখেনে আমি বড়োজোর চার আনার মজুরী করতে পারি। এবার আমি ঝুনিয়াকেও সঙ্গে নে যাবো। ওখেনে আমার খাওয়া-দাওয়ার বড্ডো কষ্ট হচ্ছে।"

ধনিয়া ভয়ে ভয়ে বলে, "যেমন তোমার ইচ্চে। তবে ওখেনে ও একলা কি ঘর সামলাতে পারবে? বাচ্চাটাকেই বা দেখবে কে?"

"এখন বাচ্চাকে দেখবো না নিজের সুবিধে দেখবো? আর হাত পুড়িয়ে রোজ চুলো জ্বালতে পারচি নে।"

"নে যেতে আমি বারণ করচি নে। কিন্তু পরদেশে বাচ্চাকাচ্চা নে থাকা তাই বলছিলুম। সেই বলে, "না কোই আগে না কোই পীছে" *কত ঝঞ্ঝাট ভাবো দিকিনি।"

"পরদেশে সঙ্গী সাথী আপনি জোটে মা, আর এ তো স্বাথের সংসার। যার সঙ্গে দুঃখ ভাগ করে নেবে সেই আপনজন। খালি হাতে তো মা-বাপও পোঁছে না।"

ধনিয়া কথাটা বুঝতে পেরে আগুন হয়ে ওঠে, "মা বাপকেও তুমি পয়সার ইয়ারদোস্তদের সঙ্গে এক মনে করো।"

"তাই তো দেখচি।"

না দেখতে পাচ্চো না। মা বাপের মন এত নিষ্ঠুর হয় না। তবে ছেলেরা চার পয়সা রোজগার করতে শিখে মা-বাপের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এই গায়েই একটা-দুটো নয় দশ-বিশটা ছেলে দেখিয়ে দোব। মা-বাপ ধারকর্জ করে

*না কোই আগে না কোই পীছে=আগে পিছে কেউ কোথাও নেই।

কার জন্যে? ছেলেমেয়ের জন্যেই তো নাকি নিজেদের ভোগবিলাসের জন্যে।"

"কে জানে তোমরা কেন ধার নিয়েছিলে। আমি তো এক পয়সার কথাও জানি না।"

"আপনিই এত বড়ো হয়ে গেলে?"

"পালতে-পুষতে তোমাদের কি খরচ হয়েচে বলো তো? যদ্দিন বাচ্চা ছিলুম, দুধ খাইয়েচো, তারপর বেওয়ারিশের মতো ছেড়ে দিয়েচো। যা সবাই খেয়েচে, আমিও তাই খেয়েচি। আমার জন্যে দুধ মাখন কিচ্ছু আসতো না। এখন তুমি আর বাবা চাও আমি সব ধার দেনা মেটাই, খাজনা দিই, মেয়েদের বে দিই। যেন আমার জেবন তোমাদের দেনা শোধ করতেই আচে। আমারও তো বালবাচ্চা আচে।"

ধনিয়ার মন অবসন্ন হয়ে ওঠে। এক মুহূর্তের মধ্যে তার জীবনের সব আশা স্বপ্নের মতো ভেঙে গেল। এতক্ষণ সে ভাবছিল, তার দুঃখদারিদ্র্য সব দূর হবে। গোবর আসার পর থেকে তার মুখে হাসি যেন ধরছিল না। আজকের কথাগুলো সব আশা নির্মূল করে দিল। আর কোন সুখের আশায় সে বাঁচবে?

কিন্তু না, তার গোবর এত স্বার্থপর নয়। সে তো কখনো মায়ের কথার ওপর কথা বলেনি, রুখোশুকো যা পেয়েছে তাই খেয়েছে। সেই ভোলাভালা শান্তশিষ্ট ননীর পুতুলটি এসব কথা বলছে? কই তারা তো গোবরের কাছে কিছু চায়নি। ঝুনিয়াকে নিয়ে যেতে চায়, যাক না। তাদের কথা ভেবেই ধনিয়া বলেছিল। এমন কি বলেছে যে ছেলে এত চটে গেল? এ আগুন নিশ্চয় ঝুনিয়া লাগিয়েছে। ওই বসে বসে কানে মন্তর পড়ছে। এখানে সাজ-শৃঙ্গার * হয় না, কাজ করতে হয়। ওখানে টাকা পয়সা হাতে আসবে। একলা ঘরে গিন্নী! ভালো খাবে, ভালো পরবে, পা ছড়িয়ে শোবে। সব উপদ্রব তো ওই সৃষ্টি করেছে। বোকা ছেলেটাকে ফাঁসিয়ে পাঁচ মাসের পেট নিয়ে এখানে এসে উঠলো। ওই রাক্ষুসীর জন্যেই তো জরিমানা, বদনাম, একঘরে হওয়া, চাষবাস সব গেল। ডাইনী যে পাতায় খায় সেটাই ছ্যাঁদা করে! দুঃখিত স্বরে বলে, "এই মন্তর তোমায় কে দিল বাবা, তুমি তো এমন ছিলে না। তোমারি মা-বাপ, তোমারি বোন, ঘরও তোমার। আমরাই কি চেরকাল থাকবো? ঘরের মান ইজ্জত বজায় রাখলে তুমিই সুখী হবে। মানুষ ঘরের লোকের জন্যেই আয় করে বাবা, নিজের পেট তো শুয়োরও পালতে পারে। আমি জানতুম না, ঝুনিয়া কালনাগিনী হয়ে আমায় দংশাবে।"

গোবর রেগে বলে, "মা আমি বোকা নই যে ঝুনিয়া আমাকে মন্তর পড়াবে। তুমি ওকে নাহক ঠুকচো। তোমার গেরস্থালীর সারা বোঝা আমি বইতে পারবো না। যা পারবো, করবো কিন্তু পায়ে বেড়ি পরবো না।"

ঝুনিয়াও বেরিয়ে এসে বলে, "মা 'জুলাহে কা গুস্‌সা দাড়ী পর' **

* সাজ-শৃঙ্গার=সাজসজ্জা।

** জুলাহে কা গুস্‌সা দাড়ী পর=তাতীর রাগ দাড়ির ওপর/উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

নামাচ্চো কেন? কেউ কচি খোকা নয় যে আমি তাকে বোজাতে যাবো। নিজের ভালোমন্দ সবাই বোজে। সারা জেবন খেটেখুটে খালি হাতে মরবার জন্যে কেউ জন্মায় না। সবাই সুখ চায়, চায় দুটো পয়সা হোক।"

ধনিয়া দাঁতে দাঁত পিষে বলে, "আচ্ছা, ঝুনিয়া তুইও জ্ঞান দিতে এলি। এখন তুইও নিজের ভালোমন্দ ভাবার লায়েক হয়ে গেচিস। যখন এখেনে এসে আমার পায়ে কেঁদে পড়েছিলি তখন নিজের ভালোমন্দ দেখতে পারসনি? আমরাও যদি সেদিন নিজেদের ভালোমন্দ ভাবতে বসতুম তাহলে তোর ঠিক ঠিকানা থাকতো নাকি?"

এরপরে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-গালমন্দ-থুতু দেওয়া-অপমান করা যার তুণে যা আছে সব বর্ষণ হলো। গোবরও চুপ করে ছিল না। সোনা-রূপা চুপচাপ দাঁড়িয়ে, হরি বসে বসে নীরবে শোনে। দুলারী, পুনিয়া ও আরো কয়েকজন মধ্যস্থতা করতে আসে। দুজনেই নিজের নিজের সাফাই দিয়ে পরের দোষ গায়। ঝুনিয়া পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে হীরে-শোভার প্রতি সহানুভূতি দেখায়। 'ধনিয়ার আজ পর্যন্ত কার সঙ্গে মিলমিশ হয়েছে যে ঝুনিয়ার সঙ্গে হবে'? ধনিয়াও আত্মপক্ষ সমর্থন করে। কিন্তু জনমত ঝুনিয়ার পক্ষে ছিল। হয়তো সে একটু সংযত বলে কিংবা পয়সাওলা স্বামীর বৌ বলে সবাই তাকেই খুশি করতে চায়।

শেষে হরি উঠে এসে বলল, "আমি তোর পায়ে পড়চি ধনিয়া, চুপ কর্। আমার মুখে আর কালি মাখাস নে। এখনো যদি পেরান না ভরে থাকে তবে শোন্ যত পারিস।"

ধনিয়া মাথা তুলে ওদিকে ছোটে, "তুমিও মোটা ডাল ধরতে ছুটলে? আমিই দোষী হলুম। ও আমার ওপর ফুল বর্ষাচ্চে নাকি?"

সংগ্রামের ক্ষেত্র বদলে যায়। হরি বলে, "যে ছোট তার সঙ্গে তক্ক করলে ছোট হতে হয়।"

ধনিয়া ঝুনিয়াকে ছোট বলে মানতে রাজী নয়। হরি ব্যথিত হয়ে বলে, "আচ্ছা ও ছোট নয়, বড়োই সই। যে মানুষ থাকতে চায় না তাকে কি বেঁধে রাখবি? ছেলেকে বড়ো করা মা বাপের ধম্ম। তা আমরা করিচি। এখন ওদের ন্যাজ-পালক গজিয়ে গেচে। এখন কি তুই চাস ওরা তোকে দানা খুঁটে খাওয়াবে। মা-বাপের ধম্ম ষোলো আনা ছেলের সঙ্গে, ছেলের ধম্ম মা-বাপের জন্যে কানাকড়িও নয়। যে যেতে চাচ্চে তাকে আশীর্বাদ করে বিদেয় দে। আমাদের মালিক ভগমান। ভাগ্যে যত ভোগ আচে ভুগতে হবে। সাতচল্লিশটা বছর এমনি কেঁদেকেটে কাটলো। বাকি পাঁচ-দশটা বছরও কাটবে।"

গোবর যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়। এবাড়ির জলও তার কাছে 'হারাম'*। মা হয়ে যখন এসব কথা শোনালো তখন সে আর মায়ের মুখ দেখবে না। তার বিছানা পত্তর বাঁধা শেষ। ঝুনিয়াও চুনরী** পরে নিয়েছে। চুন্নু টুপী, ফ্রক

*হারাম=নিষিদ্ধ খাদ্য। **চুনরী=বাঁধুনী শাড়ি/রঙীন শাড়ি।

পরে রাজা বনে গেছে। হরি আর্দ্র কণ্ঠে বলে, "বাবা তোমাকে কিছু বলার মুখ নেই কিন্তু মন মানে না। যাবার আগে অভাগী মায়ের একটু পা ছুঁয়ে গেলেও কি খরাপ হবে? যে মায়ের কোলে জন্ম নিয়েচো, দুধ খেয়ে বড়ো হয়েচো। এটুকু করতে পারবে না?"

গোবর মুখ ফিরিয়ে বলে, "আমি ওকে আমার মা মনে করি না।"

ঝুনিয়া শাশুড়ীর কাছে গিয়ে তার পায়ে আঁচল ছুঁইয়ে প্রণাম করে, ধনিয়ার মুখ থেকে আশীর্বাদের একটি কথাও বেরোয় না। সে চেয়েও দেখলে না। গোবর ছেলে কোলে আগে আগে যাচ্ছিল, পেছনে ঝুনিয়া বিছানা বগলে। একটা চামারের ছেলে বাক্স নিয়ে এগোয়। কিছু মেয়ে-পুরুষ তাদের গ্রামের সীমান্তে পেঁাছে দেয়। ধনিয়া কাঁদছিল। তার বুকটা যেন কে করাত দিয়ে চিরছে। তার মাতৃত্ব যেন একটা ঘর, তাতে আগুন লেগে সব ছাই হয়ে গেছে। বসে বসে কাঁদবার জায়গাটুকুও নেই।

২২

কিছুদিন ধরে রায়সাহেবের মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। তার সঙ্গে ইলেক্শনের ঝামেলাও আছে। কিন্তু এসবের চেয়েও এখন তাঁর পক্ষে জরুরী ব্যাপার হলো একটা দেওয়ানী মামলা দায়ের করা। যার কোর্ট ফীই পঞ্চাশ-হাজার টাকা, অন্যান্য খরচ আলাদা। রায়সাহেবের এক শালা মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তাই রায়সায়েব নিজের ছেলের হয়ে শ্যালকসম্পত্তি অধিকারের জন্যে আইনের সাহায্য নিতে চান। তাঁর খুড়তুতো শালাও রায়সাহেবকে বঞ্চিত করে ঐ সম্পত্তি হাতাবার তালে ছিলেন। রায়সাহেব আপোষ-মীমাংসার পক্ষ-পাতী হলেও শালা কোন বোঝাপড়ায় এলো না। শুধু লাঠির জোরে সমস্ত আদায়-উসুল করতে শুরু করে দিল। রায়সাহেবের আদালতে যাওয়া ছাড়া উপায় রইল না। মোকদ্দমায় লাখ টাকা খরচ হবে, সম্পত্তিও বিশ লাখের কম নয়। এমন সুযোগ কে ছাড়ে? তবে তিনটে কাজই একসঙ্গে এসে পড়ায় রায়-সাহেব দিশেহারা হয়ে পড়লেন।

মেয়ের বয়স আঠারো হয়ে গেছে শুধু হাতে টাকাটা না থাকাতেই বিয়েটা এখনো হয়নি। খরচ হবে লাখ টাকা, যার কাছে যান তারই বিরাট হাঁ। সম্প্রতি একটা মস্ত সুযোগ এসে গেল। কুমার দিগ্বিজয় সিংয়ের স্ত্রী যক্ষায় মারা গেলে কুমারসাহেব শূন্য ঘর যত শীঘ্র সম্ভব সাজিয়ে তোলার মনস্থ করলে সব কথা-বার্তা পাকা হয়ে গেল। এমন শিকার যাতে হাতছাড়া না হয়ে যাই তাই বিয়েটা অবিলম্বে হওয়া দরকার।

কুমারসায়েব কুব্যসনের ভাণ্ডার। মদ, গাঁজা, আফিম, চরস, মোদক—এমন কোন নেশা নেই যা তাঁর ছিল না। আর আয়েস বিলাস তো ধনীরদের অঙ্গ! এত দুর্গুণ থাকা সত্বেও তাঁর প্রতিভা ছিল। সঙ্গীত, নাটক, জ্যোতিষ, যোগ, কুস্তী, লাঠি খেলা, লক্ষ্যভেদেও তাঁর জুড়ি ছিল না। যেমন দাম্ভিক তেমনি নির্ভীক। স্বদেশী আন্দোলনে গোপনে অর্থসাহায্য করতেন। শাসকরা

জানতেন তবু কিছু করতে পারতেন না। বরং বছরে দু একবার তাঁর বাড়িতে অতিথিও হতেন। বয়স তিরিশ বত্রিশের বেশি নয়, স্বাস্থ্যও ভালো, একা একটা ছাগল হজম করতে পারেন।

রায়সাহেব ভাবলেন বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে। অবিলম্বে কথা-বার্তা শুরু করে দিলেন। কুমারসাহেবের কাছে বিয়ে শুধু প্রভাববৃদ্ধির উপায়-মাত্র। রায়সাহেব কাউন্সিলের মেম্বার তায় স্বদেশী আন্দোলনে জেলে গিয়ে নিজে শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়েছেন। বিয়ে স্থির হতে বাধা ছিল না।

বাকী রইল ইলেকশন! সে তো সোনার হেঁসো—না গেলা যায়, না ওগরানো যায়। এখন পর্যন্ত রায়সাহেব দুবার নির্বাচিত হয়েছেন, দুবারেই বিস্তর খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু এবার রাজাসাহেব ঐ কেন্দ্র থেকেই দাঁড়িয়ে ডংকা মেরে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যদি প্রত্যেক ভোটারকে এক এক হাজার করে টাকা দিতে হয় আর তাতে পঞ্চাশ লাখ টাকার জমিদারী মাটিতে মিলিয়ে গেলেও তিনি রায় অমরপালসিংকে কাউন্সিলে যেতে দেবেন না। রায়সাহেব বুদ্ধিমান ও হিসেবী হলেও জাতে রাজপুত এবং ধনী। সুতরাং তিনিই বা সরে দাঁড়াবেন কি করে? যদি রাজা সূর্যপ্রতাপ সিং এসে বলতেন, 'ভাই আপনি তো দুবার কাউন্সিলে গেছেন এবার আমাকে যেতে দিন' তাহলে তিনি খুশি হয়েই রাজা-সাহেবকে স্বাগত জানাতেন। তাঁর দাঁড়াবার আরো একটা কারণ ছিল. মিস্টার তংখা বলেছিলেন, "আপনি দাঁড়িয়ে পড়ুন, পরে রাজাসাহেবের কাছ থেকে এক লাখ টাকার থলি নিয়ে বসে পড়বেন। রাজাসাহেব খুশি হয়েই লাখটাকা দেবেন। আমার সঙ্গে কথাবার্তাও হয়ে গেছে।" কিন্তু এখন সে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না তাছাড়া রাজাসাহেব কুমারসাহেব ও রায়সাহেবের ঘরাণার সংযোগকে নিজের পক্ষে ক্ষতিকর ভাবছিলেন। ওদিকে শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তিও যে রায়সাহেব পাবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং রায়সাহেবকে ধুলোয় মিশিয়ে ফেলাই উচিত।

বেচারা রায়সাহেবের উভয় সংকট। তাঁর সন্দেহ হচ্ছিল মিস্টার তংখা শুধু মতলব হাসিল করার জন্যেই তাঁকে ধোঁকা দিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে এখন তিনি রাজা সাহেবের দলে ভিড়েছেন। এ যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। কয়েক-বার ডেকে পাঠানোর পরেও তংখা হয় আসেন না নয় আসবো বলে ভুলে যান। অগত্যা রায়সাহেবই তাঁর বাড়ি গেলেন। তংখা তখন বাড়িতেই ছিলেন কিন্তু রায়সাহেবকে ঘন্টাখানেক প্রতীক্ষা করতে হলো। এই তংখা আগে রোজ রায়-সাহেবের দরজায় একবার হাজিরা দিতেন। আজ নীচে নামলেন অনেক পরে। মুখে সিগার গুঁজে হাসি মুখে হাত বাড়ালে রায়সাহেব ফেটে পড়লেন, "আমি একঘন্টা ধরে বসে আছি আর আপনি 'এই আসছি' বলে এতক্ষণে এলেন? আমি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করছি।"

মিস্টার তংখা সোফায় বসে নিশ্চিন্ত ভাবে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "আমি দুঃখিত। একটা জরুরী কাজে আটকে পড়েছিলাম আপনার ফোন করে আমার সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করা উচিত ছিল।"

আগুনে ঘি পড়লো কিন্তু রায়সাহেব সেটা চেপে গিয়ে বললেন, "হ্যাঁ ভুল হয়ে গেছে। আজকাল আপনার সময় খুব কম বোধহয়।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, নাহলে আমি নিশ্চয় যেতাম।"

"আমি ঐ ব্যাপারে এসেছি। মিটমাটের তো কোন আশা দেখছি না। ওদিকে যুদ্ধের আয়োজন ভালোই চলছে।"

"রাজাসাহেবকে তো আপনি জানেন। ঝামেলাবাজ, পুরো পাগল, একটা না একটা জিনিষ মাথায় চাপে। এখন রোখ চেপেছে রায়সাহেবকে হারাবো। চল্লিশ লাখ টাকার দেনা মাথায় ঝুলছে তবু হাবড়-তাবড় খরচ করছেন। চাকরদের ছমাস বেতন বাকী ওদিকে হীরামহল তৈরি হচ্ছে। শুনছি, ইংরেজ ম্যানেজার রাখবেন।"

"তাহলে আপনি কি করে বললেন যে মিটমাট হয়ে যাবে।"

"আমার দ্বারা যতদূর সম্ভব করেছি। আর কি করবো? কেউ যদি নিজের দু চার লাখ টাকা ওড়ায় তো আমার কী?"

"বিশেষ করে যখন ঐ দু চার লাখ টাকার দশ বিশ হাজার আপনার হাতে আসতে পারে।"

"রায়সাহেব, সব কথাই স্পষ্ট করে বলবেন না। এখানে আমিও সন্ন্যাসী নই, আপনিও না। আমরা সবাই কিছু না কিছু হাতিয়ে নিতেই এসেছি। "আঁখ কে অন্ধো আউর গাঁঠ কে পুরোঁ"* আপনিও খুঁজছেন আমিও খুঁজছি। আমি আপনাকে দাঁড়াতে বলেছিলাম আর আপনিও এক লাখের লোভে দাঁড়ালেন। যদি কোন ঝঞ্ঝাট না হতো তাহলে আজ আপনি এক লাখের মালিক হতেন, সব কাজও হাসিল হয়ে যেত। কিন্তু আপনার দুর্ভাগ্য চাল বদলে গেছে। আপনিই যখন বিপদে পড়লেন তখন আমি কি করবো? সময় নষ্ট না করে ওঁর ল্যাজ ধরলাম। কোন উপায়ে বৈতরণী পেরোতে হবে তো।

রায়সাহেবের ইচ্ছে করছিল তংখাকে গুলি মেরে উড়িয়ে দিতে। এই বজ্জাতটাই তাঁকে লাভের আশা দেখিয়েছিল এখন উল্টো সাফাই গাইছে। তবু সব গিলে ফেলে বললেন, "আপনি এখন কিছু করতে পারবেন না?"

"একরকম তাই।"

"আমি পঞ্চাশ হাজারেও রাজী।"

"রাজাসাহেব রাজী হবেন না।"

"পঁচিশ হাজারে তো রাজী হবেন?"

"কোন আশা নেই। উনি সাফ জবাব দিয়েছেন।"

"উনি বলেছেন না আপনি বলছেন?"

"আপনি আমাকে মিথ্যেবাদী ভাবছেন?"

*আঁখ কে অন্ধো আউর গাঁঠ কে পুরোঁ=চোখে দেখে না অথচ গাঁটে টাকা আছে/ 'বোকা মালদার লোক'

আমি আপনাকে মিথ্যেবাদী ভাবিনি। মনে হচ্ছিল, আপনি চাইলে ব্যাপারটা মিটে যেত।”

“তাহলে আপনি মনে করেন আমিই মিটমাট হতে দিইনি?”

“না, আমি তাও বলিনি। বলছিলাম, আপনি চাইলে কাজ হাসিল হয়ে যেত। আমি ঝামেলায় পড়তাম না।”

মিস্টার তংখা ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, “আপনি যখন স্পষ্ট কথা শুনতে চাচ্ছেন তখন শুনুন। আপনি যদি একটা দশহাজার টাকার চেক আমার হাতে দিয়ে দিতেন তাহলে আজ নিশ্চয় লাখ টাকা আপনার হাতে এসে যেত। কিন্তু আপনি চাইছিলেন রাজাসাহেবের টাকা পেয়ে গেলে আমাকে হাজার দুহাজার দিয়ে বিদায় করতে। কিন্তু আমি এরকম কাঁচা কাজ করি না। আপনি রাজাসাহেবের টাকা নিয়ে আমাকে কলা দেখাতেন। তখন আমি কি করতাম বলুন। কোথাও নালিশ করা তো যেত না।”

“আপনি আমায় এত বেইমান মনে করেন?”

তংখা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “একে বেইমানী বলছে কে? আজকাল একেই বলে বুদ্ধি। পরকে বোকা বানানোর ওপরেই তো সাফল্য নির্ভর করে। আর আপনি এসব বিদ্যার গুরু।”

“আমি?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি। প্রথমবারের ইলেকশনে আমি আপনার জন্যে আপ্রাণ খেটে পাঁচ শো টাকা পেলাম। দ্বিতীয়বার একটা ভাঙাচোরা পুরনো গাড়ি গছিয়ে দিলেন, ‘দুধ কা জলা ছাঁছ ভী ফুঁকফুঁক কর পীতা হ্যায়’*।”

রায়সাহেবের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। এই অশিষ্টতার কোন মানে হয়। একে একঘন্টা বসিয়ে রাখলো তার ওপর এই অভদ্রতা। শক্তি থাকলে তিনি মিস্টার তংখাকে তুলে আছাড় মারতেন। কিন্তু দুজনেই আকারে প্রকারে সমান। যখন মিস্টার তংখা হর্ন দিলেন তখন তিনিও বেরিয়ে নিজের গাড়ি চেপে মিস্টার খান্নার বাড়ি গেলেন।

বেলা নটা। কিন্তু মিস্টার খান্না এখনও নিদ্রামগ্ন। তিনি রাত দুটোয় শুয়ে সকাল নটায় ওঠেন কাজেই রায়সাহেবকে এখানেও আধঘন্টা বসতে হলো। সাড়ে নটার সময় খান্না হাসিমুখে বেরোলে রায়সাহেব কপট ধমক দিয়ে বললেন, “আচ্ছা, বাবুর ঘুম ভাঙলো তাহলে। টাকাকড়ি খুব জমিয়ে ফেলেছেন তো তাই। আমার মতো তালুকদার হলে এতক্ষণে কারুর দরজায় গিয়ে হাজির হতেন। বসে বসে মাথা ঘুরে গেল যে।”

খান্না তাঁকে সিগারেট দিয়ে প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, “রাত্রে শুতে বড়ো দেরী হয়ে গিয়েছিল। এখন কোথা থেকে আসছেন?”

রায়সাহেব সংক্ষেপে নিজের অসুবিধের কথা বুঝিয়ে বললেন। যদিও

*দুধ কা জলা ছাঁছ ভী ফুঁকফুঁক কর পীতা হ্যায়=দুধ খেয়ে যার মুখ পুড়ে গেছে সে ঘোল খাবার সময়ও ফুঁ দেয়। তুলনীয়ঃ ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়।

জানেন খান্না সহপাঠি হলেও সর্বদা তাঁকে ঠকাবার ফন্দীফিকির খোঁজেন তবু মনের রাগ চেপে মুখে খোশামোদ করেন। খান্না এমন একটা ভাব দেখালেন যেন তিনি বিষম চিন্তায় পড়ে গেছেন। বললেন, "আমার পরামর্শ এই যে ইলেকশান গুলি মারুন আর শালাদের সঙ্গে মোকদ্দমা দায়ের করে দিন। বাকী রইল বিয়ে, ও তো তিন দিনের তামাশা। তার পেছনে জেরবার হওয়া বৃথা। কুমারসাহেব আমার বন্ধু, দেনাপাওনার কোন প্রশ্ন উঠতেই পারে না।"

আপনি ভুলে যাচ্ছেন মিঃ খান্না আমি ব্যাঙ্কার নই, তালুকদার। কুমার-সাহেব দহেজ* চান না। ভগবান তাঁকে সব কিছু দিয়েছেন। আপনি তো জানেন, আমার মা-মরা একটিমাত্র মেয়ে। ওর মা আজ বেঁচে থাকলে আজ হয়তো সারা ঘর উজার করে সব দিয়েও সন্তুষ্ট হতো না। তখন হয়তো আমিই তাকে হাতটান করে খরচ করতে বলতাম; কিন্তু এখন তো আমি তার মা-বাপ দুই-ই। আমাকে যদি বুকের রক্তও বার করে দিতে হয় তাও আমি দেব। কাজেই এসময়ে খরচ কমানো অসম্ভব। আর ইলেকশনের মাঠ থেকেও আমার পক্ষে পালানো সম্ভব নয়। আমি জানি, আমি হারবো। রাজাসাহেবের সঙ্গে আমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই কিন্তু তাঁকে বুঝিয়ে দিতে চাই অমর পাল সিংও নরম মানুষ নয়।"

"মোকদ্দর্মা দায়ের করাও তো দরকার।"

"ওর ওপরেই তো সমস্ত আশাভরসা। এখন বলুন আপনি আমায় কিভাবে সাহায্য করতে পারেন?"

"আমার ডিরেক্টরদের এ বিষয়ে যে হুকুম আছে তা তো আপনি জানেন। আর রাজাসাহেবও আমাদের একজন ডিরেক্টর, তাও আপনি জানেন। কোনো নতুন মামলা নেওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।"

"আপনি যে আমার নৌকোই ডুবিয়ে দিচ্ছেন মিস্টার খান্না।"

"আমার নিজস্ব যা কিছু আছে তা আপনার। কিন্তু ব্যাঙ্কের ব্যাপারে আমাকে ওপরওয়ালাদের হুকুমই শুনতে হবে।"

"যদি এই সম্পত্তি হাতে এসে যায়, আর আমি মনে করি আসবেই, তাহলে আমি পাই পয়সা মিটিয়ে দেব।"

"আপনি এখন ঠিক কত জলে দাঁড়িয়ে আছেন?"

"পাঁচ-ছ লাখ ধরে নিন। একটু কমই হবে।"

"হয় আপনার মনে নেই, নয় লুকোচ্ছেন।"

"আজ্ঞে না। আমি ভুল করিনি, লুকোইওনি। আমার সম্পত্তি এখন কম-করেও পঞ্চাশ লাখ টাকার হবে আর শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তিও এর চেয়ে কম হবে না। এত সম্পত্তির ওপর পাঁচ-দশ লাখের বোঝা বলতে গেলে কিছুই না।"

"কিন্তু আপনি কি করে জানবেন যে শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তির ওপরও ঋণের বোঝা চাপানো নেই।"

* দহেজ=যৌতুক।

"যতদূর আমি জানি ঐ সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে বে-দাগ।"

"আমি খবর পেয়েছি ঐ সম্পত্তির ঋণের পরিমাণ দশ লাখের কম নয়। ঐ সম্পত্তি তো এখনো পাওয়ার ওপর নির্ভর করছে। আর আপনার সম্পত্তির ওপরেও আমার অনুমান দশ লাখ টাকার ঋণ আছে। সম্পত্তির পরিমাণও এখন পঞ্চাশ লাখ নয়, বড়োজোর পঁচিশ লাখ। এই অবস্থায় কোন ব্যাঙ্ক আপনাকে ঋণ দিতে পারে না। আপনি একটা জ্বালামুখীর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, হালকা ঠোক্কর খেলেই পাতালে পেঁছোতে পারেন। এসময় আপনার খুব সাবধানে চলা উচিত।"

"এসব আমি খুব বুঝি, বন্ধু। কিন্তু জীবনের ট্র্যাজেডি এই যে, আপনার মন যে কাজ করতে চায় না সেটাই আপনাকে করতে হয়। এবারের মতো আমাকে দু লাখ টাকা পাবার ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।"

"মাই গড্, দু লাখ! অসম্ভব। একেবারে অসম্ভব।"

"আমি তাহলে আপনার দরজায় মাথা খুঁড়ে মরে যাবো খান্না। আপনার ভরসাতেই যে সব প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলেছি। এখন নিরাশ করলে আমাকে হয়ত বিষ খেয়ে মরতে হবে। আমি সূর্যপ্রতাপ সিংএর সামনে হাঁটু গাড়তে পারবো না। মেয়ের বিয়ে দু চার মাস পরে দিলেও চলবে। মামলা দায়ের করারও সময় আছে কিন্তু ইলেকশন মাথার ওপর এসে গেছে।"

খান্না চমকে উঠে বললেন, "তাহলে আপনি ইলেকশনে দু লাখ টাকা খরচ করবেন?"

"ইলেকশনের প্রশ্ন নয় ভাই, আমার মান-সম্মানের ব্যাপার। আমার সম্মানের দাম দু লাখ টাকাও নয়? আমার সমস্ত জমিদারী বিকিয়ে গেলেও সূর্যপ্রতাপ সিংকে সহজে জিততে দেব না।"

খান্না এক মিনিট ধরে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "ব্যাঙ্কের যে পরিস্থিতি সে আমি আপনাকে বলেছি। লেনদেনের কাজ একরকম বন্ধ। আমি চেষ্টা করব যদি আপনার জন্যে কিছু করা যায়। কিন্তু বিজনেস ইজ বিজনেস। আমার কমিশন কত থাকবে? আপনার জন্যে বিশেষ করে সুপারিশ করতে হবে। অন্য ডিরেক্টরদের ওপর রাজাসাহেবের প্রভাব আছে। তাঁর দোষ ত্রুটি খুঁজে বার করতে হবে। আমার দেখাশোনার ওপরই সব নির্ভর করবে তো।"

রায়সাহেবের মুখ নীচু হয়ে গেল। খান্না তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু, একসঙ্গে পড়েছেন, ঘুরেছেন। আর এখন তাঁর কাছে কমিশন চান। এতদিন তিনি খান্নার খোশামোদ করে এলেন কেন? বাগানের ফল-মূল থেকে উপহারের ডালি পাঠান কেন? এই তার জবাব! উদাস হয়ে বললেন, "আপনার যা ইচ্ছে। কিন্তু আমি আপনাকে নিজের ভাই মনে করি।"

"সে আপনার দয়া। আমিও সবসময় আপনাকে নিজের দাদা ভাবি। কিন্তু ব্যবসা এক স্বতন্ত্র ক্ষেত্র। এখানে কেউ কারুর বন্ধু নয়, ভাই নয়। ভাই বলে আমি যেমন আপনার কাছে বেশি কমিশন চাইতে পারি না তেমনি আপনিও ভাই বলে কম কমিশন দিতে চাইবেন না। আপনার জন্যে যতটা করা সম্ভব

আমি করবো। ব্যস, বিজনেস খতম্। আপনি কিছু শুনেছেন? মেহতাজী তো আজকাল মালতীর ওপর বেজায় খুশী। সব ফিলসফি বেরিয়ে গেছে। দিনে দুবেলা হাজরি দিচ্ছেন, সন্ধ্যেয় একসঙ্গে হাওয়া খেতে যাচ্ছেন। সে যদি বলতে হয় আমাকে, কোনদিন মালতীর দোরে সেলাম ঠুকতে যাইনি। এখন সেই দোষেই এড়িয়ে যাচ্ছে। এতদিন তো যা কিছু ছিল সব মিস্টার খান্না আর এখন আমাকে দেখলেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফ্রান্স থেকে একটা ঘড়ি আনিয়ে দিতে গেলাম, নিল না। কাল তার বাড়িতে 'মেওয়ার' ডালি পাঠিয়েছিলাম, ফেরৎ পাঠালে। মানুষ কি করে এত শীগ্‌গির বদলে যায়?"

রায়সাহেব খান্নার হেনস্তায় মনে মনে খুশী হয়ে মুখে সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন, "যদি ধরে নেওয়া যায় মেহতার সঙ্গে ওঁর প্রেম চলছে তাহলেও এই ব্যবহারের কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"সেই তো দুঃখ রায়সাহেব। আমি তো জানি, সে কোনদিন আমার হবে না। আমি ভুল করেও ভাবিনি যে মালতী আমায় ভালোবাসে। প্রেম কি তা সে জানে না। আমি তো শুধু তার রূপের পূজারী ছিলাম। ওর জন্যে আমি হাজার হাজার টাকা নষ্ট করেছি ভাইসাহেব। আমার ঘর উজার হয়ে গেছে। মনে যত রস ছিল ঐ ঊষর মরুর গায়ে ঢালতে গিয়ে আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেছে। কত বছর কেটে গেছে আমি কামিনীর সঙ্গে কথা বলিনি। বেদেরা যেমন বাঁদর নাচায়, মালতীও ঠিক তেমনি করে আমায় নাচিয়েছে। সে আমার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা করেনি ঠিকই তবু আমি পতঙ্গের মতো ঐ সুন্দর মুখ-দীপটির জন্যে প্রাণ দিতে পারতাম। আর এখন সে আমার সঙ্গে দেখাও করে না। আমি কিন্তু চুপ করে থাকার লোক নই। ওর কাছ থেকে সব পাই-পয়সা উসুল করে তবে ছাড়বো। আর ডক্টর মেহতাকে লক্ষ্ণৌ থেকে দূর করে দিয়ে তবে ছাড়বো। ওর এখানে থাকা......"

ঠিক সেই সময় বাইরে হর্নের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মেহতা প্রবেশ করলেন। ফর্সা রঙ, স্বাস্থ্যের উজ্জ্বল আভা গালে ফুটে উঠেছে। ঝোলা আচকান, চুড়িদার পাজামা, সোনালি চশমা যেন সৌম্যকান্তি দেবদূত।

খান্না উঠে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন, "আসুন আসুন মেহতাজী, আপনার কথাই হচ্ছিল।"

মেহতা দুজনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললেন, "খুব ভালোসময়ে ঘর থেকে বেরিয়েছি তাই দুজনকেই একসঙ্গে পেয়ে গেলাম। কাগজে বোধহয় পড়েছেন এখানে মহিলাদের জন্যে একটা ব্যায়ামশালা তৈরির তোড়জোর চলছে। মিস মালতী ঐ কমিটির সভানেত্রী। মনে হচ্ছে এর জন্যে দুলাখ টাকা লাগবে। আমি চাই দাতাদের মধ্যে আপনাদের নাম সবার ওপরে থাকুক। মিস মালতী নিজেই আসতেন কিন্তু আজ তাঁর বাবার শরীর ভালো নয় বলে আসতে পারলেন না।"

মেহতা চাঁদার তালিকা রায়সাহেবের হাতে দিলেন। রাজা সূর্যপ্রতাপ সিং দিয়েছেন পাঁচ হাজার টাকা। কুমার দিগ্বিজয় সিং দিয়েছেন তিন হাজার টাকা।

এরপর আরো কয়েকজন, এদের সমান বা কম। মালতী দিয়েছেন পাঁচ শো আর মেহতা একহাজার টাকা। রায়সাহেব বললেন, "চল্লিশ হাজার তো তুলেই ফেলেছেন।"

"এ সবই আপনাদের দয়া। মাত্র তিন ঘন্টায় হয়েছে। সূর্যপ্রতাপ সিং কোন সার্বজনীন কাজে কিছু দেন না এবার কিছু না শুনেই চেক লিখে দিয়েছেন। দেশ জাগছে। জনতা যে কোন কাজেই সাহায্য করতে রাজী। সৎ কাজে ব্যয় হলেই হলো। আপনার কাছেও আমাদের অনেক আশা মিস্টার খান্না।"

খান্না উপেক্ষা ভরে বললেন, "আমি এসব বাজে কাজে জড়িয়ে পড়িনা। জানি না আর কত পশ্চিমের গোলামী করবেন। এমনিই মেয়েদের ঘরের ওপর অরুচি ধরে গেছে। ব্যায়ামের হুজুগ মাথায় চাপলে তো তারা কোথাও থাকবে না। যে মেয়ে ঘরের কাজ করে তার জন্যে কোন ব্যায়ামের প্রয়োজন নেই। আর যে ঘরের কোন কাজ করে না কেবল ভোগবিলাসে ডুবে থাকে, তার ব্যায়ামের জন্যে চাঁদা দেওয়া আমি অধর্ম বলে মনে করি।"

মেহতা একটুও নিরুৎসাহিত না হয়ে বললেন, "তাহলে আমি আপনার কাছে কিছু চাইবো না। যে কাজে বিশ্বাস নেই, তাতে কোনরকম সাহায্য করা বাস্তবিকই অধর্ম। রায়সাহেব আপনি নিশ্চয় মিস্টার খান্নার সঙ্গে একমত নন?"

রায়সাহেব গভীর চিন্তায় ডুবেছিলেন। সূর্যপ্রতাপ সিংএর পাঁচ হাজার তাঁকে হতাশ করেছিল। চমকে উঠে বললেন, "আপনি আমায় কিছু বললেন?"

"এব্যাপারে সাহায্য করাকে আপনিও অধর্ম ভাবছেন না তো?"

"যে কাজে আপনি জড়িত, সে ভালো না মন্দ আমি তার বিচার করবো না।"

"আপনি নিজেই সে বিচার করুন। আর এই আয়োজনকে সমাজের উপ-যোগী বলে মনে হলে সাহায্য করুন। মিস্টার খান্নার নীতি আমার খুব পছন্দ হয়েছে।"

খান্না বললেন, "আমি স্পষ্ট কথা বলি বলে আমার বদনাম আছে।"

রায়সাহেব দুর্বল হাসি টেনে বললেন, "আমার তো বিচার শক্তিই নেই। মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই আমি ধর্ম মনে করি।"

"তাহলে লিখুন ভালোরকম।"

"যা বলবেন, তাই লিখবো।"

"যা আপনার ইচ্ছে।"

"আপনি যা বলবেন তাই লিখবো।"

"দুহাজারের কম লেখা উচিত হবে কি?"

"আপনার চোখে তাহলে আমার সামর্থ্য এইটুকু।" তিনি কলম তুলে নিয়ে চাঁদার খাতায় নিজের নামের পাশে লিখে দিলেন পাঁচ হাজার। মেহতা তাঁর হাত থেকে চাঁদার খাতা ফেরৎ নিলেন। গ্লানিতে মন ভরে গেল কেন তিনি খাতাটা রায়সাহেবকে দেখাত গেলেন।

মিস্টার খান্না রায়সাহেবের দিকে উপহাসভরে তাকালেন 'কত বড়ো গাধা তুমি'।

হঠাৎ মেহতা রায়সাহেবকে জড়িয়ে ধরে উন্মুক্ত কণ্ঠে বললেন, "থ্রী চিয়ার্স ফর রায়সাহেব, হিপ হিপ হুররে!"

খান্না বললেন, "এঁদের মতো রাজা মহারাজা এসব কাজে দান না করলে দেবে কে?"

মেহতা বললেন, "আপনি তো রাজার রাজা কারণ এঁদের টিকি আপনার হাতে বাঁধা।"

রায়সাহেব খুশি হয়ে বললেন, "আপনি খুব সত্যি কথা বলেছেন মিস্টার মেহতা। আমরা নামেই রাজা, আসল রাজা তো আমাদের ব্যাঙ্কাররা।"

মেহতা খান্নাকে খোশামোদ করেন, "আপনার বিরুদ্ধে আমার কিন্তু কোন অভিযোগ নেই মিস্টার খান্না। আপনি এখনি এই কাজের শরীক না হতে চান না হবেন কিন্তু কোন না কোনদিন নিশ্চয় আসবেন। লক্ষপতিদের কৃপাতেই আমাদের সংস্থা চলে। স্বদেশী আন্দোলনকে এত ধুমধাম করে চালাচ্ছে কে? এত ধর্মশালা আর পাঠশালাই বা তৈরি করে কারা? আজ সংসার চালাচ্ছে ব্যাঙ্কাররা, সরকার তো তাঁদের হাতের পুতুল। আমিও আপনার কাছে নিরাশ হইনি। যে দেশের জন্যে জেলে যেতে পারে, তার পক্ষে দু চার হাজার টাকা দান করা এমন কিছু বড়ো ব্যাপার নয়। আমরা ঠিক করেছি, এই ব্যায়াম-শালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ভার কামিনী দেবীকে দেওয়া হবে। আমরা শীঘ্রই গভর্ণর সাহেবের সঙ্গে দেখা করবো। আমার বিশ্বাস সাহায্যও পাবো। আপনারা তো জানেন লেডি উইলসন মহিলা প্রগতির সমর্থক। রাজাসাহেব ও অন্যান্যদের ইচ্ছে ছিল তাঁকে দিয়েই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করানো, শেষমেষ স্থির হলো ওই শুভ কাজ আমাদের কোন বোনের হাতেই নিষ্পন্ন হওয়া উচিত। সে সময়ে আসবেন তো?"

খান্না উপহাসের সুরে বলেন, "হ্যাঁ, যখন লর্ড উইলসন আসবেন তখন তো আমায় যেতেই হবে। এভাবে আপনারা অনেক বড়োলোককেই ফাঁসাতে পারবেন। এসব আপনারা ভালো বোঝেন আর আমাদের বড়োলোকরাও তার উপযুক্ত। তাঁদের উল্লু বানিয়েই মাথা মুড়োতে হয়।"

যখন ধন প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে যায় তখন সে নিজেই বেরোবার পথ খোঁজে। এমনি না বেরোতে পারলে হয় জুয়া, নয় ঘোড়দৌড়, নয় বাড়ি-ঘর কি বিলাসিতায় যায়।"

এগারোটা নাগাদ মেহতা চলে গেলে রায়সাহেব উঠতে গেলে খান্না বললেন, "না, আপনি আর একটু বসুন। দেখলেন তো মেহতা এমন বিশ্রীভাবে আমায় ফাঁসিয়েছে যে বেরোবার কোন রাস্তাই নেই। কামিনীকে দিয়ে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করাবে। এমন অবস্থায় আমার দূরে থাকা হাস্যকর হবে না? কামিনী কি করে রাজী হলো? আমি বুঝতে পারছি না। আর মালতীই বা কি করে মেনে নিলো? আপনার কি মনে হয়?"

"এসব ব্যাপারে স্ত্রীর সবসময় স্বামীর পরামর্শ নেওয়া উচিত!"

"এই কথা নিয়েই তো কামিনীর সঙ্গে আমার হাড়-জ্বালানো ঝগড়া হয়ে

যায়। লোকে আমাকেই মন্দ বলে। আমার এসবের সঙ্গে কি সম্বন্ধ বলুন তো? যাদের কাছে ফালতু টাকা আছে, সময় আছে, নামযশের আকাঙ্খা আছে তারাই এর পেছনে ছোটে। দুচার জন সেক্রেটারী আর এ্যাসিটেন্ট সেক্রেটারী হয়ে অফিসারদের নিমন্ত্রণ করবেন আর য়ুনিভারসিটির মেয়েদের নিয়ে মজা লুটবেন। ব্যায়াম হলো 'দিখানে কা দাঁত' *। এসব সংস্থায় সব সময় এই হয় আর এই হবে মাঝ থেকে বোকা বনবো আমরা। এসবের জন্যে কামিনীই দায়ী।"

খান্না চেয়ার ছেড়ে উঠে আবার বসে পরেন, তাঁর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। বললেন, "বুঝতে পারছি না আমার কি করা উচিত?"

"কিছুই না। আপনি কামিনীদেবীকে বারণ করে দিন।"

"কিন্তু ভাবুন তো! কি মুস্কিল হবে। লেডি উইলসনও একথা জেনে থাকবেন। সবাই জেনে গেছে, হয়তো আজকের কাগজেই বেরিয়ে যাবে। এ সব মালতীর বদমাশী। ওই আমাকে জ্বালাবার জন্যে এসব করছে।"

"হ্যাঁ তাই তো মনে হচ্ছে।"

"ও আমাকে দোষী করতে চাইছে।"

"আপনি শিলান্যাসের একদিন আগেই বাইরে চলে যাবেন।"

"কোথাও মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। ওইদিন আমার কলেরা হলেও আমাকে ওখানে যেতে হবে।"

রায়সাহেব আশা নিয়ে আগামীকাল আসবেন বলে বিদায় নিলে খান্না সোজা কামিনীর কাছে গিয়ে বললেন, "তুমি এই ব্যায়ামাশালার শিলান্যাস করতে রাজী হলে কেন?"

কামিনী কি করে বলবেন—এই সম্মান পেয়ে তিনি কত খুশি হয়েছেন। এখনি তিনি ঐদিনের জন্যে খুব মন দিয়ে নিজের ওজস্বী বক্তৃতা তৈরি করছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করলে খান্না খুশি হবেন। তাঁর সম্মান তো তাঁর স্বামীরই সম্মান! নিজের অভিভাষণে, কবিতায় লোককে মুগ্ধ করে দেবার স্বপ্ন দেখছিলেন। এই প্রশ্ন শুনে আর খান্নার ভাবভঙ্গী দেখে তাঁর বুক কেঁপে উঠলো। অপরাধীর মতো বললেন, "ডক্টর মেহতা বললেন তাই আমি রাজী হলাম।"

"মেহতা তোমায় কুঁয়োয় ঝাঁপ দিতে বললে বোধহয় এত খুশি হয়ে তৈরি হতে না।"

কামিনী চুপ করে থাকেন। খান্না আবার বলেন, "তোমাকে যখন ভগবান বুদ্ধি দেননি তখন আমাকে একবার জিজ্ঞেস করলে না কেন? মেহতা আর মালতী দুজনে মিলে এই চাল চেলে আমার কাছ থেকে দু-চার হাজার টাকা বাগাবার ফন্দী করেছেন। আমি একটা পয়সাও দেব না। তুমি আজই অক্ষমতা জানিয়ে মেহতাকে চিঠি লিখে দাও।"

"তুমিই লিখে দাও না।"

* দিখানে কা দাঁত=দেখাবার দাঁত (শোভা মাত্র, কাজে লাগে না)

"আমি কেন লিখবো? কথা দিয়েছ তুমি, আর লিখবো আমি?"

"মেহতাজী কারণ জানতে চাইবেন। কি বলবো?"

"বোলো তোমার মাথা। আমি এই ব্যভিচারশালাকে একটা পয়সা দেব না।"

"তোমাকে দিতে কে বলেছে?"

"অবুঝের মতো কথা বলো না। তুমি ওখানে শিলান্যাস করবে. কিছু দেবে না। লোকে বলবে কী?"

"বেশ, লিখবো।"

"আজই লিখতে হবে।"

"বলেছি তো লিখবো।"

খান্না বাইরে এসে ডাক দেখতে বসলেন। চিনির দাম বেড়েছে। খান্নার চেহারায় জেল্লা এসে গেল। আখের দাম নিয়ন্ত্রণের জন্যে যে কমিটি বসেছিল তারা ঠিক করেছে এভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। খান্না ঠিক এ কথাটাই বলেছিলেন। অগ্নিহোত্রী শুধু শুধু কমিটি বসালো। শেষে বাছার মুখেই চড় পড়লো। এ হচ্ছে মিলমালিক আর চাষীর ব্যাপার সরকার এতে দখল দেবার কে?

হঠাৎ মিস মালতী গাড়ি থেকে নামলেন। সদ্য ফোটা পদ্মের মতো সুন্দর প্রদীপ শিখার মতো উজ্জ্বল, উল্লসিত প্রতিমা—নিঃশংক. নির্দ্বন্দ্ব. যেন তাঁর জন্যেই সংসারের সমস্ত সুখের আয়োজন! খান্না বাইরে এসে অভিবাদন জানালেন। মালতী প্রশ্ন করলেন, "এখানে মেহতা এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ এসে তো ছিলেন।"

"কিছু বলেছেন, কোথায় যাচ্ছেন?"

"তাতো বলেননি।"

"কে জানে কোথায় ডুব মেরেছেন। আমি চারদিন ঘুরে এসেছি। আপনি ব্যায়ামশালার জন্যে কত দিলেন?"

খান্না অপরাধীর মতো বললেন. "আমি এ ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।"

মালতী বড়ো বড়ো চোখে তাঁকে দেখে বললেন. "এতে বোঝার কি আছে? আগে-পরে একসময় বুঝে নিলেই চলতো। এখন তো শুধু টাকা দেবার কথা। আমিই মেহতাকে পাঠিয়েছিলাম। বেচারা ভয়ে আসতে চাইছিল না পাছে আপনি কি জবাব দেন তাই। আপনার এই কিপ্টেমীর ফলে এখানকার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না। আপনি বোধহয় আমাকে অপমান করবেন ঠিক করেছেন। সবাই বলেছিল লেডি উইলসনকে দিয়ে শিলান্যাস করাতে। আমি কামিনীদেবীর পক্ষ নিয়ে সবার সঙ্গে ঝগড়া করে সবাইকে রাজী করালাম আর আপনি বলছেন 'এ. ব্যাপারের আমি কিছু জানি না'। আমাকে হাস্যাস্পদ করতে চান? বেশ তাই সই। মালতীর মুখ লাল হয়ে যায়।

খান্না দমে গেলেন। সেইসঙ্গে তাঁর দৃঢ়তাও কমতে শুরু করে। বুঝলেন, তিনি যদি কাঁটা ঝোপে পড়ে থাকেন তবে মালতী পড়েছেন চোরাবালিতে। মালতীর দুরবস্থায় তাঁর আনন্দও হলো। যদিও তাঁকে রাগাবার সাহস খান্নার

নেই। বললেন, "তুমি আমার প্রতি এত সদয় হয়ে গেছো দেখে খুব আশ্চর্য হচ্ছি, মালতী।"

"একথার অর্থ?"

"এখনো আমার সঙ্গে তোমার সেই আগের সম্বন্ধই আছে?"

"আমি তো কোনো প্রভেদ দেখছি নে।"

"আমি যে আকাশ-পাতাল তফাৎ দেখছি।"

"আচ্ছা! ধরে নিচ্ছি তোমার অনুমানই ঠিক। তারপর? আমি তোমার কাছে একটা সৎকাজে সাহায্য চাইতে এসেছি। আর তুমি ভাবছো, কিছু চাঁদা দিয়ে তুমি যশ আর ধন্যবাদ ছাড়া আরো কিছু পেতে পারো, এ তোমার ভুল!"

খান্না পরাস্ত হলেম। বলতে পারলেন না আমি তোমার জন্যে হাজার হাজার টাকা উড়িয়েছি। লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে বললেন, "এ আমার উদ্দেশ্য ছিল না মালতী, তুমি সম্পূর্ণরূপে ভুল বুঝেছো।"

"ভগবান করুন আমি যেন ভুলই বুঝে থাকি। কেন না, সত্যি হলে, তোমার ছায়া দেখলেও পালাতে হবে। আমি রূপসী। আমার বহু স্তাবকদের মধ্যে তুমিও একজন। কৃপা করেই আমি অন্যদের উপহার ফেরৎ দিয়ে তোমার উপহার নিতাম আর দরকার পড়লে তোমার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিতাম। তুমি যদি ধনোন্মাদ হয়ে এর মধ্যে অন্য কোন অর্থ খুঁজে থাকো তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করবো। কারণ এটা পুরুষ বা নারীর অপবাদ নয়। কিন্তু জেনে রেখো টাকা আজ পর্যন্ত কোন নারী হৃদয়কে জয় করতে পারেনি, পারবেও না।"

খান্না যেন অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিলেন। লজ্জিত হয়ে বললেন, "মালতী তোমার পায়ে পড়ছি। আর দোষী কোরো না। আর কিছু না হোক অন্ততঃ বন্ধুভাবে থাকতে দাও।" একথা বলতে বলতে তিনি চেকবই বার করে এক হাজার টাকার চেক কেটে মালতীর হাতে দিলেন।

মালতী চেক নিয়ে নির্দয় ব্যঙ্গের সুরে বলে, "এ আমার আচরণের দাম না ব্যায়ামশালার চাঁদা?"

খান্না সজল চোখে বললেন, "আমায় দয়া করো মালতী। কেন আমার মুখে চূণকালি মাখাচ্ছো?"

মালতী অট্টহাস্য করে বললেন, "দেখো, ডাঁট দেখালাম আর এক হাজার টাকাও উসুল করে নিলাম। আর এরকম দুষ্টুমী করবে না তো?"

"কক্‌খনো না, প্রাণ থাকতে নয়।"

"কান ধরো।"

"কান ধরছি কিন্তু তুমি এখন দয়া করে যাও আর আমাকে একলা বসে একটু ভাবতে দাও। তুমি আজ আমার সারা জীবনের আনন্দ......।"

মালতী আরো হাসলেন, "দেখো খান্না, তুমি আজ আমায় বড্ড অপমান করেছো আর তুমি জানো, রূপ অপমান সয় না। আমি তোমার ভালো করলাম আর তুমি আমাকে মন্দ ভাবলে?"

"তুমি আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছো না উল্টে আমার গলায় ছুরি চালাচ্ছো।"

"কেন? আমি তোমায় লুটপাট করে নিজের ঘর ভরছিলাম তোমাকে তা থেকে বাঁচিয়ে দিলাম।"

কেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছো মালতী, আমিও মানুষ।"

"আমি তো তার লক্ষণ দেখছি নে।"

"তুমি একেবারে রহস্যময়ী, প্রহেলিকা। আজ জানা গেল।"

"হ্যাঁ তোমার কাছে আমি রহস্যময়ী, আর তাই থাকবো।" বলে মালতী পাখির মতো ফুড়ুৎ করে যেন উড়ে চলে গেলেন। আর খান্না মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। 'এ কী মালতীর নতুন লীলা, না আসল রূপ!'

২৩

গোবর আর ঝুনিয়া চলে যেতে ধনিয়ার বারবার চুন্নুর কথা মনে পড়ছিল। বাড়িটা যেন খালি হয়ে গেছে। চুন্নু ঝুনিয়ার ছেলে হলেও তার দেখাশোনা তো ধনিয়াই করতো। তেল মাখাতো, কাজল পরাতো, ঘুম পাড়াতো, কাজকর্ম সেরে কোলে নিয়ে যখন বসতো তখন তার গোলগাল চাঁদপানা মুখ দেখে সব দুঃখ ভুলে যেত। এখন শূন্য খাটুলিটা দেখলে তার প্রাণ কেঁদে ওঠে। সে বারবার ভাবতে চেষ্টা করে ঝুনিয়ার সঙ্গে সে এমন কি খারাপ ব্যবহার করেছিল যে এত কান্ড হয়ে গেল। 'ডাইনী এসে আমার সোনার সংসার ধুলোয় মিশিয়ে দে গেল। গোবর তো কখনো কিছু বলতো না। ঐ রাঁড়মাগীটাই তাকে নষ্ট করলো। ওখেনে গে না জানি আবার কতো নাচাবে। এখেনেই ছেলেকে দেখে উল্টে যেত আর ওখেনে দেকবে। যে সারাদিন কাজল পরে বিনুনি বেঁধেই সময় পায় না সে আবার ছেলে দেখবে কি? বেচারা মাটিতে পড়ে কাঁদচে বোধহয়। একটা দিনও ভালো থাকে না। ওখেনে কেমন আচে কে জানে?' ধনিয়ার মনে এখনও গোবরের জন্যে কিছু মমতা অবশিষ্ট ছিল, তাই সে ঝুনিয়ার ওপর রেগে মরতো। 'ওই রাক্ষুসীই ছেলেটাকে কিছু খাইয়ে দাইয়ে বশ করেচে নিশ্চই। মায়াবিনী নিজের বাড়িতে বসে ভাই-ভাজদের লাতি খেতো, এখানে বোকাটাকে পেয়ে রাণী হয়ে গেল।'

হরি চটে-মটে বলে, "যখনই দেখি তখনই তুই ঝুনিয়ার দোষ দিস। কেন বুজিস না 'আপনা সোনা খোটা তো সোনার কা কেয়া দোষ'*। গোবর তাকে নে গেল তো, নাকি নিজে নিজেই চলে গেল। শহরের দানাপানি পেটে পড়ে ছোঁড়ারই চোখ খুলে গেচে। একতাটা বুজতে পারচিস নে।"

*আপনা সোনা খোটা তো সোনার কা কেয়া দোষ=নিজের সোনা ঝুটো হলে স্যাকরার দোষ কী।

ধনিয়া গর্জে ওঠে, "আচ্ছা চুপ করো, তুমিই তো রাঁড়টাকে মাথায় চড়িয়েছিলে। নয়তো আমি পয়লাদিনই ঝাঁটা মেরে দূর করে দিতুম।"

খামারে ফসল জমা করা হয়ে গেছে। হরি বলদ জুতে মাড়াই করতে যাচ্ছিল। মুখ ফিরিয়ে বলে, "মানলুম, বৌ গোবরকে দখল করে নিয়েচে। তাতে তুই এত খুঁড়চিস কেন? সব্বাই যা করে, গোবরও তাই করেচে। এখন তার ছেলেপুলে হয়েচে। আমাদের জন্যে ওরা কষ্ট করতে যাবে কেন?"

"তুমি সব ঝামেলার মূল।"

"তাহলে আমাকেও দূর করে দে। হেলে-দুটোকে নে যা, মাড়াই করাগে। আমি হুঁকো খাই।"

"তুমি গে জাঁতা পেষোগে আমি মাড়াই কচ্চি।"

হাসিঠাট্টায় মেঘ কেটে যায়। ধনিয়া খুশি হয়ে রূপার চুল বাঁধতে বসে। হরি খামারের দিকে রওনা হয়। বসন্ত প্রাণ খুলে আকাশে বাতাসে ঐশ্বর্য বিলোচ্ছে। কোকিল আম গাছে বসে কুহুস্বরে ডাকছে, মহুয়ার ডালে ময়নার ভিড়। নিম, শিরীশ আর বৈঁচির গন্ধে নেশা জমে আসে। হরি আম বাগানে পৌঁছোয়। আমের মঞ্জুরী গাছের নীচে আকাশের তারার মতো ছড়িয়ে আছে। এই শোভায় মুগ্ধ হয়ে সেও গান গেয়ে ওঠে—

"হিয় জরত রহত দিন রৈন
আম কী ডরিয়া কোয়ল বোলে
তনিক ন আওয়ত চৈন।"*

সামনেই দুলারী আসছিল। পরণে গোলাপী শাড়ি, পায়ে রূপোর মোটা কড়া, গলায় সোনার হাসুলী, চেহারা শুকনো কিন্তু মনটা সবুজ। একসময় হরি হাটে-মাঠে তাকে জ্বালাতো। সে বৌদি হরি দেওর এই সম্পর্কে ঠাট্টাঠুট্টি চলে। যখন থেকে সাহুজী মারা গেল তখন থেকে দুলারী বেরোনো ছেড়ে দিয়েছে। সারাদিন দোকানে বসে থাকে আর বসে বসেই সারা গ্রামের খোঁজ খবর নেয়। কোথাও ঝগড়াঝাঁটি হলেই দুলারী মধ্যস্থতা করতে ছুটে। টাকায় আনা সুদ না নিয়ে সে টাকা ধার দেয় না, যদিও সুদের লোভে আসলও হাতছাড়া হয়ে যায়। বেচারী কি করে? নালিশ-ফরিয়াদ করতে পারে না, থানা পুলিশ করতে পারে না, থাকার মধ্যে শুধু জিভের ধার। সেও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমছে। এখন তার গালমন্দ শুনে লোকে হাসে আর বলে, "খুড়ী, টাকা নে করবেটা কী? সঙ্গে তো নে যেতে পারবে না। গরীবকে খাইয়েদাইয়ে যা পারো পুণ্যিটুকু করে নাও। পরকালে কাজে লাগবে।" আর দুলারী একথা শুনলে জ্বলে ওঠে।

হরিও তাকে জ্বালায়, "বৌঠান আজ তোমাকে সত্যি সত্যি যোবতী লাগচে।"

"আজ মঙ্গলবার নজর দিও না। এই ভয়েই তো গয়নাগাঁটি পরিনে। ঘর

*হরির গানঃ "হিয়া রাত দিন জ্বলছে, আমের ডালে কোকিল ডাকছে, একটুও শান্তি আসছে না।"

থেকে বেরুলেই সবাই পেছু নেবে, যেন কখনো মেয়েছেলে দ্যাখেনি। পটেশ্বরী লালা তো পুরনো বুলি এখনো ছাড়েনি।"

হরি দাঁড়িয়ে পড়ে। বড়ো মুখরোচক প্রসঙ্গ। বলদ জোড়া এগিয়ে যায়। বলে, "ওতো আজকাল বড়ো ভক্ত হয়ে গেচে গো। দ্যাখোনি পুন্নিমায় সত্য-নারায়ণের কতা শোনে, দুবেলা মন্দিরে যায়।"

"সব লম্পটই বুড়ো হয়ে ভক্ত বনে যায়। কুকম্মের প্রাশ্চিত্তির করতে হবে তো। তা নইলে বলো, আমি তো এখন বুড়ি হয়ে গেচি, আমার সঙ্গে হাসি-মস্করা কিসের?"

"তুমি আবার বুড়ি হলে কোতায় বৌঠান, আমার তো এখনো......"

খুব হয়েচে, চুপ করো নয়তো দেড়শো গালাগাল দোব। ছেলে বিদেশ-বিভুঁইয়ে থেকে রোজগার করচে আর একদিন নেমন্তন্ন করেও খাওয়ালে না। শুধু শুধু বৌঠান বানাতে ব্যস্ত।"

"আমি দিব্যি গেলে বলচি বোঠান, যদি ওর রোজগারের একটা পয়সা ছুঁয়ে থাকি। জানিও না কি এনেচে, কোতায় খরচ করেচে। শুধু একজোড়া ধুতি আর একটা চাদর আমার হাতে এসেচে।"

"ভালো রোজগার করচে। আজ না হোক কাল ঘর দোর দেখবেই। ভগমান তাকে সুখে রাখুন। আমাদের টাকাও একটু একটু করে শোধ করো। সুদ বাড়চে তো।"

"তোমার টাকা পাই-পাই করে চুকিয়ে দোব বোঠান। হাতে পয়সা আসুক। আর যদি খেয়েই ফেলি, তা তোমার পর তো নই বোঠান, আমি হলুম তোমার আপন জন।"

দুলারী এসব চটুল কথা শুনে একটু হেসে নিজের পথ ধরে। হরি লাফিয়ে নিজের বলদের কাছে পেঁছোয়। তাদের খুঁটিতে বেঁধে চক্কর দেওয়াতে থাকে। সারা গ্রামে এই একটিই খামার। কোথাও মাড়াই হচ্ছে, কোথাও ঝাড়াই হচ্ছে, কেউ শস্য মাপছে। নাপিত, ছুতোর, কামার, পুরুত, ভাট, ভিখিরি সবাই হাজির। একটি গাছের নীচে ঝিঙুরী খাটিয়ায় বসে নিজের ভাগ আদায় করছে। কোথাও বেনিয়া দরদাম করছে, কোথাও সব্জিওয়ালা কুল আর ট্যাঁপারি বেচতে বসেছে। তেলেভাজা আর জিলিপিও বিক্রী হচ্ছে। দাতাদীন হরির ফসলের ভাগ নিতে এসেছেন। ঝিঙুরীর খাটিয়ায় বসে দাতাদীন খৈনি টিপতে টিপতে বলেন, "কিছু শুনেছো, সরকারও মহাজনদের সুদের হার কমাতে বলচে, নয়তো ডিক্রী জারি হবে।"

ঝিঙুরী হুঁকোয় টান দিয়ে বলে, "পণ্ডিতজী, আমি তো একটি কতা জানি, তোমার গরজ পড়লে তুমি ধার নেবে, আমিও সুদ নোব। সরকার যদি চাষীদের ধার দেবার বন্দোবস্ত না করতে পারে তাহলে আইন কিছুই করতে পারবে না। আমরা কম দর লেখাবো, কিন্তু একশো থেকে পঁচিশটাকা আগেই কেটে নোব। সরকার কি করবে?"

"সে তো ঠিক। কিন্তু সরকারও এসব কতা খুব বোজে। একটা না একটা ফ্যাকড়া বাঁধাবেই, দেখো।"

"এতে কোন বাধা আসতেই পারে না।"

"যদি শর্ত করে দেয় ইসটাম্পের ওপর গাঁয়ের মোড়ল কিংবা গোমস্তার সই না থাকলে দলিল পাকা হবে না তখন কি হবে?"

"চাষীরাই হাতে পায়ে ধরে মোড়লদের দস্তখত করাবে। আমরা সিকি-ভাগ আগেই কেটে নোব।"

"আর যদি ফেঁসে যাও, জাল হিসেবের জন্যে চোদ্দ বছর চাকি পিষতে যেতে হবে।"

"তুমি কি বলচো পণ্ডিতজী। দুনিয়া কি বদলে যাবে? যার পয়সা আচে আইন সব সময় তার পক্ষে যায়। আইনে কত কী আচে, মহাজন চাষীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না, জমিদার প্রজার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না, কিন্তু হয় কি? রোজ তো দেখচো। জমিদার বেঁধে মারে আর মহাজন লাথি-জুতো ছাড়া কথা কয় না। যে প্রজা পোড়খাওয়া শক্ত মানুষ তাকে জমিদারও কিছু বলে না. মহাজনও না। এদের সঙ্গে মিলেজুলেই আমরা অন্যদের গলা টিপে ধরি। তোমার কাচে রায়সাহেবের পাঁচশো টাকা পাওনা আচে, নোখেরামের সাধ্য কি তোমায় ধরে। সে জানে তোমার সঙ্গে মিলেজুলে থাকাই ভালো। চাষীরা রোজ আদালত দৌড়তে পারে না। যেমন আচে সব তেমনি চলবে।" একথা বলে ঝিঙুরী খামারটা এক পাক ঘুরে এসে আবার বলে, "মতইয়ের বে-র কি হলো? আমার মতে এবার বে-টা লাগিয়ে দাও। বড্ড বদনাম শোনা যাচ্চে।"

দাতাদীন যেন বোলতার কামড় খায়। এ আলোচনার অর্থ সে জানে। চটে উঠে বলে. "পেছনে লোকে যা খুশি বলে বলুক আমাদের মুখের ওপর বললে তার গোঁফ ছিঁড়ে দোব। আমাদের মতো ধাম্মিক কটা আচে এখেনে? সব্বাইকে তো জানি, যারা কখনো সন্ধ্যাহ্নিক করে না। না ধম্মের সঙ্গে সম্পক্ক না কম্মের সঙ্গে। না কথা শোনে, না পুরাণ—সেও নিজেকে বামুন বলে। যারা একাদশী করেনি, স্নান-পুজো করেনি তারা আমাদের নে হাসবে কী। ধম্ম পালন বড়ো কঠিন কাজ। কেউ বলুক দেখি আমরা কখনো বাজারের জিনিষ খেয়েচি কি অন্যের ছোঁয়া জল খেয়েচি তাহলে তার ঠ্যাং খোঁড়া করে দোব। সিলিয়া আমাদের চৌকাঠ পেরোয় না, বাসন-কোসন ছোঁয়া তো দূরের কতা। অবশ্য একথা বলচি না যে মতই যা করেচে, ভালো করেচে। যখন কতাটা রটে তখন পাজীটার উচিত মাগীটাকে ছেড়ে দেওয়া। আমি তো খোলাখুলিই বলচি, স্ত্রীজাতিকে সবসময়ই পবিত্র বলা হয়।"

দাতাদীন যৌবনে নিজেও রসিক ছিলেন কিন্তু নিজের জাতধর্ম কখনও ছাড়েননি। মাতাদীনও সুযোগ্য পুত্রের মতো তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে যাচ্ছিল। ধর্মের মূল তত্ত্ব হলো পুজো-পাঠ, কথা-ব্রত আর উনুন-হেঁসেল। যখন পিতাপুত্র দুজনেই মূলতত্ত্বকে ধরে আছে তখন কার সাধ্য তাদের পথ-ভ্রষ্ট বলে।

ঝিঙুরী হার স্বীকার করে, "আমি তো ভাই, যা শুনিচি, তোমাকে বলে দিলুম।"

দাতাদীন মহাভারত আর পুরাণ থেকে ব্রাহ্মণদের অন্য বর্ণের কন্যাগ্রহণের একটা লম্বা ফর্দ পেশ করে বলে দিলেন যে এদের সন্তানদেরও ব্রাহ্মণ বলা হতো এবং আজকালকার ব্রাহ্মণরা তাদেরই বংশধর। এ প্রথা আদিকাল থেকে চলে আসছে, আর তাতে কোন লজ্জা নেই।

ঝিঙুরী তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বললেন, "তবে আজকাল লোকে 'বাজপেয়ী' * আর 'সুকুল' ** হয়ে ঘোরে কেন?"

"ভেন্ন ভেন্ন সমাজের নিয়ম আর কী। কারুর মধ্যে অত তেজ থাকে তবে তো। বিষ খেলে তাকে হজম করতে হবে। সে সব সত্যযুগের কতা, সত্যযুগের কতা, সত্যযুগেই শেষ হয়ে গেচে। এখন তো জ্ঞাতগুষ্ঠির সঙ্গে মিলেমিশে থাকাই উচিত। তা কি করবো? কোন মেয়ে পক্ষও তো আসে না। তোমাকেও বলেচি, অন্যদেরও বলেচি। কেউ শোনে না। আমি কি মেয়ে তৈরি করবো?"

ঝিঙুরী ধমক দেয়, "মিছে কথা বোলো না পণ্ডিত, আমি দু-দুটো লোককে ফুসলে-ফাসলে এনেছিলুম কিন্তু তুমি মুখ হাঁড়ি করে রইলে আর তারা পালিয়ে গেল। আর কিসের জোরে তুমি হাজার-পাঁচশো টাকা চাইচো? দশ বিঘে ক্ষেত আর ভিক্ষে মাঁগা ছাড়া তোমার আর আচেটা কি?"

দাতাদীনের মনে ঘা লাগে। দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে, "মানলুম আমার কিছু নেই। ভিক্ষে মেংগে খাই। কিন্তু আমি মেয়েদের বে দেবার সময় পাঁচশো টাকা পণ দিয়েছি। তাহলে ছেলের বে-তে পাঁচশো চাইবো না কেন? কেউ শুদুমুদু আমার মেয়েকে বে করলে আমিও খালি হাতে ছেলের বে দিতুম। এই হলো কতা। তুমি যজমানীকে ভিক্ষে মনে করো, আমি তাকে জমিদারীর চেয়েও বড়ো মনে করি। জমিদারী চলে যায়, ব্যাঙ্ক উঠে যায়, কিন্তু যজমানী চেরকাল থাকবে। যদ্দিন হিন্দুরা আছে তদ্দিন যজমানীও থাকবে। শুভদিনে ঘরে বসে একশো-দুশো টাকা আসে, ভাগ্য ভালো হলে চার-পাঁচশোও জোটে। কাপড়, বাসন, ভোজন সব আলাদা আলাদা ব্যবস্থা। কোথাও না কোথাও কিছু একটা হয়ই আর সেখেনে আর কিছু না মিলুক দু-এক থালা নৈবিদ্যি আর দক্ষিণা তো পাওয়া যাবেই। এ শান্তি জমিদারীতেও নেই, ব্যবসাদারীতেও নেই। সিলিয়াকে দিয়ে আমরা যতটা উপকার পাই অতটা কি আর বামুনের মেয়ের দ্বারা হবে? সে তো বউড়ী বনে বসে থাকবে নয়তো দুটো রুটি করে দেবে। আর এখেনে সিলিয়া একা তিনটে লোকের কাজ করে। আমি তাকে দুটো রুটি ছাড়া কি দিই? বড়োজোর বছরে একখানা ধুতি।"

অপর গাছের নীচে দাতাদীনের নিজস্ব ফসল মাড়াই হচ্ছে। চারটে বলদ

* বাজপেয়ী=উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের পদবী

** সুকুল=উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের পদবী

হাঁকাচ্ছে ধন্না চামার। আর সিলিয়া পা দিয়ে নেড়ে চেড়ে খোসা ছাড়াচ্ছে। মাতাদীন অপরদিকে বসে নিজের লাঠিতে তেল মাখাচ্ছে।

সিলিয়া শ্যামলী, লাবণ্যময়ী প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণা কিশোরী। রূপসী না হলেও চোখে পড়ে, তার হাসি, চাউনী, অঙ্গভঙ্গী যেন খুশির মাদকতায় ভরপুর। চলাফেরায় রয়েছে নাচের ছন্দ। সর্বাঙ্গে ভূষি ভর্তি, গায়ে ঘাম ঝরছে তবু দৌড়ে দৌড়ে কাজ করছে, দেখলে মনে হয়, কাজ নয়, সে খেলায় ব্যস্ত।

মাতাদীন বলে, "আজ সন্ধ্যের মধ্যে যেন ঝাড়াই শেষ হয় সিলিয়া। তুই হাঁফিয়ে পড়লে আমি আসচি।"

"তুমি কেন আসতে যাবে গো পণ্ডিত। আমি সন্ধ্যের মধ্যে সব ঝেড়ে দোব।"

"আমি গোলায় গম তুলে দে আসি। তুই একলা কত আর করবি?"

"অত ভাবচো কেন? আমি ঝেড়ে দোব, তুলে দোব। এক পহর রাত অব্দি একটা দানাও এখেনে পড়ে থাকবে না।"

দুলারী আজ পাওনা আদায় করতেই বেরিয়েছে। সিলিয়া তার দোকান থেকে হোলির দিন দু পয়সার গোলাপী রঙ কিনেছে, এখনও পয়সা দেয়নি। তাই সে সিলিয়ার কাছে এসে বলে, "কি রে সিলিয়া, মাসখানেক হলো রঙ এনিচিস, এখনো পয়সা দিলিনি। চাইলে মট্‌কা মেরে চলে যাস। আজ পয়সা না পেলে যাবো না।"

মাতাদীন চুপচাপ সরে পড়ে। সিলিয়ার দেহমন অধিকার করেও প্রতিদানে সে কিছু দিতে চায় না। তার চোখে সিলিয়া একটা কাজ করার যন্ত্রমাত্র। সিলিয়া চোখ তুলে দেখে মাতাদীন সেখানে নেই। বলে, "চেঁচিও না মুদীবৌ। এই নাও। দুইয়ের জায়গায় চার পয়সার গম। পেরান নিয়ে টানাটানি করচো কেন, আমি কি মরে যাচ্চি।"

সে আন্দাজমতো সেরখানেক গম বার করে মুদীবৌয়ের আঁচলে ঢেলে দিয়েচে কি মাতাদীন গাছের আড়াল থেকে তেড়ে বেরিয়ে এসে দুলারীর আঁচল চেপে ধরে বলল, "গম রেখে দে মুদী বৌ, এখেনে হরির লুঠ হচ্ছে নাকি?" তারপর চোখ লাল করে সিলিয়াকে বলে, "তুই গম দিয়েচিস কেন? কাকে জিজ্ঞেস করে দিয়েচিস? আমার জিনিষ বিলোবার তুই কে রে?"

দুলারী আঁচল ঝেড়ে গম ঢেলে দেয় আর সিলিয়া হতভম্ব হয়ে মাতাদীনের দিকে চেয়ে থাকে। সে যে ডালে বসেছিল যেন সেই ডাল হঠাৎ ভেঙে পড়ে তাকে মাটিতে মিলিয়ে দিয়েছে। অভিমানে চোখে জল ভরে আসে। বলে, "তোমার পয়সা আমি দোব মুদীবৌ। আজকে আমায় ছেড়ে দাও।"

দুলারী তার দিকে সমবেদনার চোখে চেয়ে মাতাদীনের প্রতি বিষাক্ত কটাক্ষ করে চলে যায়। এখন সিলিয়া আহত কণ্ঠে বলে, "তোমার জিনিষে আমার কোন জোর নেই?"

মাতাদীন চোখ বার করে বলে, "না, তোর কোন জোর নেই। কাজ করিস, খেতে পাস। তুই খেতেও চাস আবার বিলোতেও চাস, তা হবে না। এখেনে

তোর যদি না পোষায় তবে অন্য কোতাও কাজ কর্‌গে যা। মজুরের অভাব নেই। মাঁগনা তো খাটাই না। রুটি-কাপড়ও দিই।"

সিলিয়া শিকলি কাটা পাখির মতো চুপ করে থাকে। তার মালিক তাকে নিজেই খাঁচা খুলে দূর করে দিয়েছে তবু তার খাঁচাতেই ঢুকতে ইচ্ছে করছিল, তা সে দানা পানি না পেয়ে লোহার শিকে মাথা ঠুকে মরতে হলেও সে মরবে। সিলিয়া ভাবছিল, এখন কি তার কোথাও যাবার উপায় আছে? বিয়ে না হলেও মাতাদীনকে সে স্বামী বলেই ভাবে, মারুক-কাটুক যাই করুক তাকে সে ছাড়বে কি করে? দুবছর আগেও এই মাতাদীন তার পায়ে পায়ে ঘুরতো, পৈতে ছুঁয়ে বলেছিল, 'যদ্দিন বাঁচবো তোকে বৌয়ের মতন রাখবো'। আর আজ দু মুঠো গমের জন্যে তাকে এত অপমান করলো? কোন জবাব না দিয়ে সে শিথিল হাতে আবার কাজে মন দিতে চেষ্টা করে।

ঠিক সেই সময় তার মা, বাপ, দুই ভাই ও আরো কয়েকজন চামার এসে মাতাদীনকে ঘিরে ধরে। সিলিয়ার মা এসে তার হাত থেকে ঝুড়ি কেড়ে নিয়ে বলে, "রাঁড় কোতাকার। মজুরী করবি তো ঘর ছেড়ে এখেনে মজুরী করতে এসেচিস কেন? বামুনের সঙ্গে যখন থাকিস তখন বামুনের মতো থাক্। বেরাদরীর নাক কেটেও যদি চামারনী হয়েই থাকবি তো এখেনে কি ঘিয়ের ড্যালা কুড়ুতে এসেছিস? ডুবে মরার মতো এক আঁজলা জলও জোটেনি?"

ঝিঙুরী সিং আর দাতাদীন দুজনেই ছুটে এসে তাদের রুক্ষ মেজাজ সামলাবার চেষ্টা করে। ঝিঙুরী সিং সিলিয়ার বাপকে জিজ্ঞেস করে, "কি হয়েচে চৌধুরী, কেন বাগড়া দিতে এসেচো।"

সিলিয়ার বাপ হরখু ষাট বছরের বুড়ো। রোগা, কালো, শুকনো লঙ্কার মতো চিমড়ে চেহারা কিন্তু শুকনো লঙ্কার মতোই ঝাঁঝালো তীক্ষ্ণ। বলে, "ঝগড়াঝাঁটির কিছু নেই ঠাকুর। আমরা আজ হয় মাতাদীনকে চামার বানিয়ে ছাড়বো নয়তো রক্তগঙ্গা করে ছাড়বো। সিলিয়া মেয়েমানুষ, কারুর না কারুর ঘরে যাবেই ; তাতে আমাদের কিচু আপত্তি নেই তবে যে ওকে রাখবে তাকে আমাদের আপনলোক হয়েই থাকতে হবে। তোমরা আমাদের যদি বামুন বানাতে না পারো তো আমরা তোমাদের চামার বানিয়ে দিচ্চি। আমাদের বামুন করে দিতে পারো তো আমরা সক্কলে রাজী। না পারো তো চামার হয়ে আমাদের সঙ্গে খাও-দাও, ওঠো-বসো। আমাদের ইজ্জত নিচ্চো তো তোমাদের ধম্ম দাও।"

দাতাদীন লাঠি ঠুকে বলে, "মুখ সামলে কতা বল্ হরখুয়া। তোর মেয়ে ঐ তো দাঁড়িয়ে রয়েচে। নে যা যেখেনে খুশী। আমরা ওকে বেঁধে রাখিনি। কাজ করে, মজুরী নেয়। এখেনে মজুরের অভাব নেই।"

সিলিয়ার মা আঙুল মটকে বলে, "বাঃ বাঃ পণ্ডিত খুব ন্যায়ধম্ম দেখাচ্চো। তোমার মেয়ে কোন চামারের হাত ধরে বেইরে গেলে তুমি যদি এমন কতা কইতে তো বুজতুম। আমরা চামার বলে আমাদের মানইজ্জত নেই। আমরা সিলিয়াকে একলা নে যাবো না, মাতাদীনকেও সঙ্গে নে যাবো। সে আমার মেয়ের ধম্ম নাশ

করেচে। তোমরা খুব নামী ধার্ম্মিক পণ্ডিত কিনা তাই তার সঙ্গে শোবে তবু তার হাতে জল খাবে না কেমন। এই হতভাগী বলেই এসব সহ্য করচে, আমি হলে তো এমন মানুষকে বিষ খাইয়ে মারতুম।"

হরখু তার সঙ্গীদের উৎসাহ দিয়ে বলে, "এদের কথা তোমরা সব শুনলে তো। এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ দেখচো কি?"

একথা শুনেই দুজন চামার লাফিয়ে এসে মাতাদীনের দুটো হাত চেপে ধরে আর তৃতীয়জন ঝাঁপিয়ে পড়ে তার পৈতেটা ছিঁড়ে দিয়ে, দাতাদীন আর ঝিঙুরী সিং লাঠি উঁচিয়ে বাধা দেবার আগেই মাতাদীনের মুখে একটা বিরাট হাড় গুঁজে দেয়। মাতাদীন ভয়ে দাঁতে দাঁত চাপে কিন্তু ঐ ঘৃণ্যবস্তুটা যে তার ঠোঁটে ঠেকে আছে। ঘৃণা ও ভয়ে সে আচ্ছন্ন হয়ে গেলে মুখটা আপনিই খুলে যায় আর হাড়টা গিয়ে গলায় ঠেকে। এতক্ষণে খামারের সবাই এসে জড়ো হয়েছে কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে কেউ ধর্মনাশীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো না। মাতাদীনকে সবাই অপছন্দ করে, সুযোগ পেলেই সে গ্রামের মেয়ে-বৌদের পেছু নেয় তাই তার বেইজ্জতীতে সবাই খুশি হয়। ওপর ওপর অবশ্য চামারদের বকাঝকা করে।

হরি বলে, "আচ্ছা খুব হয়েছে হরখু। ভালো চাও তো এখন কেটে পড়ো দিকি।"

হরখু নির্ভীকভাবে বলে, "তোমার ঘরেও মেয়ে আচে হরিমাহাতো, কাজেই বুঝে নাও। এভাবে গাঁয়ের মানইজ্জত যেতে বসলে কারুরই আবরু বাঁচবে না।"

শত্রু জয় করার পর চামাররা সেখান থেকে সরে পড়াই শ্রেয় বোধ করলো। জনমত বদলাতে কতক্ষণ। মাতাদীন বমি করছিল। দাতাদীন তার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলেন, "সব্বাইকে পাঁচ বছরের জন্যে জেলে না পাঠিয়েচি তো বলিস্। পাঁচপাঁচ বছর চাকি পেষাবো।"

হরখু অবজ্ঞা করে বলে, "তাতে দুঃখু নেই। তোমার মতো বসে বসে কে মৌজ করে? যেখেনে কাজ করবো, সেখেনেই খেতে পাবো।"

মাতাদীন বমি করে নির্জীব হয়ে মাটিতে পড়ে ছিল। যেন তার কোমর ভেঙে গেছে। ডুবে মরবার মতো জলটুকুও অবশিষ্ট নেই। যার জোরে সে শৌর্য-বীর্য দেখিয়েছে, আজ সব শেষ হয়ে গেল। হাড়ের টুকরোটা যেন তার আত্মাকেই অপবিত্র করে দিয়েছে। তার ধর্ম যে খাওয়া-ছোঁয়ার ওপরই টিঁকে ছিল, আজ তাও শেষ হয়ে গেল। এখন সে লাখখানেক প্রায়শ্চিত্ত করুক, আর যতই দান-পুণ্য-তীর্থ-ব্রত-উপবাস করুক না কেন তার মরা-ধর্ম আর বাঁচবে না। যদি একলা থাকতো তাহলেও বা কথা ছিল, কিন্তু এখানে সবার চোখের সামনে তার ধর্ম গেল। তার স্নেহময়ী মাও তাকে অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করবেন। সবাই দাঁড়িয়ে শুধু তামাশা দেখলে। যারা প্রণাম করতো তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। সে আর মন্দিরে ঢুকতে পারবে না, কারুর বাসন-কোসন ছুঁতে পারবে না। এসবই হলো হতভাগী সিলিয়ার জন্যে।

সিলিয়া সেখানেই চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। যেন তারই হেনস্তা হচ্ছে।

হঠাৎ তার মা এসে ধমক লাগায়, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি হতভাগী, চল্ সিধে ঘরে চল্। নয়তো টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবো। বাপ-দাদার মুখ পুড়িয়েচিস। এখন আর কী বাকী আচে?"

সিলিয়া মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। মা, বাপ, ভাইদের ব্যবহারে তার রাগ হচ্ছিল। সে যেমন খুশি তেমনি থাকে তাতে কার কী? বলে কিনা, এখানে তোর অপমান হচ্চে। কোথাও কি বামুনের ছেলে তার হাতের রান্না খাবে, না জল ছোঁবে? ক্ষণপূর্বের বিরাগ মাতাদীনের দুর্গতিতে আবার অনুরাগে পরিণত হলো। বিদ্রোহ করে বলে, "আমি কোত্থাও যাবো না। তুই কি এখেনেও আমায় বাঁচতে দিবি না।"

"তুই যাবি না?"

"না।"

"চল্ শীগ্গির।"

"যাবো না।"

তৎক্ষণাৎ তার দুই ভাই তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে চায়। সিলিয়া মাটিতে বসে পড়ে। তার শাড়ি ছেঁড়ে, পিঠ আর কোমর ছড়ে-ছিঁড়ে যায়। তবু সে যায় না। হরখু ছেলেদের বলে, "হয়েচে এবার ওকে ছেড়ে দে। ভাববো মরে গ্যাচে। কিন্তু আমার দোরে যদি কক্খনো গে দাঁড়ায়, খুন করে ফেলবো, রক্ত খাবো।"

সিলিয়া মরিয়া হয়ে ওঠে, "হ্যাঁ যখন যাবো তখন তাই খেয়ো।"

বুড়ি ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়ে আরো গোটাকয়েক লাথি মারলে হরখু বাধা দেয়। বুড়ি ঝাঁপিয়ে পড়লে হরখু বলে, "তুই যে খুনী হয়ে গেলি কালিয়া! ওকে মেরে ফেলবি নাকি?"

সিলিয়া বাপের পায়ে পড়ে, "মেরে ফ্যালো বাবা, তোমরা সব্বাই মিলে আমায় মেরে ফ্যালো। হায় হায় রে মা! তুই এত পাষাণ, এইজন্যে দুধ খাইয়ে বড়ো করেছিলি। আঁতুড়ে গলা টিপে মেরে ফেললিনি কেন? আমার জন্যে বামুনেরও ধম্ম ভেরেষ্ট হলো। তার ধম্ম নে তোর কি হলো? এখন তো সেও আমাকে পুঁছবে না। তবু আমি ওর সঙ্গেই থাকবো। উপোষ করিয়ে মেরে ফেললেও থাকবো। ওর সব্বোনাশ করে চলে যাবো কি করে? মরে যাবো তবু বেবুশ্যে হতে পারবো না গো। একবার যখন হাত ধরিচি ওর সঙ্গেই থাকবো।"

কালিয়া ঠোঁট চিবিয়ে বলে, "যেতে দে রাঁড় মাগীটাকে। ভাবচে ও ওকে দেখবে। আজই মেরে ভাগিয়ে না দিলে আমার মুখ কাউকে দেখাবো না।"

ভাইদেরও দয়া হলো। তারা সিলিয়াকে ছেড়ে চলে গেলে সিলিয়া কোন রকমে খামারে এসে বসে আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে।

দাতাদীন চটেমটে বলেন, "ওদের সঙ্গে গেলিনে কেন সিলিয়া? আবার কি করবি বলে বসে আচিস? আমার সব্বোনাশ করেও তোর পেট ভরলো না?"

সিলিয়ার জলভরা চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক ফোটে, "ওদের সঙ্গে কেন যাবো, যে আমার হাত ধরেচে তার সঙ্গেই থাকবো।"

"আমার বাড়িতে ঢুকলে লাথি মেরে দূর করে দোব।"

"ও আমায় যেখেনে রাখবে আমি সেখেনে থাকবো।"

মাতাদীন সংজ্ঞাহীন হয়ে বসেছিল। দুপুরের রোদ পাতার ফাঁক দিয়ে তার গায়ে এসে পড়েছে তবু কোন হুঁস নেই। হঠাৎ যেন জ্ঞান ফিরে পেয়ে বলে, "আমি এখন কি করবো, বাবা।"

দাতাদীন তার মাথায় হাত রেখে সাহস দিয়ে বললেন, "তোকে এখন কি বলবো বাবা? চল্, ওঠ। চান করে দুটি মুখে দে। তারপর পণ্ডিতরা যেমন বিধেন দেবেন তেমনি হবে। তবে হ্যাঁ সিলিয়াকে ছাড়তে হবে।"

মাতাদীন সিলিয়ার দিকে রক্তনেত্রে চেয়ে বলে, "আমি আর কোনদিন ওর মুখ দেখবো না। কিন্তু প্রাশ্চিত্তির হবার পরে কোন দোষ থাকবে নাতো?"

"প্রাশ্চিত্তির পরে তো দোষ-পাপ থাকে না।"

"তাহলে আজই পণ্ডিতদের কাছে যাও।"

"আজই যাবো, বাবা।"

"পণ্ডিতরা যদি বলে এর প্রাশ্চিত্তির হবে না, তখন?"

"ওঁদের যেমন ইচ্ছে।"

"তুমি আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবে?"

দাতাদীন পুত্র স্নেহে বিহ্বল হয়ে বলেন, "তা কখনও হতে পারে বাবা। ধন যায়, ধম্ম যায়, লোক মর্য্যাদা যায় যাক, তবু তোমায় ছাড়তে পারবো না।"

মাতাদীন লাঠি তুলে নিয়ে বাপের সঙ্গে রওনা হলে সিলিয়াও তাকে অনুসরণ করে। মাতাদীন পেছন ফিরে রুক্ষ নির্মম স্বরে বলে, "আমার সঙ্গে আসবি না। আমার সঙ্গে তোর আর কোন সম্পক্ক নেই। এত দুঃখ দিলি তবু পেট ভরলো না।"

সিলিয়া ধৃষ্টতা করে তার হাত চেপে ধরে বলে, "সম্পর্ক নেই কেন? এ গাঁয়ে তোমার চেয়ে ধনী-মানী-সোন্দর পুরুষ মানুষ আচে। আমি তাদের হাত না ধরে তোমার হাত ধরেচি কেন? যে দড়ি তোমার গলায় পড়েচে এখন হাজার চাইলেও তা খুলবে না। আমিও যাবো না। মজুরী করবো, ভিক্ষে মাঁগবো। তবু তোমায় ছাড়বো না।"

একথা বলে সে মাতাদীনের হাত ছেড়ে খামারে ঝাড়াই করতে বসে। হরি তখনও মাড়াই করছিল। ধনিয়া তাকে খাবার জন্যে ডাকতে এসেছিল। হরি বলদজোড়াকে বেঁধে সিলিয়াকে বলে, "তুইও যা। খেয়ে দেয়ে আয় সিলিয়া। ধনিয়া এখেনে বসে আচে। তোর পিঠের কাচে শাড়িটা তো রক্তে লাল হয়ে গেচে। পেকে না যায়। তোর ঘরের লোকরা বড্ড পাজী।"

সিলিয়া করুণকণ্ঠে বলে, "এখেনে কে পাজী না বাবা, আমি তো কাউকে দয়ালু হতে দেখিনি।"

"পণ্ডিত কি বলল?"

"বলচে আমার সঙ্গে তোর সম্পর্ক নেই।"

"এই কতা বলচে।"

"ভেবেচে এই করে নিজের মুখ রক্ষে করবে কিন্তু দুনিয়ার সবাই যে কতা জানে তাকে লুকোবে কি করে? আমার কটাই বা রুটি লাগে? না দ্যায় না দিক। আমার কী? মজুরী এখনও করি তখনও করবো। শোবার জন্যে হাতখানেক ভুঁই যদি তোমার কাছেই চাই তুমি দেবে না বাবা?"

ধনিয়া দয়ার্দ্র কণ্ঠে বলে, "ভুঁইয়ের অভাব কি মা? তুই চল্ আমার ঘরে থাকবি।"

হরি কাতর স্বরে বলে, "ডাকচিস তো, পণ্ডিতকে জানিস নে?"

"চটবে তো একখানা রুটি বেশি খাবে। ওঁর তাঁবে আচি নাকি আমরা? মেয়েটার ইজ্জত-আবরু লুটলো, জ্ঞাতগুষ্টি থেকে বের করে আনলো, এখন বলচে আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নেই। মানুষ না কসাই? তাই তো ভগমান এমন শাস্তি দিলেন। আগে ভাবতে পারেনি?"

হরির বিচারে ধনিয়া ভুল করলো। সিলিয়ার ঘরের লোকেরা মাতাদীনকে যেভাবে জাতিচ্যুত করেছে সেটা ভালো হয়নি। সিলিয়াকে মেরেধরে কি আদর করে নিয়ে যেতে পারতো। সে তাদের মেয়ে। কিন্তু মাতাদীনকে কেন বিধর্মী করলো?

ধনিয়া মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, "খুব হয়েচে। ভারি ন্যায় বিচার করতে এলেন। সব পুরুষ মানুষই একরকম। মতই যখন ওর ধম্মোনাশ করলো তখন তো কারুর খারাপ লাগেনি। এখন মতইয়ের ধম্মোনাশ হয়েচে বলে খারাপ লাগচে। কেন সিলিয়ার ধম্ম বুঝি ধম্ম নয়। চামারণী রেখে আবার ধার্ম্মিক বনেছেন। ঠিক করেচে হরখু চৌধুরী। এমন লোকেদের এই হচ্ছে উপযুক্ত সাজা। চল্ সিলিয়া তুই আমার ঘরে চল্। কী নিদ্দয় তোর বাপ-মা রে? বাব্বাঃ! পিঠটা একেবারে রক্তারক্তি করে দিয়েচে। তুমি সোনাকে পাঠিয়ে দাও গে। আমি ওকে নে যাচ্ছি।"

হরি বাড়ি চলে গেলে সিলিয়া ধনিয়ার পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে।

২৪

সোনার বয়স সতেরো হলো, এবছর তার বিয়ে দেওয়াই উচিত। হরি বছর দুই ধরে চেষ্টা চরিত্তির করছে, হাত খালি থাকায় কিছু করতে পারেনি। কিন্তু এ বছর যেমন করে হোক, দিতেই হবে। ধার নিয়ে, ক্ষেত বাঁধা দিতে হলেও দেবে। শুধু হরির কথা খাটলে দু বছর আগেই বিয়েটা হয়ে যেত। কিন্তু ধনিয়া বলে, 'যতই টেনে খর্চাপাতি করো না কেন দু-আড়াইশো লেগেই যাবে।' ঝুনিয়ার জন্যে জ্ঞাতগুষ্ঠির চোখে এরা একটু নেমে গেছে আর একশো দুশো না দিলে কুলীন বরও মেলে না। গত বছর চৈতী ফসলে লাভ হয়নি। দাতাদীনের সঙ্গে ভাগ চাষে হরির হাতে সিকি ভাগ ফসলও আসেনি। আখ আর সন নষ্ট হয়ে গেল অতিবৃষ্টি আর উই পোকায়। এ বছর চৈতী ফসল ভালো হয়েছে, আখও। কাজেই দুশো টাকা হাতে এলে কন্যাদায় উদ্ধার হয়ে

যায়। গোবর যদি একশো দিত তাহলে সহজেই হরি আরেকশো জোগাড় করতে পারতো। ঝিঙুরী সিং আর মগরু শাহ দুজনেই এখন একটু নরম হয়েছে। গোবর যখন বিদেশে কাজ করছে তখন তাদের টাকা মার পড়বে না। একদিন হরি গোবরের ওখানে ঘুরে আসার প্রস্তাব করেছিল কিন্তু ধনিয়ার প্রবল আপত্তিতে হয়ে ওঠেনি। সে গোবরের কাছ থেকে এক পয়সাও নেবে না।

হরি ঝাঁঝিয়ে উঠে বলে, "কাজ চলবে কি করে, সেটা বল্।"

"ধরে নাও গোবর কোতাও যায়নি। তখন যা করতে তাই করো।"

হরির মুখ বন্ধ হয়ে যায়। শুধু বলে, "আমি তো তোকেই জিজ্ঞেস করচি।"

"এসব কতা ভাবা পুরুষমানুষের কাজ।"

"ধরে নে আমি নেই, তুই একলা। তখন যা করতিস এখন তাই কর।"

"তখন আমি ধানদুব্বো দে 'কুশকন্যে' পার করলেও কেউ হাসবে না।"

'কুশকন্যে' পার করতে হরিও জানতো। আর তাতেই তার মঙ্গল কিন্তু কুলমর্যাদা ছাড়ে কি করে? তার বোনেদের বিয়েতে তিনশো বরযাত্রী এসেছিল। দহেজও ভালোই দেওয়া হয়েছিল। নাচ-তামাশা, বাজা-গাজা *, হাতি-ঘোড়া সবই এসেছিল। আজও লোকে সেকথা বলে। দশটা গ্রামের লোকের সঙ্গে তার ভাব-সাব আছে। 'কুশকন্যা' দিলে মুখ দেখাবে কি করে? আর সে 'কুশ-কন্যা' দিতেই বা যাবে কেন? তিন বিঘে জমি আছে, বিঘেটাক বেচলেও শত-খানেক টাকা পাবে। কিন্তু চাষাভূষো মানুষ, জমি বেচে থাকবে কি করে? কয়েকদিন এভাবেই কাটে। হরি কুলকিনারা খুঁজে পায় না।

দশহরা **র ছুটিতে ঝিঙুরী, পটেশ্বরী আর নোখেরামের ছেলেরা ঘরে ফিরেছে। তিনজনেই ইংরিজি পড়ে, বিশ বছর বেরিয়ে গেলেও স্কুলের গণ্ডী পেরোয়নি। এক এক ক্লাসে দু-তিন বছর থাকে। বিয়েও হয়ে গেছে। পটে-শ্বরীর সুপুত্র বিন্ধেশ্বরী তো ছেলের বাপও হয়েছে। তিনজনেই দিনভোর ভাঙ খেয়ে, তাস খেলে মস্তানী করে বেড়ায়। দিনে কয়েকবারই হরির দরজার সামনে দিয়ে তাকাতে তাকাতে যায় আর এমনই ঘটনা সংযোগ যে ঠিক যখন তারা যায় তখনই সোনা কোন না কোন কাজে দরজায় এসে দাঁড়ায়। এসময় তার অঙ্গে ওঠে গোবরের দেওয়া সেই পাতলা ফিনফিনে পাড়ওয়ালা শাড়িটা। সব দেখে শুনে হরির রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছিল, যেন তার সবকিছু উজাড় করে দেবার জন্যে আকাশেও ষড়যন্ত্র চলেছে।

একদিন, হরি যে কুঁয়ো থেকে জল সেঁচছে আর সোনা মোট নিয়ে যাচ্ছে সেই কুঁয়োতেই তারা তিনজনে স্নান করতে এলো। দেখে হরির মাথায় যেন খুন চেপে গেল। দেরী না করে সেই সন্ধ্যেতেই সে দুলারীর কাছে গেল।

* বাজা-গাজা=ব্যাণ্ডপার্টি , ** দশহরা=পুজোর ছুটি

ভাবলে, মেয়েদের দয়া বেশি, একটু মন গলাতে পারলে আরো কম সুদেই টাকাটা দিতে পারে। কিন্তু দুলারী নিজেই কাঁদুনী গাইতে বসে। গ্রামের সব্বাই তার কাছে টাকা ধার নিয়েছে। কেউ শোধ দেবার নাম করে না। এমনকি ঝিঙুরী সিং-এর কাছেও কুড়ি টাকা পায়।

হরি মিনতি করে, "বোঠান, বড্ড পুণ্যি হবে। তুমি টাকা দেবে না, আমার গলার ফাঁস খুলে দেবে। ঝিঙুরী আর পটেশ্বরী আমার ক্ষেতের ওপর দাঁত লাগিয়ে পড়ে আচে। ভাবচি, বাপ-ঠাকুদ্দার এটুকু চেহ্ন গেলে কোতায় যাবো? সুপুত্তুর ঘরের সম্পত্তি বাড়ায় আর আমি এমনই কুপুত্তুর যে বাপ-ঠাকুদ্দার রোজগারের ওপর ঝাঁটা ঘোরাচ্ছি।"

"হরি আমি ঠাকুরের চরণ ছুঁয়ে বলচি, এখন আমার হাতে কিচ্ছু নেই। যে নিয়েচে, কেউ দেয়নি। আমি কি করবো? তুমি তো আমার শত্তুর নও। সোনাও আমারই মেয়ে কিন্তু তুমিই বলো, আমি কি করি? তোমার ভাই হীরে, হেলে গরু কেনবার নাম করে পঞ্চাশটাকা নে চলে গেল। তার বৌয়ের কাছে চাইতে গেলে ঝাঁটা মারতে আসবে। শোভা দেখতে সাদাসিধে কিন্তু পয়সা দিতে চায় না। কারুর কাছেই নেই তা দেবে কোত্থেকে! তাই সবুর করচি। চাষের জমি বেচবার শলা পরামশ্শ আমি দোব না। কিছু না হোক, মানইজ্জত তো আছে।" তারপর ফিসফিসিয়ে বলে, "পটেশ্বরী লালার ছোঁড়াটা ঘরের দিকে খুব চক্কর মারচে। তিনটের এক অবস্থা। একটু সাবধানে থেকো। ওরা শহুরে হয়ে গেচে, গাঁয়ের ভাই-ভাই সম্পক্ক বোজে না। গাঁয়ের ছেলেদের আদব * আচে, ভয়ও আচে। এ সব তো 'ছুটে ষাঁড়' **। আমার কৌশল্যা শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছিল তা আমি ওদের ঢঙ ঢাঙ দেকে ওর শ্বশুরকে ডেকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েচি। কে কত পাহারা দেবে।"

হরিকে হাসতে দেখে দুলারী সরস তাড়না দেয়, "হাসলে আমিও ছেড়ে দোব না হরি। সব কিছু বলে দোব। তুমিই কি কম বজ্জাত ছিলে নাকি। দিনে প'চিশবার একটা না একটা বাহানায় আমার দোকানে আসতে। আমি চোখ তুলে তাকাইওনি।"

হরি মৃদু প্রতিবাদ করে, তুমি মিছে কতা বল্‌চো বোঠান। কিছু রস না পেলে শুধুমুদু আসতুম নাকি? পাখি পোষ মানলে তবে তো বারবার উঠোনে আসে।"

"চল্ মিথ্যুক।"

"চোখ তুলে না তাকালেও তোমার মন পথ চেয়েই থাকতো। আবার তাকাতোও।"

"আচ্ছা হয়েচে হয়েচে। ভারী অন্তর্যামী হয়ে গেচো দেখচি। তোমাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখলে আমার দয়া হতো। তা না হলে তুমিও এমন কিছু সোন্দর জোয়ান-পুরুষ ছিলে না।"

* আদব=ভদ্রতা ** ছুটে ষাঁড়=খোলা ষাঁড়

হ্বসেনী এক পয়সার ন্বন নিতে এলে এসব পরিহাস বন্ধ হয়ে গেল। হ্বসেনী চলে গেলে দ্বলারী আবার বলল, "গোবরের কাছে যাচ্চো না কেন? দেখাও হবে আর হয়তো কিছ্ব পেয়েও যাবে।"

"সে কিছ্ব দেবে না। চার পয়সা রোজগার করতে পারলেই ছেলেদের মাথা ঘ্বরে যায়। আমি তো বেহায়ার মতো তব্ব যেতে রাজী ছিল্বম কিন্তু ধনিয়ার ইচ্ছে নয়। ওর মরজী ছাড়া গেলে তো ঘরে থাকাই দায়। তার স্বভাব তো জানো।"

"তুমি তো বৌয়ের গোলাম হয়ে গেচো।"

"তুমি এদিকে তাকালেই না, কি আর করবো?"

"আমার গোলামী করতে চাইলে আমি লিখিয়ে নিতুম। সত্যি বলচি।"

"এখনই বা অস্ববিধে কিসের? লিখে নাও না। দ্বশো টাকায় লিখে দিচ্চি। এমন কিছ্ব দামী নই।"

"ধনিয়াকে বলবে না তো।"

"না, বলো তো কসম খাচ্চি।"

"আর যদি বলো।"

"তাহলে আমার জিভটা কেটে নিও।"

"আচ্ছা. তাহলে যাও, ঘর ঠিকঠাক করো গে, আমি টাকা দোব।"

হরি সজল নেত্রে দ্বলারীর পা চেপে ধরে। দ্বলারী পা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে. "এসব বজ্জাতি আমার ভালো লাগে না। আমি একবছরের মধ্যে নিজের টাকা স্বদশ্বদ্ধ্ব আদায় করে নোব। তুমি মোটেই এসব ব্যাপারে খাঁটি লোক নও তবে ধনিয়াকে আমি বিশ্বেস করি। শ্বনচি, পণ্ডিত তোমার ওপর খ্বব চটেচে। বলে, এই গাঁ থেকে ওকে না তাড়াই তো বাম্বন নই। তুমি সিলিয়াকে বার করে দিচ্চো না কেন? বসে বসে ঝগড়া বাঁধালে।"

"ধনিয়া ওকে রেখেচে, আমি কি করবো।"

"শ্বনিচি. পণ্ডিত কাশী গেছিল। ওখেনে এক বড়ো পণ্ডিত আচে। সে পাঁচশো টাকা চাইচে। তবে প্রাশ্চিত্তির করাবে। আচ্ছা, বলো তো এত বোকা কেউ আছে? যখন ধম্ম নষ্ট হয়ে গেচে তখন একটা কেন হাজারটা প্রাশ্চিত্তির করলেই বা কি হবে? তোমার ছোঁয়া জল কেউ খাবে না. তা সে যতই প্রাশ্চিত্তির করো না কেন?"

হরি যখন ঘরে ফেরে তখন তার মন আনন্দে উছলে পড়ছে। পথে শোভাকে পাকা দেখার নেমন্তন্ন করে ফিরে আসে। তারপর দাতাদীনের কাছে দ্বজনে গিয়ে পাকা দেখার লগ্ন জিজ্ঞেস করে এসে প্রস্তুতি পর্ব শ্বর্ব করে দেয়।

ধনিয়া এসে বলে, "এক পহর রাত হয়ে গেল এখনও র্বটি খাবার সময় হলো না। খেয়ে নাও। গালগপ্প করার জন্যে তো সারারাত পড়ে আচে।"

হরি তাকেও শলাপরামর্শের শরীক করে নিয়ে বলে, "এই শ্বভদিনেই লগন ঠিক হলো রে। এখন বল্ কি কি আনতে হবে? আমার তো কিচ্ছ্ব মনে নেই।"

"যখন কিছুই মনে নেই তো কি শলা করতে বসেচো? টাকা পয়সার ব্যবস্থা হয়েচে না কি মনে মনেই মিঠাই খাচ্চো?"

"তোর তাতে দরকার কী? তুই শুধু বল্ কি কি লাগবে।"

"আমি তো মনে মনে মিঠাই খেতে রাজী নই।"

"তুই শুধু বল্ আমার বোনেদের বে-তে কি কি জিনিষ এসেছিল।"

"আগে বলো, টাকা পেয়েচো?"

"হ্যাঁ পেয়েচি, নয়তো কি ভাঙ গিলেচি।"

"তাহলে আগে খেয়ে নাও, পরে শলা করবো।"

কিন্তু সে যখন শুনলো দুলারীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে তখন নাক কুঁচকে বললে, "ওর কাছ থেকে টাকা নিয়ে আজ অব্দি কেউ শোধ করতে পেরেচে। রাক্ষুসী বড্ড সুদ নেয়।"

"তাহলে কি করবো! আর কে দেবে?"

"সত্যি কতাটা বলচো না কেন? এই বাহানায় ওই মাগীর সঙ্গে হাসি-মস্‌করা করতে গেছিলে। বুড়ো হলে তবু ওস্বভাব আর গেল না।"

"দ্যাখ্ ধনিয়া তুই মাঝে মাঝে বড়ো অবুঝের মতো কতা কোস। আমার মতো হতভাগার সঙ্গে সে গালগপ্প করতে যাবে কোন্ দুঃখে? ভালো করে কতাই কয় না।"

"তোমার মতো লোক ছাড়া ওর কাছে যাবেই বা কে?"

"ওর দোরে অনেক ভালো ভালো লোক নাক ঘষে রে ধনিয়া। ওর কাচে লক্ষ্মী আচে।"

"ও একটু হ্যাঁ বললেই তুমি বুজি একেবারে খোশখবর নিয়ে চারদিকে ছুটচো।"

"শুধু রাজী হয়নি, পাকা কতা দিয়েচে।"

হরি এবং শোভা দুজনেই উঠে পড়ে। সোনা সিলিয়ার সঙ্গে বাইরে আসে। সে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনেছে। তার বিয়ের জন্যে দুলারীর কাছ থেকে দুশো ধার নেওয়া হচ্ছে শুনে সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সিলিয়াকে বলে, "তুই কিছু শুনিচিস? বাবা মুদীবৌয়ের কাছ থেকে আমার বের জন্যে দুশো টাকা ধার নিচ্চে।"

সিলিয়া বাড়ির সব খবরই রাখতো। বলে, "ঘরে পয়সা নেই তো কি করবে?"

"আমি এমন বে করতে চাই না যাতে বাপ মাকে ধারকর্জ্জ করতে হয়। কোত্থেকে দেবে বেচারারা, তুই-ই বল্। আগের বোঝাতেই তারা ডুবে আচে আরো দুশো নিলে কি হবে বল্‌তো?"

"দান-দহেজ না দিলে বড়োলোকদের কি কোতাও বে হয়রে পাগলী? দহেজ না দিলে তো বুড়ো হাবড়া জুটবে। যাবি বুড়োর সঙ্গে?"

"বুড়োর সঙ্গে কেন যাবো? দাদা কি বুড়ো? ঝুনিয়াকে তো এনেছিল। ওকে কে কটা পয়সা দহেজ দিয়েচে।"

"তাতে বাপ-দাদার নাম ডোবে যে।"

আমি তো সোনারিওয়ালাদের বলে দোব যদি তুমি এক পয়সাও দহেজ নাও তাহলে আমি তোমাকে বে করবো না।"

সোনার বিয়ে স্থির হয়েছে সোনারীর এক ধনী কৃষকের ছেলের সঙ্গে। সিলিয়া শুনে বলে, "আর সে যদি বলে দেয়, আমি কি করবো? তোমার বাপ দিচ্চে, আমার বাপ নিচ্চে, এতে আমার কি করার আচে?"

সোনা যে অস্ত্রকে রামবাণ* ভেবেছিল এখন দেখলে সেটা বাঁশের ভোঁতা কঞ্চি ছাড়া কিছু নয়। হতাশ হয়ে বলে, "আমি শুধু একবার তাকে বলে দেখতে চাই। যদি সে বলে আমার কিছু করার নেই তাহলে ডুবে মরবো। গোমতী কি এখেন থেকে খুব দূরে? মা-বাপ কত কষ্ট করে পেলে-পুষে বড়ো করেচে। যাবার সময় কি একগাদা ঋণের বোঝা চাপিয়ে দে যাবো? ওদের থাকলে ওরা দিতো, আমিও মানা করতুম না। কিন্তু পয়সা-পয়সা করে যখন হেদিয়ে মরচে তখন বাপের চাষের ক্ষেত নীলেম না করিয়ে মেয়ের ধম্ম হলো ডুবে মরা। আমার জন্যে ওদের সারাটা জেবন কাঁদতে হবে না। তিন বছরে দুগুণ সুদ হয়ে গেলে বাবা দেবে কোত্থেকে বল্?"

সিলিয়া আনন্দে সোনাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, "তুই এত শিখলি কোত্থেকে রে সোনা? এত বুজদার মেয়ে তুই? দেখে তো তোকে বোকাসোকা ভালোমানুষ মনে হয়।"

"এতে বুদ্ধির কি আছে রে মুখপুড়ী। আমার কি চোক নেই, না আমি পাগল? আমার বে-তে দুশো নিলে তিন বছরে তা দুগুণ হয়ে যাবে। তারপর রূপিয়ার বে-তে আবার দুশো নিলে সব বেচেকুচে দোরে দোরে ভিক্ষে মাঁগতে হবে। এর চেয়ে তো মরা ভালো। তুই ভোর রাতে সোনারি থেকে তাকে ডেকে আনিস। নাঃ ডেকে কাজ নেই। ওর সঙ্গে কতা বলতে লজ্জা করবে। তার চেয়ে তুই-ই আমার কতা বলবি। দ্যাখ কি বলে? এমন কিছু দূর তো নয়। গরু-মোষ নে এদিকেও আসে। একদিন তো আমাদের ক্ষেতে ঢুকেছিল ওর মোষটা। খুব গাল দিইছিলুম। হাত জোড় করতে শুরু করলো। হ্যাঁরে, তোর সঙ্গে মতইয়ের দেখা হয়নি? শুনচি, বামুনরা ওকে জাতে তুলবে না।"

সিলিয়া বিদ্রূপ করে বলে, "বেরাদরী আবার নেবে না? বুড়োটা টাকা খরচা করতে চায় না তাই। ওরা তো পয়সা পেলে না-কে হ্যাঁ করে। ছেলে আজকাল বাইরের বারান্দায় বসে টিক্কড়** বানায়।"

"তুই ওকে ছাড়চিস না কেন? নিজের বেরাদরীতে কারুর সঙ্গে আরাম করে থাকগে যা। সে তো তোকে হেনস্তা করবে না।"

"আমার জন্যে ও বেচারার এত দুদ্দশা হলো আর আমি তাকে ছেড়ে যাবো? এখন যদি ও দেবতা বনে যায় কি পন্ডিত হয়ে যায় তবু আমার কাছে

* রামবাণ=চরম অস্ত্র/রামের বাণ ** টিক্কড়=চাপাটি

মতই-ই থাকবে। আর বামুন হয়ে যদি বামনী বে করে, আমার মতো সেবা কেউ করতে পারবে না। মান ইজ্জতের মোহে এখন ছেড়ে গেলেও দেখিস একদিন ঠিক আসবে।"

"আর এসেচে। তোকে পেলে কাঁচা মাথাটা চিবিয়ে খাবে।"

"তা ওকে ডাকতে যাচ্চে কে? সবারই ধম্ম আচে। ও নিজের ধম্ম নষ্ট করেচে, আমি আমার ধম্ম নষ্ট করতে যাবো কেন?"

সকালে সিলিয়া সোনারি যেতে পারে না, হরি বাধা দেয়। ধনিয়ার মাথা ধরেছে, তাই ক্ষেতের কাজ করতে হয়। দুপুরে ছুটি পেয়ে সে সোনারী যায়। বেলা তিন প্রহরে হরি আবার যখন কুঁয়োর কাছে গেল তখন সে সিলিয়াকে দেখতে পেলো না। রেগে উঠে বলে, "সিলিয়া কোতায় উড়ে গেল? থাকে থাকে কোতায় যেন উড়ে যায়। কাজে মন নেই। সোনা তুই জানিস?"

সোনা মিথ্যে কথা বলে, "আমি তো জানি না। বলছিল, ধোপার বাড়িতে যাবে। ওখেনেই গেচে বোধহয়।"

ধনিয়া উঠে বলে, "চলো আমি যাচ্চি। ওকে কি মজুরী দাও যে এত রাগ করচো?"

"আমাদের বাড়িতে থাকে না? ওর জন্যে সারা গাঁয়ে বদনাম হচ্চে।"

"হুঃ, এক কোণে পড়ে আচে। তার জন্যে ভাড়া নেবে নাকি?"

"এক কোণে পড়ে নেই একটা পুরো ঘর নে আচে।"

"তা ঐ ঘরের ভাড়া পঞ্চাশ টাকা হবে নাকি?"

"তার ভাড়া এক পয়সাই সই। আমার ঘরে তো থাকে। যেখেনে যাক, বলে যাক। আজ এলে দেখাচ্চি মজা।"

সেচের কাজ চলছে। ধনিয়াকে হরি আসতে দিল না, সোনা ও রূপা তার কাজে সাহায্য করে। সোনা সশংক চিত্তে সোনারীর দিকে চেয়ে থাকে। আশা ও আশংকায় তার মন দুলছে। গৌরী মাহাতো যে ভীষণ লোভী। মথুরার দয়া ধর্ম আছে কিন্তু বাপের কথা তো শুনতে হবে। তাহলে সোনা স্পষ্ট বলে দেবে 'যাও ধনীর দুলালী বে করো গে, তোমার সঙ্গে আমার মিলবে না।' আর গৌরী মাহাতো যদি মেনে নেয় তাহলে সে তার পা ধোয়া জল খাবে। বাপের চেয়েও বেশি সেবা করবে আর সিলিয়াকে ভরপেট মিষ্টি খাওয়াবে। গোবর তাকে যে টাকাটা দিয়েছিল, সেটা এখনও তার কাছে আছে। মধুর স্বপ্ন তার চোখেমুখে গোলাপী রেশ ছড়িয়ে দেয়।

সিলিয়া তো এখনো এলো না। কী বা এমন দূর? না, ঐ তো আসছে, কিন্তু বড়ো ধীরে ধীরে। এসেই সে কাজে লাগে, পাছে হরি তাকে কিছু বলে বসে। ঘন্টা দুয়েক উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটে তারপর সোনা ছুটে এসে বলে, "ওখেনে গে তুই মরে গেছিলি নাকি? তোর পথ দেখতে দেখতে চোক ফেটে গেল যে।"

সিলিয়ার খারাপ লাগলো কথাটা। বললে, "তাহলে কি আমি ওখেনে শুয়েছিলুম। এরকম কতাবাত্তা পথে দাঁড়িয়ে হয় নাকি? সুযোগ খুঁজতে হয়। মথুরা নদীর ধারে গরু মোষ নে গেছিল। খুঁজে খুঁজে তার কাছে গে তোর

খপর দিলুম। এত ভাবনায় পড়লো তা তোকে কি বলবো। আমার পায়ে পড়ে বললে—সিল্লো, আমি তো যবে থেকে শুনচি সোনা আমার ঘরে আসবে তখন থেকে আমার ঘুম ছুটে গেচে। কিন্তু বাবাকে কি বলবো? সে তো কারুর কতা শোনে না।”

“তা না শুনুক। সোনারও জিদ আচে। যা বলেচে তাই করে দেখাবে। হাত ধুয়ে বসে থাকুক।”

“ব্যস, তক্ষুণি গরুমোষ সব ফেলে আমায় নে গৌরী মাহাতোর কাচে গেলো। মাহাতোর চারটে সেঁচের কাজ চলচে। কুঁয়োটাও ওদেরই। দশ বিঘে জমি। আর মাহাতোকে দেখতে কেমন জানিস? ঠিক যেন ঘেসেড়া। ভাগ্য ভালো অবিশ্যি। বাপ-বেটার খুব তক্ক হলো গৌরী মাহাতো বলছিল, ‘আমি কিছু নিই না নিই তোর তাতে কি? তুই মাঝে কতা বলবার কে?’ আর মথুরা বললে, ‘তোমার দেনাপাওনা থাকে তো আমার বে দিও না। আমি আমার বে যেমন খুশি করবো।’ তক্কাতক্কি হলো। গৌরী মাহাতো মথুরাকে খুব জুতোপেটা করলো। অন্য কোন ছেলে হলে এত মার খেয়ে বিগড়ে যেত। মথুরা একটা ঘুষি মারলেও মাহাতোকে আর উঠতে হতো না। কিন্তু বেচারা পঞ্চাশ ঘা জুতো খেয়েও কতা কইলে না। তারপর মাহাতো আমাকে নে পড়লো। তা আমি শুনতে যাবো কেন? আমি সাফ বলে দিলুম, ‘দ্যাখো মাহাতো দু তিনশো টাকা খুব বেশি নয় আর হরি মাহাতোও এটুকুতে বিকিয়ে যাবে না, তুমিও বড়োলোক হবে না। ওসব রঙ-তামাশাতেই উড়ে যাবে কিন্তু এমন বৌ পাবে না’।”

সোনা সজল নেত্রে বলে, “মাহাতো এই কতা শুনে ওকে মারতে শুরু করে দিল।”

সিলিয়া প্রথমে কথাটা বলতে চায়নি, তবু বেরিয়ে গেল। বলে, “সেই গোবর ভাইয়ের কতা আর কী। মাহাতো বলছিল, ‘লোকে মিঠে পেলে তবেই এঁটো তুলে খায়’ ‘কলঙ্ক চাঁদী সে হী ধুলতা হ্যায়।’* তাতে মথুরা বললে, ‘বাবা, কোন্ ঘরে পাপ নেই। তবে হ্যাঁ কোতাও জানাজানি হয়েচে আর কারুর লুকোছাপা আচে।’ গৌরী মাহাতোও এক চামারণীর সঙ্গে ফেঁসেছিল তার দুটো ছেলেও আচে। মথুরার মুখ থেকে কতাটা বেরোতেই মুখপোড়ার ওপর যেন ভূতে ভর করলো। যেমন লুভী তেমনি রাগী। ও না পেলে ছাড়বে বলে মনে হয় না।”

দুজনে ঘরে ফেরে। সোনার মাথায় দড়ি-বালতী আর জোয়ালের বোঝা তবু তার মনে হচ্ছিল সবই যেন খুব হাল্কা। মথুরা তার কল্পনায় বীরের বেশে দাঁড়িয়ে। মনে মনে সে মথুরাকে অভিনন্দন জানায়। রাতে সোনার খুব জ্বর এলো। তৃতীয় দিন হরির কাছে গৌরী মাহাতোর নাপিত একটা চিঠি নিয়ে এলোঃ

* কলঙ্ক চাঁদী সে হী ধুলতা হ্যায়=টাকা দিয়েই ময়লা ধোয়া যায়

"স্বস্তি শ্রী সর্বোপমা যোগ শ্রীহরিমাহাতোকে গৌরীরামের রাম রাম। আগে আমাদের মধ্যে যে দহেজের কথাবার্তা হয়েছিল আমি তা শান্তমনে বিচার করে বুঝেছি যে দেনাপাওনা নিয়ে বর আর কনে দুজনের বাড়ির লোকেরই জেরবার হয়। যখন তোমার-আমার সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেছে তখন আমাদের এমন ব্যবহার করা উচিত যাতে কারুর কোন ক্ষতি না হয়। তুমি দান-দহেজের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিও না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, মোটা-মিহি যা কিছু জোটে বরযাত্রীদের খাইও। সে খরচও আমি করবো, রসদের জোগাড় করে নিয়েছি। তুমি খুশি মনে আমাদের যেটুকু খাতির করবে আমরা হাসিমুখে তা মেনে নেব।"

হরি চিঠি পড়ে আনন্দে উছলে উঠে ধনিয়াকে শোনায়। ধনিয়া একটু ভেবে বলে, "এ হচ্ছে গৌরী মাহাতোর ভালোমান্ষি। কিন্তু আমাদেরও তো মানইজ্জত আচে। লোকে কি বলবে? টাকা তো হাতের ময়লা। তার জন্যে কুল মর্যাদা ছাড়া উচিত নয়। আমরা যা পারি দোব, আর গৌরী মাহাতোকেও নিতে হবে। তুমি এ কথাই লিখে দাও। মা-বাপের রোজগারে মেয়ের হক নেই বুজি? নাঃ লেখার কি আচে, চলো আমিই নাপিতকে বলে দিচ্চি।"

হরি হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর ধনিয়া গৌরীমাহাতোর উদারতার প্রত্যুত্তর দিতে যায়। তারপর সে নাপিতকে সরবৎ খাইয়ে পয়সা দিয়ে বিদায় করে। সে চলে গেলে হরি বলে, "এ তুই কি করলি বল্‌তো ধনিয়া? তোর মেজাজের আজো কুল পেলাম না। আগে বলছিলি, ধারকজ্জ করে কিছু দিয়ে কাজ নেই আর ভগমান যখন গৌরীর মধ্যে বসে এই চিঠি লেখালেন তখন তুই কুল মর্যাদার কতা নে পড়লি।"

"মুখ দেখেই বাজী রাখতে হয়, তা জানো তো। তখন গৌরী তেজ দেখাচ্ছিল, এখন ভালোমানষি দেখাচ্চে। কিন্তু 'ইট কা জবাব পত্থর'* হলেও সেলামের জবাবে তো গাল দেওয়া যায় না।"

"তাহলে দেখা তোর ভালোমানষি। দেখি কোত্থেকে টাকা আনিস।"

"টাকা রোজগার করা আমার কাজ নয়, তোমার কাজ।"

"আমি তো দুলারীর কাছ থেকেই নোব।"

"ওর কাছ থেকেই নাওগে, 'জব ডুবনা হী হ্যায় তো কেয়া তালাও আউর কেয়া গঙ্গা'**।"

হরি বাইরে এসে ছিলিম ধরায়। কত সহজে কাটানো যেত কিন্তু ধনিয়া ছাড়বে তবে তো। যখন দেখো উল্টো চাল। যেন মাথায় ভুত চেপেছে। ঘরের অবস্থা দেখেও তার চোখ খোলে না।

*ইঁট কা জবাব পত্থর=ইঁটের উত্তর পাথর/যথোপযুক্ত

**যব ডুবনা হী হ্যায় তো কেয়া তালাও আউর কেয়া গঙ্গা=যখন ডুবেই মরতে হবে তখন পুকুরই বা কী আর গঙ্গাই বা কী (সব সমান)

২৫

এদিকে ভোলা আবার নতুন বিয়ে করেছে। নারী ছাড়া জীবনটাই পান্‌সে মনে হচ্ছিল। যতদিন ঝুনিয়া ছিল তাকে জলটা-হুঁকোটা এগিয়ে দিত, খাবার সময় ডেকে নিয়ে যেত। এখন বেচারা অনাথের মতো অসহায়। ছেলের বউরা ঘরের কাজ সেরে ফুরসৎ পায়না। তাই বিয়ে করা দরকার হয়ে উঠেছিল। সংযোগবশতঃ এক যুবতী বিধবার খোঁজ পাওয়া গেল। তার স্বামী মাত্র তিন মাস মরেছে, একটা ছেলেও আছে। শুনেই ভোলার জিভে জল ঝরতে শুরু করে। বিয়ে ঠিক না হওয়া পর্যন্ত সে তার ঘরের চৌকাট কামড়ে পড়ে থাকে এবং ঝটপট কাজও হাসিল করে ফেলে।

এতদিন সংসার ছিল বৌয়েদের হাতে। তারা যা চাইতো তাই করতো। জংগী তার বৌকে নিয়ে লক্ষ্ণৌ চলে গেলে কামতার বৌই পুরোপুরি বাড়ির গিন্নী হয়েছিল। পাঁচ-ছ মাসের মধ্যেই তার হাতে তিরিশ-চল্লিশ টাকা জমে গেল। একসের আধসের দৈ পেলেই চুরি করে বেচে দিত। আর এখন গিন্নী হলো সৎ শাশুড়ী। তার গিন্নীপনা বৌয়ের ভালো লাগে না, প্রায়ই ঝগড়া হয়। এমনকি তাদের পেছনে কামতা আর ভোলা কথা কাটাকাটি করে। শেষে ভিন্ন হবার কথাও উঠলো আর সনাতন রীতি অনুযায়ী একসময় মারপিটও হলো।

কামতা জোয়ান ছেলে। ভোলার যা কিছু-জোর সে বাপ হওয়ার দরুণ কিন্তু নতুন বৌ এনে সে ছেলের কাছে খাতির যত্ন পাবার হক্ হারিয়েছে। অন্ততঃ কামতা তাই মনে করে। সে ভোলাকে পট্‌কে ফেলে কয়েকটা লাথি মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। ঘরের জিনিষপত্রও ছুঁতে দিল না। গ্রামের কেউ ভোলার পক্ষ নিলো না। তারা রাতটা কোনরকমে একটা গাছের নীচে কাটিয়ে পরদিন সকাল হতেই নোখেরামকে নালিশ জানায়। ভোলার জন্যে ভাবতে নোখেরামের বয়ে গেছে। কিন্তু তার সংগে চটকদার সুন্দরী বৌ দেখে সে আশ্রয় দিতে রাজী হয়। যেখানে তার গরু থাকতো সেখানকার একটা কুঠরীতে তাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। তার গরুমোষকে দেখার জন্যে একটা লোকের দরকার থাকায় ভোলাকে তিন টাকা মাইনে ও এক সের দৈনিক খোরাক দিয়ে সে চাকর রাখলে।

নোখেরাম বেঁটেখাটো, মোটা, টেকো। তার চোখ ছোট , নাক লম্বা, গায়ের রঙ ময়লা। মাথায় বড়ো একটা পাগড়ী আর ঝোলা কুর্তা পরে সে শীতকালে গায়ে লেপ জড়িয়ে ঘোরা ফেরা করে। তেল মালিশ করাতে ভালোবাসে। তাই পরনের কাপড়টা সবসময় তেলচিটচিটে ময়লা। পরিবার খুব বড়ো। সাত ভাই তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে নোখেরামের আশ্রিত। তার নিজের ছেলেও ক্লাস নাইনে ইংরিজি পড়ে, তাই তার বাবুয়ানীর ঠাটও কম নয়। রায়সাহেব তাকে মাত্র বারোটাকা বেতন দেন। কিন্তু খরচ একশো টাকার কম নয়। তাই প্রজারা কোন রকমে তার জালে ফেঁসে গেলে তাকে ভালোভাবে শুষে না নিয়ে

নোখেরাম ছাড়ে ন। আগে সে যখন ছটাকা মাইনে পেত তখন এভাবে প্রজা-দের গায়ের ছাল খুলতো না কিন্তু মাইনে বাড়ায় তার লোভ আরো বেড়েছে। তাই রায়সাহেব আর মাইনে বাড়ান না।

গ্রামের সবাই তাকে তোষামোদ করে এমনকি দাতাদীন ও ঝিঙুরী সিংও তাকে মানে শুধু পটেশ্বরী তার সঙ্গে তাল ঠোকবার জন্যে সবসময় তৈরি। নোখেরাম যদি ভাবে যে 'আমি বামুন আর আমি কায়েতগুলোকে আঙুল দিয়ে নাচাই' তো পটেশ্বরীও ভাবে 'আমি কায়েত, কলমের বাদশাহ, আমার সঙ্গে কে লড়বে'। তার ওপর সে জমিদারের চাকর নয়, তার মালিক সরকার বাহাদুর, যার রাজ্যে সূর্য কখনও ডোবে না। নোখেরাম যদি একাদশীতে পাঁচজন বামুন ভোজন করায় তো পটেশ্বরী প্রতি পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ কথা শুনে দশটা বামুন খাওয়ায় শুধু একটা ব্যাপারে পটেশ্বরী এগিয়ে আছে। লোকে বলে সে এক বিধবা কাহারনীকে রক্ষিতা রেখেছে। এবার নোখেরামও নিজের মান-সম্মানের খামতিটুকু মিটিয়ে নেবার সুযোগ পেলো। সে ভোলাকে সাহস দিয়ে বলে, "তুমি এখেনে আরামে থাকো ভোলা। কোনো অসুবিধে হবে না। যা দরকার হবে, বলবে। তোমার বৌয়ের জন্যেও কোন না কোন কাজ নিশ্চয় পাওয়া যাবে। গোলায় ফসল তোলা-নামানো কি কম কাজ!"

ভোলা আরজি জানায়, "সরকার একবার কামতাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে নাও। বাপ-বেটার মধ্যে কি এ সম্পক্ক হওয়া ভালো? আমি ঘর বানালুম, গরু-মোষ আনলুম। এখন সব কেড়ে নিয়ে আমায় দূর করে দিল। এ অন্যায় নাতো কী? আমাদের মালিক তো তুমিই। তোমার দরবারে এর বিচার হওয়া উচিত।"

নোখেরাম বোঝায়, "ভোলা তুমি ওর সঙ্গে লড়ে পারবে না। ওর সাজা ভগমান দেবেন। বেইমানী করে কেউ ভালো ফল পেয়েচে? দুনিয়ায় অন্যায় না হলে একে নরক বলবো কেন? ভগমান সব দেখছেন। তোমার মনের কথা তিনি অন্তরযামী, ঠিক টের পাচ্চেন। তুমি চুপচাপ থাকো। ভগমানের ইচ্ছেয় এখানেও তুমি সুখে থাকবে।"

এখান থেকে গিয়ে ভোলা হরিকে নিজের দুঃখের কান্না শোনায়, হরিও বলে, "ছেলেদের কতা আর বোলো না ভাই, মরে-মরে মানুষ করো, জোয়ান হয়ে তোমার দুশমন হয়ে যাবে। আমার গোবরকেই দ্যাখো না। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেল। বছর ঘুরে গেল না খোঁজ না পত্তর। ওর কাছে বাপ-মা মরে গেচে। মেয়ের বে সামনে। জমিটুকু বাঁধা রেখে আমি দুশো টাকা ধার করেচি। ইজ্জত-আবরু রেখে কাজ করতে হবে তো।"

কামতা বাপকে মেরে ভাগালেও বুঝতে পারলো বুড়ো বাপ কত কাজ করতো। সকালে উঠে গরুকে খোল-জাব দেওয়া, দুধ দোওয়া—এক পক্ষের মধ্যে তার মাথা খারাপ হবার জোগাড় হলো। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া শুরু হয়। বৌ বলে, "আমি পেরাণ দেবার জন্যে তোমার ঘরে আসিনি। আমাকে রুটি দিতে কষ্ট হয় তো আমি চললুম বাপের বাড়ি।" কামতা ভয় পায়। এও চলে

গেলে হয়ত রুটিটুকুও জুটবে না। শেষে একটা চাকর রাখে তাতেও কাজ হয়নি। সে খোল ভুষি চুরি করে বেচে দেয়। তাকে তাড়ালে আবার স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হয় ও তার বৌ বাপের বাড়ি যায়। কামতার হাত পাও ফুলেছে। হার মেনে ভোলার কাছে এসে মিনতি জানায়, "বাবা যা ভুলচুক হয়ে গেচে, ক্ষমা করো। বাড়ি চলো, ঘরদোর দ্যাখো। তুমি যা বলবে তাই করবো।"

এখানে মজুরের মতো থাকতে ভোলারও ভালো লাগেনা। প্রথমে একমাস তার যে খাতির হয়েছিল এখন আর তা হয় না। নোখেরাম তাকে মাঝে মাঝে তামাক সাজতে কি খাটিয়া বিচোতেও বলে। বেচারা ভোলা মুখ টিপে সহ্য করে। নিজের বাড়িতে মারদাঙ্গা হলেও কারুর তাবেদারী করতে তো হবেনা।

তার বৌ নোহরী রেগে বলে, "যেখেনে লাতি খেয়ে পালিয়ে এসেচো সেখেনে আবার যাবে? তোমার লজ্জাও করে না।"

"এখেনেই বা কোন সিংহাসনে বসে আচি?"

নোহরী বলে, "তুমি যাও আমি যাবো না।"

ভোলা জানতো, নোহরী বিরোধ বাঁধাবে। কারণটাও সে বুঝতে পারছিল, দেখতেও পাচ্ছিল। এখান থেকে পালাতে চাওয়ার সেটাও অন্যতম কারণ। এখানে ভোলাকে কেউ পোঁছে না বটে তবে নোহরীর খুব খাতির। পেয়াদারাও তার কথায় ওঠে বসে। তাই নোহরীর কথা শুনে ভোলার খুব রাগ হলো। কিন্তু কি করে? নোহরীকে ছেড়ে চলে যাবার সাহস যদি তার থাকতো তবে নোহরীও তার পেছুপেছু যেত। তাকে একলা নিজের আশ্রয়ে রাখবার সাহস নোখেরামের নেই। সে বেড়ার আড়ালে বসে শিকার করে কিন্তু নোহরী ভোলার স্বভাবটি চিনে ফেলেছিল।

ভোলা মিনতি করে, "দ্যাখ নোহরী, দিক * করিস না। এখন তো ওখেনে বৌয়েরাও নেই। তোর হাতেই সব কিছু থাকবে। এখেনে মজুরী করলে বেরাদরীতে বদনাম হবে। সে কথাটাও ভাব।"

"তোমার যেতে হয় যাও, আমি তোমায় বাধা দিচ্চি না। বেটার লাতি খেতে তোমার ভালো লাগতে পারে আমার লাগে না। আমি মজুরী করেই খাবো।"

ভোলাকে থাকতেই হলো। কামতা তার স্ত্রীকে খোশামোদ করে ফিরিয়ে আনে। গ্রামে নোহরীকে নিয়ে কানাকানি শুরু হয়—'নোহরী আজ গোলাপী শাড়ি পরেচে, রোজ একটা শাড়ি পরলেই বা কার কী? "সৈঁয়া ভয়ে কোতোয়াল অব ডর কাহে কা"!** 'ভোলাটা চোকের মাতা খেয়েচে নাকি?'

শোভা খুব হাসাতে পারে, সে সারা গ্রামের বিদূষক, নারদও। একদিন নোঁহরীর সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেলে সে একটু ঠাট্টাঠুট্টি করে বসলো। নোহরী নোখেরামকে নালিশ জানালে সে শোভাকে চৌপালে ডেকে এমন শাসালে যা সে জীবনে ভুলবে না।

* দিক্=বিরক্ত

** সৈঁয়া ভয়ে কোতোয়াল অব ডর কাহে কা=নাগর হলো কোতোয়াল, তখন ভয় কাকে

একদিন লালা পটেশ্বরীর পালা এলো। গরমের দিন। লালা বাগানে আম পাড়াচ্ছে। নোহরী সেজেগুজে সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল, লালা দেখে বলে, "ও নোহরীরানী ইদিকে এসো, কটা আম নে যাও, খুব মিষ্টি।"

নোহরীর মনে হলো লালা তাকে ঠাট্টা করছে। এখন তার অহংকার হয়েছে, সে চায় লোকে তাকে জমিদারনীর মতো খাতির করে। অহংকারীরা খুব সন্দিগ্ধ হয়। ভাবে, 'আমায় দেখে হাসলো কেন? সবাই আমায় দেখে জ্বলে মরে কেন? আমি তো কারুর কাচে কিছু চাইতে যাই না। কে এমন সতী-লক্ষ্মী আচে, আমার সামনে আসুক তো। এই লালা কাহারনী রেখেচে আবার আমাকে দেখে হাসচে। ওকে কেউ কিছু বলে না, বড়লোক কিনা তাই। নোহরী গরীব, ছোটজাত তাই তাকে নে হাসে। আর যেমন বাপ, তেমনি ছেলে—ওর ছেলে রামেশ্বরী তো সিলিয়ার জন্যে পাগল!' সে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, "তুমি দাতা হয়ে গেলে কবে থেকে লালা। পেলে তো পরের থালা থেকে রুটি উড়িয়ে দাও। আজ বড়ো আমওলা হয়ে উঠেচো যে! আমাকে জ্বালালে ভালো হবে না বলে দিচ্চি।"

ওহ্! গয়লানীর মেজাজ দেখ! নোখেরামকে ফাঁসিয়ে দিয়ে ভাবছে সারা দুনিয়ার রানী হয়ে গেছে। বলে, "তুই শুধুমুদু চটে যাচ্ছিস নোহরী! যেন গাঁয়ে আর কাউকে থাকতে দিবি না। একটু মুখ সামলে কথা বল্। এত শীগ-গির নিজেকে ভুলে গেলি?"

"তা তোমার দোরে কি কোনদিন ভিখ মাঁগতে এসেচি।"

"নোখেরাম ছায়া না দিলে ভিক্ষেও মাঁগতে হতো।"

নোহরী রাগে লাল-লঙ্কাটি হয়ে উঠলো। যা মুখে আসে তাই গালাগাল দিলে—দেড়েল, লম্পট, মুখপোড়া—তারপর রেগেমেগে ঘরে ফিরে নিজের হাঁড়ি-কুঁড়ি বার করতে বসে।

নোখেরাম শুনে দৌড়ে আসে, "এ কী কচ্চিস রে নোহরী? কাপড়-চোপড় বাইরে বের কচ্চিস কেন? কেউ কিছু বলেচে নাকি?"

নোহরী পুরুষদের নাচাতে জানতো। সারা জীবনে সে শুধু এই ছলা-কলার বিদ্যেই শিখেছিল। নোখেরাম লেখাপড়া জানতো; আইন কানুন জানে। অনেক ধর্ম পুস্তক পড়েছে। অনেক বড়ো বড়ো উকিল-ব্যারিস্টারের মুখে ঝামা ঘষেছে কিন্তু মূর্খ নোহরী তাকে খেলার পুতুলে পরিণত করেছে। নোহরী ভুরু কুঁচকে বলে, "সময়ের ফের, তাই এখেনে এসে পড়িচি কিন্তু নিজের আবরু-ইজ্জত বেচবো না।"

নোখেরাম গোঁফ খাড়া করে বলে, "তোর দিকে যে তাকাবে তার চোখ গেলে দোব।"

নোহরী তাতানো লোহায় ঘা মারে, "লালা পটেশ্বরী যখন দ্যাখো, আমার সঙ্গে অকতা-কুকতা বলে। আমি বেশ্যা নাকি যে যার যা খুশি বলে আমাকে পয়সা দেখাবে। গাঁ ভর্ত্তি মেয়েছেলে আচে, কই তাদের তো কিছু বলে না। আমাকেই জ্বালায়।"

নোখেরামের মাথায় খুন চেপে গেল। নিজের মোটা লাঠি তুলে ঝড়ের গতিতে বাগানে গিয়ে চেঁচায়, "সত্যিকারের মরদ যদি হোস তো চলে আয়। গোঁফ উবড়ে নোব। মাটিতে পুঁতে ফেলবো। বেরিয়ে আয় সামনে। আর কোনদিন যদি নোহরীকে কিছু বলিস তো খুন করে ছাড়বো। পাটোয়ারী-গিরি বার করে দোব। নিজে যেমন তেমনি সব্বাইকে ভাবিস, তাই না?"

লালা পটেশ্বরী মুখ নীচু করে দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখ খুললেই বিপদ। সে জীবনে এত অপমানিত হয়নি। একবার লোকে তাকে পুকুরের পাড়ে অন্ধকারে খুব মেরেছিল কিন্তু গ্রামের লোক সে খবর পায়নি। আজ তার সব সম্মান ধুলোয় মাটি হলো। কাল যে মেয়ে গ্রামে আশ্রয় চাইতে এসেছিল আজ সে গ্রামের আতঙ্ক হয়ে উঠলো।

এখন নোহরী গ্রামের রাণী। তাকে আসতে দেখলেই চাষীরা তার রাস্তা ছেড়ে সরে যায়। সবাই বুঝে গিয়েছিল নোহরীকে খুশি করতে পারলেই নোখেরামকে দিয়ে অনেক কাজ করানো যায়। কখনো কখনো সে ভালো চাষী-কেও ধমক লাগায় আবার গোমস্তাসাহেবকেও বকে দেয়।

ভোলা তার আশ্রিত হয়ে থাকতে চায় না। বৌয়ের রোজগারে খাওয়ার মতো নিকৃষ্ট কাজ নেই। সে মোটে তিনটাকা মাইনে পায় তাও তার হাতে আসে না নোহরীই উড়িয়ে দেয়। সে তামাক খাবার জন্যে একটা আধলাও পায় না অথচ নোহরী রোজ দু আনার পান খায়। যাকে দেখো, সেই ভোলার ওপর তেজ দেখায়। পেয়াদারাও তাকে দিয়ে তামাক সাজায়, কাঠ কাটায়। দিনভোর খেটেখুটে ভোলা দোরের সামনে খাটিয়ায় পড়ে থাকে। এক ঘটি জলও কেউ দেয় না। দুপুরের বাসী রুটি চিবোয় জল আর নুন দিয়ে।

শেষে হার মেনে সে ঠিক করে বাড়ি ফিরে কামতার সঙ্গেই থাকবে। কিছু না থাক, নিজের ঘরে একটুকরো রুটি তো জুটবে। নোহরী বলে, "আমি ওখেনে কারুর গোলামী করতে পারবো না।"

ভোলা মন শক্ত করে, "তোকে যেতে বলচি না। আমি নিজের কথা বলচি।"

"তুমি আমায় ছেড়ে চলে যাবে? বলতে লজ্জা করচে না?"

"লাজলজ্জা তো গুলে খেয়েচি।"

"আমি তো খাইনি। তুমি আমায় ছেড়ে যেতে পারবে না।"

"তুই নিজের মনে থাকবি, আমি তোর গোলামী করতে যাবো কেন?"

"পঞ্চায়েৎ ডেকে তোমার মুখে কালি লাগাবো।"

"এখনো কি কালি কম লাগচে? তুই কি আমায় ধোঁকায় রাখতে চাস নাকি?"

"তুমি এমন মেজাজ দেখাচ্চো যেন রোজ কত গয়না গড়িয়ে দিচ্চো। নোহরী কারুর মেজাজ সয় না।"

ভোলা লাফিয়ে উঠে পাগড়ি আর লাঠি নিয়ে যাবার উপক্রম করতেই নোহরী ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলে। তার বলিষ্ঠ বাহুবন্ধন কাটিয়ে ভোলার পক্ষে বেরোনো সম্ভব নয়। চুপ করে সে কয়েদীর মতো বসে পড়ে। এমন

একদিন ছিল যখন সে মেয়েদের নাচাতে পারতো কিন্তু এখন একটি নারীর করপাশ থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারলো না।

২৬

লালা পটেশ্বরী সমস্ত সদ্গুণের সাক্ষাৎ অবতার। গ্রামের সমস্ত প্রাণীর ভালোমন্দের ভার যেন তার হাতে। কোন চাষা তার ভাইয়ের ইঞ্চিখানেক জমি দখল করলে কি কোন খাতক মহাজনের টাকা ফেরৎ না দিলে সে সহ্য করতে পারে না। মিলেমিশে সদ্ভাবে থাকায় সে বিশ্বাসী নয়। সে নিজে সংঘর্ষের পূজারী তাই সবাইকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। ইদানীং তার সহানুভূতি পড়েছে মগরু শাহের ওপর। মগরু শাহ গ্রামের সবচেয়ে ধনী, কিন্তু গ্রাম্য রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে না। বাড়িও গ্রামের বাইরে, সেখানে একটা শিব-মন্দির বানিয়ে তাই নিয়েই থাকে। মহাজনী কারবার নিয়েও খুব মাথা ঘামায় না, চাষীরা টাকা ফেরৎ না দিলেও নালিশ-টালিশ করে না। হরির কাছেও সুদে আসলে দেড়শো টাকা বাকী, কিন্তু কারুরই সেদিকে হুঁস নেই। সে দুবার বকুনি দিয়েও হরির অবস্থা দেখে চুপ করে গেছে। এবার ঘটনাচক্রে হরির আখের ফলন সবচেয়ে ভালো হয়েছে, দুশো-আড়াইশো টাকা নিশ্চয় উঠবে। পটেশ্বরী মগরুকে বোঝায় এসময় হরিকে ধরলে টাকা উসুল হতে পারে। মগরু যতটা অলস ততটা দয়ালু নয়। ঝামেলায় পড়তে হবে না জেনে সে ডিগ্রী জারি করার ভার এবং আদালতের রাহাখরচ পটেশ্বরীকে দিয়ে দেয়।

হরি এসব কথা জানতেও পারলে না। কবে মামলা দায়ের হলো, কবে ডিক্রী জারি হলো কে জানে। আমিন যখন তার আখ নীলাম করতে এলো তখন সে জানলো। সারা গ্রাম ক্ষেতের পাশে জমা হয়ে যায়। হরি মগরু শাহের কাছে দৌড়োয় আর ধনিয়া পটেশ্বরীকে গালাগাল করে। তার সহজ বুদ্ধি বলে দিয়েছিল এ হচ্ছে পটেশ্বরীর কারসাজি। কিন্তু মগরু পুজোয় ব্যস্ত তাই দেখা হলো না আর ধনিয়ার গালাগালও পটেশ্বরীর কোন ক্ষতি করতে পারলো না। ওদিকে ক্ষেত দেড়শো টাকায় নীলাম হয়ে গেল আর ডাকও হলো মগরু শাহের নামে। অন্য কেউ ডাকতে পেলো না এমনকি দাতাদীনও ভয় পেয়ে গেলেন।

ধনিয়া হরিকে বলে, "বসে আচো কেন? পাটোয়ারীকে শুধোও গে, তোমার গাঁয়ের লোকের সঙ্গে এ কী ব্যাভার? এই কি তোমার ধম্ম?"

"শুধোবার জন্যে তুই মুখ রেখেছিস কি না? তোর গাল কি শোনেনি?"

"গাল খাবার কাজ করলে তো খাবেই।"

"তুই গালও দিবি আবার গাঁ-সম্পক্কও পাতাবি?"

"দেখবো কে আমাদের ক্ষেতের কাছে আসে।"

"মিলওয়ালারা এসে কেটে নে যাবে। তুই কি করবি আর আমিই বা কি করবো। গাল দে যত পারিস জিভ চুলকে নে।"

"আমি বে'চে থাকতে আমার ক্ষেত কেটে নে যাবে?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ তুই-আমি সারা গাঁয়ের লোক মিলেও ওকে রুখতে পারবো না। এখন ও আর আমাদের জিনিষ নয়, মগরু শাহের জিনিষ।"

"মগরু শাহ মরে-মরে জষ্ঠির দুপুরে ক্ষেতের কাজ করেচে?"

"সে সব তুই করেচিস কিন্তু এখন জিনিষ মগরু শাহের আমরা ওর কাচে ধার নিইনি?"

আখ তো গেল। কিন্তু তার সঙ্গে এক নতুন সমস্যা এসে গেল। দুলারী এই আখের ভরসাতেই টাকা দিতে রাজী হয়েছিল। এখন সে কিসের জামিনে টাকা দেবে? এখনো তার দুশো টাকা বাকী। ভেবেছিল আখ থেকে পুরনো দেনা শোধ হলে নতুন হিসেব আবার শুরু হবে। তার নজরে হরির দাম দুশো টাকা, তার বেশি দেওয়া বিপজ্জনক। এদিকে শুভদিন এসে গেছে। বিয়ের দিন পর্যন্ত স্থির। গৌরী মাহাতোর প্রস্তুতি শেষ। এখন বিয়ে পেছোনো অসম্ভব। হরির ইচ্ছে করছিল দুলারীর গলা টিপে মেরে ফেলে। যতটা কাকুতি মিনতি করা সম্ভব সে করেছে। দুলারীর পাথরের মূর্তি তাতে গলেনি। সে যেতে যেতে বলে, "দুলারী আমি তোমার টাকা নে পালিয়ে যাবো না। শীগগির মরচিও না। ক্ষেত আচে, গাছপালা আচে, ঘর আচে, জোয়ান ছেলে আচে। তোমার টাকা মারা যাবে না। আমার ইজ্জত যেতে বসেচে, তুমি বাঁচাও।" কিন্তু দুলারী ব্যবসার সঙ্গে দয়াকে মেলাতে রাজী নয়। ব্যবসাকে দয়ারূপে চালাতে তার আপত্তি নেই, তবে দয়াকে ব্যবসার রূপ দিতে সে নারাজ।

হরি ঘরে এসে ধনিয়াকে বলে, "এখন উপায়?"

"এই তো তুমি চাও।"

"আমারই সব দোষ?"

"যারই দোষ হোক, হয়েচে তোমার ইচ্ছেয়।"

"তোর ইচ্ছে কি? জমি বাঁধা দোব?"

"জমি বাঁধা দিলে করবে কি?"

"মজুরী।"

কিন্তু জমি দুজনেরই প্রিয়। তার ওপরই তাদের মান মর্যাদা নির্ভর করছে। যার জমি নেই সে তো গৃহস্থ নয়, মজুর মাত্র! হরি জবাব না পেয়ে বলে, "তা কী বলিস?"

"বলার কি আচে? গৌরী বরযাত্তির নে আসবে। এক বেলা খাইয়ে সকালে মেয়ে বিদেয় করে দিও। দুনিয়া হাসবে, হাসুক। ভগমানের ইচ্ছে আমাদের মুখে চূণকালি লাগে, তাই হবে।"

হঠাৎ নোহরীকে চুনরী শাড়ি পরে সামনে দিয়ে যেতে দেখা গেল। হরিকে দেখে সে একটু ঘোমটা টানে, তার সঙ্গে বেয়াই সম্পর্ক মেনে চলে। ধনিয়ার সঙ্গেও তার পরিচয় হয়েছে। হরি ডাকে, "আজ কোতায় চললে গো বেয়ান? এসো, বসো।"

নোহরী দিগ্বিজয় শেষ করে এখন জনমতকে নিজের দিকে টানার চেষ্টা

করছিল। এসে দাঁড়াতে ধনিয়া তাকে আপাদমস্তক তীক্ষ্ন সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বলে, "আজ ইদিকে পথ ভুলে নাকি?"

নোহরী কাতর সুরে বলে, "এমনি তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলুম। মেয়ের বে কবে নাগাদ হচ্চে?"

ধনিয়া সন্দিগ্ধ সুরে উত্তর দেয়, "ভগমানের ইচ্ছে যবে হয়।"

"আমি যে শুনলুম আসচে লগনেই হবে। দিন স্থির হয়ে গেচে।"

"হ্যাঁ দিন স্থির হয়ে গেচে।"

"আমাকেও নেমন্তন্ন কোরো।"

"তোমারই তো মেয়ে, নেমন্তন্ন কিসের?"

"দহেজের জিনিষপত্তর কেনা হয়ে গেচে বোধহয়। আমিও একটু দেখি।"

ধনিয়া অস্বস্তি বোধ করে। হরি বলে, "এখনো কিছু কেনা হয়নি বেয়ান। আর জিনিষ কি হবে? কুশকন্যে দান তো করবো।"

নোহরী অবিশ্বাসের সুরে বলে, "কুশকন্যে কেন দেবে মাহাতো, পেরথম মেয়ে, হাত খুলে দাও।"

হরি হাসে। যেন বলতে চায়, তুমি চারদিকে সবুজ দেখছো নোহরী, এখানে সবই বর্ণহীন! বলে, "টাকা পয়সার অসুবিধে আচে। তোমার কাচে আর লুকোবো কি?"

"রোজগেরে ছেলে, তুমি রোজগার করো। তবুও টাকাপয়সার অভাব। কি করে বিশ্বেস করবো?"

"ছেলে লায়েক হলে আর ভাবনা কি ছিল? চিঠি পত্তরই দেয় না তার টাকা পাঠাবে কি? এই দুবছর চলচে, একটা চিঠিও পাইনি।"

এমন সময় সোনা বলদের জন্যে এক বোঝা ঘাস এনে সেখানেই ফেলে ছুটে পালায়। নোহরী বলে, "মেয়ে তো খুব স্যায়না হয়ে গেচে।"

ধনিয়া বলে, "জানোই তো 'লড়কী কী বাড় রেঁড় কী বাড় হ্যায়' *। নাঃ খুঁড়বো না, আর কটা দিনই বা আচে।"

"বর ঠিক হয়ে গেচে তো?"

"হ্যাঁ বর ঠিক আচে। টাকার জোগাড় হলে এমাসেই চায় হাত এক করে দোব।"

নোহরীর মন হাল্কা, অগভীর। সে সামান্য কিছু টাকা জমিয়েছিল। ভাবলে যদি কিছু টাকা সোনার বিয়েতে দিয়ে দেয় তাহলে নাম যশ হবে। লোকে অবাক হবে। হরি-ধনিয়া সবার কাছে তার কথা বলবে। এখন সারা গ্রাম তার শত্রু, রাতারাতি তারা হিতৈষী হয়ে যাবে। তাই বলে, "অল্পে সল্পে কাজ চলে তো আমি দিতে পারি। হাতে টাকা এলে ফেরৎ দিও।" হরি আর ধনিয়া তার দিকে অবাক হয়ে তাকায়। না, নোহরী ঠাট্টা করছে না। তারা লজ্জিত হয়। লোকে যত বলে নোহরী তাহলে তত খারাপ নয়। নোহরী

*লড়কী কী বাড় রেঁড় কী বাড় হ্যায়=মেয়েদের বাড় রেঁড়ি গাছের মতো

আবার বলে, "তোমার-আমার মানইজ্জত তো এক। তোমাদের নে হাসলে আমাকে নে হাসা হবে না বুজি! যেভাবেই হোক এখন তো তোমরা আমাদের কুটুম।"

হরি সংকুচিত হয়ে বলে, "তোমার টাকা তো ঘরেই আছে বেয়ান। যখন দরকার পড়বে নোবখন। মানুষ তো জ্ঞাতকুটুমের ওপরই ভরসা করে। বাইরে থেকে পাওয়া গেলে আর ঘরের টাকা নে কি হবে?"

ধনিয়া অনুমোদন করে, "হ্যাঁ তাই তো।"

নোহরী আত্মীয়তার ওজর তোলে, "ঘরেই যখন টাকা আচে তখন বাইরে হাত পাততে যাবে কেন, সুদ দিতে হবে, তার ওপর 'ইস্টাম' লেখো, সাক্ষী ডাকো, দস্তুরী দাও, খোশামোদ করো। অবশ্য আমার টাকায় দোষ থাকলে আলাদা কতা।"

হরি সামলায়, "না না বেয়ান, ঘরের টাকায় যখন কাজ চলবে তখন বাইরে হাত পাতবো কেন? কিন্তু আপোষের কতা তো। বুজতেই পারচো। চাষবাসের ওপর ভরসা নেই। তোমার যদি তাড়াতাড়ি দরকার পড়ে আর আমি টাকা জোগাড় করতে না পারি তাহলে তোমার খারাপ লাগবে, আমারও বিপদ হবে। তাই বলছিলুম। নইলে, তোমারই তো মেয়ে।"

"আমার এখনই টাকার দরকার নেই।"

"তাহলে তোমার থেকেই নোবখন। কন্যেদানের সুফলই বা বাইরে যায় কেন?"

"কত টাকা চাই?"

"তুমি কত দিতে পারবে?"

"একশোয় কাজ চলবে?"

হরির লোভ হলো। ভগবান ছাত ফুঁড়ে টাকা দিচ্ছেন, তাহলে যত পারে ততই বা নেবে না কেন? বলে, "একশোতেও চলবে। পাঁচশোতেও চলবে। যেমন কুলোয়।

"আমার কাছে সবশুদ্ধু দুশো আচে, সেটা আমি দোব।"

"তাহলে তো খুব ভালোভাবে কাজ চলে যাবে। ঘরে যব-গম সব আচে; কিন্তু ঠাকরুণ, আজ সত্যি বলচি তোমায় আমি এমন লক্ষ্মী ভাবিনি। এই যুগে কে কার সাহায্য করে? আর কারই বা আচে? তুমি আমাকে ভরাডুবি থেকে বাঁচালে।"

সাঁঝ বাতি জ্বালার সময় হলো। ঠান্ডা পড়েছে। ধনিয়া ঘর থেকে 'অঙ্গীঠী'* জেবলে আনে। সবাই ঘুর** তাপতে বসে। পৃথিবী নীল চাদর মুড়ি দিয়েছে। খড়ের আগুনে সুন্দরী কুলটা নোহরীকে ছবির মতো দেখাচ্ছে।

* অঙ্গীঠী=আগুন রাখার ছোট পাত্র, (কড়া জাতীয়)

** ঘুর=আগুন তাপা

এখানে সে বরদাত্রী, তাই চটুল চোখে নম্র সমবেদনা, কপোলে গাঢ় লজ্জা আর ঠোঁটে সংপ্রেরণার মৃদু হাসি!

কিছুক্ষণ পরে নোহরী উঠে পড়ে বলে, "দেরী হয়ে যাচ্ছে। কাল তুমি এসে টাকা নে যেও মাহাতো।"

"চলো আমি তোমায় পেঁছে দিই।"

"না না, তুমি বোসো। আমি চলে যাবো।"

"ইচ্ছে করচে তোমায় কাঁধে করে নে যাই।"

নোখেরামের চৌপাল গ্রামের অপর মাথায়। সোজা পরিষ্কার পথ! দুজনে পথে নামে। চারদিকে ঘন ছায়া। নোহরী বলে, 'রাত্তত'কে* একটু বুজিয়ে বলো না। কেন সবার সঙ্গে ঝগড়া করে? যখন এদের সঙ্গে থাকতেই হবে তখন একটু আপন হয়ে থাকাই তো ভালো। ঝগড়াঝাঁটি করে কি হবে? তুমি যখন আমাকে পরদাপোষে রাখতেই পারবে না, আমাকে মজুরী করতে হবে তখন আমি কারুর সঙ্গে হাসবো না, কইবো না তা কি হয়? এসব ঘরে বসে থাকলে তবে চলে। যখনকার যা তাই করো। এককালে তোমার ঘরে হাতি বাঁধা থাকতো, তা এখন তোমার কি কাজে লাগচে। এখন তো তুমি তিনটাকা মাইনের মজুর। আমার ঘরেও তো মোষ বাঁধা থাকতো কিন্তু এখন তো আমি মজুরনী। ও কিচ্ছু বুজতে চায় না। কখনো বলে ছেলেদের কাচে গে থাকবো, কখনো বলে লক্ষ্ণৌ চলে যাবো। কি বলবো নাকোদম হয়ে গেল।"

হরি সহানুভূতি জানায়, "এতো ভোলার মুখ্যুমি। বুড়ো হয়েচে। বোজা উচিত। আমি বুজিয়ে দোবখন।"

"তাহলে সকালে এসো। টাকা নে যেও।"

"কিছু লেখাপড়া......"

আমি জানি তুমি আমার টাকা হজম করবে না। নোহরীর বাড়ি এসে গেলে সে ঘরে যায়, হরি বাড়ি ফেরে।"

২৭

গোবর শহরে ফিরে দেখলো সে যেখানে খোঞ্চা নিয়ে বসতো সেখানে আরেকজন খোঞ্চাওয়ালা বসায় ক্রেতারা তাকে ভুলে গেছে। ঘরটাকেও এখন তার খাঁচা মনে হয়। ঝুনিয়া একলা বসে কাঁদে। ছেলেটার উঠোনে খেলা অভ্যেস। এখানে দরজার সামনে হাতখানেক রাস্তা আছে। যেমন ময়লা, তেমনি দুর্গন্ধ। গরমেও বাইরে শোয়াবসার উপায় নেই, ছেলেটাও মাকে ছেড়ে থাকে না। ঘরে ধনিয়া, হরি, সোনা, রূপা কি পুনিয়া তাকে খেলাতো। এখানে কেউ নেই তাই মাকে ছাড়ে না। ঝুনিয়াকে একাই সব কাজ করতে হয়।

গোবর যৌবনের নেশায় মত্ত। তার অতৃপ্ত লালসা ভোগের সমুদ্রে ডুবে থাকতে চায়। কোন কাজে তার মন লাগে না। খোঞ্চা নিয়ে যায় তো ঘণ্টা-

*রাত্তত=সর্দার (এখানে স্বামী অর্থে ব্যবহৃত)

খানেক বাদেই ফিরে আসে। মনোরঞ্জনের অন্য কোন জিনিষ তার হাতের কাছে ছিল না। প্রতিবেশী মজুর আর এক্কাওয়ালারা রাত-ভোর তাস আর জুয়া খেলে। আগে সেও খেলতো কিন্তু এখন তার শুধু ভালোলাগে ঝুনিয়ার সঙ্গ ও রঙ্গপরিহাস। দুদিনেই ঝুনিয়ার এই জীবনের ওপর বিতৃষ্ণা এসে গেল। একটু নিরালা অবসর পেলেও যেন সে কেঁদে বাঁচতো। তার এখন গোবরের ওপরই রাগ হয়। শহরজীবনের কত মোহময় ছবি সে এঁকেছিল আর এখানে অন্ধকার কুঠরী ছাড়া কিছুই নেই। ছেলের ওপরও তার রাগ হয়। মাঝে মাঝে তাকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। চুন্নু কেঁদে সারা হয়।

তার ওপর উড়ো বিপত্তি হলো ঝুনিয়া আবার অন্তঃসত্বা হয়েছে। মাথার ওপর কেউ নেই। সব সময় মাথা ব্যথা, অরুচি। তন্দ্রায় নিঝুম হয়ে এককোণে পড়ে থাকে। কেউ ডেকে একটা কথাও জিজ্ঞেস করে না। শুধু গোবরের বাঁধনভাঙা নিষ্ঠুর প্রেম দেহের দুয়ারে বারবার হানা দেয়। স্তনে দুধ নেই, তবু চুন্নু বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে শুষে নিতে চায়। ঝুনিয়া সবসময় মৃত্যুর ছায়া চোখের সামনে নাচতে দেখে। স্বামী বা ছেলে কারুর ওপরই তার কোন টান ছিল না। কিন্তু বর্ষাকালে যখন চুন্নুর দাস্ত হতে শুরু করলো এবং সে দুধ খাওয়াও ছেড়ে দিল তখন ঝুনিয়ার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। একসপ্তাহ বাদে চুন্নুও মারা গেল। এখন তার স্মৃতি পুত্রস্নেহের সঙ্গে সজীব হয়ে ঝুনিয়াকে কাঁদায়। আর গোবর যখন ছেলের মৃত্যুর এক সপ্তাহ বাদেই আবার আগ্রহ দেখাতে শুরু করে তখন ঝুনিয়া রাগে জ্বলে ওঠে, "তুমি কি জানোয়ার নাকি?"

ঝুনিয়ার কাছে চুন্নুর চেয়েও চুন্নুর স্মৃতি প্রিয়। সে যতদিন তার সামনে ছিল তখন সুখের চেয়ে কষ্টই পেত বেশি। এখন চুন্নু শান্ত শিষ্ট সহাস্য-বদন! বাইরের চুন্নু তার অন্তরের চুন্নুর প্রতিবিম্বমাত্র। প্রতিবিম্ব যা অস্থির, অসত্য তা আর সামনে নেই। সত্যরূপটিকে সে অন্তরে লালন করছিল। তাই বেঁচে থাকতে যে ছেলে ভার হয়েছিল, মরে সে প্রাণের সঙ্গে মিশে রইল। অন্যান্য সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে সে উদাসীন হয়ে গেছে। গোবর দেরীতে আসে, না আগে : ভালো করে খায়, না খায় না ; খুশি না অখুশি তা সে ভাবেও না। এখন সে নির্জীব যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

গোবর যদি তার দুঃখের ভাগ নিয়ে অন্তরে প্রবেশ করতে চাইতো তাহলে হয়ত বাইরে দেহের শুষ্ক তটে এসে তৃষ্ণার্ত হয়ে তাকে ফিরে যেতে হতো না। শেষে একদিন সে রেগে উঠে বলে, "চুন্নুর নাম করে আর কদ্দিন কাঁদবি? চার মাস তো কেটে গেল।"

ঝুনিয়া ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, "তুমি আমার দুঃখু বুঝবে না। তুমি নিজের কাজ করোগে। আমি যেমন আছি, তেমনি পড়ে থাকবো।"

"তুই কাঁদলে কি চুন্নু ফিরবে?"

ঝুনিয়ার কাছে এর উত্তর ছিল না। সে উঠে আলু সেদ্ধ করতে বসে।

গোবরকে সে এত হৃদয়হীন ভাবেনি। চুম্নুর স্মৃতি আরো গাঢ় হয়। এখন চুম্নু শুধু তার, শুধু তারই আর কারুর নয়।

গোবর ফেরিওয়ালার কাজে হতাশ হয়ে চিনিকলে চাকরি নিয়েছিল। মিস্টার খান্না প্রথম সুগার মিলটি দেখে উৎসাহিত হয়ে আরেকটি মিল খুলেছেন। ওখানে গোবরকে খুব ভোরে যেতে হয় আর দিনের শেষে পিদীম জ্বালা হলে সে যখন ঘরে ফেরে তখন তার দেহে যেন প্রাণ থাকে না। গ্রামেও সে কাজ করতো কিন্তু উন্মুক্ত আকাশের নীচে তার একটুও ক্লান্তি ছিল না। এখানে খাটনি আর হৈ হট্টগোলের ভিড়ে সে যেন পেরে ওঠে না। তারওপর সর্বদা বকুনি খাবার ভয়। সব শ্রমিকদেরই এই দশা। তাই সবাই মদ আর তাড়ির নেশায় নিজেদের মানসিক অবসাদকে ডুবিয়ে দিতে চাইত। গোবরেরও মদের নেশা ধরে গেল। প্রায়ই এক প্রহর রাতে নেশায় চুর হয়ে ঘরে ফেরে আর কোন না কোন বাহানায় ঝুনিয়াকে মারে-ধরে গালাগালি দেয়।

ঝুনিয়ার ভয় হয় সে রক্ষিতা বলেই বোধহয় গোবর এত অপমান করছে। বিয়ে করা বৌ হলে পারতো না। বিরাদরী তাকে দন্ড দিত, হুঁকো-পানি বন্ধ করতো। এই কপটীর সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে খুব ভুল করেছে। প্রসবের সময় যত এগিয়ে আসছিল তত ভয়ে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে। এই ঘরে সে নির্ঘাৎ মরে যাবে। কে তাকে দেখবে? কে তাকে সামলাবে? জীবনটা যেন নরক হয়ে গেল!

একদিন সে জল আনতে গেলে এক পড়শিনী জিজ্ঞেস করে, "ক মাস হলো রে?"

ঝুনিয়া লজ্জিত হয়ে বলে, "কি জানি দিদি আমি তো গুণিটুনিনি।"

পড়শিনীর দোহারা চেহারা, কালো, বেঁটে, কুরূপা। তার স্বামী এক্কা চালায় আর সে নিজে একটা কাঠের দোকান করেছে। ঝুনিয়া কয়েকবার সেখান থেকে কাঠ এনেছে, এটুকুই তার পরিচয়। সে হেসে বলে, "আমার তো মনে হচ্ছে আজকালের মধ্যেই হবে। কোন দাই-টাই ঠিক করেচিস।"

ঝুনিয়া ভীত স্বরে বলে, "আমি তো এখেনে কাউকে চিনি না।"

"তোর মরদ কেমন মানুষ। কানে তেল দিয়ে ঘুমোচ্চে?"

"আমার খোঁজে তার দরকার কী?"

"তাই তো দেকচি। তুই আঁতুড়ে ঢুকবি। কাজ-কম্ম করার জন্যেও তো লোক চাই। শাশুড়ী-ননদ-জা-ভাজ কেউ নেই? কাউকে ডাকলেই তো হয়।"

"আমার কেউ নেই।" সে জল নিয়ে ফিরে এঁটো বাসন মাজে আর ভাবে, 'কি করে কি হবে ঠাকুর? ওহ! আর কি হবে, মরে যাবো এই তো! ভালোই হবে, সব জঞ্জাল মিটবে।'

সন্ধ্যে বেলা তার ব্যথা ওঠে। বুঝতে পারে সময় আসন্ন। এক হাতে পেটটা চেপে ধরে ঘামতে ঘামতে উঠে কোনরকমে উনুন ধরিয়ে গোবরের জন্যে খিচুড়ি চাপিয়ে যন্ত্রনায় কাতর হয়ে সেখানেই মাটিতে শুয়ে পড়ে। রাত দশটা নাগাদ গোবর বাড়ি ফেরে। তাড়ির দুর্গন্ধে ম-ম করছে। মাথাটা বুকের ওপর

ঝুঁকে পড়েছে। মুখে আবোল তাবোল বকুনি, “আমি কারুর পরোয়া করি না। যার গরজ সে থাকবে নয়তো চলে যাবে। কারুর তেজ সহ্য করবো না। নিজের মা-বাপের তেজ সহ্য করিনি। তাহলে পরের সইতে যাবো কেন? জমাদার মেজাজ দেকায়। লোকে চেপে না ধরলে খুন করে ফেলতুম। খুন! কাল দেকবো, বড়োজোর ফাঁসীই তো হবে। দেকিয়ে দোব মরদ কি করে মরে। মেয়েছেলের জাত! কি পাগল! খিচুড়ি বসিয়ে পা ছাড়িয়ে শুয়ে আচে। কেউ খেলো না খেলো বয়েই গেল। নিজে মজা করে ফুলকা ওড়ায় আমার বেলায় খিচুড়ি। দে যত পারিস কষ্ট দে, ভগমান বিচার করবেন। তোকে কষ্ট দেবেন।”

সে ঝুনিয়াকে ডাকে না। চুপচাপ খিচুড়ি বেড়ে দু-চার গ্রাস খেয়ে বারান্দায় শুয়ে পড়ে। ভোররাতে শীত লাগছে বলে ঘরে কম্বল আনতে গিয়ে সে ঝুনিয়ার কাৎরানি শোনে। নেশা ছুটে গিয়েছিল। বলে, “কি হয়েচে রে ঝুনিয়া?”

“বড্ড পেট ব্যথা করচে।”

“তুই আগে কেন বলিসনি? এখন আমি কোতায় যাই?”

“কাকে বলবো?”

“আমি কি মরে গেচি নাকি?”

“আমি মরি বাঁচি, তোমার কি?”

গোবর ভয় পায়। কোথায় দাই খুঁজতে যাবে? এখন সে কি আসবে? ঘরেও তো কিচ্ছু নেই। হতচ্ছাড়ী আগে বললে কারুর কাছে ধারধোর করে দু-চার টাকা চেয়ে আনতো। এই হাতেই আগে পঞ্চাশ-একশো টাকা থাকতো, লোকে খোশামোদ করতো। আর এই অলক্ষ্মী আসতেই যেন মা লক্ষ্মী মুখ ফিরিয়ে নিলেন। টাকা টাকা করে হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়। হঠাৎ কে যেন ডেকে বলে, “এ কী তোমার বৌয়ের গলা, ব্যতা ওঠেনি তো?”

প্রশ্ন করে সেই মোটা স্ত্রীলোকটি, সে ঘোড়াকে দানা খাওয়াবার জন্যে উঠেছে। ঝুনিয়ার আর্তনাদ শুনে এগিয়ে আসে। গোবর বারান্দায় এসে বলে, “ব্যতা উঠেছে। ছটফটও করচে। এখেনে কোন দাই পাওয়া যাবে?”

“সে তো আমি ওকে দেখেই বুঝেছি। দাই ‘কচ্চী সরাই’এ থাকে। দৌড়ে গে ডেকে আনো।”

“আমি তো কচ্চী সরাই চিনি না। কোন্ দিকে?”

“আচ্ছা তুমি ওকে একটু হাওয়া করো। আমি ডেকে আনচি। তাই তো বলে, ‘আনাড়ী আদমী কিসি কাম কা নহী, পুরা পেট আউর দাই কী খবর নহী।’ *” বলতে বলতে সে চলে যায়। তার নাম চুহিয়া, লোকে আড়ালে বলে ‘মুটকী’। একথা শুনলে সে অবশ্য চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে দেয়। মিনিট

* আনাড়ী আদমী...খবর নহী=অনভিজ্ঞ লোক কোন কাজে লাগে না, আসন্ন প্রসবা অথচ ধাইয়ের খবর নেই

দশেকের মধ্যেই সে ফিরে এসে বলে, "এ সংসারে গরীবদের যে কি হবে ভগমানই জানে। রাঁড়টা বলচে পাঁচ টাকা নোব—তারপর যাবো। আর আট আনা রোজ। বারো দিনের দিন একটা শাড়ি। আমি বললুম, 'তোর মুখ ঝলকে দোব। চুলোয় যা। আমি দেকে নোব।' বারোটা বাচ্চা শুধুমুদু বিইয়েচি নাকি? তুমি বাইরে যাও গোবর্ধন, আমি সব করে নোবখন। সময় পড়লে মানুষকেই মানুষের কাজ করতে হয়। বলে না, 'চার বচ্চে জনা লিয়ে তো দাই বন বৈঠী!'*"

সে ঝুনিয়ার পাশে বসে নিজের উরুর ওপর ঝুনিয়ার মাথাটা রেখে পেটে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, "আমি তো আজ তোকে দেখেই বুজতে পেরেচি। সত্যি বলতে কি, এই চিন্তায় রাতে ঘুমই আসেনি। এখেনে তোর কে আচে?"

ঝুনিয়া দাঁতে দাত চেপে প্রাণপণে যন্ত্রণা ঠেকায়, "আর বাঁচবো নাগো দিদি। আমি তো ভগমানের কাছে চাইতে যাইনি। একটাকে বড়ো করলুম। ঠাকুর তাকে তুমি ছিনিয়ে নিলে তো এর দরকার কি ছিল। আমি মরে যাবো মা, তুমি বাচ্চাটাকে পেলে পুষে বড়ো কোরো। ভগমান তোমার ভালো করবেন।"

চুহিয়া সস্নেহে তার চুলে বিলি কাটে, "ধৈরজ ধর্ মা, ধৈরজ ধর্। এক্ষুণি সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে। তুই যে সব চুপচাপ সারছিলি। এতে লজ্জা কিসের? আমাকে বললেই তো আমি মৌলবী সায়েবের কাছ থেকে তাবিজ এনে দিতুম। ওই মির্জাজী, এই হাতাতেই থাকেন।"

এরপর ঝুনিয়ার আর হুঁস রইল না। সকাল নটার সময় যখন জ্ঞান ফিরলো দেখে চুহিয়া শিশুকোলে বসে আছে আর সে পরিষ্কার শাড়ি পরে শুয়ে রয়েছে। এত দুর্বল, যেন দেহে এক ফোঁটা রক্ত নেই।

চুহিয়া রোজ সকালে হরীরা** আর হালুয়া তৈরি করে দিয়ে যায়। দিনেও কয়েকবার এসে বাচ্চাকে উবটন*** মাখায়, তোলা দুধ খাওয়ায়। আজ চারদিন হলো। কিন্তু ঝুনিয়ার বুকে দুধ আসছে না। শিশু কেঁদে কেঁদে গলা চিরে ফেলছে কারণ তোলা দুধ তার হজম হচ্ছে না। এক মিনিটও চুপ করে না। চুহিয়া নিজের স্তন তার মুখে দেব। শিশু একটু চুষেই দুধ না পেয়ে আবার চেঁচায়। চারদিনের দিন সন্ধ্যেবেলাতেও দুধ এলো না দেখে চুহিয়া ভয় পেয়ে গরুছাগলের বাজারের কাছ থেকে একজন রিটায়ার্ড ডাক্তার ডেকে আনলো। তিনি দেখে শুনে বললেন, 'এর গায়ে রক্তই নেই, দুধ আসবে কোত্থেকে?' সমস্যা জটিল হয়ে ওঠে। দেহের পুষ্টির জন্যে মাসখানেক ওষুধ পথ্য পড়লে দুধ হতে পারে। ততদিনে ছেলেটার কি হবে!

প্রহর খানেক রাত। গোবর তাড়ি খেয়ে বারান্দায় পড়ে আছে। চুহিয়া বাচ্চাকে চুপ করাতে তার মুখটা নিজের বুকে গুঁজে বসেছিল। হঠাৎ সে অনু-

*চার বচ্চে জনা লিয়ে তো দাই বন বৈঠী=চারটে বাচ্চার জন্ম দিয়ে ধাই হয়ে বসলো।

**হরীরা=হরতুকি, জায়ফল প্রভৃতি শুকনো ফল এবং মশলা মিশ্রিত বস্তু, সদ্য প্রসূতীকে খাওয়ানো হয়।

***উবটন=রূপটান/বাচ্চাকে তেল মাখানো

ভব করে তার বুকে দুধ এসে গেছে। খুশি হয়ে বলে, "নে ঝুনিয়া এবার তোর ছেলে বাঁচবে আমার বুকে দুধ এসে গেচে।"

ঝুনিয়া অবাক, "তোমার বুকে দুধ এসে গেচে?"

"হ্যাঁ রে, সত্যি।"

"আমার তো বিশ্বেস হচ্ছে না।"

"দ্যাখ না।" সে নিজের স্তন টিপে দেখায়, দুধের বিন্দু ফুটে ওঠে।

ঝুনিয়া বলে, "তোমার ছোট মেয়েটার বয়েস তো আটের কম নয়।"

"হ্যাঁ, [illegible]টে পড়েচে। কিন্তু আমার খুব দুধ হতো।"

"তা[illegible]রে আর কোন ছেলেপুলে হয়নি?"

"ওই মেয়েটাই কোলপোঁচা। বুক একেবারেই শুকিয়ে গেছিল। সবই ভগবানের লীলা আর কী!"

এখন থেকে চুহিয়া চার পাঁচবার এসে দুধ খাইয়ে যায়। ছেলেটা খুব দুর্বল জন্মালেও চুহিয়ার দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে। একদিন চুহিয়া নদীতে স্নান করতে গেছে। এসে দেখে ছেলেটা খিদের জ্বালায় ছটফট করছে আর ঝুনিয়া তাকে কোলে নিয়ে থামাতে চাইছে। চুহিয়া কোলে নিতে গেলে ঝুনিয়া অভিমানভরে বলে, "হতভাগা মরে যায় তো সেই ভালো। কারুর দয়া কুড়োতে হবে না।" চুহিয়া কাকুতিমিনতি করলে ঝুনিয়া তার কোলে বাচ্চাকে তুলে দেয়।

ঝুনিয়ার সঙ্গে গোবরের মিটমাট এখনো হয়নি। সে ধরেই নিয়েছিল 'গোবর ঘোর মতলববাজ, নিষ্ঠুর আর আমি তার ভোগের বস্তু। আমি মরি বাঁচি যাই হোক না কেন তার ইচ্ছে মিটিয়ে দিলে কোন দুঃখ নেই। হয়তো ভাবে এটা মরে গেলে আরেকটা আনবো। কিন্তু হাত ধুয়ে বসে থাকো তুমি। আমি বোকা বলেই তোমার ফাঁদে পা দিয়েছি। তখন তো পায়ে মাথা ঘষতে। এখানে এসেই মেজাজ বদলে গেল।' শীত এসে গেছে। পাতবার বা গায়ে দেবার কিচ্ছু নেই। ডাল-রুটি খেয়ে যে দু-চার টাকা বাঁচে তাড়িতেই উড়ে যায়। একটা পুরনো লেপ ছিল তাতেই দুজনে শোয়, তবু তাদের মধ্যে যেন একশো ক্রোশের ব্যবধান!

গোবরের মন শিশুকে কোলে নেবার জন্যে মাঝে মাঝে ব্যাকুল হয়ে উঠতো। কখনো কখনো মনে হতো রাতে উঠিয়ে তার চাঁদ মুখখানা দেখে। কিন্তু ঝুনিয়ার দিক থেকে তার মন সরে যাচ্ছিল। ঝুনিয়াও তার সঙ্গে কথা বলতো না, সেবাযত্নও না। দুজনের মনোমালিন্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লোহার মরচের মতো গভীর হয়ে চেপে বসছিল।

ওদিকে গোবরের চিনিকলেও প্রায়ই একটা না একটা হাঙ্গামা লেগেই থাকে। এবারের বাজেটে চিনির ওপর ডিউটি লেগেছে। মিলের মালিকরা মজুরী কমাবার একটা সুযোগ পেয়ে গেল। ডিউটির জন্যে যদি পাঁচগুণ ক্ষতি হয় তো মজুরী কমালে দশগুণ লাভ। এই মিলেও নানারকম মশলা ছড়ানো হচ্ছে। মজুরেরা 'হরতাল' করার জন্যে তৈরি।এদিকে মজুরী কমাতেই

ওদিকে হরতাল শুরু হলো। মজুররা মজুরী থেকে এক আধলাও কাটতে দিতে রাজী নয়। যখন লাভের সময়ে তারা এক আধলা মজুরী বেশি পায়নি। তখন মন্দার দিনে তারাই বা সাহায্য করতে যাবে কেন?

মির্জা খুরশেদ সংঘের সভাপতি আর 'বিজলী'র সম্পাদক পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ সেক্রেটারী হলেন। দুজনে হরতাল করাবার জন্যে এমন তুলকালাম কাণ্ড করলেন যা মিলমালিকদের অনেকদিন মনে থাকবে। হরতালের ফলে যে মজুরদেরও ক্ষতি হবে এমনকি হাজার হাজার মানুষের রুটি জোটাও কঠিন হয়ে উঠতে পারে সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি একেবারেই ছিল না। [illegible]র গোবর তো ধর্মঘটীদের মধ্য সবার আগে ছিল। উদ্দণ্ড স্বভাব তো ছিলই[illegible]রা কিম্বা মারার ভয়ও ছিল না। একদিন ঝুনিয়া মন শক্ত করে তাকে বোঝায়, "তুমি ছেলেপুলের বাপ, তোমার কি এমন করে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া উচিত?" গোবর রেগে যায়, "আমার ব্যাপারে তুই কতা বলবার কে? আমি তোর কাচে শলা চাইতে গেচি নাকি?" কথায় কথা বাড়ে এবং গোবর ঝুনিয়াকে খুব মারে। চুহিয়া এসে তার হাত থেকে ঝুনিয়াকে ছাড়ায় আর বকতে থাকে। গোবরের মাথায় যেন শয়তান ভর করে। চোখ পাকিয়ে বলে, "আমার ঘরে তুমি আসবে না চুহা, তোমার আসার দরকার নেই।"

চুহিয়া ব্যঙ্গ করে বলে, "তোমার ঘরে আসবো না। ওরে বাপ রে! তাহলে আমার রুটি জুটবে কি করে? এখেন থেকে চেয়ে চিন্তে নে যাই তবে তো উনুনে তাওয়া চাপে। আমি না থাকলে, লালা তোমার এই বিবি তোমার লাথি খাবার জন্যে এখেনে বসে থাকতো না।"

গোবর ঘুঁষি তুলে বলে, "ব্যস ব্যস বলে দিয়েচি, আমার ঘরে আসবে না। তুমিই এই চুড়েলের* মেজাজ আকাশে তুলে দিয়েচো।"

চুহিয়া ধমক খেয়েও নিঃসংকোচে বলে, "আচ্ছা হয়েচে গোবর। এবার চুপ করো। বেচারী আধমরা মেয়েছেলে তায় কোলে কচি বাচ্চা। ওকে মেরে বীরত্ব ফলাতে হবে না। তুমি ওর জন্যে কি করো যে তোমার হাতে পড়ে পড়ে মার খাবে। দুটো রুটি খেতে দাও বলে? নিজের ভাগ্যের গুণ গাও এমন ভালো মেয়ে পেয়েচো বলে। অন্য কেউ হলে তোমার মুখে ঝাঁটা মেরে চলে যেত।"

পাড়ার লোক জমে যায়। চারদিক থেকে গোবরের বিরুদ্ধে ভর্ৎসনার ঝড় ওঠে। যারা নিজেদের ঘরে নিজের নিজের বৌকে রোজ ঠ্যাঙায় তারাই এখন ন্যায়ধর্মের দোহাই পাড়ে। চুহিয়া বাঘিনী হয় ওঠে, "তোমরা শোনো গো, হতচ্ছাড়া বলচে, আমার ঘরে ঢুকো না। বিবি-বাচ্চা রেখেছেন অথচ জানেন না বিবি-বাচ্চা রাখা কত শক্ত কাজ। ওকে জিজ্ঞেস করো আমি না থাকলে আজ এই বাচ্চা কোতায় থাকতো? বৌকে মেরে তেজ দেখানো হচ্চে। আমি তোর বৌ নই তাই নইলে জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দিতুম আর কুঠরী থেকে দূর করে দিতুম। একটা দানার জন্যে হেদিয়ে মরতে।"

* চুড়েল=শাঁখচুন্নী

গোবর চটে-মটে নিজের কাজে চলে যায়। চুহিয়া মেয়ে না হয়ে পুরুষ হলে সে আজ মজা দেখাতো কিন্তু 'এ মাগীর মুখের সঙ্গে পারবে-কে?'

মিলে অসন্তোষের কালো মেঘ ধুঁইয়ে ওঠে। মজুররা 'বিজলী' কাগজ পকেটে নিয়ে ঘোরে আর অবকাশ পেলেই দু তিনজনে মিলে পড়ে। পত্রিকা বিক্রীর হার বেড়ে যায়। মজুরদের নেতা 'বিজলী' কার্যালয়ে বসে মাঝরাত পর্যন্ত হরতালের স্কীম তৈরি করে আর সকালে যখন এই খবর মোটা হরফে ছাপা হয় তখন জনতা ভেঙে পড়ে। কাগজও দ্বিগুণ বিক্রী হয়।

ওদিকে কোম্পানীর ডিরেক্টররাও নিজেদের সুযোগ বুঝে বসে থাকেন। ধর্মঘট হলেই তাঁদের ভালো। লোকের তো অভাব নেই। বেকার বাড়ছে। এর অর্ধেক বেতন দিলেও লোকে কাজ করতে আসবে। পাঁচ দশদিন অসুবিধে হবে কিন্তু মাল তৈরির অর্ধেক খরচই বেঁচে যাবে। শেষে ঠিক হলো, মজুরী কমাবার নোটিশ জারি করা হবে। দিন সময় স্থির করে পুলিশকে জানানো হলো। মজুররা সবাই খবর পেলো না, তারা নিজেদের উদ্দেশ্য নিয়েই বসে থাকে। তাদের ইচ্ছে ছিল গুদামে যখন মাল থাকবে না অথচ চাহিদা তখন ধর্মঘট ডাকা হবে।

হঠাৎ একদিন সন্ধেবেলা ছুটির সময় ডিরেক্টরদের নোটিশ মজুরদের শুনিয়ে দেওয়া হলো। তৎক্ষণাৎ পুলিশও এলো। মজুররা নিরুপায় হয়ে তখনি ধর্মঘট করতে বাধ্য হলো। গুদামে প্রচুর মাল রয়েচে। খুব বেশি চাহিদা হলেও মাল ছমাসে ফুরোবার সম্ভবনা নেই।

মির্জা খুরশেদ এখবর শুনে হাসলেন, যেন মনস্বী যোদ্ধা প্রতিপক্ষের রণকৌশলে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। বললেন, "ভালো কথা। যদি ডিরেক্টরদের এই ইচ্ছে হয় তবে তাই হোক। অবস্থা ওদের পক্ষে তবে আমাদের পক্ষে ন্যায় ও শক্তি আছে। ওরা নতুন লোক রেখে কাজ চালাতে চায়। আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে ওরা একটাও নতুন লোক না পায়। তাতেই আমাদের জয় হবে।"

'বিজলী' কার্যালয়েও জরুরী মীটিং হলো। রাত আটটায় মজুরদের বিরাট মিছিল বেরোলো। রাত দশটা নাগাদ আগামীকালের প্রোগ্রাম ঠিক করে দেওয়া হলো যাতে কোন দাঙ্গা ফ্যাসাদ না বাঁধে।

কিন্তু সমস্ত চেষ্টা বৃথা হলো। পরদিন নতুন মজুরদের বিরাট দলকে মিলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধর্মঘটীদের হিংসাবৃত্তি দমন করা সম্ভব হলো না। ভেবেছিল, পঞ্চাশ কি শতখানেক লোক আসবে আর তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরৎ পাঠাবে। কিন্তু এত নতুন লোক এলে ধর্মঘটীদের যে কোন আশাই নেই। ঠিক হলো নতুনদের মিলে যেতে দেওয়া হবে না। বলপ্রয়োগ ছাড়া রাস্তা ছিল না। নতুন দলও লড়তে-মরতে রাজী। ভুখা মানুষের দল কোন মতেই এ সুযোগ ছাড়তে রাজী নয়। দুই দলের মারামারি হয়ে গেল। বিজলী'র সম্পাদক পালিয়ে বাঁচলেন। বেচারা মির্জা মার খেলেন আর তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে গোবর ভালোরকম ঘায়েল হলো। শেষে ধর্মঘটীরা হার মানলে নতুন লোকেরা বিজয় পতাকা উড়িয়ে মিলে গিয়ে পেঁাছোয়। হতাহতদের হাস-

পাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানেও আর জায়গা ছিল না। মির্জাকে ভর্তি করে নিয়ে গোবরকে মলম-পটি বেঁধে ঘরে পেঁৗছে দেওয়া হলো।

গোবরের চেতনাহীন দেহ দেখে ঝুনিয়ার মমত্ববোধ ফিরে আসে। এতদিন যে বলিষ্ঠতা দেখিয়েছে আজ সে দয়ার পাত্র! গোবরকে দেখে প্রথমে তার খুব রাগ হলো। গোবর জানতো সে নিঃসহায়, কোথাও একটা পয়সা পাবার আশা নেই তবু সব কিছু জেনেও এই বিপত্তি ঘাড় পেতে নিল। সে কতবার বলেছিল, "তুমি এই ঝগড়ায় মাতা গলিয়ো না। আগুন লাগানেওয়ালারা আগুন দিয়ে পালাবে, গরীবের পেরান যাবে।" তার কথা শোনে কে? সে তো শত্তুর! জলভরা চোখে বলে, "বেশ হয়েচে, খুব হয়েচে মাথাটা দুখানা হয়ে গেল না কেন?" পরক্ষণেই গোবরের আর্তনাদে ভয়ে শিউরে ওঠে, "হায় হায়, গা-গতর যে একেবারে চুর হয়ে গেচে। কারুর একটু দয়াহলো না গো! সে গোবরের দিকে চেয়ে জীবনের লক্ষণ খোঁজে আর প্রতিবারই অস্তগামী সূর্যের মতো হতাশার অন্ধকারে ডুবে যায়।

চুহিয়া ছুটে আসে, "গোবরের কি হয়েচে বৌ! আমি তো এক্ষুণি শুনলুম। দোকান থেকে দৌড়ে আসচি।"

ঝুনিয়ার রুদ্ধ অশ্রু দুগাল বেয়ে ঝরে পড়ে। চুহিয়া গোবরের মুখ দেখে, বুকে হাত দিয়ে দেখে আশ্বাসভরা সুরে বলে, "এ দুদিনে ভালো হয়ে যাবে।

ভয় পাস না বৌ। ভালো হবে। তোর সোহাগের* জোর আছে। কয়েকজন তো ঐ দাঙ্গায় মারাই গেচে। ঘরে টাকা পয়সা কিছু আচে?"

ঝুনিয়া লজ্জায় মাথা নীচু করে।

চুহিয়া বলে, "আমি এনে দিচ্চি। একটু দুধ এনে গরম করে নে।"

ঝুনিয়া তার পা ধরে বলে, "দিদি তুমি আমার মা, আমার আর কেউ নেই।"

শীতের সন্ধ্যা আরো বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। ঝুনিয়া উনুন ধরিয়ে দুধ জ্বাল দেয়। চুহিয়া বারান্দায় ছেলেটাকে খেলাচ্ছিল। হঠাৎ ঝুনিয়া ধরা গলায় বলে, "আমি বড়ো অভাগিনী দিদি। শুধু মনে হচ্চে আমার জন্যেই ওর এ দশা হলো। কত শাপমুন্যি গালমন্দ করেচি তাই হয়ত..." আর সে কথা বলতে পারে না। কান্নায় কথা ডুবে যায়। চুহিয়া আঁচল দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিয়ে বলে, "কি সব ভাবচিস মা। তোর সোহাগের জোরেই তো ও বাঁচলো। তবে হ্যাঁ, নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া হলে মুখে যা খুশি বলো ক্ষেতি নেই, মনে ঘেন্না পুষো না। বীজ পড়লে তার গাছ বেরোবেই।"

ঝুনিয়া কম্পিতস্বরে বলে, "এখন আমি কি করবো দিদি।"

"কিচ্ছু না বেটি। ভগমানের নাম নে। তিনিই গরীবদের রক্ষে করেন।"

ঠিক সেই সময় গোবর চোখ খুলে ঝুনিয়াকে সামনে দেখে ক্ষীণ স্বরে বলে, "আজ খুব চোট খেয়েচি রে ঝুনিয়া। আমি কাউকে কিছু বলিনি। সবাই

* সোহাগ=সিঁদুর/এয়োস্তীর চিহ্ন

মিছিমিছি মেরেচে। তোকে যা বলেচি, মাফ কর্। তোকে কষ্ট দিয়ে তার ফল হাতে হাতে পেলুম। আর বাঁচবো না। গা-গতর যেন ফেটে পড়চে।"

চুহিয়া বলে, "বোলচাল বন্ধ করে চুপচাপ পড়ে থাকো মরবে না। আমি বলে দিচ্চি।"

"সত্যি? আমি মরবো না?"

"সত্যি বলচি মরবে না। তোমার হয়েচে কি শুনি? মাথায় একটু চোট লেগেছে আর হাতের হাড় ভেঙেচে। এমন চোট পুরুষ মানুষের নিত্যি লাগে। তাতে কেউ মরে না।"

"আর আমি ঝুনিয়াকে কখনো মারবো না।"

"ভয় পাচ্ছো বুজি? পাছে ঝুনিয়া তোমায় মারে।"

"ও মারলেও কিছু বলবো না।"

"ভালো হয়ে গেলে সব ভুলে যাবে।"

"না দিদি, কক্খনো ভুলবো না।" গোবর এসময় শিশুর মতো কথা বলে আর পাঁচ দশ মিনিট নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে। কখনো আচ্ছন্ন অবস্থায় দেখে সে নদীতে ডুবে যাচ্ছে আর ঝুনিয়া তাকে টেনে তুলছে কিংবা কোন দৈত্য তাকে মারতে আসছে আর ঝুনিয়া দেবীর মতো তাকে রক্ষা করছে। সে বারবার জিজ্ঞেস করে, "আমি মরবো না তো ঝুনিয়া?"

তিনদিন তার এই অবস্থা রইল। ঝুনিয়া সব সময় তার সামনে বসে থাকে। বাচ্চা রইল চুহিয়ার কাছে। চারদিনের দিন তারা এক্কা করে হাসপাতালে গেল এবং সেখান থেকে ফিরে গোবর বুঝলো সে সত্যিই বেঁচে যাবে। কৃতজ্ঞতায় সজল চোখে বলে, "তুই আমায় মাফ কর্ ঝুনিয়া।"

তিন চার দিনে চুহিয়ার তিন চার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল। এখন ঝুনিয়া তার কাছ থেকে কিছু নিতে সংকোচ বোধ করে। সেও তো আর পয়সাওলা লোক নয়। এখনো গোবরের সারতে দেরী আছে। ওষুধ-পথ্যি চাই। সে কাজ খোঁজে। শৈশবে গোপালন আর ঘাস কাটা শিখেছে। এখানে গরু কই? তবে সে ঘাস কাটতে পারে। পাড়ার কত স্ত্রী-পুরুষ বরাবর শহরের বাইরে ঘাস কাটতে যায় ও আট-দশ আনা রোজগার করে। সেও গোবরকে হাত মুখ ধুইয়ে তার হাতে বাচ্চা সঁপে দিয়ে ঘাস কাটতে যায়। তারপর বাজারে ঘাস বেচে সন্ধ্যে বেলা ফেরে।

রাতেও সে গোবরের সঙ্গে ঘুমোয়, জাগে। তবু এই কঠোর শ্রমের মধ্যেও সে খুশিতে ভরে থাকে। সঙ্গীদের সঙ্গে গল্প করতে করতে যায়, আসে। ভাগ্য নিয়ে কাঁদে না, বিপদেও মাথা ঘামায় না। জীবনের পরম সার্থকতা যে কঠিন ত্যাগ ও স্বাধীন সেবায়, তার জ্যোতি ঝুনিয়ার অঙ্গে অঙ্গে ফুটে ওঠে। তার দেহে এখন চপল ছন্দ, মুখে গোলাপী আভা, কুণ্ঠিত যৌবন আলো-হাওয়া পেয়ে সতেজ হয়ে ওঠে।

পরিবর্তে গোবর সুস্থ হয়েও একটু উদাসীন হয়ে থাকে। প্রিয়জনের ওপর অত্যাচার করার পর কোন বিপদে পড়লে মানুষ তার অন্তরে তীব্র ব্যথা

অনুভব করে। গোবরও তার নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রতিকার করার চেষ্টা করে। এখন থেকে তার জীবন অন্য খাতে বইবে। তিক্ততার বদলে ভদ্রতা, অহংকারের জায়গায় বিনয়। সে বুঝতে পারে সেবা করার সুযোগ অনেক সৌভাগ্যে পাওয়া যায়, এই সুযোগ সে আর নষ্ট করবে না।

২৮

মজুরদের এই ধর্মঘট মিস্টার খান্নার খুব অযৌক্তিক মনে হচ্ছিল। তিনি সবসময় জনতার সঙ্গে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করেছিলেন। নিজেকেও জনতার একজন বলেই মনে করতেন। গতবারের স্বদেশী আন্দোলনে তিনি খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। এখনও তিনি শ্রমিকদের হিত শুনতে রাজী কিন্তু তাবলে চিনিকলের অংশীদারদের কথা ভাববেন না তাতো হতে পারে না। যদি কোন উচ্চতর মনোবৃত্তি তাঁকে স্পর্শ করতো তাহলে তিনি নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে পারতেন। কিন্তু অংশীদারদের স্বার্থরক্ষাও তো তাঁর কর্তব্য। শেয়ার বিক্রীর সময় বলা হয়েছিল শতকরা পনেরো বিশ ভাগ লাভ হবে। আর তাঁরা যদি শতকরা দশও না পান তাহলে তো ডিরেক্টরকেই মিথ্যে-বাদী ভাববেন। তিনি নিজে মাত্র একহাজার টাকা বেতন নেন আর কিছু কমিশন। তিনিই তো এর ডিরেক্টর।

মজুররা কেবল হাতে কাজ করে। ডেরেক্টরেরা নিজের বুদ্ধি, বিদ্যা, প্রতিভা ও প্রভাব খাটিয়ে কাজ করান। দুই শক্তির মূল্য সমান হতে পারে না। শ্রমিকরা বুঝতে পারছে না কেন মানুষের দাম কমে গেছে। এক-এর জায়গায় পৌনে এক পেয়েই সন্তুস্ট থাকা উচিত। আর সত্যি বলতে কি ওরা সন্তুষ্টই ছিল। ওদের কোন দোষ নেই। ওরা তো মূর্খ "বছিয়া কে তাউ"* আসল বজ্জাতি তো পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ আর মির্জা খুরশেদের। এরাই ঐ বেচারাদের নাচাচ্ছে, সামান্য পয়সা আর যশের লোভে। ভাবে না তাদের ফাজলামীর জন্যে কত ঘর নষ্ট হয়ে যাবে। ওঙ্কারনাথের কাগজ চলে না তো মিস্টার খান্না কি করবেন? আজ ওঁর কাগজের কাটতি এক লাখ হয়ে গেলে কিংবা কাগজ থেকে পাঁচ লাখ আয় হলে উনি কি শুধু নিজের সামান্য মাইনে নিয়ে সব কিছু কর্মচারীদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন? ওই ত্যাগী মির্জা খুরশেদও তো একদিন লাখপতি ছিলেন, হাজার মজুর ওঁর কাছে কাজ করতো। তখন কি তিনি নিজের মাইনেটুকু নিয়ে বাকীটা শ্রমিকদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন? তিনি ওই খরচেই য়ুরোপীয়ান ছুকরিদের সঙ্গে ঘুরতেন, বড়ো বড়ো অফিসার-দের নেমন্তন্ন করতেন। হাজার-হাজার টাকার মদ ওরাতেন আর বছরে একবার করে ফ্রান্স-ইংলণ্ড বেড়াতে যেতেন। এখন মজুরদের দশা দেখে তাঁর কল্‌জে ফাটছে।

* বছিয়া কে তাউ=বাছুরের জ্যাঠা (খুব বোকা)

এই দুই নেতাকে খান্না পরোয়া করেন না। এঁদের সততার ওপরও তাঁর সন্দেহ ছিল। এমনকি রায়সাহেবকেও তিনি বিশ্বাস করতেন না। নিজের পরিচিত লোকেদের মধ্যে তিনি একটি মাত্র লোকের নিরপেক্ষ বিচারের ওপর পুরোপুরি ভরসা করতেন, তিনি আর কেউ নন, উক্টর মেহতা। যখন থেকে তিনি মালতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা শুরু করেছেন তখন থেকে তিনিও খান্নার চোখে নেমে গিয়েছেন। মালতী বহুদিন খান্নার হৃদয়েশ্বরী ছিলেন কিন্তু তাঁকে মিস্টার খান্না একটি খেলনা ভেবেই এসেছেন। সন্দেহ নেই, খেলনাটি খান্নার খুব প্রিয় ছিল এবং সেটি হারিয়ে যাওয়ায় বা চুরি যাওয়ায় তিনি খুব কেঁদেছেন এখনও কাঁদছেন তবু মালতী তাঁর কাছে খেলনা ছাড়া কিছু ছিলেন না। তাঁকে তিনি কখনও বিশ্বাস করেননি বা বাইরের বিলাস-আবরণ ভেদ করে অন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেননি। মালতী নিজেই খান্নাকে বিয়ে করতে চাইলে খান্না হয়তো পেছিয়ে আসতেন বা নানা ছুতোয় এড়িয়ে যেতেন।

অন্যান্য বহুপ্রাণীর মতো খান্নার জীবনও দ্বিধারায় বইছে। একদিকে তিনি ত্যাগ, জনসেবা আর উপকার করতে চান অপরদিকে স্বার্থ, বিলাসিতা ও প্রভুত্ব চান। কোনটা তাঁর আসল বলা কঠিন। একবার তাঁর মন মালতীর দিকে ঝোঁকে তো অপরবার মিস্টার মেহতার দিকে। কিন্তু এখন মেহতাই মালতীর দিকে ঝুঁকেছেন। খান্না বুঝতে পারছিলেন না মেহতার মতো আদর্শবাদী মানুষ মালতীর মতো চঞ্চল প্রজাপতিমার্কা মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলেন কি করে? তিনি অনেক চেষ্টা করেও মেহতাকে বাসনার শিকার ভাবতে পারেন না। তাঁর সন্দেহ হয় মালতীর নিশ্চয় আর একটি রূপ আছে, যাকে দেখার ক্ষমতা তাঁর নেই। শেষে তিনি স্থির করলেন এ অবস্থায় মেহতার কাছ থেকেই আলো পাওয়া যেতে পারে।

ডক্টর মেহতার বাগান করার নেশা ছিল। অবশ্য তিনি যখন যে কাজ করতেন মন দিয়েই করতেন। কয়েকবছর ধরে দর্শন শাস্ত্রের একটি বিশাল বই লিখছিলেন, প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এরই ফাঁকে তিনি নিজের বাগানে বসে চারাগাছে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চার করে পরীক্ষা নিরীক্ষাও চালাচ্ছিলেন। মিস্টার খান্নার কথা মন দিয়ে শুনে তিনি কঠোরভাবে বললেন, "ডিউটি লাগলেও শ্রমিকদের বেতন কমানোটা কি খুব জরুরী ছিল? আপনাদের উচিত সরকারের কাছে অভিযোগ করা। যদি সরকার নাও শোনে তবে তার দণ্ড শ্রমিকদের দিতে হবে কেন? আপনি কি মনে করেন তাদের যা মজুরী দেওয়া হয় তার থেকে সিকিভাগ কমিয়ে দিলে শ্রমিকদের কষ্ট হবে না? আপনার শ্রমিকরা খোঁয়াড়ে থাকে—নোংরা দুর্গন্ধভরা খোঁয়াড়ে—যেখানে আপনি এক মিনিটের জন্যে গেলেও বমি করে ফেলবেন। যে কাপড় তারা পরে তা দিয়ে আপনি জুতোও মুছবেন না। যা খায় সেতো আপনার কুকুরও খাবে না। আমি ওদের সঙ্গে জীবন কাটিয়ে দেখেছি। ওরা সত্যিই গরীব, নিঃসহায়। আপনি ওদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আপনার অংশীদারদের পেট ভরাতে চাইছেন... "

খান্না অধীর হয়ে বলেন, "কিন্তু আমাদের সব অংশীদারই তো ধনী নয়। কতজন নিজের সর্বস্ব এই মিলেই লাগিয়েছে। এই লাভটাই তাঁর একমাত্র আয়।"

"যে মানুষ কোন ব্যবসায় অংশীদার হয় সে এত গরীব হয় না যে এই লাভেই তার একমাত্র উপার্জন হয়ে দাঁড়ায়। হতে পারে, লাভ কম হওয়ার জন্যে সে একজন চাকর কম রাখবে কিংবা মাখন আর ফলের খরচ কমিয়ে দেবে। কিন্তু সে খালি গায়ে, খালি পেটে থাকে না। যারা নিজেদের প্রাণ দিয়ে কাজ করে তাদের দাবি, যারা শুধু টাকা লগ্নী করে তাদের চেয়ে বেশি।"

একথাই পন্ডিত ওঙ্কারনাথ বলছিলেন। মির্জা খুরশেদও এই পরামর্শই দিচ্ছিলেন। এমনকি কামিনীও মজুরদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। খান্না কর্ণপাত করেননি। কিন্তু মেহতার মুখেও এ কথা শুনে তিনি প্রভাবিত হলেন। তিনি ওঙ্কারনাথকে স্বার্থপর, মির্জা খুরশেদকে ব্যর্থ ও কামিনীকে অযোগ্য মনে করতেন। মেহতার কথায় শক্তি ছিল। হঠাৎ মেহতা প্রশ্ন করেন, "আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছেন?"

খান্না সসঙ্কোচে বলেন, "হ্যাঁ জিজ্ঞেস করেছিলাম।"

"তিনি কি বললেন?"

"ওই, আপনি যা বললেন।"

"আমিও তাই আশা করেছিলাম। আর আপনি এই বিদুষীকে অযোগ্য ভেবেছিলেন।"

ঠিক সেইসময় মালতী সেখানে এলেন। আর খান্নাকে দেখেই বলে উঠলেন, "আপনিও এখানে। আমি মেহতাকে আজ নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। সব নিজের হাতে রেঁধেছি। আপনাকেও নিমন্ত্রণ করছি। কামিনীদেবীকে বলে-কয়ে আপনার এই অপরাধ ক্ষমা করিয়ে দেব।

খান্নার কৌতূহল বাড়ে। এখন মালতী নিজের হাতে রাঁধছে? সেই মালতী? যে নিজের জুতোটাও নিজে পরতো না। নিজের হাতে সুইচটাও টিপতো না। বিলাস আর প্রমোদই ছিল যার জীবন! ঠাট্টা করে বললেন, "যদি আপনি রেঁধে থাকেন তাহলে নিশ্চয় খাবো। আমি তো ভাবতেই পারছি না আপনি রাঁধতে জানেন।"

মালতী নিঃসংকোচে বলে, "উনিই মেরে মেরে বদ্যি করে ছেড়েছেন। ওঁর হুকুম টলাবো কি করে? দেবতুল্য পুরুষ কি না।"

"পুরুষ তো আপনার কাছে এত সম্মানের বস্তু ছিল না।"

"কিন্তু এখন হয়ে গেছে। কারণ আমার চেনা গন্ডীর মধ্যে আমি যাদের দেখেছিলাম ইনি তাদের সবার চেয়ে মহৎ। পুরুষের যে এত সুন্দর এত কোমল হৃদয়......"

মেহতা মালতীর দিকে করুণ চোখে চেয়ে বললেন, "না মালতী। দয়া করে চুপ করো। না হলে আমি এখান থেকে পালিয়ে যাবো।"

ইদানীং যার সঙ্গে মালতীর দেখা হতো তাকেই মেহতার তারিফ শুনতে

হতো। নবদীক্ষিত যেমন তার নতুন ধর্মবিশ্বাসের ঢ্যাঁটরা পিটিয়ে বেড়ায় মালতীও তেমনি মেহতার প্রশংসা করেন। শোভনতার সীমাটুকুও তাঁর মনে থাকে না। বেচারা মেহতা মরমে মরে যান। তিনি নিজের কঠোর সমালোচনা হাসিমুখে শুনলেও প্রশংসা শুনলেই লজ্জায় কুঁকড়ে যান। আর মালতীর মন অন্তর্মুখী নয়। তিনি বাইরেই ছড়িয়ে পড়তে চান, আগেও এবং এখনও। ব্যবহার এবং বিচারেও। তিনি একটা ভালো শাড়ি পেলে যেমন অধীর হয়ে ওঠেন তেমনি মনে সুন্দর ভাবের উদয় হলেও তাকে প্রকাশ না করা পর্যন্ত শান্তি পেতেন না। তিনি আরো কাছে এসে মেহতার পিঠে হাত রেখে বললেন, "আচ্ছা পালাতে হবে না। আর কিছু বলবো না। মনে হয় তুমি নিন্দে শুনতেই বেশি ভালোবাসো। তবে নিন্দেই শোনো, মিস্টার খান্না এই ভদ্রলোকটি আমার ওপর প্রেমের জাল......।"

চিনিকলের চিমনিটা এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। খান্না সেদিকে তাকালেন। ওই চিমনি খান্নার কীর্তিস্তম্ভের মতো আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। খান্নার চোখে গর্বের ছায়া পড়ে। এসময় তাঁর মিলের অফিসে যাওয়া উচিত। ওখানে ডিরেক্টরদের একটা আর্জেন্ট মীটিং করে সবাইকে বোঝাতে হবে, এই সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত।

কিন্তু চিমনির কাছে এত ধোঁয়া কোথা থেকে উঠছে? দেখতে দেখতে সারা আকাশ বিরাট বেলুনের মতো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল। সবাই শঙ্কিত হয়ে ওদিকে তাকায়। কোথাও আগুন লাগেনি তো? আগুন বলেই তো মনে হচ্ছে।

সামনে দিয়ে বহু লোককে মিলের দিকে ছুটতে দেখা গেল। খান্না চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কোথায় যাচ্ছো?" একজন থেমে বললে, "আরে চিনিকলে যে আগুন লেগেছে দেখতে পাচ্ছেন না?"

খান্না মেহতার দিকে তাকান আর মেহতা খান্নার দিকে। মালতী দৌড়ে বাংলো থেকে জুতো পরে আসেন। আফসোস বা অভিযোগ করার সময় ছিল না। তিনজনে গাড়িতে চেপে মিলের দিকে যান। চৌমাথায় পেঁছে দেখলেন সারা শহর মিলের দিকে ছুটে চলেছে। আগুন মানুষকেও টানে। গাড়ি থেমে যায়। মেহতা প্রশ্ন করেন, "অগ্নিবীমা করা আছে তো?"

খান্না দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন, "কই ভাই, এখনো তো লেখাপড়া চলছিল। কে জানতো এ বিপদ অসবে।"

গাড়ি ওখানেই রেখে তিনজনে ভিড় চিরে এগিয়ে মিলের সামনে গিয়ে পেঁছোলেন। আগুন সারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। আগুন নয় তো যেন অগ্নি-সমুদ্র! তার উন্মত্ত ঢেউ জিভের মতো লকলক করে সব কিছু গ্রাস করছে। আকাশটাকে বুঝি গলিয়ে দেবে। সেই অগ্নিসমুদ্রের ওপরে ধোঁয়া শ্রাবণের কালো মেঘ হয়ে ছুটে আসছে। সে এক ভয়ানক দৃশ্য! পুলিশ, ফায়ারবিগ্রেড, সেবা সমিতি সবই ছিল কিন্তু সবই বৃথা। ইঁট জ্বলছে, লোহা জ্বলছে আর চিনি গলে গলে চারদিকে গরম রসের স্রোত বইছে। মাটি পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

দূর থেকে মেহতা আর খান্না ভাবছিলেন এত লোক দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে, আগুন নেভাচ্ছে না কেন? কাছে এসে বুঝলেন কারুর কিছু করার ছিল না। তিনজনেই ভিড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে রইলেন। কি করবেন বুঝতেও পারছেন না। আগুন লাগলো কি করে? এত তাড়াতাড়ি ছড়ালোই বা কেন? আগে কি কেউ দেখতে পায়নি? না দেখেও কেউ নেভাবার চেষ্টা করেনি। কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? হঠাৎ আগুনের হল্‌কা জোয়ারের জলের মতো সামনে এগিয়ে আসতে লোক প্রাণভয়ে পেছু হটে। ভিড়ের চাপে খান্না মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। মালতীকে মেহতা দুহাতে চেপে ধরেছিলেন তা না হলে তিনিও পায়ের নীচে পড়ে থেঁতো হয়ে যেতেন। তিনজনেই হাতার প্রান্তে তেঁতুল গাছের নীচে এসে দাঁড়ালেন। খান্না বজ্রাহতের মতো নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

মেহতা বললেন, "আপনার খুব বেশি লাগেনি তো?" খান্না উত্তর দিলেন না। তাঁর শূন্য দৃষ্টিতে উন্মাদের লক্ষণ স্পষ্ট। মেহতা তাঁর হাত ধরে বললেন, "আমরা এখানে বৃথাই দাঁড়িয়ে আছি। আমার ভয় হচ্ছে, আপনার বেশ চোট লেগেছে। চলুন ফিরে যাই।"

খান্না ক্ষিপ্তের মতো বললেন, "যারা এই বজ্জাতি করেছে তাদের আমি খুব চিনি। যদি তারা এতেই সন্তুষ্ট হয় তাহলে ভগবান তাদের ভালো করুন। আমি কারুর পরোয়া করি না, কিচ্ছু না। আমি আজ চাইলে এমন নতুন মিল আবার তৈরি করতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ, একেবারে নতুন মিল। এরা আমাকে কি ভেবেছে? মিল আমাকে বানায়নি, আমি মিল বানিয়েছি। আমি আবার বানাতে পারি। কিন্তু যারা এই বজ্জাতি করেছে তাদের আমি ছাইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেব। আমি সব বুঝেছি। তন্ন তন্ন করে বুঝেছি।"

মেহতা তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে ভয় পেয়ে বললেন, "চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। আপনার শরীর ভালো নেই।"

খান্না হোহো করে হেসে উঠলেন, "আমার শরীর ভালো নেই! মিল পুড়ে গেছে বলে! এমন মিল তো আমি তুড়ি মেরে খুলতে পারি। আমার নাম চন্দ্রপ্রকাশ খান্না! আমি আমার সর্বস্ব এই মিলের পেছনে ঢেলেছি। প্রথম মিলটা থেকে কুড়ি পারসেন্ট লাভ হলে আমি এই নতুন মিল খুলেছি। এর অর্ধেক টাকাই আমার। ব্যাঙ্কের দুলাখ টাকা আমি এই মিলে লাগিয়েছি। আমি এক ঘন্টা, না না আধ ঘন্টা আগেও দশ লাখটাকার মানুষ ছিলাম। আজ্ঞে হ্যাঁ দশ লাখ। আর এখন ফকির, না না দেউলিয়া। ব্যাঙ্কে আমার দু লাখ টাকা দেনা। যে বাড়িতে থাকি সেটা আর আমার নয়। যে বাসনে খাই সেটা আর আমার নয়। ব্যাংক থেকে আমায় তাড়িয়ে দেবে। যে খান্নাকে দেখে লোকে হিংসেয় জ্বলে মরতো সেই খান্না পথের ধুলোয় মিশে যাবে। সমাজে আমার স্থান নেই। বন্ধুরা বিশ্বাস করবে না, দয়া করবে। শত্রু জ্বলে মরবে না, হাসবে। আপনি জানেন না মিস্টার মেহতা আমি আমার আদর্শকে কতবার হত্যা করেছি। কত ঘুষ খেয়েছি, কত ঘুষ দিয়েছি। চাষাদের আখ মাপবার সময় কত

ঠকিয়েছি। কি করবেন এ কথা শুনে। কিন্তু খান্না নিজের দুর্দশা দেখবার জন্যে বেঁচে রইল কেন? যা হবার হোক, দুনিয়া যত পারে হাসুক, খান্না সে সব দেখবার জন্যে বসে থাকবে না। সে এত নির্লজ্জ বেহায়া নয়।" একথা বলতে বলতে খান্না কান্নায় ভেঙে পড়েন।

মেহতা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "মিস্টার খান্না একটু ধৈর্য ধরুন। আপনি এতো বুঝদার হয়েও এমন অবুঝের মতো কাজ করছেন? ঐশ্বর্য মানুষকে যে সম্মান দেয়, সে তার সম্মান নয় সে হচ্ছে ঐশ্বর্যের সম্মান। আপনি গরীব হয়েও বন্ধুদের বিশ্বাসভাজন হতে পারেন এমনকি শত্রুদেরও। সত্যি বলতে কি, এখন কেউ আর শত্রু থাকবে না। চলুন, বাড়ি চলুন। একটু বিশ্রাম করলেই আপনার মন শান্ত হবে।"

খান্না কোন উত্তর দিলেন না। তিনজনেই চৌমাথায় ফিরে এসে গাড়িতে ওঠেন। দশ মিনিটে খান্নার বাড়ি পৌঁছে যায়। খান্না নেমে এসে শান্ত স্বরে বলেন, "আপনি গাড়িটা নিয়ে যান। আর আমার এর প্রয়োজন নেই।"

মালতী আর মেহতাও নামেন। মালতী বললেন, "তুমি গিয়ে আরাম করে শুয়ে পড়ো, আমরা বসে গল্প টল্প করবো, ঘরে যাবার কোন তাড়া নেই।"

খান্না কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে করুণ স্বরে বললেন, "আমার যে অপরাধ হয়েছে তুমি তা ক্ষমা করো মালতী! তুমি আর মেহতা, সারা সংসারে তোমরা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আশা করি, তোমার চোখে আর আমি নেমে যাবো না। হয়তো পাঁচ দশদিনের মধ্যেই এ বাড়ি ছাড়তে হবে। ওঃ ভাগ্য কি ভাবে ধোঁকা দিল।"

মেহতা বললেন, "আমি আপনাকে সত্যি বলছি মিস্টার খান্না, আজ আমার নজরে আপনি যে সম্মানের অধিকারী হয়েছেন, কোনদিন তা ছিলেন না।"

তিনজনেই ঘরে প্রবেশ করেন। দরজার শব্দ পেয়েই কামিনী ছুটে আসেন, "আপনারা কি ওখান থেকে আসছেন? মহারাজ* তো খুব খারাপ খবর এনেছে।"

খান্নার মনে হলো কামিনীর পায়ে পড়ে তাকে চোখের জলে ভিজিয়ে দেন। ভারি গলায় বললেন, "হ্যাঁ কামিনী, আমরা শেষ হয়ে গেলাম।"

তাঁর হতাশ হৃদয় সান্ত্বনার জন্যে বিকল হয়ে সত্যিকারের স্নেহের সন্ধান করছিল। সেই কামিনী, যাকে তিনি সর্বদা অপমান করতেন, মৃত্যুকামনা করতেন এখন তাকেই কল্যাণময়ী দেবী মনে হলো। যেন কামিনী তাঁর হত-ভাগ্য দেহে পুনরায় প্রাণসঞ্চার করবেন। কামিনী তাঁকে সোফায় বসিয়ে কোমল কণ্ঠে বললেন, "তা তুমি মনকে এত ছোট করছো কেন? ধনের জন্যে? যা সমস্ত পাপের জড়? ঐ ধন কি আমাদের কোন সুখ দিয়েছে? সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত ঝঞ্ঝাট। ছেলেরা তোমার জন্যে হেদিয়ে মরে আর তুমি আত্মীয়-দের একটা চিঠি লেখার ফুরসৎ পাও না। খুব সম্মান ছিল? তা অবশ্য ছিল।

*মহারাজ=ঠাকুর/রাঁধুনী।

পৃথিবীতে ধনেরই তো পুজো হয়। যতক্ষণ তোমার কাছে লক্ষ্মী আছে তত-ক্ষণ তোমার সামনে সবাই ল্যাজ নাড়বে আবার কাল ততটা ভক্তি নিয়েই অন্য দরজায় সেলাম ঠুকবে। সৎ পুরুষ ধনের সামনে মাথা নত করে না। সে দেখে তুমি কি? যদি তোমার মধ্যে শৌর্য, বীর্য, সত্য, ত্যাগ, ন্যায়, মহত্ব, পুরুষার্থ থাকে তাহলে সে তোমার পুজো করবে। আমি ভুল বলছি না তো মিস্টার মেহতা?"

মেহতা বললেন, "ভুল! আপনি ঠিক সেই কথাটিই বলেছেন যা মহান পুরুষেরা জীবনের সাত্ত্বিক অনুভবের পরে বলেছেন। জীবনের সত্যোপলব্ধি তো একেই বলে।"

কামিনী তাঁকে বলেন, "ধনী কে এ বিচার কেউ করে না। যে নিজের কৌশল দিয়ে অপরকে বোকা বানাতে পারে..."

খান্না বাধা দিয়ে বলেন, "না কামিনী। ধনার্জনের জন্যেও সংস্কার চাই। শুধু কৌশলে ধন মেলে না তার জন্যে ত্যাগ আর তপস্যাও করতে হয়। হয়তো এতো সাধনায় ঈশ্বরকেও পাওয়া যায়। আমাদের সমস্ত আত্মিক, বৌদ্ধিক আর শারীরিক শক্তির নাম ধন।"

কামিনী মধ্যস্থতার সুরে বললেন, "আমি স্বীকার করি ধনের জন্যে কম তপস্যা করতে হয় না। তবু আমাদের জীবনে যেসব জিনিষকে আমরা মহত্বের বস্তু মনে করি ততটা মহত্ব ধনে নেই। তোমার মাথা থেকে এই বোঝা নেমেছে বলে তো আমি খুশি হয়েছি। কিছু মনে কোরো না, এতদিন তোমার জীবনের অর্থ ছিল আত্মবিলাস। কিন্তু জীবনে সুখ পাওয়া যায় অপরকে সুখী করার মধ্যে। দৈব তোমাকে বিলাসের উপাদান থেকে বঞ্চিত করে অনেক উঁচু পবিত্র জীবন যাপনের রাস্তা খুলে দিয়েছেন। এই সিদ্ধি পেতে গেলে কষ্ট হলেও তাকে স্বাগত জানাও। তুমি একে বিপত্তি ভাবছো কেন? এতদিনে তুমি অন্যায়ের সঙ্গে লড়বার শক্তি পেয়েছো। আমার মতে, ধন খুইয়ে আমরা যদি আমাদের আত্মাকে ফিরে পাই তবে এই ভালো। ন্যায়ের পথে লড়াই করার মধ্যে যে গৌরব আছে তা কি তুমি ভুলে গেলে?"

কামিনীর রক্তহীন পীতাভ শুষ্ক মুখে একটা তেজের আভাস। যেন তাঁর মধ্যে কোন শক্তি এসে তাঁর মূক সাধনাকে মুখর করে তুলেছে। মেহতা তাঁর দিকে ভক্তিপূর্ণ চোখে তাকিয়ে এই দৈবী প্রেরণাকে বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। আর মালতী মনে মনে লজ্জিত হচ্ছিলেন। কামিনীর মন এত উঁচু, এত বিশাল আর মহৎ!

২৯

নোহরী তেমন মেয়ে নয় যে ভালো কাজ করে সেটা সমুদ্রে ফেলে দেবে। সে কিছু করলে, ঢাক পিটিয়ে বলে যাতে তার যতটা যশ পাওয়া উচিত তার কিছুটা বেশি পায়। বাস্তব জগতে এই ধরণের মানুষ যশের পরিবর্তে অপ-যশই কুড়োয়। ভদ্রতা না করলে তার জন্যে কেউ কাউকে মন্দ বলতে পারে না।

কিন্তু আমরা যখন ভালো কাজ করে কৃতজ্ঞতা দাবি করি তখন যার উপকার করেছি সেই শত্রু হয়ে যায়। মনোহরী চারদিকে বলে বেড়াচ্ছিল, "বেচারা হরি বড্ডো বিপদে পড়েছিল। মেয়ের বে-তে জমি বাঁধা দিতে যাচ্ছিল। ওর দশা দেখে আমার দয়া হলো। ধনিয়াকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। রাঁড় মাগীটার তেজে মাটিতে পা পড়ে না। বেচারা হরি চিন্তায় মরে যাচ্চে দেকে আমি ভাবলুম একটু সাহায্য করি। মানুষই মানুষের বিপদে আপদে সাহায্য করে তো। আর হরি তো শত্তুর নয়, আমাদের কুটুম। টাকা বের করে দিলুম। নয়তো মেয়ের বে আটকে পড়ে থাকতো।"

ধনিয়া এসব কথা শুনলে চটে যায়। 'টাকা খয়রাত দিয়েচে নাকি? ভারী দেনেওয়ালী এসেছেন। সুদ মহাজনও নেবে, তুমিও নেবে। অন্য কাউকে দিলে সুদ শুদ্ধ টাকা গায়েব হয়ে যেত। আমরা নিয়েচি, টাকা হাতে এলেই শোধ করে দোব। আমরাই তোমার ঘরের বিষ তুলে খেয়েচি কোন কতা বলিনি। এখেনে কেউ দরজায় দাঁড়াতে দিত না। আমরাই মানইজ্জত দিয়ে তোমার মুখ রেখেচি।

রাত দশটা। শ্রাবণের কালো মেঘে আকাশ ঢাকা। সারা গ্রামে অন্ধকার। হরি খেয়েদেয়ে তামাক খেয়ে শুতে যাবে এমন সময় ভোলা এসে দাঁড়ায়। হরি বলে, "কেমন চলচে ভোলা মাহাতো। এ গাঁয়েই যদি থাকো তো একটা আলাদা কুঁড়ে বানিয়ে নাও না কেন? কুচ্ছো শুনতে ভালো লাগচে তোমার? কিছু মনে কারো না, তোমার সঙ্গে কুটুম্বিতা হয়ে গেচে তো তাই তোমার বদনাম শুনতে পারি না। নয়তো আমার বলার কি আচে?"

ধনিয়া সেসময় হরির জন্যে এক ঘটি জল রাখতে এসেছিল। শুনে বলে, "অন্য কোন পুরুষমানুষ হলে এমন বৌয়ের মাথা কেটে নিত।"

হরি ধমকে দেয়, "কেন আজেবাজে কথা বলচিস। জল রেখে দিয়ে শুগে যা। আজ তুই যদি কুপথে যাস আমি কি তোর মাথা কেটে নোব? না, তুই কাটতে দিবি?"

ধনিয়া ঐ জলের এক ছিটে হরির গায়ে দিয়ে বলে, "কুপথে যাক তোমার বোন, আমি কেন যেতে যাবো। আমি তো দুনিয়ার কথা বলচি, তুমি অম্নি আমায় গাল দিতে বসে গেলে। এখন মুখমিষ্টি হয়ে গেচে বোধহয়। বৌ যেদিকে খুশি যাবে আর পুরুষমানুষ শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবে? এমন মানুষকে আমি পুরুষমানুষ বলেই মনে করি না।"

হরি লজ্জা পায়। ভোলা কোথায় তার কাছে নিজের দুঃখকষ্টের কথা বলতে এসেছে। ধনিয়া উল্টে তাকেই কথা শোনাচ্ছে। তাই একটু গরম হয়ে বলে, "তুই যে সারাদিন নিজের খেয়ালখুশিমতো কাজ করিস তাতে আমি কিছু বলিচি। কিছু বললে তো মারতে ছুটিস। সেটাও মনে করে দ্যাখ্।"

ধনিয়া লুকো-ছাপা শেখেনি। বলে, "বৌ ঘিয়ের ঘড়া উলটে দিক কি আগুন লাগিয়ে দিক, পুরুষ মানুষের সইবে কিন্তু সে মন্দ পথে হাঁটলে চুপ করে থাকবে না।"

ভোলা দুঃখিত স্বরে বললে, "তুই খুব খাঁটি কথা বলেচিস ধনিয়া সত্যিই আমার উচিত ছিল ওর মাথাটা কেটে নেওয়া। কিন্তু এখন আর শক্তি নেই। পারিস তো তুই গে বুজিয়ে দে। আমি হার মেনেচি।"

"যখন বৌকে বশে রাখবার ক্ষ্যামতা নেই তখন বে করতে যাওয়া কেন? একেবারে সর্বনাশান্ত হবার জন্যে? কি ভেবেছিলে বলো তো? বৌ এসে তোমার পা টিপে দেবে, তামাক সেজে দেবে আর অসুখে সেবা করবে? এসব করতে পারে সেই বৌ, যে বয়সকালে তোমার সঙ্গে সুখভোগ করেচে। আমি বুজতে পারি না ওকে দেকে তুমি মজলে কি করে? একটু খোঁজ খপর নেবে তো। কেমন স্বভাবের মেয়ে, কেমন রঙ-ঢঙ হাব-ভাব। তা নয়, তুমি একেবারে উপোষী-শেয়ালের মতো ছুটে গেলে। এখন তোমার উচিত গাঁড়াশী দে ওর মাথাটা কেটে নেয়া। ফাঁসী হবে এই তো। এভাবে নষ্ট হওয়ার চেয়ে ফাঁসী যাওয়াই ভালো।"

ভোলার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। বলে, "তাহলে এই তোর কতা?"

"হ্যাঁ। এখন তো আর পঞ্চাশ কি একশো বছর বাঁচবে না। ভেবে নাও এ্যাদ্দিনই তোমার আয়ু ছিল।"

হরি এবার জোর ধমক দেয়, "চুপ কর্। ভারি এস্‌ছিস্ সতী সাবিত্রী হয়ে। জবরদস্তী করে পাখিকেও খাঁচায় পুরে রাখা যায় না। মানুষ থাকবে কি? তুমি ওকে ছেড়ে দাও ভোলা, আর ধরে নাও, ও মরে গেচে। বাড়ি গে ছেলেপুলের সঙ্গে সুখে থাকো গে। দুটো রুটি খাও আর রামনাম করো। যৌবনের সুখ এখন গেচে। ওই মেয়েছেলেটাই কুলটা, ওর কাছ থেকে কিছুই পাবে না উল্টে বদনাম হবে।"

ভোলা নোহরীকে ছাড়বে? অসম্ভব! নোহরী এখনও যেন রোষকষায়িত লোচনে তার দিকে চেয়ে আছে। বুঝতে পারছে। তবু, নাঃ ভোলা এবার ওকে ছেড়েই দেবে। যেমন কাজ করেছে তেমনি ফলভোগ করুক। ভোলার চোখে জল এসে গেল। বলে, "হরি ভাই, এই মেয়েছেলের জন্যে আমার যে কত হেনস্তা হচ্চে সে আমিই জানি। ওর জন্যেই কামতার সঙ্গে আমার মারামারি হয়ে গেচে। বুড়ো বয়সে এও অদেষ্টে ছিল। আমাকে রোজ ঠেশ দে বলে তোমার মেয়ে তো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমার মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাক কি পালিয়ে যাক যাইহোক পড়ে তো আছে নিজের মানুষটার কাচে, তারই সুখদুঃখের সাথী হয়ে আচে। এরকম মেয়েছেলে আমি কখনো দেকিনি। অন্যের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করবে আর আমাকে দেখলেই মুখ ভার হয়ে যায়। আমি গরীব-মানুষ, তিন-চার আনা রোজ মজুরী করি। দুধ-দৈ, মাছ-মাংস, রাবড়ি-মালাই পাবো কোত্থেকে?"

ভোলা প্রতিজ্ঞা করে বাড়ি ফেরে। এবার সে ছেলেদের কাছে গিয়ে থাকবে। অনেক ধাক্কা খেয়েছে, আর নয়। কিন্তু হরি পরদিন সকালে দেখলো ভোলা দুলারীর দোকান থেকে তামাক কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

হরি তাকে ডাকলো না। আসক্তি মানুষকে আত্মবশে থাকতে দেয় না। এসে

ধনিয়াকে বলে, "ভোলা তো এখনও এখেনেই আচে। নোহরী সত্যিই ওকে যাদু করেচে।"

ধনিয়া নাক সিঁটকে বলে, "যেমন এ বেহায়া, তেমনি ও বেহায়া দুই-ই সমান। এমন পুরুষমানুষের তো জলে ডুবে মরা উচিত। এখন সেই তেজ গেল কোতায়? ঝুনিয়ার পেছু পেছু ডাণ্ডা নে ছুটে এসছিল মানইজ্জত চলে যাচ্ছিল বলে আর এখন যাচ্ছে না?"

হরির ভোলার জন্যে দয়া হচ্ছিল। বেচারা এই কুলটার ফেরে পড়ে জীবন নষ্ট করছে। ছেড়ে যাওয়া কি সহজ? এই ডাইনী ওকে কোথাও শান্তিতে থাকতে দেবে না। কখনো পঞ্চায়েত ডাকবে, কখনও রুটি-কাপড় চাইবে। এখন তো শুধু গ্রামের লোক জানে, মুখে কিছু বলে না, সংকোচে কানাকানি করে। তখন মুখের ওপর বলবে আর ভোলাকেই দোষ দেবে। পুরুষমানুষ ছেড়ে দিলে অবলা বেচারী কি করবে? পুরুষ খারাপ হলে বৌয়ের গলা কাটে, আর বৌ খারাপ হলে পুরুষের মুখে চুণকালি পড়ে। এর দুমাস পরে একদিন গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়লো নোহরী ভোলাকে সবার সামনে জুতো পেটা করেছে।

বর্ষা শেষ। রবিশস্য বোনার প্রস্তুতি চলছে। হরির আখ নীলাম হয়ে গিয়েছিল। আখের বীজের জন্যে সে টাকা জোগাড় করতে পারেনি বলে সে এবার আখ বুনতে পারেনি। ওদিকে ডানদিকের বলদটাও বসে পড়েছে। নতুন বলদ না হলে কাজ চলবে না। পুনিয়ার একটা বলদ নালায় পড়ে মরে যাওয়ায় আরো বিপত্তি বেড়েছে। একদিন হরির ক্ষেত চাষ হয় তো আরেকদিন পুনিয়ার। তার ফলে ক্ষেতে যেভাবে লাঙল দেওয়া উচিত তা হতে পারছে না।

হরি লাঙল নিয়ে মাঠে যায় কিন্তু ভোলার কথাই ভাবে। সে এতখানি বয়স পর্যন্ত্য কখনও শোনেনি যে কোন স্ত্রী তার স্বামীকে জুতো পেটা করেছে। জুতো কি, চড়-ঘুঁষির কথাও শোনেনি। আর নোহরী ভোলাকে জুতো মারলো। সব লোক দাঁড়িয়ে তামাশা দেখলো। এই মেয়েছেলে কি করে হতভাগা ভোলার গলায় ঝুললো। এখন তো ভোলার ডুবে মরাই উচিত। জীবনে যদি বদনাম আর দুর্দশা ছাড়া কিছুই না জোটে তাহলে মরাই ভালো।

এক এই নোহরী আর এক এই সিলিয়া চামারনী। দেখতে শুনতে ওর চেয়ে লাখ গুণ ভালো, 'চাহে দো কো খিলাকর খায়ে আউর রাধিকা বনি ঘুমে' * কিন্তু মজুরী করে, খিদেয় মরে তবু মতইয়ের জন্যে হেদিয়ে মরে। মাতাদীন তার কথা জিজ্ঞেসও করে না। কে জানে, ধনিয়া মরে গেলে হরিরও হয়তো এ দশাই হতো। ধনিয়ার মৃত্যুকল্পনা করলেই হরির ভয় করে। তার মানসনেত্রে ধনিয়া ত্যাগের প্রতিমা। মুখরা কিন্তু মনটা মোমের মতো নরম। পয়সা-পয়সা করে মরে কিন্তু মান মর্যাদা রক্ষার জন্যে সর্বস্ব দিতে পারে। যৌবনে সেও কম রূপসী ছিল না। নোহরী তার কাছে কোথায় লাগে? যখন হাঁটতো রাণীর

* চাহে দোকো খিলাকর খায়ে আউর রাধিকা বনি ঘুমে=ইচ্ছে হলে দু চারজনকে খাইয়ে খেয়ে রাধা হয়ে সুখে থাকতে পারে

মতো দেখাতো। এই পটেশ্বরী, ঝিঙুরীর তখন জোয়ান বয়স। দুজনেই ধনিয়াকে দেখে বুকে হাত দিত। দরজার কাছে একশোবার ঘুরে মরতো। কিন্তু ধনিয়া কখনো কারুর দিকে চোখ তুলে তাকায়নি পর্যন্ত।

হঠাৎ দেখে মাতাদীন তার দিকেই আসছে। কসাই কোথাকার! কেমন ফোঁটা তিলক কেটেছে, যেন ভগবানের আসল ভক্ত! 'রঙ্গা হুয়া শিয়ার' * এমন বামুনের পা ছোঁবে কে? মাতাদীন এসে বলে, "তোমার হেলে গরুটা যে বুড়ো হয়ে গেচে হরি, এবার সেচের সময় কাজ করতে পারবে না। পাঁচ বছর আগে এনেছিলে বোধহয়, তাই না?"

হরি বাঁদিকের বলদটার গায়ে হাত বুলিয়ে বলে, "পাঁচ কি, এখন তো আট চলচে ভাই। ইচ্ছে করে একে 'পিনসিন' দিই কিন্তু চাষা আর চাষার গরুকে যমরাজ ছাড়া কেউ 'পিনসিন' দেয় না। এর কাঁধে জোয়াল চাপাতে আমার মন কেমন করচে। বেচারা হয়তো ভাবচে এখনো ছুটি পাবো না, এবার কি আমার হাড়গুলো লাঙল টানবে? কোন উপায় নেই। তা তুমি কেমন আচো? এখন ভালো তো?"

মাতাদীন একমাস ম্যালেরিয়ায় ভুগে উঠেছে। তার বাঁচার আশাই ছিল না। তখন থেকে তার ধারণা হয়েছে, সে সিলিয়ার ওপর যে অবিচার করেচে এ সেই পাপের শাস্তি। যখন সে সিলিয়াকে তাড়িয়ে দেয় তখন সিলিয়া গর্ভবতী। পূর্ণগর্ভ নিয়েও সে মজুরী করে। ধনিয়া আশ্রয় না দিলে বেচারী মরে যেত। এই অবস্থায় মজুরীই বা করবে কি করে? তাই লজ্জিত ও দয়ার্দ্র মাতাদীন হরির হাতে দুটো টাকা দিতে এসেছিল। হরি যদি তার হয়ে টাকাটা সিলিয়াকে দেয় তাহলে সে খুবই উপকৃত হবে। হরি বলে, "তুমি নিজেই দে এসো না।"

মাতাদীন দুঃখিত স্বরে বলে, "আমাকে ওর পাশে পাঠিও না হরি মাহাতো। কোন্ মুখে যাবো? ভয়ও করচে। আমাকে দেখে যদি গালাগালি করে। তুমি একটু দয়া করো। আমি আর চলতে পারচি না কিন্তু এই টাকা দুটোর জন্যে কোশখানেক ছুটে এক যজমানের কাছে গেছিলুম। নিজের কম্ম-ফল খুব ভুগচি। এই বামনাইয়ের বোজা আর আমি বইতে পারচি নে। লুকিয়ে চুরিয়ে যা খুশি করো কেউ কিছু করবে না। সামনে করলেই যত দোষ, কলঙ্ক লাগবে। তুমি ওকে বুজিয়ে বোলো দাদা, সে যেন আমায় মাফ করে। এই ধম্মের বাঁধন বড্ড কড়া। আর কারুর ধম্ম গেলে হানি হয় না কিন্তু বামুনের ধম্ম গেলেই সব গেল। যে সমাজে জম্মেচি, বড়ো হয়েচি তার ইজ্জত রাখতে হবে তো। তার ধম্মই তার বাপ-ঠাকুরদার উপার্জন, তারই রুটি সে খায়। এই প্রাশ্চিত্তিরের জন্যে আমাদের তিনশো টাকা খরচ হয়ে গেল। তবে বিধম্মী হয়েই যদি থাকতে হয় তাহলে সবকিছু পষ্টাপষ্টিভাবেই করবো। সমাজের জন্যে মানুষের যদি দায় থাকে তবে মানুষের জন্যেও তার কিছু দায় আচে।

* রঙ্গা হুয়া শিয়ার=রাঙানো শেয়াল (নীলবর্ণ শিয়াল)

সমাজধর্ম্ম পালন করলে তবেই সমাজে আদর মেলে। কিন্তু মানুষের ধর্ম্ম পালন করলে ভগমান খুশি হন।"

সন্ধ্যেবেলা হরি যখন ভয়ে ভয়ে সিলিয়াকে টাকা দেয় তখন সে যেন তার তপস্যার ফল পেয়ে গেল। দুঃখের ভার একাই বওয়া যায়, সুখের ভার একলা বওয়া যায় না। কিন্তু এই সুখবর কাকে সে শোনাবে? ধনিয়াকে বলতে পারে না। সোনাই ছিল তার প্রাণের সখী। সিলিয়া তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আকুল হয়ে ওঠে। মাতাদীনের সব অপরাধ সে নিঃশেষে ক্ষমা করে। সত্যিই তো, তার কি দোষ? ধর্মভ্রষ্ট হলে কার না রাগ হয়। মাতাদীনের তো হবেই। সে ব্রাহ্মণ, চামাররা তার ধর্ম নষ্ট করলো আর সে সিলিয়ার রক্ত খেতে চাইবে না? এখন সে সব দোষ নিজের ঘাড়ে তুলে নেয়।

কার্তিকের রুপোলী জ্যোৎস্নায় সিলিয়া ঘর ছেড়ে বেরোয়। সে সোনাকে এই সুখবর দিতে যাবে। এখন সন্ধ্যে। নৌকো পাওয়া যাবে কিন্তু ঘাটে গিয়ে একটাও নৌকো পেল না। একটু ভেবে সে সাঁতরেই নদী পার হয়ে যায়। ওপারে যখন পেঁাছোলো তখন অন্ধকারের গাঢ় ছায়া নেমেছে। শিয়ালের ডাকও শোনা যাচ্ছে না। শাড়িটা নিংড়ে নিয়ে সে কাঁপতে কাঁপতে এগোয়। কিন্তু গ্রামে পেঁাছে সোনাদের বাড়ি যেতে সংকোচ হয়। মথুরা কি ভাববে? সোনাও রেগে যাবে হয়তো। সারা গ্রাম নিঝুম হয়ে আছে, সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনীর পর চাষীরা সন্ধেবেলাতেই শুয়ে পড়ে। মথুরার বাড়ির দরজাও বন্ধ। দরজার পাশে 'অলাও' *এ তখনও আগুন জ্বলছে। সিলিয়া খুর তাপে। নিজের কাপড় সেঁকে। হঠাৎ দরজা খুলে মথুরা বেরোয়। বলে, "আরে? 'অলাও'-এর কাচে কে বসে আচে?"

সিলিয়া তাড়াতাড়ি মাথায় আঁচল টেনে বলে, "আমি সিলিয়া।"

"সিলিয়া! এত রাতে এলে কি করে? ওখেনে সব ভালো তো।"

"হ্যাঁ সব ভালো। মন কেমন করছিল। ভাবলুম সোনার সঙ্গে দেকা করে আসি। দিনে তো ছুটি পাই না।"

"নদী সাঁতরে এলে?"

"আর কি করে আসবো?"

মথুরা তাকে ঘরে নিয়ে যায়। বারান্দায় অন্ধকার। সে হঠাৎ সিলিয়ার হাত ধরে নিজের দিকে টানে। সিলিয়া এক ঝট্‌কায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, "দ্যাখো, মথুরা, বজ্জাতি করলে আমি সোনাকে বলে দোব। তুমি আমার ছোটবোনাই, বুজলে। সোনাকে নে মন উঠছে না বুজি।"

মথুরা তার কোমরে হাত দিয়ে বলে, "তুমি বড্ড নিদ্দয় সিল্লো। এখন কে দেকচে?"

"কেন আমি কি সোনার চেয়ে সোন্দর? এমন ইন্দ্রের পরী পেয়েও হচ্ছে

* অলাও=আগুন তাপার জন্যে আগুন রাখার পাত্র

না? এখন ভোমরা হবার সাধ হয়েচে? ওকে বলে দিলে ও তোমার মুখ দেখবে না।"

মথুরা লম্পট নয়, সোনাকে সে ভালোও বাসে। তবু আধ অন্ধকারে একান্তে যুবতী সিলিয়ার সান্নিধ্যে তার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ভৎর্সনায় সম্বিত ফিরে পায়। সিলিয়াকে ছেড়ে দিয়ে বলে, "তোমার পায়ে পড়চি সিল্লো, ওকে বোলো না। এক্ষুণি যে সাজা দিতে হয় দাও।"

সিলিয়ার দয়া হলো। তার মুখে একটা আলতো চড় মেরে বললে, "এই হচ্চে সাজা, আমার সঙ্গে আর বজ্জাতি কোরো না। কারুর সঙ্গেই কোরো না, তাহলে সোনা হাতছাড়া হয়ে যাবে বুজেচো।"

"আমি দিব্যি দে বলচি সিল্লো, আর কখনো এমন হবে না।" তার কণ্ঠে বাসনার আগ্রহ। সিলিয়ার মন আন্দোলিত হয়। সরস কণ্ঠে বলে, "আর যদি করো?"

"তাহলে তোমার যা খুশি তাই কোরো।" ওর মুখের খুব কাছে সিলিয়ার মুখ। দুজনের নিঃশ্বাস দুজনের দেহে কাঁপন জাগায়। হঠাৎ সোনা ডাকে, "কার সঙ্গে কতা বলচো ওখেনে?"

সিলিয়া পেছু হটে যায়। মথুরা উঠোনে নেমে বলে, "সিল্লো, তোমার গাঁ থেকে এসেচে।"

সিলিয়াও তার পেছু পেছু এসে দাঁড়ায়। সে দেখে সোনা কত সুখে থাকে। বারান্দায় খাটিয়া, তার ওপর 'সুজনী'র * নরম বিছানা ঠিক যেমন মাতাদীনের 'চারপাই'য়ে বিছানো থাকতো। তাকিয়া আছে, লেপও। খাটিয়ার নীচে এক ঘটি জল। উঠোনে জ্যোৎস্না। এককোণে তুলসীমঞ্চ, অপরদিকে জোয়ারের আঁটি সাজানো। মাঝখানে খড়ের গর্ত, কাছেই ওখল **। তার পাশে ধানের কুটি পড়ে আছে। খাপরার চালে সতেজ লাউডগা, তাতে কয়েকটা লাউয়ের জালি চকচক করছে। অপর দিকের বারান্দায় একটা গরু বাঁধা রয়েছে। এদিকে সোনা আর মথুরা শোয়। অপরদিকে বাড়ির অন্যেরা। সিলিয়া ভাবলে, সোনা কত সুখী!

সোনা উঠোনে নেমে আসে কিন্তু ছুটে এসে সিলিয়াকে জড়িয়ে ধরে না। সিলিয়া ভাবে হয়তো মথুরা দাঁড়িয়ে আছে বলে কিংবা এখন অহংকার হয়েছে তাই সিলিয়া চামারনীকে গলা জড়িয়ে ধরতে সোনার লজ্জা করছে। তার সমস্ত উৎসাহ নিভে গেল। হর্ষের পরিবর্তে জাগলো ঈর্ষা! সোনার গায়ের রঙ পাকা সোনার মতো উজ্বল, গড়ন পেটন ভরাট, সুডোল, মুখে গৃহিনীর গরিমার সঙ্গে যুবতীর হাসি!

সিলিয়া এক মুহূর্ত মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে থাকে। এ সেই সোনা, যে শুকনো শরীরে রুক্ষ চুলের ঝুঁটি নেড়ে এদিক ওদিক ছুটে বেড়াতো। মাসের পর মাস মাথায় তেল পড়তো না, ছেঁড়া কাপড় পরে বেড়াতো। আজ সে নিজের

* সুজনী=চাদর ** ওখল=উদ্‌খল

ঘরে রাণী। গলায় হাঁসুলী আর হুমেল*, কানে কানফুল আর সোনার মাকড়ি, হাতে রূপোর চুড়ি আর কঙ্কণ। চোখে কাজল কপালে সিঁদুর। এই হচ্ছে সিলিয়ার স্বর্গ! সেখানে সোনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখে সে প্রসন্ন হতে পারলো না। এত অহংকার! একদিন সিলিয়ার গলা ধরে ঘাস কাটতে যেত যে সোনা সে আজ ভালো করে কথাও বলছে না। সে ভেবেছিল সোনা তার গলা জড়িয়ে ধরে একটু কাঁদবে, আদর করে বসাবে, খাওয়াবে, গাঁয়ের কথা জিজ্ঞেস করবে, নিজের সোহাগরাত আর মধুর অভিজ্ঞতার গল্প শোনাবে কিন্তু সোনার মুখে যেন দৈ জমে আছে। সে মনে মনে আফসোস করে।

সোনা রুক্ষ্ম স্বরে প্রশ্ন করে, "এত রাতে এলি কেন সিল্লো?"

সিলিয়া চোখের জল রুখতে চেষ্টা করে, "তোমাকে দেকতে বড্ড ইচ্ছে করছিল। এতদিন হয়ে গেচে তাই দেখা করতে এলুম।"

সোনা কঠোর স্বরে বলে, "কিন্তু লোকে কারুর ঘরে যেতে গেলে তো দিনে যায়। এত রাতে কেন?" আসলে এসময় সিলিয়ার আসা তার ভালোলাগেনি। এখন তার প্রেম-প্রণয়-হাসি-বিলাসের সময়। সিলিয়া তাতে বাধা দিয়ে যেন মুখের সামনে থেকে খাবারের থালা ছিনিয়ে নিল।

সিলিয়া হতভম্ব হয়ে মাটির দিকে চেয়ে আছে। ধরণী দ্বিধা হলে সে লুকিয়ে বাঁচে। এত অপমানিত সে কখনো হয়নি। সিলিয়ার মনের কোমল ভাবগুলো প্রচণ্ডভাবে আহত হলো। ঘরে উপোষ করে থাকা এক জিনিষ আর পংক্তিভোজন থেকে উঠিয়ে দেওয়া আরেক জিনিষ। এখান থেকে যেতে পারলেই যেন বাঁচে। সে কিছু বলতে পারে না। সোনার মনের কথা সে বুঝতে পারে। ঝাঁপির মধ্যে থেকে সাপ ফুঁসে বেরোবার আগেই সে পালাতে চায়। মথুরার হাতে ভাঁড়ারের চাবি, সিলিয়ার জন্যে কিছু খাবার বার করে দেবার জন্যে সে দাঁড়িয়েছিল। সিলিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

সোনার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড়ো পাপ হলো নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক। পরস্ত্রী বা পরপুরুষের দিকে পাপদৃষ্টিতে তাকানোর বাড়া অপরাধ নেই। চুরি. খুন, জাল-জোচ্চুরিও তার কাছে এত ভীষণ নয়। খোলাখুলি হাসিঠাট্টাকে সে মন্দ ভাবতো না কিন্তু লুকোছাপা তার দারুণ অপছন্দ। ছোটবেলা থেকেই এর অনেক রূপের সঙ্গে সে পরিচিত। হরির হাট থেকে ফিরতে যখন দেরি হতো আর ধনিয়া যখন জানতে পারতো সে দুলারীর দোকানে গেছে, তা সে যে কাজেই হোক না কেন, সে কদিন ঘরের কাজ করতো না, কথাও বলতো না। একবার তো বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল। সোনার মধ্যে এটা আরো তীব্রভাবে ছিল। যদ্দিন বিয়ে হয়নি সে এটা নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়নি কিন্তু এখন এ জিনিষটা তার কাছে ব্রতের মতো রূপ নিয়েছে। এমন মেয়ে-পুরুষের গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া উচিত। প্রেমের জন্যে দাম্পত্যের বাইরে তার দৃষ্টি পৌঁছতো না। কর্তব্যকেই সে প্রেম বলে ভাবতো। আর সিলিয়া তার বোনের

*হুমেল=সুতোয় গাঁথা গিনির (টাকার) মালা

মতো, ভালোও বাসতো, বিশ্বাসও করতো। সেই সিলিয়া. বিশ্বাসঘাতকতা করছে? মথুরা আর সিল্লো নিশ্চয় মেলামেশা করে, হয়তো নদীর ধারে গিয়ে দেখা করে। আজ এত রাতে নদী পার হয়ে তাই এসেছে। সে জিজ্ঞেস না করলে জানতেও পারতো না। মথুরাই এই সময়টি বেছে নিয়েছে। সব জানবার জন্যে সে অধীর হয়ে ওঠে। যাতে আত্মরক্ষার একটা উপায় মেলে। মথুরাই বা দাঁড়িয়ে কেন? সে রুদ্ধস্বরে বলে, "তুমি বাইরে যাবে, না এখেনেই পাহারা দেবে?"

মথুরা ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে যায়। আর সিলিয়া ভয়ে ভয়ে ভাবে তার মাথায় খাঁড়া ঝুলছে। সোনা গম্ভীর সুরে বলে, "দ্যাখ সিল্লো। আমাকে সব পষ্টা-পষ্টি বলে দে। নয়তো আমি তোর সামনে নিজের গলায় গাঁড়াশী বসিয়ে দোব। তারপর তুই আমার সতীন হয়ে রাজত্ব করিস। দ্যাখ, ঐ গাঁড়াশী তোর সামনে পড়ে আছে। একটা খাপে দুটো তলোয়ার থাকে না।" সে লাফিয়ে গাঁড়াশীটা তুলে এনে আবার বলে, "ভাবিসনে আমি খালি ভয় দেখাচ্ছি। রাগের মাথায় কি করে বসবো যানি না। সব কিছু খুলে বল্।"

সিলিয়া কেঁপে ওঠে। সে গ্রামাফোনের রেকর্ডের মতো সব কথা বলে যায়। একটা কথাও লুকোয় না। সোনার চোখে ভীষণ সংকল্প, মাথায় যেন খুন চেপে গেছে। বলে, "ঠিক ঠিক বলচিস?"

"একেবারে ঠিক। আমার ছেলের দিব্যি।"

"কিচ্ছু লুকোসনি?"

"একটা কথা লুকোলে আমার চোখ গলে যাবে।"

"তুই ওই পাপীটাকে লাথি মারলিনে কেন? ওকে কামড়ে দিলিনে কেন? চেঁচালি না কেন? বল্।"

সিলিয়া নীরব। কী জবাব দেবে।

সোনা উন্মাদিনীর মতো বলে, "কতা বলচিস না কেন? ওর নাকটা দাঁত দে কেটে ফেলতে পারিসনি? কিংবা দুহাত দে গলাটা টিপে ধরতে পারলিনি, তাহলে আমি তোর পায়ে মাথা খুঁড়তুম। এখন তো তুই আমার চোখে বেশ্যা, পুরো বেশ্যা। এই যদি তোর মনে ছিল তাহলে মাতাদীনের নামে কালি দিলি কেন? আর কাউকে নে থাকলেই পারতিস। নিজের ঘরেই বা গেলিনে কেন? তোর বাড়ির লোকরা তো তাই চায়। তুই ঘুঁটে-ঘাস বেচতে বাজার যেতিস, ওখেন থেকে টাকা আনতিস আর তোর বাপ ঘরে বসে তাড়ি খেত। তাহলে ঐ বামুনের জাত মারলি কেন? সতীপনার বড়াই করচিস কেন? একলা যখন থাকতে পারবিনে তখন আবার বে কর্ নয়তো জলে ডুবে মর্। পরের জেবন বিষিয়ে দিচ্ছিস কেন? আজ আমি তোকে পষ্ট বলে দিচ্চি ফের যদি এমন কথা আমি জানতে পারি তাহলে আমাদের তিনজনের একজনও বাঁচবে না। এখন মুখে চুণকালি মেখে দূর হ। আজ থেকে তোর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

সিলিয়া ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। মনে হচ্ছিল তার কোমর ভেঙে গেছে।

একটু সাহস খোঁজে। নিজের পক্ষে বলার মতো আর কিছু ছিল না। চোখে অন্ধকার, মাথা ঘুরছে, গলা শুকিয়ে কাঠ। সে ধীরে ধীরে চলে যায়।

দরজায় মথুরা দাঁড়িয়েছিল। বলে, "এখন কোতায় যাচ্ছো সিল্লো?"

সিলিয়া উত্তর দেয় না। মথুরাও প্রশ্ন করে না। সেই রূপালী জ্যোৎস্না এখনো নদীর জলে ঝিকমিক করছে। সিলিয়া স্বপ্নচ্ছায়ার মতো নদীর দিকে এগিয়ে যায়।

৩০

মিলটা প্রায় পুরোটাই জ্বলে গেছে কিন্তু ওই মিলকে আবার দাঁড় করাতে হবে। মিস্টার খান্না প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করছেন। মজুরদের হরতাল এখনও চলছে তাতে অবশ্য মিলমালিকের কোন ক্ষতি নেই। কম বেতনে নতুন লোক পাওয়া গেছে তারা প্রাণ দিয়ে করছে। কারণ সবার অবস্থা সমান. বেকাররা এমন কিছু করতে চায় না যাতে কাজে বাধা পড়ে। তাই পুরনো মজুরদের কম মজুরীতে কাজ করা ও মিস্টার খান্নাকে খোশামোদ করা ছাড়া আর উপায় রইলো না। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের ওপর তাদের আর একরত্তিও বিশ্বাস নেই। তাঁকে একলা পেলে হয়তো তাঁর অবস্থা খারাপ করে দিত কিন্তু পণ্ডিত বেশ সাবধানে থাকেন। প্রদীপ জ্বলার পর নিজের অফিস থেকে বাইরে যান না আর শুধু অফিসারদের খোশামোদ করেন। মির্জা খুরশেদের অবস্থা যে কে সেই। এদের কষ্ট দেখে তিনি মনে মনে চান সবাই কাজ ফিরে পাক কিন্তু নতুন মজুররা আবার কোথায় যাবে ভেবে চুপ করে থাকেন।

মিস্টার খান্না পুরনো মজুরদের নতুন বেতনে কাজে রাজী দেখে আরো বেঁকে বসলেন। যদিও তিনি জানতেন নিজের সমস্ত শক্তি দিয়েও নতুনরা পুরোনোদের মতো কাজ করতে পারবে না। তারা বেশিরভাগই চাষাভুষোর দল, মিলে কাজ করতে অভ্যস্ত নয়। শেষে পুরোনোরা হার মানলে খান্না তাদের বহাল করতে রাজী হলেন। প্রশ্ন উঠলো, কাদের রাখা হবে। ডিরেক্টরদের অর্ধেক নতুনদের পক্ষে। বাকী অর্ধেকের ইচ্ছে পুরোনোদেরও নতুন বেতন দিয়ে রাখা।একটু খরচ বেশি হলেও কাজ পাওয়া যাবে। খান্নাই মিলের সর্বেসর্বা। তিনি এ ব্যাপারে শুধু বন্ধুদের নয়, শত্রুদেরও পরামর্শ নিলেন। সবার আগে নিলেন কামিনীর পরামর্শ। যখন থেকে মালতী তাঁকে হতাশ করেছেন আর কামিনী জেনেছেন মেহতার মতো বিদ্বান ব্যক্তিও তাঁকে সম্মান করেন তখন থেকে দুজনের ব্যবধানটা কমে এলো। একে ঠিক প্রেম হয়তো বলা চলে না তবে সাহচর্য নিশ্চয় বলা যায়। পরস্পরের মধ্যে সেই মেরুপ্রমাণ ব্যবধান আর নেই। মধ্যের অলংঘ প্রাচীরও ভেঙে গেছে।

মালতীর রঙঢঙও ভোল পাল্টাচ্ছিল। মেহতার জীবন এতদিন সাধনা ও চিন্তার মধ্যে কেটেছে। সেসব চুকেবুকে গেলে আত্মবাদ ও অনাত্মবাদ নিয়ে মেতেছিলেন। এখন প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মার্গের মধ্যবর্তী সেবামার্গকে গ্রহণ

করেছেন। একে কর্মযোগও বলা চলে। কোন সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের ওপর তাঁর বিশ্বাস নেই তবু তিনি নাস্তিকও নন। তিনি মনে করতেন প্রাণীর জীবন-মরণ, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্যের মধ্যে কোন ঐশ্বরিক বিধান নেই। ঈশ্বর কল্পনার একটা উদ্দেশ্যই তাঁর কাছে স্পষ্ট তা হলো মানবজাতির একতা। একাত্মবাদ, সর্বাত্মবাদ কিংবা অহিংসাতত্বকে তিনি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে নয়, ভৌতিক দৃষ্টিতেই দেখতেন। যদিও তাঁর তত্ত্বগুলি ইতিহাসে আধিপত্য বিস্তার করেনি তবু এরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মানব সমাজের একতায় মেহতার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এই বিশ্বাসের জন্যে তিনি ঈশ্বরতত্ব স্বীকার করা প্রয়োজনীয় মনে করতেন না। প্রাণীমাত্রেরই এক আত্মা ভেবে তাঁর মানবপ্রেম জাগেনি। সেবাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। আর তাঁর এই উদার দৃষ্টির অদৃশ্য প্রভাব মালতীর ওপরও পড়ছিল। এতদিন তিনি যত পুরুষ দেখেছেন সবাই তাঁর বিলাসবৃত্তিকেই উদ্দীপ্ত করেছে। কিন্তু মেহতার সংস্পর্শে এসে তাঁর ত্যাগের ভাবই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সব মানুষের মনেই সৎভাব লুকিয়ে থাকে, আলো পড়লে চকচক করে। যে নাম আর অর্থের মোহে পড়ে থাকে সে এখনও কোন পরিচ্ছন্ন আত্মার সংস্পর্শে আসেনি ধরে নিতে হবে।

মালতী এখন প্রায়ই গরীবদের বাড়িতে ফীজ না নিয়েই রোগী দেখতে যান। রোগীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারও করেন। তবে এখনো সাজ-গোজ ছাড়তে পারেননি। রুজ-পাউডার ত্যাগকে তিনি আন্তরিক পরিবর্তনের চেয়েও কঠিন মনে করেন।

মাঝে মাঝে তাঁরা দুজনেই গ্রামে চলে যান। সেখানে চাষীদের সঙ্গে গল্প করে তাদের কুটিরে থেকে তাদের সঙ্গে খেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করেন। একদিন তাঁরা ঘুরত ঘুরতে বেলারী গিয়ে হাজির হন। হরি দরজার কাছে বসে তামাক খাচ্ছিল। মেহতা ও মালতীকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। মেহতা হরিকে চিনতে পেরে বললেন, "এটা তোমার গ্রাম? মনে আছে আমরা রায়সাহেবের ওখানে এসেছিলাম। আর তুমি 'ধনুষযজ্ঞে' মালী সেজেছিলে।"

হরির মনে পড়ে। সে পটেশ্বরীর বাড়ি থেকে চেয়ার সংগ্রহ করতে যায়। মেহতা বলেন, "চেয়ারের দরকার নেই। আমরা এই খাটিয়াতেই বসছি। এখানে চেয়ারে বসবো বলে আসিনি। তোমার কাছে কিছু শিখতে এসেছি।"

দুজনে খাটিয়ায় বসলেন। হরি হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এঁদের কি করে খাতির করবে? বড়ো বড়ো লোক! এঁদের খাতির করার সামর্থ্য কোথায়? শেষে জিজ্ঞেস করে, "জল আনবো?"

"হ্যাঁ তেষ্টা পেয়েছে।"

"একটু মিষ্টিও আনি?"

"আনো। তবে যদি ঘরে থাকে।"

হরি ঘর থেকে গুড় আর জল নিয়ে আসে। ততক্ষণে ছেলেপুলেরা এসে তাঁদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। যেন চিড়িয়াখানায় আজব জন্তু এসেছে। সিল্লো

ছেলে কোলে নিয়ে কাজে যাচ্ছিল। কৌতূহলী হয়ে দাঁড়ায়। মালতী এসে তার কোল থেকে ছেলেকে নিয়ে আদর করে বলেন, "কতদিনের বাচ্চা।" সিল্লোর ঠিক মনে ছিল না। অপর একটি মেয়ে বলে, "বছর খানেক হবে, না রে?" সিল্লো সমর্থন জানায়।

মালতী মজা করে বলে, "খুব সুন্দর খোকা। একে আমায় দিয়ে দাও।"

সিল্লো গর্বে ফুলে ওঠে, "আপনারই তো জিনিষ।"

"তাহলে আমি নিয়ে যাই?"

"নে যান। আপনার কাচে থাকলে মানুষ হয়ে যাবে।"

গ্রামের আরো মেয়েরা এসে মালতীকে হরির বাড়িতে নিয়ে যায়। এখানে পুরুষদের মধ্যে তারা মালতীর সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। মালতী দেখলেন খাটিয়ার ওপর শতরঞ্চী পাতা। মালতী বসেন তারপর শিশুপালন সম্বন্ধে নানা কথা হয়। মেয়েরা মন দিয়ে শোনে।

ধনিয়া বলে, "এখানে এসব পোস্কার পচ্ছন্ন থাকবে কি করে সরকার। খাবারই জোটেনা।"

মালতী বোঝান, "পরিষ্কার থাকতে কোন খরচ নেই। শুধু একটু পরিশ্রমী আর সতর্ক হলেই চলবে।"

দুলারী বলে, "এসব কথা তুমি কি করে জানলে সরকার? তোমার তো এখনো বে হয়নি।"

মালতী মুচকি হেসে বললেন, "তোমরা কি করে জানলে আমার বিয়ে হয়নি।"

সব মেয়ে মুখ ফিরিয়ে হাসে। ধনিয়া বলে, "আরে এ কি লুকোনো থাকে মিস বাবা? মুখ দেখলেই বোঝা যায়।"

মালতী লজ্জা পেয়ে বললেন, "বিয়ে করিনি। করলে তোমাদের সেবা করবো কি করে?"

সবাই সমস্বরে বলে, "ধন্য হো সরকার, ধন্য হো।" সিলিয়া মালতীর পা টিপতে শুরু করে—সরকার এত দূর থেকে এসেছেন, হাঁফিয়ে পড়েছেন নিশ্চয়। মালতী পা টেনে নিলেন, "না-না, আমি ক্লান্ত হইনি। আমি তো হাওয়া গাড়ি চেপে এসেছি রে। তোমরা বরং তোমাদের ছেলেপুলেদের আনো, আমি দেখে বলে দেব তারা ভালো থাকবে কি করে?"

দেখতে দেখতে বিশ-পঁচিশটা শিশু এসে গেল। মালতী তাদের পরীক্ষা করলেন। কয়েকটি বাচ্চার চোখ উঠেছিল তাদের চোখে ওষুধ দিলেন। বেশির ভাগই দুর্বল। মা-বাপ ভালো খেতেই পায় না। মালতী শুনে আশ্চর্য হলেন যে খুব কম ঘরেই দুধ হয়, আর বছরের পর বছর কেউ ঘি চোখে দেখতেও পায় না।

মালতী এখানেও তাদের খাদ্যের গুণাগুণের কথা বলেন। যেমন তিনি অন্যত্রও বলে থাকেন। গ্রামের লোকের ওপর তাঁর রাগ হয়। এরা কেন ভালো খায় না? যেখানে দু-চারটে বলদ আছে সেখানে একটা গরু কি মোষ পোষা

যায় না? কেন সরকারকে বলে না যে সে নামমাত্র সুদে টাকা দিয়ে তাদের মহাজনের ফাঁস থেকে রক্ষা করুক? সবাই বলে আয়ের মোটা অংশ চলে যায় ধার শোধ করতে। আপোষে ভাগবাঁটোয়ারা আর ঝগড়া-বিবাদ এত বেড়েছে যে কোথাও দুভাই একসঙ্গে থাকে না। মালতী এই বিষয় নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা তাঁর মনে সেবার প্রেরণা জাগায়। এই প্রথম তাঁর দামী জরির কাজ করা রেশমী শাড়ি, সুগন্ধিত শরীর ও প্রসাধনে অলংকৃত মুখ তাঁকেই লজ্জা দিল। তাঁর হাতে বাঁধা সোনার ঘড়ি অপলক নেত্রে তাঁকে ব্যঙ্গ করে। গলার ঝলমলে নেকলেশ যেন ফাঁসীর মতো চেপে ধরে।

ওদিকে মেহতা খাটিয়ায় বসে চাষাদের কুস্তী দেখছিলেন আর পস্তাচ্ছিলেন মির্জাকে সঙ্গে আনেননি বলে, তাহলে তাঁদেরও এক হাত হয়ে যেত। তিনি অবাক হয়ে ভাবছিলেন এই নিরীহ প্রৌঢ় শিশুদের সঙ্গে তথাকথিত শিক্ষিতরা কি করে এত নিষ্ঠুর ব্যবহার করে? তিনি কল্পনায় এক আদর্শ সংসার বানিয়ে তাতে আদর্শ মানবতার আবাদ করার স্বপ্ন দেখেন। বাস্তবে তা যে কত অসম্ভব সে বিচার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এখন ভাবছিলেন এদের এত দুর্দশা কেন? এদের সারল্যই যে তার প্রধান কারণ একথা ভাবতে তাঁর কষ্ট হলো। এরা একটু কম সরল হলে এত দুঃখ পেত না। এদের নিরীহভাব জড়তার স্তরে পেঁাছে গেছে একমাত্র কঠোর আঘাতই তাদের কর্মণ্য করে তুলতে পারে। তাঁর মন চারদিকে ঘা খেয়ে হতাশ হয়ে পড়ে।

সন্ধ্যেবেলা যারা ক্ষেতে কাজ করছিল তারাও দৌড়ে আসে। ঠিক সেই-সময় মেহতা মালতীকে গ্রামের কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে তাদের একজনের বাচ্চা কোলে বসে থাকতে দেখলেন, মনে হলো মালতী যেন ওদেরই একজন। মেহতার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে। মালতী নিজেকে একরকম মেহতার হাতেই সমর্পণ করেছিলেন। যদিও মালতীর প্রতি মেহতার সেই জাতীয় কোন আকর্ষণ জাগেনি, যে আকর্ষণ ছাড়া বিয়ের প্রস্তাব করা তাঁর পক্ষে হাস্যকর মনে হতো। মালতী নিজেই তাঁর দরজায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মেহতাও তাঁকে আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রেমহীন পৌরুষের মাধ্যমে। সেই-সঙ্গে মালতীকে কামিনীর পথ থেকে সরিয়ে আনাও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। মেহতা জানতেন মালতীর সঙ্গে ছলনা করে তিনি নীচতার পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর মনও মালতীর দিকে ঝুঁকছিল। আকর্ষণ রূপজ নয়, গুণগত। তিনি জানতেন প্রকৃত প্রেম বিবাহ-বন্ধনে বন্দী না হলে পাওয়া যায় না। কিন্তু এখনও সে সময় আসেনি। এতদিন মালতী তাঁর হৃদয়ের ভিন্ন অংশে রশ্মিপাত করেছেন কিন্তু সমস্ত অন্তরকে আলোকিত করে তুলতে পারেননি। আজ মালতী গ্রামের লোকেদের সঙ্গে ভেদাভেদ ভুলে মিশে যাওয়ায় সমস্ত আলোকরশ্মি যেন একত্রিত হয়ে গেল। মালতী গ্রাম বেড়িয়ে ফিরতেই মেহতা তাঁকে নিয়ে নদীর ধারে গেলেন এবং রাতটা সেখানেই কাটাবেন স্থির করলেন। আজ কি জানি কেন মালতীর বুকটা অকারণে কাঁপতে শুরু করে। তিনি মেহতার মুখে এক বিচিত্র বাসনার আলো ফুটে উঠতে দেখলেন।

নদীর তীরে রূপোর ফরাশ বিছোনো। মেহতা প্রকৃতির শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি বালিতে কয়েকটা ডিগবাজি খেয়ে হাঁটু জলে গিয়ে দাঁড়ালেন। মালতী বললেন, "জলে দাঁড়িও না। ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে তো।"

মেহতা জল ছিটিয়ে দিয়ে বলে, "ইচ্ছে করছে সাঁতার কেটে ওপারে চলে যাই।"

"না-না। জল থেকে উঠে এসো। আমি যেতে দেব না।"

"তুমি আমার সঙ্গে যাবে না? ওই নির্জন স্বপ্নরাজ্যে?"

"আমি সাঁতার কাটতে পারি না।"

"আচ্ছা এসো একটা ভেলা বানাই, তাতে বসে ওপারে যাবো।"

আশেপাশে ঘন ঝাউয়ের জঙ্গল। মেহতা পকেট থেকে ছুরি বার করে অনেক ডাল কেটে জমা করলেন। নদীর তীরে অনেক জায়গা জুড়ে রয়েছে শরবন। সেখান থেকে দড়ির মতো শনের ছাল সংগ্রহ করে এনে বালির ওপরেই ভেলা বাঁধতে বসলেন। তাঁর খুশি দেখে মনে হলো স্বর্গযাত্রার প্রস্তুতি চলছে। কয়েকবার আঙুল কাটলো, রক্ত বেরুলো। মালতী রাগ করে গ্রামে ফিরতে চাইলেন। কিন্তু মেহতা কর্ণপাতও করলেন না। ভেলা বাঁধা হলে মেহতা সেটা জলে নামিয়ে মালতীকে বললেন, "এসো।"

মালতী সন্ত্রস্ত, "দুটো মানুষের ভার সইবে তো?"

"যে নৌকোয় বসে আমরা জীবনযাত্রায় বেরিয়েছি সে নৌকোতো এর চেয়েও ভঙ্গুর মালতী, ভয় পাচ্ছো?"

"তুমি যখন সঙ্গে আছো তখন ভয় কি?"

"সত্যি বলছো?"

"এতদিন আমি একাই সব বাধা জয় করেছি। আজ তুমি পাশে আছো।"

দুজনে ভেলায় ওঠেন। মেহতা একটা ঝাউয়ের ডালকে দাঁড় হিসেবে ব্যবহার করলেন। ভেলাটা টলমল করতে করতে এগোয়।

মালতী অন্যত্র মনটাকে সরাতে চেষ্টা করে বলেন, "তুমি তো সবসময় শহরে ছিলে। গ্রামের জীবনে অভ্যস্থ হলে কি করে? আমি তো এমন ভেলা কখনো বানাতে পারতাম না।"

"বোধহয় আমার গত জন্মের সংস্কার। প্রকৃতির সংস্পর্শে এলেই আমি যেন নবজীবন পাই। এই আনন্দ আমি কোথাও পাই না মালতী। পাখি যেমন নীড়ে ফিরে নিজেকে পায় তেমনি আমি যেন নিজেকে ফিরে পাই।"

"আর আমাকে তোমার কখনো মনে পড়ে না?"

মেহতা তাঁর হাত ধরে বললেন, "পড়ে মালতী, বারবার পড়ে। একঝলক সুগন্ধের মতো তুমি আমার জীবনে এসে দাঁড়াও আবার মিলিয়ে যাও। তোমাকে বাহুপাশে বাঁধবার জন্যে আমি হাত বাড়াই কিন্তু হাত খোলাই থাকে তুমি অধরা থেকে যাও।"

"তুমি কি বুঝতে চেষ্টা করেছো? কেন এমন হয়?"

"হ্যাঁ মালতী ভেবেছি, বারবার ভেবেছি।"

"ভেবে কি পেলে?"

"আমি যে ভিতের ওপর জীবনকে দাঁড় করাতে চাই. সে বড়ো অস্থির মালতী। কোন বিশাল প্রাসাদ গড়তে চাই না। শুধু একটা ছোট্ট শান্তির নীড় কিন্তু তার জন্যেও তো একটু শক্ত মাটি চাই।"

মালতী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, "মিথ্যে আক্ষেপ করছো। তুমি সবসময় আমাকে পরীক্ষকের চোখে দেখেছো, প্রেমিকের চোখ দিয়ে নয়। তুমি জানো না, নারী পরীক্ষা চায় না, প্রেম চায়। যাচাতে গেলে গুণকে নির্গুণ, সুন্দরকে অসুন্দর মনে হয়। প্রেম গুণহীনের মধ্যে গুণ দেখে, অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরকে। আমি তোমাকে ভালবেসেছি. আমি কল্পনাই করতে পারি না তোমার কোন দোষ আছে কিন্তু আমার পরীক্ষা নিয়ে আমায় অস্থির, চঞ্চল আরো কত কী ভেবে আমার কাছ থেকে দূরে সরে থেকেছো। না আমি যা বলতে চাই, শোনো। বাধা দিও না। আমি অস্থির কেন না আমি এখনও সেই প্রেমের সন্ধান পাইনি যা আমায় পরিপূর্ণ ও ধীরস্থির করতে পারে। যদি তুমি আত্মসমর্পন করতে তাহলে তোমার এই আক্ষেপ থাকতো না।"

মেহতা মালতীর অভিমানে খুশি হয়ে বললেন, "তুমি আমায় কখনো পরীক্ষা করোনি? সত্যি বলছো?"

"কক্‌খনো না।"

"তাহলে তুমি ভুল করছো।"

"আমি তা নিয়ে ভাবি না।"

"ভাবুকতা নিয়ে থেকো না মালতী। ভালোবাসার আগে আমরা সবাই পরীক্ষা করি আর তুমিও করেছো। তা সে যত অপ্রত্যক্ষভাবেই হোক। আমি আজ তোমায় স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, প্রথমদিকে আমি তোমাকে প্রতিদিনকার দেখা আর পাঁচজন মহিলাদের একজন বলেই মনে করতাম। শুধু একটু অবসর বিনোদনের জন্যে। আর যদি ভুল না করে থাকি তবে তুমিও আমাকে মনোরঞ্জনের একটা নতুন খেলনা ভাবতে।"

"ভুল বলছো। আমি তোমাকে কোনদিন এভাবে দেখিনি। আমি প্রথম দিন থেকেই তোমাকে দেবতা করে হৃদয় সিংহাসনে..."

মেহতা বাধা দিয়ে বললেন, "আবার সেই ভাবাবেগের কথা। এরকম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমি ভাবাবেগ পছন্দ করি না। যদি প্রথমদিন থেকেই আমাকে এইরকম দয়ার পাত্র বলে ভেবে থাকো তাহলে এর একটাই কারণ হতে পারে যে আমি তোমার চেয়ে চোখে পড়ার কৌশল বেশি জানি। নয়তো আমি যত মহিলা দেখি তারা প্রেমকে যাচাই করে নেয়। আগেও স্বয়ম্বর সভায় পুরুষের পরীক্ষা হতো। সেই মনোবৃত্তি এখনও আছে। আমি প্রথম থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তোমার সামনে তুলে ধরে তোমার মনের গহনে প্রবেশ করতে চাই। আর আমি যতই তোমার মনের গভীরে ডুব দিচ্ছি ততই ধনরত্নের সন্ধান পাচ্ছি। এসেছিলুম অবসর বিনোদনের জন্যে, হয়ে গেছি উপাসক। তুমি আমার মধ্যে কি পেয়েছো আমি জানি না।"

নদীর অপর তীর এসে গিয়েছে। দুজনে নেমে বালির ওপর বসে। মেহতা আগের কথার খেই ধরে বললেন, "আমি সে কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যেই তোমাকে এনেছি।"

মালতী কম্পিতস্বরে বললেন, "এখনো কি একথা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন আছে?"

"হ্যাঁ, কারণ আমি আজ তোমাকে আমার প্রকৃত রূপ দেখাবো, যাকে হয়তো এখনো তুমি দেখোনি আর আমিও গোপন করার চেষ্টা করেছি। আচ্ছা, ধরে নাও আমি তোমাকে বিয়ে করে কাল তোমার সঙ্গে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি, তুমি আমায় কি সাজা দেবে?"

মালতী তাঁর দিকে কৌতুহলী হয়ে তাকান। উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন না। বললেন, "একথা জিজ্ঞেস করছো কেন?"

"আমার কাছে একথা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই।"

"আমি এর সম্ভাবনা দেখছি না।"

"সংসারে, কিছুই অসম্ভব নয়। বড়ো বড়ো মহাত্মাও এক মুহূর্তে পতিত হতে পারে।"

"আমি তার কারণ খুঁজে তা দূর করবার চেষ্টা করবো।"

"ধরে নাও আমার স্বভাব বদলালো না।"

"আমি বলতে পারছি না কি করবো। হয়তো বিষ খেয়ে মরবো।"

"কিন্তু তুমি যদি আমায় প্রশ্ন করো তাহলে আমি অন্য জবাব দেব।"

"কি বলবে?"

"আমি আগে তোমাকে শেষ করবো। তারপর নিজেকে।"

মালতীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। তিনি অট্টহাস্য করে ওঠেন। তাঁর হাসি অবশ্য শিহরণকে চাপা দেবার জন্যে।

মেহতা বললেন, "তুমি হাসলে কেন?"

"তোমাকে এত হিংস্র বলে তো মনে হয় না।"

"না মালতী, এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ পশু আর সেজন্যে লজ্জিত হবার কোন কারণ দেখি না। নিঃস্বার্থ প্রেম আমার কাছে অর্থহীন বলে মনে হয়। আমি বইয়ে এসব প্রেমের গল্প পড়েছি, যাতে প্রেমিক প্রেমিকার জন্যে আত্মাহুতি দেয়। কিন্তু ঐ ভাবনাকে আমি শ্রদ্ধা করতে পারি, ভালোবাসতে পারিনে। প্রেম সাদাসিধে গরু নয়, হিংস্র ভয়ংকর বাঘ! যে নিজের শিকারের ওপর কারুর চোখ পড়তে দেয় না।"

"প্রেম যদি হিংস্র বাঘ হয় তো আমি তার কাছ থেকে দূরেই থাকবো। আমি তো তাকে নিরীহ গরু ভেবেছিলাম। আমি প্রেমকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে মনে করি। প্রেম দেহের কেউ নয়, তার স্থান অন্তরে। সন্দেহ সেখানে ঠাঁই পায় না। হিংসা তো সন্দেহেরই পরিণাম। প্রেম সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন। তার মন্দিরে তুমি পরীক্ষক হয়ে নয়, উপাসক হয়েই প্রবেশ করতে পারো।"

মালতী উঠে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে ফিরে যান, তিনি যেন হারানো পথ

খ্রুজে পেয়েছেন। এত স্ফ্রর্তি তিনি কোনদিন অন্রভব করেননি। তাঁর অব-চেতন মন একটা আশ্রয় খ্রুজছিল যার সাহায্যে তিনি সংসারের সামনে দাঁড়াতে পারেন। তাঁর নিজের মধ্যে সে শক্তি ছিল না। মেহতার ব্রদ্ধি ও চারিত্রিক দ্ঢ়তা দেখে তিনি ম্রগ্ধ হয়েছিলেন।

এখনও তাঁর মনোব্ত্তি অনেকটা ছাত্রীস্রলভ। তাঁর প্রথম লক্ষ্য পরীক্ষায় পাশ। তিনি যা কিছ্র করেন সবই মেহতাকে প্রসন্ন করার জন্যে। তাঁর ইচ্ছে মেহতার প্রেম ও বিশ্বাস অর্জন করে তাঁর মনোরাজ্যের রানী হওয়া। তাই তিনি ছাত্রীর মতোই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে ব্যস্ত। কিন্তু মেহতা আজ আঘাত করে তাঁর আত্মশক্তিকে জাগিয়ে দিলেন। মালতী মেহতাকে প্রথম দেখেই ম্রগ্ধ হয়েছিলেন। নিজের পরিচিতদের মধ্যে মেহতাকেই সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। যে প্রেরণার অভাব তাঁর জীবনে ছিল তা তিনি পেয়েছেন। এখন মেহতার আরো কাছে গিয়ে সফল হবার স্বপ্ন দেখছিলেন। হঠাৎ মেহতা তাঁকে আশার দরজায় নিয়ে গিয়ে প্রেমের যে আদর্শ চিত্র দিখালেন তা যেন মালতীকে আত্মা ও সমর্পনের স্বর্গ থেকে ধ্রলোমাটির প্থিবীতে নামিয়ে দিল। ঈর্ষা ও ভোগের রাজ্যে তাঁর উন্নত র্রচি আহত হলো। মেহতার ওপর যে শ্রদ্ধা ছিল তাতেও চিড় ধরলো, যেন শিষ্য তার গ্ররুকে একটা নিষিদ্ধ কাজ করতে দেখে ফেলেছে। মালতী দেখলেন, মেহতার ব্রদ্ধি প্রেমের পশ্র-ভাবের দিকে ধাবিত হচ্ছে আর তাঁর মহত্বের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এসব দেখে মালতী দমে গেলেন। মেহতা একট্র লজ্জিত হয়ে বললেন, "এসো একট্র বসি।"

"না, এবার ফেরা উচিত দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

৩১

রায়সাহেবের সময় ভালো যাচ্ছিল। তাঁর তিনটি ইচ্ছেই প্র্ণ হয়েছে। মেয়ের বিয়ে ধ্রমধামের সঙ্গে হয়ে গেছে, মোকর্দমায় জিতেছেন আর ইলেক-শনে শ্রধ্র জয় হয়নি তাঁকে হোমমেম্বার করে নেওয়া হয়েছে। চারদিক থেকে শ্রধ্র প্রশংসা আর ধন্যবাদ! টেলিগ্রামের ছড়াছড়ি। এই মামলায় জিতে তিনি প্রথম শ্রেণীর তাল্রকদারদের একজন হলেন। কাগজে তাঁর ছবি ও জীবনী বের্রচ্ছে। অনেক ধার হয়ে গেছে। কিন্তু এখন আর ভাবনা নেই। নতুন সম্পত্তির ছোট্ট একটা ট্রকরো বেচেই তিনি ঋণম্রক্ত হতে পারেন। তাঁর কল্পনায় স্বর্গস্রখ বলতে যা ছিল, বাস্তব তাকেও ছাড়িয়ে গেল। এতদিন শ্রধ্র লক্ষ্ণৌ-এ তাঁর বাংলো ছিল এখন নৈনিতাল, মসৌরী ও সিমলাতেও এক একটা বাংলো তৈরি করার প্রয়োজন দেখা দিল। স্র্যপ্রতাপ সিংএর এসব জায়গায় বাংলো আছে, আর তাঁর থাকবে না? সৌভাগ্যক্রমে তিনটি তৈরি বাংলোও সস্তায় পাওয়া গেল। সর্বত্র মালী, চৌকিদার গোমস্তা খানসামাও রাখা হলো। সোনায় সোহাগা হলো, যখন 'হিজ ম্যাজেষ্টি'র জন্মদিনে তিনি রাজা উপাধিও পেয়ে গেলেন। এই ত জীবন!

কিন্তু রায়সাহেবের জীবনে সবচেয়ে বড়ো জিৎ হলো সেদিন, যেদিন পরাজিত সূর্যপ্রতাপ সিং নিজের মেয়ের সঙ্গে রায়সাহেবের ছেলে রুদ্রপাল সিংয়ের বিয়ের প্রস্তাব করলেন। রায়সাহেব মামলায় জিতেও এত খুশি হননি, ইলেকশনে জিতেও না। সে সব তাঁর কল্পনায় ছিল, এ যে আশাতীত, কল্পনারও অতীত! সেই সূর্যপ্রতাপ সিং, যিনি মাসকয়েক আগে তাঁকে কুকুরের অধম ভাবতেন, তিনি আজ তাঁর ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে চান? কী তাজ্জব ব্যাপার! রুদ্রপাল এখন এম এ পড়ছে, নির্ভীক আদর্শবাদী, আত্মবিশ্বাসী, অভিমানী, রসিক ও অলস যুবক। বাবার ধন ও মানলিপ্সা তার ভালো লাগে না।

রায়সাহেব এ সময় নৈনিতালে ছিলেন। এ খবর পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। যদিও বিয়ের ব্যাপারে তিনি ছেলের ওপর জোর খাটাতে চান না তবে তাঁর বিশ্বাস এ ব্যাপারে তাঁর মনোনয়নই চূড়ান্ত। রাজা সূর্যপ্রতাপ সিংয়ের সঙ্গে আত্মীয়তার সৌভাগ্য কল্পনা করে তিনি রুদ্রপালের মত নেবার কথাও ভুলে গেলেন। তৎক্ষণাৎ রাজাসাহেবকে পাকা কথা দিয়ে তিনি রুদ্রপালকে ফোন করলেন।

রুদ্রপাল উত্তর দিল, "আমি এ বিয়ে করবো না।"

রায়সাহেব জীবনে এত হতাশ হননি, চটেনওনি। বললেন, "কেন?"

"সময় এলে সব জানতে পারবেন।"

"আমি এখনই জানতে চাই।"

"আমি বলতে চাই না।"

"তোমাকে আমার হুকুম শুনতে হবে।"

"যে কথায় আমার মন সায় দেয় না তা আমি আপনার হুকুমে স্বীকার করবো না।"

রায়সাহেব নরম হয়ে বোঝালেন, "বাবা, তুমি আদর্শের জন্যে নিজের পায়ে কুড়ুল মারছো। এই সম্বন্ধের ফলে সমাজে তোমার মাথা কত উঁচু হবে সেটা ভেবেছো। একে ভগবানের আশীর্বাদ মনে করো। ঐ বংশের কোন গরীব মেয়েকে পেলেও আমি ধন্য মনে করতাম। আর এতো রাজা সূর্যপ্রতাপ সিংয়ের মেয়ে। আমাদের মাথার মুকুট। আমি তাকে রোজ দেখি। তুমিও হয়তো দেখেছো। রূপে, গুণে, স্বভাবে এমন মেয়ে আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। আমার তো দিন শেষ হয়ে এলো। তোমার সামনে সারাজীবন পড়ে আছে। আমি তোমার ওপর কোন জোর খাটাতে চাই না। তুমি তো জানো বিয়ের ব্যাপারে আমার দৃষ্টি কত উদার। কিন্তু তোমাকে ভুল করতে দেখলে শুধরে দেওয়াই আমার কর্তব্য।"

"আমি এ ব্যাপারে অনেক আগেই স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তার কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়।"

ছেলের দৃঢ়তায় রায়সাহেব ক্রুদ্ধ হলেন। গর্জে উঠে বললেন, "মনে হচ্ছে

তোমার মাথা ঘুরে গেছে। এখনি আমার সঙ্গে এসে দেখা করো। আমি রাজা-সাহেবকে কথা দিয়েছি।”

“দুঃখিত আমার এখন সময় নেই।”

পরদিন রায়সাহেব নিজেই এলেন। দুজনেই নিজের নিজের অস্ত্রে সুসজ্জিত। একদিকে সমগ্র জীবন উপভোক্তা বুদ্ধিমান ব্যক্তি অপরদিকে উগ্র আদর্শবাদী যুবক। রায়সাহেব এসেই মর্মভেদী প্রশ্ন নিক্ষেপ করলেন, “আমি জানতে চাই মেয়েটি কে?”

“আপনি যদি অত্যন্ত উৎসুক হয়ে থাকেন তাহলে শুনুন। সে হচ্ছে মালতীদেবীর ছোট বোন সরোজ।”

রায়সাহেব আহত হয়ে বললেন, “আচ্ছা, সে।”

“আপনি সরোজকে দেখে থাকবেন।”

“খুব দেখেছি। তুমিও রাজকুমারীকে দেখেছো তো, না দেখনি?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখেছি।”

“তবুও...”

“আমি রূপকে কোন মূল্যবান বস্তু মনে করি না।”

“তোমার বুদ্ধি দেখে আফসোস হচ্ছে। মালতীকে জানো তো। কি রকম মেয়েছেলে? তার বোন কি অন্যরকম হবে?”

রুদ্রপাল উগ্রভাবে বলে, “আমি এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আর কিছু বলতে চাই না। আমার বিয়ে হলে সরোজের সঙ্গেই হবে।”

“আমি বেঁচে থাকতে কক্‌খনো হবে না।”

“তাহলে আপনার মৃত্যুর পরে হবে।”

“এই তাহলে তোমার ইচ্ছে?”

রায়সাহেবের চোখ সজল হয়ে ওঠে। মন্ত্রীত্ব, জমিদারী, খেতাব সবই যেন বাসীফুলের মতো নীরস হয়ে গেল। সবই ব্যর্থ! স্ত্রীর মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছত্রিশ। আবার বিয়ে করতে পারতেন ভোগবিলাসে ডুবে আনন্দে কাটাতে পারতেন কিন্তু ছেলে মেয়ের মুখ চেয়ে তিনি তা করেননি। এদের জন্যেই সব সুখের পানপাত্র তিনি ত্যাগ করেছিলেন আর সেই ছেলে কী নিষ্ঠুরের মতো ব্যবহার করছে। তিনি যেন কেউ নন। তাহলে তিনি জমিদারী আর সম্পত্তি রক্ষার জন্যে প্রাণপাত করতে গেলেন কেন? অন্যদের মতো গোঁফে তা দিয়ে ভোগবিলাস করাই তো ভালো। তাঁর মনে পড়লো না এসময় তিনি যে সাধনা করছেন তা ছেলের জন্যে নয়, নিজের জন্যে। কেবল যশের জন্যে নয়, কর্মঠ হয় বেঁচে থাকার জন্যেই কাজ করতে হয়। বিলাসী অকর্মন্য হয়ে ডুবে থাকা তাঁর স্বভাবে নেই। নিজের কাজ করার জন্যেই তিনি জন্মেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাই করবেন।

কিন্তু এই চোটের প্রতিক্রিয়া তক্ষুণি হলো। আমরা যাদের জন্যে ত্যাগ করি তার কাছে কিছু আশা না করেও তাকে বশে রাখতে চাই। ভালোর জন্যেই অবশ্য তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভালোর মাত্রা তার দিকে না ঝুঁকে নিজের দিকেই

ঝোঁকে। শাসন করবার ইচ্ছেও বেড়ে প্রতিহিংসার রূপ নেয়। রায়সাহেব স্থির করলেন রুদ্রপালের সঙ্গে সরোজের বিয়ে কিছুতেই হতে দেবেন না তা সে পুলিশ ডাকতেই হোক, আর নীতি আদর্শকে হত্যা করেই হোক। বললেন, "হ্যাঁ আমি মরবার পরে হবে। আর তার এখনও অনেক দেরি।"

"ভগবান করুন আপনি অমর হয়ে থাকুন। সরোজের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে।"

"মিথ্যেকথা!"

"কক্‌খনো না, প্রমাণপত্র মজুৎ রয়েছে।"

রায়সাহেব আহত হয়ে তার দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকালেন। লোকে এমন-ভাবে তার শত্রুর দিকেও তাকায় না। শত্রুর আঘাত বাইরে লাগে, এ আঘাত তাঁর মর্মভেদ করেছে। এখন তিনি সবদিক থেকে পঙ্গু। পুলিশের সমস্ত শক্তি তার হাতে থাকলেও তাঁর উপায় নেই। বলপ্রয়োগই ছিল তাঁর শেষ অস্ত্র। সেও হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। রুদ্রপাল সাবালক, সরোজ সাবালিকা। রুদ্রপাল নিজের সম্পত্তির মালিক। তার কোন জোর খাটবে না। আঃ আগে জানলে কি এই ছোঁড়ার সম্পত্তির জন্যে তিনি লড়তেন? মোকর্দমার জন্যে তাঁর দু আড়াই লাখ টাকা খরচ হয়ে গেল। এখন মুখ রক্ষার জন্যে এই ছোঁড়ারই খোশামোদ করতে হবে। না হলেই তাঁর মানইজ্জত ধুলোয় লুটোবে। ওহ, সারা জীবন নষ্ট হয়ে গেল। সারা জীবন!

রুদ্রপাল চলে গিয়েছিল। রায়সাহেব গাড়ি বার করে মেহতার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। মেহতা ইচ্ছে করলে মালতীকে বোঝাতে পারেন। সরোজও তাঁকে অমান্য করবে না। যদি দশ-বিশ হাজার টাকা দিয়েও এ বিয়ে বন্ধ করা যায় তাতেও তিনি রাজী। নিজের স্বার্থচিন্তায় তিনি ভুলেই গেলেন যে, যার কাছে তিনি এ প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছেন সেই মেহতার এসব ব্যাপারে সহানুভূতি থাকার সম্ভাবনা কম। মেহতা সব শুনে তাঁকে জ্বালাতে শুরু করলেন. "এ যে আপনার মানসম্মানের প্রশ্ন।"

রায়সাহেব চাপতে পারলেন না। বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, শুধু মানসম্মানের প্রশ্ন। রাজা সূর্যপ্রতাপ সিংকে তো আপনি জানেন।"

"আমি তাঁর মেয়েকেও দেখেছি। সরোজ তার পায়ের ধুলোর যোগ্য নয়।"

"কিন্তু এ ছোঁড়ার বুদ্ধি গেছে 'অক্‌ল পর পত্থর পড় গয়া হ্যায়' *।"

"তাহলে গুলি মারুন। আপনি কি করবেন, ওই পস্তাবে।"

"ওহ! এতো দেখা যায় না মিস্টার মেহতা। হাতে পাওয়া সম্মান ছাড়া যায় না। আমি এই সম্মানের জন্যে অর্ধেক জমিদারী পর্যন্ত কোরবানি করতে পারি। আপনি মালতী দেবীকে বুঝিয়ে বলেন তো কাজ হয়ে যাবে। এদিক থেকে আপত্তি হলে রুদ্রপাল মাথা চাপড়াবে। পাঁচ দশদিনে তার নেশা আপনিই ছেড়ে যাবে। এ প্রেম ট্রেম কিস্‌সু নয়, পাগলামী।"

* অকল্‌ পর পত্থর পড় গয়া হ্যায়=বুদ্ধির গোড়ায় পাথর পড়ে গেছে

"কিন্তু মালতী কিছু ঘুষ না নিয়ে তো শুনবে না।"

"আপনি যা বলবেন, আমি তাকে তাই দেব। সে যদি চায় তো তাকে আমি এখানকার ডাফরিন হাসপাতালের ইনচার্জ করে দেব।"

"আচ্ছা ধরুন সে যদি আপনাকেই চেয়ে বসে, আপনি রাজী হবেন? যখন থেকে আপনি মিনিষ্ট্রী পেয়েছেন তখন থেকে আপনার বিষয়ে তার রায় নিশ্চয় বদলে গিয়েছে।"

রায়সাহেব মেহতার দিকে ভালোভাবে তাকাতে মেহতার মুখে হাসির রেখা দেখতে পেলেন। ব্যথিত স্বরে বললেন, "এইসময়ে আপনারও আমাকে নিয়ে মজা করবার ইচ্ছে হলো। আমি আপনার কাছে এসেছিলাম আপনি আমার দুঃখ বুঝবেন, সুপরামর্শ দেবেন বলে। আর আপনি আমায় নিয়ে ঠাট্টা করছেন? এই জন্যেই বলে, 'জিসকে দাঁত নহী দুখে ওয়হ দাঁতোঁ কা দর্দ কেয়া জানে'!*"

মেহতা গম্ভীর হয়ে বললেন, "মাফ করবেন। আপনি এমন ব্যাপার নিয়ে এসেছেন যা নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা করা হাস্যকর ব্যাপার ভেবেছিলাম। আপনি নিজের বিয়ের দায়িত্ব নিতে পারেন। ছেলের বিয়ের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিচ্ছেন কেন? বিশেষ করে আপনার ছেলে যখন সাবালক এবং নিজের লাভ লোকসান সম্বন্ধে সচেতন। আমি বিয়ে-শাদীর মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মানসম্মানকে টানতে রাজী নই। প্রতিষ্ঠা যদি ধন থেকে আসতো তাহলে রাজা-সাহেব সেই নাঙা ফকিরের সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা গোলামের মতো দাঁড়িয়ে থাকতেন না। সত্যি কি না জানি না, শুনেছি রাজাসাহেব নিজের এলাকার দারোগাকেও সেলাম করেন। একে আপনি প্রতিষ্ঠা বলেন? লক্ষ্ণৌএর যে কোন দোকানদার, অফিসার কিংবা পথিককে জিজ্ঞেস করে দেখবেন সবাই তাঁর নাম শুনে গাল দেবে। একে আপনি প্রতিষ্ঠা বলেন? বাড়ি গিয়ে আরাম করুন। সরোজের মতো ভালো পুত্রবধূ অনেক কষ্টেই পাওয়া যায়।"

রায়সাহেব আপত্তি জানিয়ে বললেন, "মালতীরই বোন তো।"

মেহতা গরম হয়ে বললেন, "মালতীর বোন হওয়া কি অপরাধ? মালতীকে আপনি জানেন না, জানার চেষ্টাও করেননি। আমিও তাই ভেবেছিলাম কিন্তু এখন বুঝেছি সে আগুনে পোড়া ধাতুর মতোই ঝকঝকে। কিছু কিছু বীর আছে যারা সময় এলে বীরত্ব দেখায় কিন্তু অকারণে সবসময় তলোয়ার ঘোরায় না, মালতী তাদেরই একজন। আপনি জানেন না, খান্নার কি দশা হয়েছে।"

রায়সাহেব সহানুভূতিসূচক মাথা নেড়ে বললেন, "শুনেছি। বারবার দেখা করবো ভেবেছি, সময় পাইনি। মিলে আগুন লেগেই ওঁর সর্বনাশ হলো।"

"হ্যাঁ, এখন উনি বন্ধুদের দয়াতেই একরকম বেঁচে আছেন। তার ওপর কামিনী মাসখানেক হলো অসুস্থ। তিনি খান্নার জন্যে নিজেকে শেষ করে

* জিসকে দাঁত নহী দুখে ওয়হ দাঁতোঁ কা দর্দ কেয়া জানে=যার দাঁত নেই সে দাঁতের ব্যথার মর্ম বুঝবে কী

দিয়েছেন। মালতী রাতের পর রাত তাঁর মাথার কাছে বসে রয়েছে—সেই মালতী যে কোন রাজা উজীরের কাছ থেকে পাঁচ শো টাকা ফীজ পেয়েও রাত-ভোর কোথাও বসে থাকেনি। খান্নার ছোট বাচ্চাটার দেখাশোনাও মালতীই করে। তার মধ্যে এই মাতৃত্ব কোথায় লুকিয়েছিল কে জানে? আমি তো মালতীকে দেখে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছি। তার অন্তরের নির্মলতার সঙ্গে মুখেও দেবত্বের আভাস দেখতে পাই। যদিও আপনি জানেন আমি ঘোর জড়বাদী। আপনি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চান তো বলুন এই ছুতোয় আমিও একবার যাই।"

রায়সাহেব সন্দিগ্ধ সুরে বললেন, "যখন আপনিই আমার দুঃখ বুঝলেন না তখন মালতী কি বুঝবে? মিথ্যে লজ্জা দেবে। কিন্তু তাঁর কাছে যেতে আপনার ছুতোর দরকার হবে কেন? আমি তো ভেবেছিলাম আপনিই তাকে জাদু করেছেন।"

মেহতা হেসে বললেন, "এখন সে কথা স্বপ্ন হয়ে গেছে। ওঁর দেখাই পাই না। উনিও সময় পান না। দু-চারবার গিয়েওছি কিন্তু বুঝতে পারি দেখা হলেও উনি খুশি হন না। তখন থেকে যেতে লজ্জা পাই। আরে, হ্যাঁ আজকে মহিলা ব্যায়ামশালার জলসা আছে, আপনি যাবেন?"

রায়সাহেব একটুও আগ্রহ না দেখিয়ে বললেন, "না। আমার সময় নেই। রাজাসাহেবকে যে কি জবাব দেব? আমি তাঁকে কথা দিয়ে ফেলেছি।" বলতে বলতে তিনি উঠে পড়েন। যে জট খুলতে এসেছিলেন তা আরো জটিল হয়ে চেপে বসে।

রায়সাহেব নিজের বাংলোয় ফিরে দৈনিকপত্রটা হাতে নিতে না নিতেই মিস্টার তংখার কার্ড পেলেন। তংখাকে তিনি ঘৃণা করতেন আর কোনদিন তাঁর মুখ দেখার ইচ্ছেও ছিল না। কিন্তু দুর্বল মন সমব্যথী খোঁজে। সে আর কিছু না করুক একটু মৌখিক সহানুভূতি তো দেখাবে। তাই ডেকে পাঠালেন।

তংখা পা টিপে টিপে কাঁচু-মাচু মুখে এসে মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম করে বললেন, "হুজুরের দর্শন পাবার জন্যে আমি তো নৈনিতাল যাচ্ছিলাম। কপাল ভালো, এখানেই দেখা হয়ে গেল। হুজুরের মেজাজ ভালো তো!" এরপর তিনি সাজানো-গোছানো ভাষায় নিজের আগেকার ব্যবহার সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে রায়সাহেবের যশোগান শুরু করলেন, "যেদিকে তাকাই দেখি হুজুরেরই চর্চা হচ্ছে। এ পদে হুজুরকেই মানায়।"

রায়সাহেব ভাবছিলেন এ লোকটা কত বড়ো ধূর্ত, গরজ পড়লে গাধাকে দাদা বলে, এক নম্বরের বেইমান আর নির্লজ্জ। কিন্তু তংখার ওপরে তাঁর রাগ না হয়ে দয়া হলো। বললেন, "আজকাল আপনি কি করছেন?"

"কিচ্ছু না হুজুর, বেকার বসে আছি। এই আশায় আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। নিজের পুরণো চাকরদের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করুন। আজকাল বড়ো বিপদে পড়েছি হুজুর। রাজা সূর্যপ্রতাপ সিংকে তো আপনি জানেন।

নিজের সমান কাউকে মনে করেন না। একদিন আপনার নিন্দে করতে বসলেন। আমি শুনতে পারলাম না। বললাম, এবার থামুন মহারাজ, রায়সাহেব আমার প্রভু, আমি আর তাঁর নিন্দে শুনতে পারছি না। ব্যস এই কথায় তিনি আমার ওপর রেগে গেলেন। আমিও তাঁকে সেলাম করে ঘরে চলে এলাম। সাফ-সাফ বলে দিয়েছি, আপনি যতই ঠাটবাট দেখান না কেন রায়সাহেবের যে সম্মান সে আপনার ভাগ্যে কোনদিনই জুটবে না। মানইজ্জত ঠাট থেকে আসে না, আসে প্রতিভা থেকে। আপনার মধ্যে যে প্রতিভা আছে সে তো দুনিয়া জানে।"

রায়সাহেব অভিনয় করলেন, "আপনি তো সোজা ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলেন।"

তংখা বাহাদুরি করে বললেন, "আমি তো হুজুর পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, সে কারুর ভালো লাগুক আর না লাগুক। যখন হুজুরের পা ধরে পড়ে আছি তখন ভয় কি? হুজুরের নাম শুনলেই তো জ্বলে ওঠেন। যখন দেখুন, শুধু হুজুরের নিন্দে। যখন থেকে আপনি মিনিস্টার হয়েছেন তখন থেকে ওঁর বুকে যেন সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার সমস্ত পরিশ্রম জলে গেল। দিতে তো জানেন না। প্রজাদের ওপর এত অত্যাচার করেন, বলার কথা নয়। কারুর আবরু আড়াল রইল না। দিনদুপুরে মেয়েদের..."

একটা গাড়ির শব্দ। রাজা সূর্যপ্রতাপ সিং নামলেন। রায়সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁকে সমাদর করে নিয়ে এলেন। নম্রসুরে বললেন, "আমিই তো আপনার কাছে যাচ্ছিলাম।" এই প্রথম রাজা সূর্যপ্রতাপ সিং এই বাড়িতে পদার্পণ করলেন। কী সৌভাগ্য!

মিস্টার তংখা ভিজে বেড়ালের মতো বসেছিলেন। রাজাসাহেব এখানে! দুজনের বধুত্ব হয়ে গেল নাকি? তিনি যে রায়সাহেবের ঈর্ষাগ্নিতে ইন্ধন যুগিয়ে নিজের হাত সেঁকতে চাইছিলেন।

রাজাসাহেব সিগার জ্বালিয়ে তংখার দিকে কঠোর নেত্রে চেয়ে বললেন, "তুমি তো মুখই দেখালে না তংখাজী। আমার কাছ থেকে সেই পার্টির সমস্ত টাকা উসুল করে নিলে অথচ হোটেলওয়ালাকে পাই-পয়সাও দিলে না। সেতো আমার মাথা খেয়ে ফেলছে। এতো বিশ্বাসঘাতকতা। ইচ্ছে করলে আমি এখনই তোমায় পুলিশে দিতে পারি।"

একথা বলতে বলতে তিনি রায়সাহেবকে সম্বোধন করে বললেন, "এমন বেইমান আমি দুটি দেখিনি রায়সাহেব। আমি সত্যি বলছি, আমি কখনো আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াতাম না কিন্তু এই শয়তান আমাকে সমানে তাতিয়েছে আর আমার লাখ টাকা উড়িয়ে দিয়েছে। বাংলো কিনেছে, গাড়ি কিনেছে। একটা বেশ্যার সঙ্গে আশনাই করেছে। পুরো বড়োলোক হয়ে এখন দাগা দিচ্ছে। বড়োলোকী দেখাবার জন্যে এখন জমিদারী চাই, আপনার জমিদারী দেখিয়ে এখন বন্ধুদের চোখে ধুলো দেবে।"

রায়সাহেব তংখার দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি চুপ করে আছেন কেন মিস্টার তংখা? কিছু বলুন। রাজাসাহেব তো আপনার সমস্ত পারিশ্রমিক

মেরে দিয়েছেন। এর কোন জবাব আছে আপনার কাছে? এখন কৃপা করে এখান থেকে চলে যান আর খবরদার, ফের নিজের মুখ দেখাবেন না। দুটো ভালোমানুষের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে নিজের কাজ হাসিল করাই হলো বিনা পুঁজিতে ব্যবসা করা; কিন্তু তার লাভ লোকসান দুই-ই প্রাণান্তকর হয়।"

তংখা মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে চলে গেলেন। ঠিক যেমন করে রাস্তার কুকুর কোন বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে মালিকের তাড়া খেয়ে পালিয়ে যায়। তংখা চলে গেলে রাজাসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "আমার খুব নিন্দে করছিল বোধ-হয়।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও খুব তাতিয়েছি।"

"শয়তান।"

"বাপ-বেটার ঝগড়া করায়, মিয়া-বিবির লড়াই করায়। এসব ব্যাপারে ওস্তাদ। যাক, আজ বাছার ভালো সাজা মিলেছে।"

"পুরো।"

এরপর রুদ্রপালের বিয়ের কথা শুরু হলো। রায়সাহেবের বুক শুকিয়ে যাচ্ছিল। কি করে তিনি বলবেন রুদ্রপালের ওপর তাঁর জোর খাটবে না। কিন্তু রাজাসাহেব সে কথা জেনে গিয়েছিলেন। রায়সাহেবকে কিছুই বলতে হলো না। তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপনি এ খবর পেলেন কি করে?"

"একটু আগে রুদ্রপাল আমার মেয়ের নামে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল। সে আমাকে দিয়েছে।"

"আজকালকার ছেলেদের মধ্যে আর কোন গুণ না থাক স্পষ্ট কথা বলার পাগলামী আছে।"

"পাগলামী তো বটেই। তবে এর ওষুধও আমার কাছে আছে। আমি ঐ ছুঁড়িকে এমন গায়েব করে দেব যে কেউ কোন খোঁজই পাবে না। পাঁচ দশ-দিনেই এ পাগলামী ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বুঝিয়ে কোন লাভ হবে না।"

রায়সাহেব কেঁপে উঠলেন। তাঁর মনেও এই ধরণের কথা ঘোরাফেরা কর-ছিল কিন্তু তিনি তাকে কোন রূপ দিতে চাননি। সংস্কার দুজনেরই সমান। গুহাবাসী মানব দুজনের মধ্যেই বেঁচে আছে। রায়সাহেব তার ওপর বস্ত্রাবরণ দিয়েছেন রাজাসাহেবের মধ্যে সে নগ্নরূপেই রয়েছে। নিজের মহত্ত্ব জাহির করার সুযোগ রায়সাহেব ছাড়তে পারলেন না। একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, "কিন্তু এটা বিংশ শতাব্দী, দ্বাদশ নয়। রুদ্রপালের ওপর এর প্রতিক্রিয়া কি হবে, আমি বলতে পারি না। মানবতার দৃষ্টিতে..."

রাজাসাহেব কথা কেটে বললেন, "আপনি মানবতা নিয়ে ঘুরছেন আর দেখতে পাচ্ছেন না সংসারে আজও মানুষের পশুশক্তিই মানবতার ওপর জয়ী হয়। নাহলে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে লড়াই হবে কেন? পঞ্চায়েতে মামলা মিটে যায় না কেন? যতদিন মানুষ থাকবে, পশুশক্তিও থাকবে।"

ছোটখাটো বচসা বিতণ্ডায় পরিণত হয়। রাজাসাহেব নারাজ হয়ে ফিরে যান। পরের দিন রায়সাহেবও নৈনিতালে চলে গেলেন। তার একদিন পরে

রুদ্রপালও সরোজকে নিয়ে ইংলণ্ডের পথে পাড়ি দেয়। এখন আর তার সঙ্গে রায়সাহেবের পিতাপুত্রের সম্পর্ক নেই। মিস্টার তংখা এখন রুদ্রপালের পরামর্শদাতা এবং মোসাহেব হয়েছেন। তিনি রুদ্রপালের পক্ষ থেকে রায়সাহেবের কাছে জমিদারীর হিসেব চেয়ে পাঠালেন। রায়সাহেবের ওপর দশলাখের ডিক্রী জারি হয়ে গেল। এজন্যে রায়সাহেব যত না দুঃখ পেলেন অপমানিত হলেন তার চেয়ে অনকে বেশি। দাগা দিলো কিনা তাঁরই ছেলে। অনুগত পুত্রের পিতা হবার গৌরব-বঞ্চিত হলেন।

কিন্তু এখনো বোধহয় তাঁর দুঃখের পেয়ালা পূর্ণ হয়নি। যেটুকু বাকি ছিল সেটুকু তাঁর মেয়ে-জামাইয়ের সম্পর্কচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ হয়ে গেল। সাধারণ হিন্দু মেয়েদের মতো মীনাক্ষীও মৌনভাবে বাবার পছন্দ করা পাত্রের গলায় মালা দিয়ে স্বামীর ঘর করতে গিয়েছিল কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে উঠলো না। দিগ্বিজয় সিং যেমন বিলাসী তেমনি মদ্যপ। মীণাক্ষী ভেতর ভেতর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, বইপত্র পড়ে সময় কাটায়। দিগ্বিজয়ের বয়স তিরিশের বেশি নয়, লেখাপড়াও শিখেছে। কিন্তু কুলমর্যাদার বড়াই খুব বেশি। শুধু কি অহংকারী? যেমন নিষ্ঠুর তেমনি কৃপণ। গ্রামের ছোট জাতের বৌ-ঝিদের পেছন পেছন ঘুরতো। সঙ্গীরাও ছিল নিম্নমানের, তারা খোশামোদ করে করে তাকে আরোই চাটুপ্রিয় করে তুলেছিল। মীনাক্ষী এমন স্বামীকে মনে মনে শ্রদ্ধা করতে পারতো না। তার ওপর পত্র পত্রিকায় মেয়েদের অধিকারের কথা পড়ে তার চোখ খুলে যাচ্ছিল। সে মেয়েদের ক্লাবে যাতায়াত শুরু করলো। সেখানে বহু শিক্ষিত ও ধনী পরিবারের মেয়েরা আসতেন। তাঁরা ভোট, অধিকার, স্বাধীনতা আর নারীজাগরণ নিয়ে আলোচনা করতেন। দেখে মনে হতো পুরুষদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলেছে। অধিকাংশ মহিলারই স্বামীর সঙ্গে পটতো না। নতুন শিক্ষা দিয়ে পুরনো ব্যবস্থাকে বিচার করতো। কয়েকজন যুবতী ডিগ্রী নিয়ে বিবাহিত জীবনকে আত্মসম্মানের পরিপন্থী ভেবে চাকরী খুঁজছিল। এঁদের একজন হলেন মিস সুলতান, তিনি বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এসেছেন, এদেশের পর্দানশীন মেয়েদের আইনের পরামর্শ দেবার ব্যবসা করেন। তাঁর পরামর্শে মীনাক্ষী স্বামীর কাছে খোরপোষ দাবি করলো। সে স্বামীগৃহে থাকতে চায় না। অবশ্য মীনাক্ষীর খোরপোষের প্রয়োজন ছিল না। বাপের বাড়িতে সে আরামেই থাকতে পারতো কিন্তু সে দিগ্বিজয় সিংয়ের মুখে চুণকালি লাগিয়ে চলে যেতে চাইছিল। দিগ্বিজয় উল্টে মীনাক্ষীর বিরুদ্ধে চরিত্রহীনতার অভিযোগ আনলো। রায়সাহেব মিটমাট করার বহু চেষ্টা করলেও মীনাক্ষী স্বামীর মুখ দেখতেও রাজী হলো না। যদিও দিগ্বিজয় সিংয়ের অভিযোগ টিকলো না এবং মীনাক্ষীর খোরপোষের দাবি স্বীকৃত হলো তবু এই অপমান মীনাক্ষীর বুকে কাঁটার মতো বিঁধে রইলো। সে আলাদা একটা বাড়িতে থাকে আর সমষ্টিবাদী আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা নিতে শুরু করে। কিন্তু জ্বালা নেভে না।

শেষে একদিন মীনাক্ষী ক্রোধে হান্টার নিয়ে দিগ্বিজয়সিংয়ের বাংলোর

দিকে রওনা হয়। লম্পটদের মজলিশে তখন বাঈজীর নাচ হচ্ছে। সে রণচণ্ডীর মতো সেই পিশাচের জলসায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। হান্টার খেয়ে যে যেদিকে পারলো ছুটলো। তার জেদের কাছে লম্পট-মাতালেরা দাঁড়াবে কি? যখন দিগ্বিজয় সিং একলা পড়ে রইলো তখন মীনাক্ষী তাকে বেদম হান্টার পেটা করলো। বেশ্যাটি এতক্ষণ পর্যন্ত এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। এবার তার পালা। মীনাক্ষী তার দিকে হান্টার হাঁকড়াতেই সে তার পায়ের ওপর লুটিয়ে কেঁদে বললে, "বৌরাণী, আজ আমার প্রাণ বাঁচাও। আমি আর কখনো এখানে আসবো না। আমার কোন দোষ নেই।"

মীনাক্ষী তার দিকে ঘৃণাভরা চোখে চেয়ে বলে, "হ্যাঁ, তোর কোন দোষ নেই। জানিস তো, আমি কে? চলে যা। আর কখনো এখানে আসিস না। আমরা মেয়েরা ভোগবিলাসেই বস্তু। তোর কোন দোষ নেই যা।"

বেশ্যাটি তার পায়ে মাথা রেখে বলে. "পরমাত্মা আপনাকে সুখী রাখুন। যেমন আপনার নাম শুনেছি ঠিক তেমনটিই দেখলাম।"

"আমি সুখে থাকলে তোর কি লাভ হবে?"

"আপনার যা খুশি ভাবুন মহারাণী।"

"না, তুই বল্।"

পতিতা প্রমাদ গণে। কেন মরতে সে কথা বাড়াতে গেল। ভয়ে ভয়ে বলে, "হুজুরের মমতা বাড়বে, নাম হবে।"

মীনাক্ষী হাসে, "হ্যাঁ ঠিক বলেছিস।"

সে ফিরে এসে গাড়িতে বসে ও জেলা হাকিমের কাছে সমস্ত ঘটনার বিবরণ জানিয়ে নিজের বাড়ি ফিরে যায়। তারপর থেকে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের শত্রু। দিগ্বিজয় রিভালবার নিয়ে মীনাক্ষীকে তাক করে ফেরে আর মীনাক্ষী প্রাণ বাঁচাবার জন্যে দুজন পালোয়ানকে দেহরক্ষী করে রেখেছে। রায়সাহেবের সুখের স্বর্গ তাঁর চোখের সামনেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সংসারের ধাক্কা খেয়ে তাঁর বাসনা অন্তর্মুখী হয়ে আপনিই ভক্তির দিকে ঝোঁকে। যে নতুন জায়দাদের আশায় তিনি ধার নিয়েছিলেন ধার শোধ হবার আগেই তা হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার বোঝা এখনও মাথায় ছিল। মিনিস্ট্রী থেকেও ভালোরকম পেতেন, সবই ঠাটবাট বজায় রাখতে চলে যেত। তাই তাঁকে চাষীদেরই শোষণ করতে হতো। একাজে তাঁর ঘৃণা হতো তবু নিরুপায় হয়েই করতেন।

অসুবিধে এই যে উপাসনা আর ভক্তির মধ্যে তিনি শান্তি পেতেন না। তিনি মোহ ছাড়তে চাইলেও মোহ তাঁকে ছাড়ে না তাই অপমান, গ্লানি আর অশান্তি লেগেই থাকে। মনে শান্তি নেই বলে শরীরও সুস্থ থাকে না। রান্নাঘরে পঞ্চ পর্ব রান্না হয় কিন্তু তাঁর বরাদ্দ সেই মুগের ডাল আর 'ফুলকো' রুটি। তাঁর ভাইরা ভোগবিলাসে ডুবে থাকে কিন্তু রায়সাহেব তা পারতেন না। পরপীড়ন, বজ্জাতি আর নির্লজ্জ অত্যাচারকে তালুকদারদের গৌরব বলে

ভাবতে তাঁর খারাপ লাগতো অথচ সেখান থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা তাঁর ছিল না আর এখানেই তাঁর সবচেয়ে বড়ো পরাজয়!

৩২

মির্জা খুরশেদ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে একটা নতুন কাজ শুরু করে দিলেন। নিশ্চিন্ত বসে থাকা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। এখন কাজ কী? শহরের পতিতাদের নিয়ে একটি নাটকের দল বানানো। নিজের সুখের দিনে তিনি খুব বিলাসী ছিলেন। ইদানীং হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে তাঁর মন নিষ্ঠাবান হয়ে উঠলো। বিগত জীবনের কথা মনে পড়লে তাঁর মন বেদনায় ভরে যেত। আগে এই বোধ জাগলে তিনি হয়তো অনেকের উপকার করতে পারতেন। কিন্তু ঐশ্বর্য তাঁকে আয়েসী ও বিলাসী করে তুলেছিল। তাঁর এই অনুশোচনা নতুন কিছু নয়, বিপদের দিনেই মানুষের মন জেগে ওঠে। মির্জা অনুভব করলেন সংসারে তাঁর কেউ আপন নয়। তাঁর মৃত্যুতে কেউ দুফোঁটা চোখের জল ফেলবে না। থেকে থেকে তাঁর পুরনো কথা মনে পড়ে। বসরার এক গ্রামে যখন তিনি একবার ম্যালেরিয়া রুগী হয়ে একটা ক্যাম্পে পড়েছিলেন তখন একটি গ্রাম্যকিশোরী তাঁকে কত যত্ন করে সেবা করেছিল। সুস্থ হবার পর যখন তিনি তাকে টাকা এবং গয়না দিয়ে তাঁর কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতে চেয়েছিলেন তখন সে চোখের জল চেপে মাথা নীচু করে উপহার নিতে অস্বীকার করেছিল।

এই নার্সদের শুশ্রূষার নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে, নিষ্ঠা আছে কিন্তু সেই অশিক্ষিত মেয়েটির সেবার মধ্যে যে ভালোবাসা ছিল তা নেই। তার কাছে ফিরে যাবার প্রতিজ্ঞা করেও তিনি আর ফিরে যাননি। বিলাসের উন্মাদনায় তাকে কখনও মনে পড়েনি। পড়লেও তাতে ছিল শুধু দয়া, প্রেম নয়। কে জানে সেই কিশোরীটির কি হলো? হায়, তাকে যদি বিয়ে করতেন তাহলে আজ জীবন মধুময় হয়ে উঠতো। সেই দুঃখই মির্জাকে গরীবদুঃখীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করে তুলেছে। একদিন মির্জা এক বাসন্তী সন্ধ্যায় নিজের ঘরের সামনে বারান্দায় বসে দুটি পতিতার সংগে কথা বলছেন এমন সময় সেখানে মেহতা এলেন। মির্জা খুশি হয়ে তাঁর হাত ধরে বললেন, "আসুন আসুন মেহতাজী, আমি তো আপনার খাতিরযত্ন করার জিনিষ নিয়ে আপনার পথ দেখছি।"

মেয়েদুটি হেসে উঠলো মেহতা লজ্জা পেলেন। মির্জা তাদের চলে যেতে ইশারা করে মেহতাকে আদর করে বসিয়ে বললেন, "আমি তো নিজেই আপনার কাছে যাচ্ছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল আমি যে কাজ করতে যাচ্ছি তা আপনার সাহায্য ছাড়া পূর্ণ হতে পারে না। আপনি শুধু আমার পিঠ ঠুকে বলুন, হ্যাঁ মির্জাজী এগিয়ে যান, ঠিক আছে।"

মেহতা হেসে বললেন, "আপনি যে কাজে হাত দেবেন তাতে আমার

মতো গ্রন্থকীটের দরকারই হবে না। আপনার বয়স আমার চেয়ে বেশি আর অভিজ্ঞতাও বেশি। সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাও আপনার আছে। আমার সে শক্তি থাকলে কি করতাম কে জানে?"

মির্জা অল্প কয়েকটি শব্দে নিজের নতুন স্কীমের বর্ণনা দিলেন। তাঁর ধারণায়, রূপের বাজারে সেইসব মেয়েরাই আসে, সংসারে যারা কোন সম্মানের আশ্রয় পায়নি কিংবা আর্থিক অনটন তাদের এপথে আসতে বাধ্য করেছে। যদি এ দুটি সমস্যার সমাধান হয় তাহলে খুব কম মেয়েই এ পথে পা বাড়াবে।

মেহতা অন্যান্য শিক্ষিত ভদ্রলোকের মতো এই সমস্যা নিয়ে ভেবেছিলেন। তাঁর মনে হতো ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা ও মানসিক প্রবণতাই মেয়েদের এ পথে নিয়ে আসে। এই প্রসঙ্গ নিয়ে দুই বন্ধুর তর্ক শুরু হলো। মেহতা হাওয়ায় ঘুঁষি ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "আপনি এ ব্যাপারটা ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখেননি। রুজি রোজগারের আরো অনেক উপায় আছে। কিন্তু সুখের জন্যে ভালো ভালো জিনিষ চাই। যতক্ষণ না সমান ব্যবস্থা ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত বদল হচ্ছে ততক্ষণ এসব নাটকের দল করে কোন লাভ হবে না।

মির্জার গোঁফ খাড়া হয়ে গেল, "আমি বলছি শুধু রুটির জন্যেই এসব হচ্ছে। অবশ্য সবারই যে এক সমস্যা তা নয়। একজন মজুর কি মজুরনীর জন্যে আটা-ডাল আর মাটির কুঁড়ে হলেই চলে। কিন্তু একজন উকিলের জন্যে গাড়ি-বাড়ি চাকর-বাকরের প্রশ্ন আসে। মানুষ শুধু রুটি চায় না, আরো অনেক কিছু চায়। মেয়েদের কাছেও এ প্রশ্ন যদি নানারূপে আসে তাতে দোষ কী?"

ডক্টর মেহতা একটু খেয়াল করলেই দেখতে পেতেন তাঁর আর মির্জার এ ব্যাপারে মতের গরমিল নেই, শুধু কতকগুলো শব্দের হেরফের হচ্ছে। কিন্তু তর্কের ঝড়ে যুক্তি উড়ে গেল। বললেন, "মাফ করুন মির্জাজী। যতদিন দুনিয়াতে ধনীরা থাকবে, বেশ্যারাও থাকবে। আপনার নাটক-মন্ডলী যদি সফলও হয়, আমার অবশ্য ঘোর সন্দেহ আছে, তাহলেও আপনি পাঁচ-দশটার বেশি মেয়ে কক্‌খনো পাবেন না আর তাও কয়েকদিনের জন্যে। সবাই যেমন কবি হতে পারে না তেমনি সব মেয়েই অভিনয় করতে পারে না। আর যদি আপনার নাটকের দলে বেশ্যারা টিকেও যায় তবু বাজারে তাদের জায়গা খালি থাকবে না। একেবারে মূলে কুঠারাঘাত না করে পাতা ছিঁড়ে কোন লাভ হবে না। বড়োলোকদের মধ্যেও কেউ কেউ সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়, কিন্তু ধনী সমাজ আগের মতই থাকে, তার কোন ক্ষতি হয় না।"

মির্জা মেহতার হঠকারিতায় দুঃখ পেলেন। এত লেখাপড়া শেখা বুদ্ধিমান মানুষও এমন কথা বলে। সমাজ ব্যবস্থা কি এত সহজে বদলানো যায়? সে তো শতাব্দীর ব্যাপার। ততদিন এ অনর্থ থামাবার চেষ্টা না করে মেয়েদের পুরুষের বাসনার শিকার করে তোলা হবে? বাঘকে খাঁচায় বন্ধ করে দিলে তো সে তার দাঁত-নখ দিয়ে কোন ক্ষতি করতে পারে না। যতক্ষণ না বাঘ অহিংসাব্রত নিচ্ছে ততক্ষণ বসে থাকতে হবে নাকি? ধনীরা তাদের যেমন খুশি

টাকা ওড়াক মির্জার দুঃখ নেই। মদে ডুবে যাক, মটোর গাড়ির মালা পরুক কিংবা কেল্লা-ধর্মশালা-মসজিদ বানাক মির্জার আপত্তি নেই। শুধু অবলাদের জীবন নষ্ট না করে। এটা মির্জা সহ্য করতে পারেন না। তিনি রূপের বাজার এমন খালি করে দেবেন যে ধনীদের আসরফীতে* থুতু ফেলবার জন্যেও কেউ থাকবে না। কেন যেদিন মদের দোকানে পিকেটিং হয় সেদিন বড়ো বড়ো মাতালেরা জল খেয়ে মনের আগুন নেভায় না?

মেহতা মির্জার বোকামীতে হাসলেন, "আপনার জানা উচিত, পৃথিবীতে এমন দেশও আছে যেখানে বেশ্যা নেই। কিন্তু ধনীর ধন সেখানেও বিলাসের উপকরণ সৃষ্টি করে নেয়।"

মির্জাও মেহতার অজ্ঞতায় হাসেন, "জানি মশাই জানি। আপনাদের আশীর্বাদে সারা দুনিয়া দেখে এসেছি। কিন্তু এ দেশ হিন্দুস্থান, য়ুরোপ নয়।"

"মানুষের স্বভাব সব দেশেই এক।"

"কিন্তু এও জানি এক এক দেশের এমন এক জিনিষ থাকে, যাকে আত্মা বলা যায়। সতীত্ব হিন্দুস্থানী সভ্যতার আত্মা।"

"ওই নিয়েই বসে থাকুন।"

"আপনিও আর বলবেন না। ঐশ্বর্যের নিন্দে করছেন অথচ খান্নাকে সমর্থনও করছেন।"

মেহতার তেজ বিদায় নিল। নম্রভাবে বললেন, "আমি খান্নাকে তখনই সমর্থন করেছি যখন তিনি ধনী নন। এখন তাঁর অবস্থা দেখলে আপনারও দয়া হবে। আর আমি তাঁকে সাহায্য করবোই বা কি করে? বড়োজোর শুকনো সহানুভূতি দেখাই। বরং সাহায্য করেছেন মালতী, তিনি খান্নাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। মানুষের মনের গভীরে ত্যাগ আর আত্মাহুতির কতখানি শক্তি লুকিয়ে আছে আজও তা বুঝে উঠতে পারলাম না। আপনিও একদিন খান্নার সঙ্গে দেখা করে আসুন। এখন তাঁর সহানুভূতি প্রয়োজন।"

মির্জা অনিচ্ছাসত্বেও বললেন, "আপনি যখন বলছেন, যাবো। আপনার সঙ্গে জাহান্নামে যেতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু মিস মালতীর সঙ্গে তো আপনার বিয়ে হবার কথা ছিল। খুব গরম খবর রটেছিল।"

মেহতা লজ্জিত হয়ে বললেন, "তপস্যা তো করছি, দেখুন কবে বরলাভ করি।"

"আরে সেই তো আপনার জন্যে মরছিল।"

"আমারও তাই মনে হতো। কিন্তু হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়ে দেখি সে আকাশে উঠে বসে আছে। এত ওপরে কি আমি পেঁছতে পারবো? মিনতি করছি যাতে নীচে নামে। আজকাল তো সে আমার সঙ্গে কথাও বলে না।" বলতে বলতে মেহতার মুখে ম্লান হাসি ফুটে ওঠে।

মির্জা বলেন, "আবার কবে দেখা হবে?"

* আসরফী=সোনার মুদ্রা/মোহর

"এবার আপনাকে কষ্ট করতে হবে। খান্নার কাছে নিশ্চয় যাবেন।

"যাবো।"

মির্জা দেখলেন মেহতা কি যেন ভাবতে ভাবতে চলে যাচ্ছেন।

৩৩

ডক্টর মেহতা পরীক্ষক থেকে পরীক্ষার্থীতে পরিণত হলেন। মালতীর কাছ থেকে দূরে-দূরে থেকে তাঁর ভয় হতে লাগলো পাছে তাঁকে হারাতে হয়। কয়েকমাস মালতীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। থাকতে না পেরে তিনি মালতীর বাড়ি গেছেন সেখানেও দেখা হয়নি। রুদ্রপাল ও সরোজের প্রেম-পর্বে মালতী প্রায়ই মেহতার পরামর্শ নিতে আসতেন কিন্তু তারা বিলেত চলে গেলে তাঁর আসা-যাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে মেহতার মনে হয় মালতী ইচ্ছে করেই দূরে সরে থাকতে চান। গ্রন্থকীটেরও আর বইয়ের পাতায় মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হলো না।

সাংসারিক ব্যাপারে মেহতা কুশলী নন। সব মিলিয়ে তাঁর মাসিক আয় হাজার টাকারও বেশি। কিন্তু একটা পাইও বাঁচাতে পারতেন না। ডাল-রুটি খাবার পয়সা ছাড়া তাঁর কাছে কিছুই থাকতো না। বাড়তি জিনিষের মধ্যে ছিল একটি শখের গাড়ি, তিনি নিজেই ড্রাইভ করতেন। কিছু টাকা বই কেনায় খরচ হতো, কিছু টাকা দান খয়রাতে আর বাকীটা বাগানের গাছপালার পেছনে। নানারকম দেশী-বিলিতি গাছ ছিল বাগানে, ইদানীং সেদিকেও তাঁর নজর নেই। ঘরের অবস্থা আরো খারাপ। মাত্র গোটা দুই 'ফুলকা'র জন্যে একশো টাকার ওপর খরচ। কখনো কখনো ঘি ছাড়াই ডাল খেতে হয়। কবে ঘিয়ের টিন আনিয়েছেন মনে পড়ে না। আর ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় না পাছে সে কিছু মনে করে।। আচকান* পুরনো হয়ে গেছে তবু সেটা দিয়েই সারা শীতটা কাটিয়ে দিলেন, নতুন করা হয়ে উঠলো না। শেষে যেদিন মালতীর সঙ্গে দেখা হলো তিনি আর থাকতে পারলেন না। বললেন, "তুমি কি এবারের শীতটা এভাবেই কাটাবে নাকি? এই আচকান পরতে তোমার লজ্জা করে না?"

মেহতা লজ্জিত না হয়েই বললেন, "কি করবো মালতী, পয়সা বাঁচে না।"

মালতী অবাক, "তুমি এক হাজারের চেয়েও বেশি মাইনে পাও আর তোমার কাছে জামা তৈরির পয়সা নেই? আমার আয় কখনো চারশো টাকার বেশি হয় না, তাতেই আমি সংসার চালিয়ে কিছু বাঁচাই। তুমি এত টাকা করো কি?"

"আমি একটা পয়সাও বাজে খরচ করি না। আমার এমন কোন শখও নেই।"

"আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাও আর একজোড়া আচকান বানিয়ে নাও।"

* আচকান=পাঞ্জাবী জাতীয়

"এবার তৈরি করবো, সত্যি বলছি।"

"এখানে যখন আসবে ভদ্রলোক হয়ে আসবে।"

"এত কড়া শর্ত?"

"কড়া হয় হোক। তোমাদের মতো লোকের সঙ্গে শক্ত না হলে চলে না।"

কিন্তু ওখানে তো বাক্সো খালি আর কোন দোকানে ধারে কেনবার সাহসও মেহতার ছিল না। মালতীর কাছে কোন মুখে যাবেন? মন আনচান করে। ইতি-মধ্যে আবার একটা উড়ো ঝঞ্ঝাট এসে গেল। কয়েকমাস বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়নি। পঁচাত্তর টাকা ভাড়া। বাড়িওয়ালা অনেক চেষ্টা করে ভাড়া উসুল করতে না পেরে নোটিশ দিলেন। কিন্তু নোটিশ তো আর টাকা তৈরির কার-খানা নয় তাই নোটিশের তারিখ শেষ হলো, টাকা এসে পৌঁছলো না। বাধ্য হয়ে বাড়িওয়ালা নালিশ করলেন। তিনি জানতেন মেহতা খুব সজ্জন ও পরোপকারী কিন্তু ছমাস কেটে গেলে আর তো বসে থাকা যায় না। মেহতা কোন চেষ্টা করলেন না। একতরফা ডিক্রী হয়ে গেল। নীলামের আমিন মেহতাকে খবরটা আগেই দিতে এলো কারণ তার ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো আর মেহতা তাকে সাহায্যও করতেন। ঘটনাচক্রে সেদিন সেখানে মালতী এসে পড়েছিলেন। বললেন, "নীলাম? কি ব্যাপার?"

আমিন বলে, "বাড়ি ভাড়ার জন্যে যে ডিক্রী হয়েছিল তার। আমি বলেছি, হুজুরকে এত্তেলা দিয়ে দিই। চার পাঁচশো টাকার ব্যাপার, খুব বেশি তো নয়। দশদিনের মধ্যে টাকা দিলেও চলবে। কোন অসুবিধে হবে না। আমি মহাজনকে দশদিন আটকাতে পারবো।"

আমিন চলে গেলে মালতী ভর্ৎসনার সুরে বললেন, "এখন তাহলে এই অবস্থা। আমি অবাক হয়ে যাই তুমি এতো বড়ো বড়ো বই লেখো কি করে? বাড়ী ভাড়া ছমাস বাকী, জানো না?"

মেহতা লজ্জিত হয়ে মাথা নীচু করে বললেন, "জানবো না কেন মালতী, কিন্তু টাকা বাঁচে না। আমি একটা পয়সাও বাজে খরচ করি না।"

"কোন হিসেব-টিসেব রাখো?"

"হিসেব রাখবো না? যা পাই তার সব হিসেব আছে, নইলে ইনকামট্যাক্স ধরবে যে।"

"আর যা খরচ করো?"

"তার হিসেব কে রাখে?"

"কেন?"

"কে লেখে? বোঝার মতো মনে হয়।"

"আর এসব বই লেখো কি করে?"

"তার জন্যে বিশেষ কিছু করতে হয় না। কাগজ-কলম নিয়ে বসে পড়ি। সবসময় খরচের খাতা খুলে বসা যায় না।"

"টাকাটা আসবে কি করে?"

"কারুর কাছে ধার নেব। তোমার কাছে থাকে তো দাও না।"

"আমি একটি শর্তে দিতে পারি। তোমার আয়ের সব টাকা আমার হাতে আসবে আর খরচও আমার হাত দিয়ে হবে।"

"ওঃ তুমি যদি এই ভার নাও তো কি বলবো 'মুসলোঁ ঢোল বজাউ" *।"

মালতী ডিক্রীর টাকা চুকিয়ে দিলেন। এবং পরের দিনই মেহতাকে তাঁর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে মালতীর বাড়িতে উঠে যেতে বাধ্য করলেন। নিজের বাড়িতে দুখানা বড়ো বড়ো ঘর তিনি মেহতাকে ছেড়ে দিলেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা এক হেঁসেলেই হলো। মেহতার জিনিষ পত্র ছিল না, ছিল শুধু কয়েকগাড়ি বই। দুটো ঘরই বইয়ে ভরে গেল। নিজের বাগান ছেড়ে আসতে মেহতার নিশ্চয় কষ্ট হচ্ছিল তবে মালতী নিজের পুরো কম্পাউন্ড মেহতাকে যত খুশি গাছপালা লাগাবার জন্যে ছেড়ে দিলেন।

মেহতা নিশ্চিন্ত কিন্তু মালতীকে মেহতার আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্যে বেশ অসুবিধেয় পড়তে হলো। তিনি দেখলেন আয় হাজারের বেশি বটে তবে সবই দানখয়রাতে উড়ে যায়। বিশ-পঁচিশটি ছাত্র তাঁর সাহায্যেই পড়াশোনা করে। বিধবাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থাও কম হতো না। এসব খরচের মধ্যে কোনটা কমাবেন তিনি ভেবে পেলেন না। সব দোষ তাঁর মাথাতেই পড়বে। তাঁর কখনও রাগ হয় মেহতার ওপর, কখনও নিজের ওপর আবার কখনও যারা সরল উদার মানুষটির ঘাড়ে ভার চাপাতে ইতস্ততঃ করেনি তাদের ওপর। তাঁর আরো রাগ হতো দানটা অপাত্রে পড়তো বলে। একদিন মেহতাকে অনেক কথা শোনালে মেহতা নিশ্চিন্ত ভাবে বললেন, "তোমার ওপর ভার, তুমি যাকে যা খুশি দাও আর না দাও জিজ্ঞেস করতে যাবো না তবে জবাবও তোমাকেই দিতে হবে।"

"হ্যাঁ তাই বইকি। যশ তুমি নেবে আর নিন্দে আমার মাথায় চাপুক। আমি বুঝতে পারি না তুমি এই দানধ্যানকে সমর্থন করো কি করে? এই প্রথা মানুষকে অলস আর ভিখিরি করে তোলে। এতে তাদের আত্মগৌরব যতটা আহত হয় অন্যায়ও ততটা আঘাত করতে পারে না। বরং অন্যায় মানুষের মনে বিদ্রোহের ভাব সৃষ্টি করে সমাজের উপকার করে।"

"আমারও তাই মনে হয়।"

"তোমার তা মনে হয় না।"

"না মালতী, সত্যি বলছি।"

"তাহলে কাজে আর কথায় এত ভেদ কেন?"

মালতী তৃতীয় মাসে অনেককে নিরাশ করলো। কাউকে স্পষ্টভাষায় বিদায় দিয়ে, কাউকে অসুবিধের কথা বলে আবার কাউকে বুঝিয়ে। মিস্টার মেহতার বাজেট তো ধীরে ধীরে ঠিক হয় কিন্তু এতে তাঁর মনে গ্লানি জমে। মালতী যখন তৃতীয় মাসে তিনশো টাকা বাঁচিয়ে ফেলে তখন তাঁর দৃষ্টিতে মালতীর

* মুসলোঁ ঢোল বজাউ= মনের আনন্দে ঢোল বাজাই

গৌরব কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়। নারীর মধ্যে দান ও ত্যাগ দুই-ই থাকা চাই। এই তার ঐশ্বর্য। এর ওপরেই সমাজ দাঁড়িয়ে আছে।

যেদিন মেহতার নতুন আচকান আর হাতঘড়ি এসে গেল সেদিন তিনি লজ্জায় বেরোতে পারলেন না। আত্মসেবা তাঁর চোখে অপরাধের সামিল!

মজার ব্যাপার এই যে মালতী তাঁকে হিসেবের মধ্যে কষে বাঁধতে চাইলেও নিজের সব কিছু উজাড় করে দিচ্ছিলেন। ধনীদের বাড়িতে তিনি ফীজ না নিয়ে যেতেন না তবে গরীবদের বিশ পয়সায় দেখতেন ও ওষুধ দিতেন। দুজনের মধ্যে তফাৎ এই যে, মালতী ঘরে-বাইরে দুদিকেই নজর রাখতেন আর মেহতার ঘর বলে কিছুই ছিল না। দুজনেই নিজেকে মুছে দিতে চান। মেহতার পথ পরিষ্কার কিন্তু মালতীর পথ সহজ নয়। দায়দায়িত্ব ছিল, বন্ধন ছিল যা তিনি ভাঙতে পারতেন না, ভাঙতে চাইতেনও না। বরং বন্ধনের মধ্যেই প্রেরণা পেতেন।* তিনি মেহতাকে দেখে বুঝতে পারছিলেন আকাশের পাখিকে খাঁচায় বন্ধ করা যাবে না। কারণ ঘর সংসারের রীতিনীতির সঙ্গে মেহতা পরিচিত নন।

মেহতা সংসারকে এতদিন বাইরে থেকেই দেখেছিলেন। যেদিকে তাকাতেন মন্দটাই আগে চোখে পড়তো। কিন্তু যেদিন তিনি সমাজের গভীরে প্রবেশ করলেন সেদিন বুঝলেন এই মন্দ বস্তুর নীচে ত্যাগ, প্রেম, সাহস, ধৈর্য সবই আছে। এই শংকা ও সন্দেহের মধ্যে মালতীর দেবীরূপ তাঁর চোখের সামনে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি ঈর্ষাবশে মালতীকে সবার চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। বুঝতে পারেননি মোহই সর্বনাশের আকর। প্রেম ভয়ে নত হয় না, সে বিশবাস আর স্বাধীনতা চায়। প্রেম তো ইঁট-পাথরের দেওয়াল নয় সে জীবন, প্রাণশক্তির মতোই পল্লবিত হবার দুর্বার শক্তি তার আছে।

যখন থেকে মেহতা মালতীর বাংলোয় এসেছেন তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে মালতীর দিনে বেশ কয়েকবার দেখা হয়। তাঁর বন্ধুরা ভেবেছিলেন এ ঘটনা তাঁদের বিবাহের ভূমিকামাত্র। এখন শুধু পাকা কথা দেওয়া বাকী। মেহতা নিজেও তাই ভাবতেন। মালতী হয়তো তাঁকে ভাববার সময় দিচ্ছে। এখন তিনি বুঝতে পেরেছেন মালতী বিনা তিনি অসম্পূর্ণ। তিনিই মেহতাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারেন। বাইরে তিনি বিলাসিনী অন্তরে তিনিই মনঃশক্তির কেন্দ্র। কিন্তু পরিস্থিতি বদলে গেছে। তখন মালতী তৃষ্ণার্তা ছিলেন এখন মেহতা ব্যাকুল।

এদিকে মালতী নিজের বাগানের জন্যে গোবরকে মালী রেখেছিলেন। একদিন তিনি রোগী দেখে ফেরবার সময় দেখলেন গাড়িতে পেট্রল নেই। তিনি নিজেই ড্রাইভ করছিলেন। কি করেন? এমন কেউ নেই যে গাড়ি ঠেলে পেট্রলের দোকানে নিয়ে যাবে। গোবর সে পথ ধরেই যাচ্ছিল। সে মালতীর অবস্থা বুঝতে পেরে গাড়িটা দু ফার্লং পথ ঠেলে পেট্রলের দোকানে নিয়ে আসে। মালতী খুশি হয়ে বললেন, "কাজ করবে?"

গোবর সানন্দে রাজী হলে পনেরো টাকা বেতন স্থির হলো। মালীর কাজ তার ভালোই লাগে। এই কাজেই সে অভ্যস্থ তাতেই আনন্দ পায়। মিলে মজুরী করলে বেশি টাকা পেতো কিন্তু সে কাজ তার ভালো লাগে না।

পরদিন থেকে গোবর মালতীর বাড়িতে কাজে লাগে। একটা ঘরও পায়। ঝুনিয়াও আসে। মালতী বাগানে এলে দেখতে পেতেন ঝুনিয়ার ছেলে ধুলোমাটি নিয়ে খেলছে। মালতী একদিন তাকে একটা মিষ্টি দিতে ছেলেটি তাঁকে চিনে ফেলেছে। তাঁকে দেখলেই পেছনে পেছনে ছুটে মিষ্টি আদায় করে তবে ছাড়ে। একদিন মালতী বাগানে তাকে না দেখে ঝুনিয়াকে জিজ্ঞেস করতে জানলেন তার জ্বর হয়েছে।

"জ্বর! তা আমার কাছে নিয়ে আসিসনি কেন? চল্ তো দেখি।"

বাচ্চাটি জ্বরে অচেতন হয়ে পড়ে আছে। খাপরার বন্ধ অন্ধকার ঘর। এত শীতেও মশার দৌরাত্ম্যে অস্থির হয়ে মালতী এক মিনিটও দাঁড়াতে পারলেন না। তখনই থার্মোমিটার আনিয়ে জ্বর দেখলেন, একশো চার! মালতীর ভয় হলো, বসন্ত নয়তো! ছেলেটার এখনো টীকে হয়নি। এই অন্ধ কুঠরীতে পড়ে থাকলে জ্বর না আরো বেড়ে যায়।

হঠাৎ বাচ্চাটি তাকিয়ে মালতীর দিকে চেয়ে হাত বাড়াল। মালতী কোলে নিয়ে ভোলাতে থাকেন। শিশুর নজর তাঁর গলার নেকলেশটির ওপর। তপ্ত কচি কচি আঙুল দিয়ে সে হারটি চেপে ধরে। মালতী হারটি খুলে তার গলায় পরিয়ে দিলেন। হার পেয়েই শিশু ঝুনিয়ার কোলে ফিরে যায়।

মালতী হেসে বলেন, "খুব চালাক হয়ে গেছো। জিনিষ নিয়েই পালাচ্ছে।"

ঝুনিয়া বলে, "দে বাবা, মেমসায়েবের জিনিষ।"

শিশু হারটি দুহাতে চেপে ধরে। মালতী বলেন, "তুমি পরে থাকো বেটা, আমি চাই না।"

তিনি তখনই ফিরে এসে তাঁর বসবার ঘরটি খালি করে ঝুনিয়াদের সেই ঘরে নিয়ে এলেন। মঙ্গল কৌতূহলী চোখে দেখে ছাদে পাখা, রঙীন বাল্ব, দেওয়ালে ছবি, এ কোন স্বপ্নের মায়াপুরী! মালতী সস্নেহে ডাকেন, "মঙ্গল!"

মঙ্গল তাঁর দিকে চেয়ে একটু হাসে, যেন বলতে চায় আর পারছি নে মেমসায়েব কি করবো, যা পারেন করুন। মালতী ঝুনিয়াকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললেন, "তোর ঘরে যদি অন্য কোন মেয়েছেলে থাকে তো গোবরকে পাঠিয়ে দু-চারদিনের জন্যে আনিয়ে নে না। আমার ভয় হচ্ছে 'মায়ের দয়া' বলে। কতদূরে তোর বাড়ি?"

ঝুনিয়া গ্রামের বাড়ির ঠিকানা বলে। মালতীর বেলারীর কথা মনে ছিল। বললেন, "সেই গ্রামটা, যার পশ্চিমে আধমাইল দূরে নদী আছে?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ মেমসায়েব সেই গাঁ। আপনি কি করে জানলেন?"

"একবার আমরা সেই গ্রামে গিয়ে হরির বাড়িতে উঠেছিলাম। তুই চিনিস তাকে?"

"সেই তো শ্বশুর মেমসায়েব, আমার শ্বাশুড়ীকেও দেখেছেন বোধহয়।"

"হ্যাঁ খুব বুঝদার মেয়েছেলে মনে হলো। আমার সঙ্গে অনেক কথা বললো। তা গোবরকে পাঠিয়ে দে না, নিজের মাকে নিয়ে আসুক।"

"ও আনতে যাবে না।"

"কেন?"

"অনেক ব্যাপার আছে।"

ঝুনিয়াকে নিজের ঘরের সব কাজ করতে হয়। দিনে তারা দুজনে ছোলা-ভাজা চিবিয়ে কাটায়, রাতে মালতী এসে যখন মঙ্গলের পাশে বসেন তখন ঝুনিয়া রাঁধতে বসে। রাতে বাচ্চার জ্বর বাড়ে। সে অস্থির কচি হাত দুটি তুলে ধরে, আর মালতী তাকে কোলে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ান। চারদিনের দিন তার গায়ে গুটি বেরোয়। মালতী বাড়ির সবাইকে টীকে দিলেন, মেহতাও বাদ গেলেন না। প্রথমদিকে ছোট ছোট গুটি বেরোলেও মঙ্গল মারাত্মকভাবেই আক্রান্ত হয়। অসহায় শিশু জ্বালাযন্ত্রনায় কাতর হয়ে মালতীর দিকে চেয়ে থাকে। তার ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলে দিচ্ছিল মালতী তাকে বাঁচাতে পারেন। মালতীকে সারা রাত মঙ্গলের পাশে বসে কাটাতে হয়।

গোবর আর ঝুনিয়ার আস্থা ছিল ঝাড়ফুঁকে। এখানে তার কোন সুযোগ নেই। তার ওপর ঝুনিয়া দুছেলের মা হয়েও ছেলেমানুষ করতে জানে না। মঙ্গল বিরক্ত করলে তাকে বকে ঝকে। একটু সময় পেলেই মাটিতে শোয় আর ভোরের আগে উঠতে পারে না। গোবর তো এ ঘরে আসতেই ভয় পায়। মালতী বসে আছেন সে কেমন করে ঢুকবে? ঝুনিয়ার কাছে মঙ্গলের খবর নিয়ে নিজের ঘরে পড়ে থাকে। সেই আঘাতের পর তার ভগ্ন স্বাস্থ্য ফেরেনি। একটু কাজ করলেই হাঁফিয়ে পড়ে। সেই যখন ঝুনিয়া ঘাস বেচতো আর সে আরাম করে পড়ে থাকতো তখনই যা একটু তরতাজা চকচকে হয়েছিল কিন্তু কয়েক মাস বোঝা বয়ে আর চুণকামের কাজ করে তার শরীর খারাপ হয়ে গেছে। তার ওপর এখানে কাজও বেশি। বাগানের কাজ, মাটি খোঁড়া, জল দেওয়া সব করতে হয়। আর যে মালিক এত দয়ালু তাঁর কাজ ফাঁকি দেওয়া যায় কি? বিশেষ করে মেহতা স্বয়ং খুরপী নিয়ে বাগানের কাজ করতে আসেন। সে বসে থাকে কি করে? তাই সে নিজে শুকোচ্ছে কিন্তু বাগান সতেজ সবুজ হয়ে ওঠে।

মিস্টার মেহতাও মঙ্গলকে স্নেহ করেন। একদিন তাকে কোলে নিলে সে তাঁর গোঁফ ছিঁড়ে দিয়েছিল আর কী! পাজীটা এমন শক্ত হাতে গোঁফ-জোড়া চেপে ধরেছিল যে মেহতার চোখে জল এসে গিয়েছিল। তিনি রেগে বললেন, "ছোঁড়া ভীষণ শয়তান।"

মালতী বকে উঠেছিলেন, "তুমি গোঁফটা কেটে ফেলতে পারো না?"

"আমার গোঁফ আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়।"

"এবার ধরলে ছিঁড়ে তবে ছাড়বে।"

"তাহলে আমি ওর কান ছিঁড়ে নেব।"

মঙ্গল তাঁর গোঁফ ছেঁড়ার মধ্যে কোন খাস মজা পেয়েছিল। সে খিলখিল

করে হাসে আর গোঁফ টানে। কিন্তু মেহতাও এ ব্যাপারে বোধহয় মজা পেয়েছিলেন তাই রোজই দু-একবার তিনি মঙ্গলকে দিয়ে গোঁফ টানাটানি করাতেন।

যবে থেকে মঙ্গলের বসন্ত হয়েছে তখন থেকে মেহতাও খুব চিন্তিত হয়ে আছেন। বারবার গিয়ে তার ব্যথিত চোখ দুটি দেখেছেন আর তার কষ্ট কল্পনা করে তাঁর কোমল হৃদয় কেঁপে উঠছে। তিনি ছুটোছুটি করলে মঙ্গল যদি ভালো হয়ে যেত তাহলে তিনি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে যেতেন। টাকা খরচ করলে যদি কাজ হতো তাহলে তিনি শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত খরচ করতেন। কিন্তু এখানে কিছুই করার ছিল না। তাকে ছুঁতে গেলেও তাঁর হাত কাঁপে পাছে মঙ্গলের কষ্ট হয়। মালতী কত যত্নে তাকে খাওয়ান, ঘুম পাড়ান। মালতীর এই বাৎসল্য মালতীকে মহিয়সী করে তুলেছে। মালতী শুধু নারী নন, তিনি মা, তাও আবার যেমন তেমন মা নন, সত্যিকারের জীবনদাত্রী দেবী। যিনি পরের ছেলেকেও নিজের বলে বুকে চেপে ধরেন। তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মাতৃত্বের কমনীয় রূপ ফুটে উঠেছে।

রাত একটা। মঙ্গলের কান্না শুনে মেহতা নিজের কামরা থেকে দৌড়ে এলেন। ভাবলেন বেচারী মালতী বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁকে দরজা খুলে দিলে তিনিই মঙ্গলকে চুপ করিয়ে দেবেন। কাঁচের দরজা দিয়ে দেখলেন মালতী মঙ্গলকে কোলে নিয়ে বসে আছেন আর সে কাঁদছে। মালতীর মাতৃ-মূর্তি দেখে মেহতার চোখ সজল হয়ে ওঠে। মনে হলো ঘরে গিয়ে মালতীর পা দুটো বুকে চেপে ধরেন। মনমন্থন করা দুর্বার প্রেম আলোড়ন তোলে, 'প্রিয়ে, আমার স্বর্গের দেবী, আমার রাণী, ডারলিং...” প্রেমোন্মাদ মেহতা দরজা ঠেললেন, “মালতী দরজা খোলো।”

মালতী দরজা খুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে মেহতা বললেন, “ঝুনিয়া ওঠেনি? ও যে খুব কাঁদছে।”

মালতী সস্নেহে বললেন, “আজ আট দিন তো, রোগটা খুব বেড়েছে, তাই।”

“তাহলে দাও আমি একটু কোলে করে ঘুরি, তুমি হাঁফিয়ে পড়েছো।”

“তোমার একটু পরেই রাগ হয়ে যাবে।”

“কথাটা সত্যি! কিন্তু নিজের দোষ কে স্বীকার করে? মেহতা জিদ ধরলেন, “তুমি আমাকে এত খেলো মনে করো।”

মালতী হেসে মঙ্গলকে তাঁর কোলে দিলেন। সে চুপ করে গেল। তার অনুভূতি তাকে বলে দিল এবার কেঁদে কোন লাভ হবে না। এই নতুন লোকটি মমতাময়ী নারী নয়, পুরুষ। পুরুষ রাগী হয় এবং নির্দয়ও। মেহতা বিজয় গর্বে বললেন, “দেখলে কেমন চুপ করিয়ে দিলাম।”

মালতী ঠাট্টা করেন, “হ্যাঁ তুমি এই বিদ্যাতেও পণ্ডিত দেখছি। কার কাছে শিখলে?”

“তোমার কাছে।”

"আমি নারী আর আমাকে বিশ্বাস করাও যায় না।"

মেহতা লজ্জিত হয়ে বললেন, "মালতী আমি তোমার কাছে হাতজোড় করে বলছি আমার সেসব কথা ভুলে যাও। এই কমাস ধরে আমি যে কত লজ্জিত, দুঃখিত সে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।"

"আমি ভুলে গেছি, সত্যি বলছি।"

"কি করে বিশ্বাস করবো?

"তার প্রমাণ এই যে আমরা এক ছাদের নীচে থাকি, একসাথে খাই, হাসি, কথা বলি।"

"আমাকে কিছু চাইবার অনুমতি দেবে না?"

তিনি মঙ্গলকে শুইয়ে দিয়ে কাতরভাবে তাকালেন যেন মালতীর ওপর তাঁর জীবনমরণ নির্ভর করছে।

মালতী আর্দ্র কণ্ঠে বললেন, "তুমি তো জানো এ সংসারে তোমার চেয়ে আপন আমার কেউ নেই। আমি বহুদিন আগেই তোমার চরণে আত্মসমর্পন করেছি। তুমি আমার পথপ্রদর্শক, আমার দেবতা, আমার গুরু। আমার কাছে তোমাকে কিছু চাইতে হবে না শুধু একটু সংকেতে জানালেই হলো। যতদিন আমি তোমাকে চিনতাম না ততদিন শুধু ভোগ আর আত্মসেবাই আমার জীবন-সবর্স্ব ছিল। তুমি এসে প্রেরণা যোগালে, স্থিরতা দিলে। আমি তোমার দয়া কোনদিন ভুলবো না। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে তুমি আমায় যা বলেছিলে সে কথা আমি মনে রেখেছি। দুঃখ এই যে, অন্য পুরুষেরা আমাকে যা ভাবে তুমিও তাই ভাবো। তার জন্যে আমিই দায়ী, সে আমি জানি কিন্তু তোমার অমূল্য প্রেমও আমাকে বদলাতে পারবে না একথা ভেবে তুমি আমার ওপর অবিচার করেছো। এ নিয়ে আমার যে কত গর্ব, তা তুমি জানো না। তোমার প্রেম আর বিশ্বাস আমাকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে।"

মালতীর তীব্র অনুরাগ যেন মেহতার বুকে আশ্রয় খোঁজে। মনের কথা মুখের ভাবে ফুটে ওঠে। তাঁর রোমাঞ্চ হয়, যাঁকে তিনি দুর্লভ মনে করেছিলেন তিনি এত কাছে? হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। মনের ভাব তাঁর মুখে যে অনির্বচনীয় সুখের আভা ছড়িয়ে দিল তা দেখে মেহতার মনে হলো এ কী নারী না পূত পবিত্র ত্যাগের প্রতিমা!

ঠিক এইসময় ঝুনিয়া উঠে বসলে মেহতা নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। এর পরে দু সপ্তাহ মালতীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগই পেলেন না। মালতী তাঁর সঙ্গে দেখাই করে না কিন্তু মালতীর সেই কথাগুলি তাঁর মনে গুঞ্জরিত হয়। তাতে কত সান্ত্বনা, কত নেশা!

দু সপ্তাহে মঙ্গল ভালো হয়ে গেল তবে মুখে বসন্তের দাগ রইলো। মালতী পাড়ার ছেলেদের ভরপেট মিষ্টি খাওয়ালেন। যেখানে যা মানত ছিল তাও পূরণ হলো। ত্যাগের মধ্যে যে আনন্দের স্পর্শ আছে এখন তা তিনি অনুভব করেন। গোবর আর ঝুনিয়ার খুশির ছোঁয়া মালতীকেও স্পর্শ করে।

এখন আর বাড়ি-গাড়ির প্রতি তাঁর মোহ নেই। মঙ্গলের মতো একটি শিশু তাঁর জীবনে সত্যিকারের আনন্দ নিয়ে এলো।

একদিন মেহতা মাথার যন্ত্রণায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন, মালতী এসে কপালে হাত রেখে কোমলস্বরে বললেন, "কখন থেকে ব্যথা করছে।"

মেহতার মনে হলো তাঁর যন্ত্রণা নিমেষে দূর হয়ে গেল। বললেন, "দুপুর থেকেই মাথা ধরেছিল। এর আগে এমনভাবে কখনো মাথা ধরেনি কিন্তু তোমার হাতের ছোঁয়ায় যেন মিলিয়ে গেল। তোমার হাতের গুণ আছে।"

মালতী তাঁকে কিছু ওষুধ খাইয়ে শুয়ে থাকতে বলে বেরোতে যেতেই মেহতা বললেন, "একটু বসবে না?"

"এসময় কথা বললে আবার ব্যথা বাড়তে পারে। আরাম করে শুয়ে থাকো। আজকাল সবসময় দেখি হয় কিছু লিখছো নয় কিছু পড়ছো। দুচার দিন এসব কাজ বন্ধ রাখো।"

"তুমি একমিনিটও বসবে না?"

"আমাকে রোগী দেখতে যেতে হবে।"

"বেশ, যাও।" মেহতার মুখে এমন একটা হতাশার ছায়া ভেসে উঠলো যে মালতী যেতে পারলেন না। ফিরে এসে বললেন, "আচ্ছা বলো কি বলছিলে?"

"কোন বিশেষ কথা নয়। বলছিলাম, এত রাতে রোগী দেখতে যাবে?"

"ওই রায়সাহেবের মেয়ে। তার অবস্থা খুব খারাপ হয়েছিল এখন একটু ভালো আছে।"

মালতী চলে যেতেই মেহতা শুয়ে পড়লেন। বুঝতে পারলেন না মালতীর স্পর্শে ব্যথাটা মিলিয়ে গেল কেন। মালতী এখন তাঁর চোখে উচ্চলোকের বাসিন্দা। প্রেমও শ্রদ্ধায় পরিণত হয়েছে। প্রেম মহৎ সন্দেহ নেই, শ্রদ্ধার চরম আনন্দ আত্মসমর্পনে।

তিন বছর ধরে মেহতা যে বিশাল গ্রন্থটি লিখছিলেন সেটা শেষ হয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি সমস্ত দর্শনতত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেছেন। গ্রন্থটি তিনি মালতীকে উৎসর্গ করেছেন। বইটি যেদিন লন্ডন থেকে ছেপে এলো সেদিন তিনি এক কপি বই মালতীকে উপহার দিলেন। মালতী উৎসর্গপত্রে নিজের নাম দেখে বিস্মিত হলেন, দুঃখিতও। বললেন, "এ তুমি কি করলে বলতো, আমি যে এর যোগ্য নই।"

মেহতা গর্বিতস্বরে বললেন, "আমি তো মনে করি এটা কোন জিনিষই নয়। আমার একশোটা প্রাণ থাকলে তোমার চরণে সমর্পণ করে ধন্য হতাম।"

"আমার জন্যে! যে স্বার্থসেবা ছাড়া কিছু জানে না?"

"তোমার ত্যাগের একটা টুকরো আমি পেলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। তুমি দেবী!"

"পাথরের দেবী, সেটা বলছো না কেন?"

"ত্যাগের, মঙ্গলের, পবিত্রতার।"

"তবে তুমি আমাকে খুব চিনেছো। আমি তোমাকে সত্যি বলছি। সেবা

কি ত্যাগের মনোভাব নিয়ে আমি কিছু করি না, করি স্বার্থের জন্যে তাতে আনন্দ পাই বলে। একে আত্মতৃপ্তি বলে, ত্যাগ নয়। তুমি আমাকে মিছেই দেবী বানিয়েছো। এখন ধূপদীপ জেবলে পূজো করাটাই বাকী আছে।"

"সেতো আমি বছরের পর বছর করে যাচ্ছি মালতী। করে যাবো যতদিন না বর পাই।"

মালতী ঠাট্টা করে বললেন, "বর পেলে বোধহয় মন্দির থেকে দেবীকে বিসর্জন দেবে।"

"আমার তো আর আলাদা সত্তাই নেই। উপাসক উপাস্যের মধ্যে লীন হয়ে যাবে।"

মালতী গম্ভীর হয়ে বললেন, "না মেহতা, আমি অনেকদিন ধরে একথা ভেবেছি। শেষে ঠিক করেছি স্বামী স্ত্রী হয়ে থাকার চেয়ে বন্ধু হয়ে থাকাই ভালো। তুমি আমাকে ভালোবাসো, বিশ্বাস করো। দরকার পড়লে প্রাণ দিয়ে রক্ষাও করবে। তুমি আমার পথপ্রদর্শকই নও, রক্ষকও। আমিও তোমাকে ভালোবাসি, বিশ্বাস করি। তোমার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার এই মনোভাবকে দৃঢ় করে রাখেন। আমাদের পূর্ণতার জন্যে, আত্মার বিকাশের জন্যে আর কী চাই? নিজের ছোট্ট সংসার পেতে নিজেদের ছোট্ট খাঁচায় বন্দী করে নিজের সুখদুঃখে জড়িয়ে থেকে আমরা কি অসীমের কাছাকাছি পৌঁছতে পারবো? সে তো আমাদের পথে বাধাই দেবে। কিছু বোকা প্রাণী এই বেড়ি পরেই পথ চলতে পারে, চলেও। কিন্তু আমি নিজেকে অত শক্ত মনে করি না। যতক্ষণ মমতা আর নিজের বোধ নেই ততক্ষণ জীবনের মোহও নেই। স্বার্থও প্রবল নয়। যেদিন আমরা সংসারের জালে জড়িয়ে পড়বো তখনই আমাদের ভালোবাসার ক্ষেত্রটাও সংকীর্ণ হয়ে যাবে। নতুন নতুন দায়িত্ব এসে পড়বে আর আমাদের সব শক্তি তাতেই ব্যয় হয়ে যাবে। তোমার মতো বিদ্বান আর প্রতিভাবান পুরুষকে আমি এই কারাগারে বন্দী করতে চাই না। এখনও তোমার জীবনে স্বার্থের কোন স্থান নেই। আমি তোমাকে নীচে নামাবো না। সংসারে তোমার মতো সাধকেরও প্রয়োজন আছে। পৃথিবীতে অন্যায় আর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। অন্ধবিশ্বাস, স্বার্থ, কপট ধর্ম সর্বত্র ছেয়ে আছে। তুমি পৃথিবীর সেই আর্ত আহ্বান শুনেছ। তুমি না শুনলে আর কে শুনবে? তুচ্ছ প্রাণীদের মতো তুমি কান বন্ধ করে থাকতেও পারবে না। তুমি নিজের বিদ্যা, মানবতাকে সেই পথেই নিয়ে যাও। আমি তোমার পেছনে পেছনে যাবো। নিজের সঙ্গে তুমি আমাকেও সার্থক করে তোলো। আমি তোমার কাছে তাই চাই। তোমার মন সাংসারিক সুখের জন্যে লুব্ধ হলেও আমি তোমাকে তোমার পথ থেকে সরতে দেব না। ঈশ্বর না করুন, আমি অসফল হলে তোমার সঙ্গে দুফোঁটা চোখের জল ফেলবো। কে জানে শেষে আমার কি হবে, কোন্ ঘাটে তরী ভিড়বে কিন্তু যাই হোক না তাতে কোন বন্ধন থাকবে না। বলো, আমার প্রতি তোমার কি আদেশ!"

মেহতা মাথা নীচু করে শুনছিলেন। প্রতিটি কথা যেন তাঁর মনের চোখ খুলে দিচ্ছিল। যে চিন্তা তাঁর কাছে স্বপ্নের মতো এসেছিল এখন তা জীবনের সত্য মনে হলো। জীবনের মহান সংকল্পের সামনে যেন নিজের শৈশব পুনর্বার ফিরে আসে। মেহতার মনে হলো তিনি তাঁর বিধবা মায়ের কোলে বসে আছেন। 'মা তুমি কোথায়? এসো, এসে দেখো তোমার ছেলের এই কীর্তিকে। তুমি আশীর্বাদ করো, তোমার সেই একরোখা জেদী, ছেলেটা আজ নবজন্ম লাভ করছে।' তিনি মালতীর পাদস্পর্শ করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "তোমার আদেশ মেনে নিলাম মালতী।"

দুজনেরই চোখে জল। তাঁরা প্রগাঢ় প্রেমে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন।

৩৪

সিলিয়ার ছেলের বয়স এখন দুবছর। সারা গ্রামে দৌড়ে বেড়ায়, বিচিত্র ভাষায় কথা বলে। কেউ কথা বোঝে না তবে হেসে আকুল হয়। কেউ যদি তাকে বলে, "রামু কুকুর কি করে ডাকে রে?" অমনি সে গম্ভীরভাবে জবাব দেবে, "ভৌ ভৌ" তারপরই কামড়াতে আসবে। "বেড়াল কি বলে রে" বললে সে "ম্যাও ম্যাও" করে বেড়ালের নকল করে। সব সময় খেলে বেড়ায়। তার সবচেয়ে ভালো লাগে নিম গাছের নীচে বসে ধুলোবালি নিয়ে খেলা করতে। কেউ বলতো, "তোর নাম কী?"

"লামু।"

"তোর বাবার নাম কী?"

"মাতাদীন।"

"আর তোর মা?"

"ছিলিয়া।"

"আর দাতাদীন কে হয়?"

"ওতো আমার ছালা।"

কে জানে কে তাকে দাতাদীনের সঙ্গে তার এই সম্বন্ধ সূত্রটি বলে দিয়েছিল।

রামু আর রূপার ভারী ভাব। রূপা তাকে নাওয়ায়, খাওয়ায়, কাজল পরায়, চুল আঁচড়ায় আবার কখনো কখনো কোলে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। ধনিয়া বকে, "তুই সব ছোঁয়াছুঁয়ি করে দিলি।" কিন্তু সে শোনে না। খেলার পুতুল তাকে মা হতে শিখিয়েছিল। এখন জীবন্ত শিশু পেয়ে সে উল্লসিত হয়ে উঠেছে।

তাদের ঘরের পেছনেই সিলিয়া ছোট্ট কুঁড়ে বেঁধে থাকে। হরির ঘরে তো সারাজীবন থাকতে পারে না।

মাতাদীনকে কয়েকশো টাকা খরচ করার পর কাশীর পণ্ডিতরা আবার

ব্রাহ্মণ করে দিয়েছেন। সেদিন খুব ধুমধাম হলো, ব্রাহ্মণ ভোজন আর মন্ত্র-পাঠ হলো। মাতাদীনকে শুদ্ধ গোবর ও গোমূত্র খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। গোবরে তার মন পবিত্র হল ও গোমূত্রে আত্মার অশুচি কীট মরে গেল।

কিন্তু এই প্রায়শ্চিত্ত সত্যিই মাতাদীনকে পবিত্র করে দিল। হোমের ধুম-ধামে সে ধর্মের ভণ্ডামীগুলোকেও দেখতে পেল। সেদিন থেকে ধর্মের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে সে পৈতে খুলে ফেলে চাষবাসের কাজে ডুবে গেল। সে আরো লক্ষ্য করলো, পণ্ডিতরা তাকে বামুন বলে মেনে নিলেও জনসাধারণ তার হাতে জল খায় না। পাঁজি পুঁথি দেখাতে কি 'লগন' জিজ্ঞেস করতে আসে বটে, এমন কি দানটানও করে কিন্তু তাকে নিজেদের বাসনকোসন ছুঁতে দেয় না।

যেদিন সিলিয়ার ছেলে জন্মালো সেদিন সে দ্বিগুণ ভাঙ খেয়ে গোঁফে তা দিল। গর্বে বুক ফুলিয়ে ভাবলে ছেলে কেমন হবে? তার মতো? কি করে দেখবে? তার মন কেমন করে। তৃতীয়দিন রূপার সঙ্গে ক্ষেতে দেখা হলো। মাতাদীন তাকে বলে, "রূপিয়া তুই সিলিয়ার ছেলেকে দেখেছিস?"

"কেন দেখবো না, লাল-লাল, মোটা-সোটা, বড়ো বড়ো চোখ, মাতাভর্ত্তি চুল, টুকুর টুকুর করে তাকায়।"

মাতাদীনের মনে ছেলের রূপটি যেন আঁকা হয়ে গেল। সে কিশোরী রূপাকেই কোলে করে কাঁধে বসায়, গালে চুমু খেয়ে আদর করে।

রূপা চুলগুলো ঠিক করে নিয়ে বলে, "চলো, আমি তোমাকে দূর থেকে দেখিয়ে দিই। বারান্দাতেই তো আচে। কে জানে কেন সিলিয়া দিদি খালি কাঁদচে।"

মাতাদীন মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাঁর ঠোঁট কাঁপে, চোখে জল। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে সিলিয়ার দরজায় এসে প্রাণভরে ছেলের কান্না শুনে যায়। মনে হলো, এ কান্না নয়, দুনিয়ার সবচেয়ে মধুর সংগীত!

সিলিয়া বাচ্চাটাকে হরির ঘরে খাটুলীর ওপর শুইয়ে রেখে মজুরী করতে যায়। মাতাদীন কোন না কোন বাহানায় হরির ঘরে এসে আরচোখে ছেলেটাকে দেখে, বুকটা ঠাণ্ডা হয়।

ধনিয়া হাসে, "লজ্জা কী? কোলে নাও। আদর করো। তোমার কল্‌জেটা কি কাঠের নাকি? দেখ্‌চো ঠিক তোমার মতো হয়েচে।"

মাতাদীন সিলিয়ার জন্যে দু-একটাকা রেখে যায়। ছেলের সঙ্গে তার মনও বড়ো হতে থাকে। তার জীবনেও সংযম এলো, গাম্ভীর্য এলো, এলো দায়িত্ব-বোধ।

একদিন রামু শুয়েছিল। মাতাদীন এসে দেখে ধনিয়া নেই, রূপাও কোথাও গেছে। ছেলেটা নীল আকাশের নীচে শুয়ে আপনমনে হাত পা নেড়ে খেলা করছে। মাতাদীনকে দেখেই পরিচিতের মতো হাসে। ব্যাকুল হয়ে মাতাদীন তাকে বুকে চেপে ধরে। তখনি ভয় হয়, তার অপবিত্র স্পর্শে ছেলেটার কিছু হবে না তো। ভয়ে ভয়ে নামিয়ে দেয়, রূপাও ফিরে আসে।

একদিন খুব শিলাবৃষ্টি হলো। সিলিয়া ঘাস নিয়ে বাজার গিয়েছিল। রুপা খেলায় মত্ত। রামুও এখন খেলতে পারে। সে উঠোনে বড়ো বড়ো শিল পড়ে থাকতে দেখে মিছরির ঢ্যালা ভেবে অনেকগুলো কুড়িয়ে খেয়ে ফেললো। সেই রাতেই তার প্রবল জ্বর এলো, নিমুনিয়া। তিন দিনের দিন সব খেলা সাঙ্গ করে সিলিয়ার কোলেই রামু শেষ নিশ্বাস ফেললো।

রামু মারা গিয়েও সিলিয়ার জীবন সর্বস্ব হয়ে রইলো বুকের দুধে আঁচল ভিজে উঠলেই সিলিয়ার চোখ জলে ভরে যেত। আগে সব কাজ সেরে ছেলেকে বুকে নিয়ে সে শান্তি পেত, নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতো। এখন দিনের শেষে শূন্য ঘরে ফিরে তার বুক ভেঙে কান্না আসে। গ্রামের সবাই এখন তার দুঃখের শরীক। রামুকে সবাই ভালোবাসতো।

মাতাদীন কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। সে নিজেই শিশুর শব দুহাতে তুলে নিয়ে একলা নদী পার হয়ে অনেক দূরে নিয়ে গেল। আট দিন সে হাত সোজা করতে পারেনি। সেদিন তার একটুও লজ্জা করেনি। কেউ কিছু বললো না বরং তার সৎসাহসের প্রশংসা করলো। হরি বললে, "এই তো মরদের মতো কাজ। যার হাত ধরেচ, তাকে ছাড়বে কী?"

ধনিয়া চোখ নাচিয়ে বলে, "আর গুণপনা ব্যাখান করতে হবে না গো, শুনলে গা জ্বলে যায়। মরদ! আমি তো এমন পুরুষমানুষকে কাপুরুষ বলি। যখন হাত ধরেছিল তখন কি দুধ খেত, না সিলিয়া বামনী হয়ে গেছিল?"

একমাস কেটে গেল। সিলিয়া আবার মজুরী শুরু করে। সন্ধ্যেবেলা। পূর্ণিমার চাঁদ আকাশ জুড়ে হাসছে। সিলিয়া কাটা ক্ষেতে যবের দানা কুড়োচ্ছিল। তার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে। আঁচল দুধে ভিজে যায়, চোখের জলে মুখ ভাসে। সে মাথা নীচু করে বসে বসে কাঁদে হঠাৎ কারুর ছায়া তার পাশে এসে পড়তে সে চমকে চেয়ে দেখে মাতাদীন দাঁড়িয়ে আছে। সে বলে, "আর কদ্দিন কাঁদবি রে সিলিয়া? কাঁদলে তো সে ফিরবে না।" বলতে বলতে সে নিজেই কেঁদে ফেলে।

সিলিয়ার মুখে ভর্ৎসনার সব ভাষা হারিয়ে যায়। শুধু বলে, "তুমি আজ এদিকে এলে কি করে?"

"এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম। তোকে দেখে এসেচি।"

"তুমি তো তাকে কোলেও নিতে পারোনি।"

"না সিলিয়া একদিন নিয়েছিলুম।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"আমি কোতায় ছিলুম?"

"তুই বাজার গেছিলি।"

"তোমার কোলে কাঁদেনি?"

"না সিলিয়া, হাসছিল।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"ব্যস, মোটে একদিন?"

"হ্যাঁ একটাই দিন। কিন্তু রোজ আসতুম। ওকে খাটুলীতে শুয়ে খেলতে দেখতুম। দেখে চলে যেতুম।"

"তোমার মতোই হয়েছিল।"

"আমি তো পস্তাচ্ছি। সেদিন নাহক তাকে কোলে নিতে গেলুম। এ আমারই পাপের শাস্তি।"

সিলিয়ার চোখে ক্ষমার স্নিগ্ধছায়া। সে মাথায় টুকরি তুলে ঘরের দিকে রওনা হয়। বলে, "আমি তো এখন ধনিয়াকাকীর বারান্দায় পড়ে থাকি। নিজের ঘর ভাল্লাগে না।"

"ধনিয়া আমায় সব সময় বোঝায়।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি। যখনি দেখা হয়, আমাকে বোঝায়।"

গ্রামের কাছে এসে সিলিয়া বলে, "এবার এদিক দে নিজের বাড়ি চলে যাও। পণ্ডিত আবার না দেখে ফেলে।"

মাতাদীন মাথা উঁচিয়ে বলে, "আমি আর কাউকে ডরাই না।"

"ঘর থেকে বের করে দিলে কোতায় যাবে?"

"আমি নিজের ঘর বেঁধেচি।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"কোতায়? আমি তো দেখিনি।"

"চল্ দেখিয়ে দিচ্ছি।"

দুজনে এগোয়। মাতাদীন আগে, সিলিয়া পেছনে। হরির ঘর ছাড়িয়ে তার খিড়কীর পেছনে সিলিয়ার কুঁড়েঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মাতাদীন বলে, "এই আমাদের ঘর।"

সিলিয়া অবিশ্বাস, দুঃখ ও ব্যঙ্গ মিশিয়ে বলে, "এ তো সিলিয়া চামারনীর ঘর।"

মাতাদীন ঘরের দরজা খুলে বলে, "এই আমার দেবীর মন্দির।"

সিলিয়ার চোখ জ্বলে ওঠে, "মন্দির যখন একঘটি জল ঢেলে দে চলে যাও।"

মাতাদীন টুকরীটা সিলিয়ার মাথা থেকে নামিয়ে কম্পিত স্বরে বলে, "না সিলিয়া, যতক্ষণ বাঁচবো, তোর কাছেই থাকবো, তোরই পুজো করবো।"

"মিথ্যে কথা বলচো।"

"না, তোকে ছুঁয়ে বলচি। শুনেচি পাটোয়ারীর ছেলে ভুনসেরী তোর পেছনে ঘুরছিল, তুই তাকে খুব গালমন্দ করেচিস।"

"তোমায় কে বলল?"

"ভুনসেরী নিজেই বলেচে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি।"

সিলিয়া কুপী জ্বাললে। একদিকে মাটির ঘড়া, অপরদিকে উনুন আর দু-তিনটে লোহা-পেতলের মাজা বাসন। মাঝখানে খড় বিছোনো। সেটাই সিলিয়ার বিছানা। মাথার কাছে রামুর খাটুলীটা পড়ে আছে। তার পাশে দু তিনটে অঙ্গহীন মাটির হাতি-ঘোড়া। মাতাদীন খড়ের ওপর বসে পড়ে তার প্রাণ ভরে কাঁদতে ইচ্ছে করে। সিলিয়া তার পিঠে হাত রেখে কোমল-কণ্ঠে বলে, "আমার কথা তোমার মনে পড়তো?"

মাতাদীন তার হাতটা বুকে চেপে ধরে বলে, "তুই সবসময় আমার চোখের সামনে ছিলি সিলিয়া। তোর কি আমার কথা মনে পড়তো?"

"আমার তো তোমার নামে গা জ্বলে যেত।"

"দয়া হতো না?"

"কক্‌খনো না।"

"তবে ভুনসেরী..."

"হয়েচে। আর গাল দিয়ো না। আমার ভয় করচে গাঁয়ের লোকেরা কি বলবে।"

"যে ভালোলোক সে বলবে, "এই ওর ধম্ম" আর যে মন্দ আমি তার পরোয়া করি না।"

"আর তোমার জন্যে রাঁধবে কে?"

"আমার রানী সিলিয়া।"

"তাহলে বামুন থাকবে কি করে?"

"আমি বামুন নই। চামারই থাকতে চাই। যে নিজের ধম্ম পালন করে সেই বামুন, যে নিজের ধম্মের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সেই চামার।"

সিলিয়া তার গলা জড়িয়ে ধরে।

৩৫

হরির দশা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। জীবনযুদ্ধে সর্বদা তার পরাজয় হয়েছে। পূর্বের প্রতিটি পরাজয় তাকে ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তি সঞ্চার করলেও এখন তার আত্মবিশ্বাসও যেতে বসেছে। এমন কোন অকাজ-কুকাজ নেই যা সে করতে বাধ্য হয়নি তবু জীবনের একটা শখও পূর্ণ হলো না। ধীরে ধীরে মরীচিকার সবুজ স্বপ্ন দেখতেও ভুলে গেল সে।

পরাজিত সম্রাটের মতো এখন সে তার তিন বিঘা জমির কেল্লায় বাস করে। আর প্রাণ দিয়ে সেই কেল্লা রক্ষা করে। উপোষ করে, মজুরী করে, বদনাম হয় তবু জমিতে সে হাত দেয় না। কিন্তু এবার সেই সাধের জমিতেও বুঝি টান পড়েছে। তিন বছরের খাজনা বাকি পড়ায়, নোখেরাম তার নামে নালিশ করে

জমি দখলের নোটিশ দিয়েছে। জমি একবার তার হাত থেকে চলে গেলে সারা জীবন মজুর হয়েই থাকতে হবে। সবই ভগবানের ইচ্ছে। রায়সাহেবের দোষ কী? প্রজাদের টাকাতেই তো তাঁর গুজরান হয়। শুধু কি হরি? এই গ্রামের অর্ধেকের বেশি ঘরেই তো এই অবস্থা। তাদের যা হবে, হরিরও নাহয় তাই হবে। ভাগ্যে সুখ থাকলে কি ছেলেটা চলে যায়?

সন্ধ্যেবেলা। হরি চিন্তায় ডুবে আছে। হঠাৎ পণ্ডিত দাতাদীন এসে বললেন, "জমির ব্যাপারে তুমি কিছু ভেবেছো হরি? ইদানীং নোখেরামের সঙ্গে আমার কতাবাত্তা বন্ধ। কিচ্ছু জানি না। শুনেচি, তারিখের আর পনেরো দিন বাকী আছে।"

হরি তাঁকে বসতে খাটিয়া পেড়ে দিয়ে বলে, "সেই তো মালিক, যা ইচ্ছে তাই করবে। আমার কাছে টাকা থাকলে এ অবস্থা হবে কেন? খাইওনি, ওড়াইওনি। কিন্তু ফসল যদি না হয়, আর হলেও কানাকড়ি দরে বিকোয় তাহলে চাষী করবে কী?"

"কিন্তু জমিজমা তো বাঁচাতে হবে। চলবে কি করে? বাপ-দাদার চেহ্ন বলতে তো এটুকুই বেঁচে আচে। তাও গেলে থাকবে কোতায়?"

"ভগমানের মরজি, আমি কি করবো?"

"একটা উপায় আছে।"

হরি যেন অভয়-দান পেলো। দাতাদীনের পা ধরে বললে, "বড়ো পুণ্যি হবে মহারাজ, তুমি ছাড়া কে আছে? আমি তো হতাশ হয়ে গেছি।"

"হতাশ হওয়া কোন কতা নয়। শুধু জেনো, সুখের দিনে মানুষের ধম্ম এক হয় তো দুঃখের দিনে আর। সুখে লোকে দান করে, দুঃখে ভিখ মাঁগতেও পেছপা হয় না। শরীর ভালো থাকলে আমরা চান-পুজো না করে মুখে জল দিই না কিন্তু অসুখ করলে খাটে বসেই পথ্যি করি। এখেনে তোমার আমার কত ভেদ, জগন্নাথধামে সব এক। আপৎকালে শ্রীরামজীকেও শবরীর এঁটো ফল খেতে হয়েছিল, লুকিয়ে বালিবধ করেছিলেন। সংকটকালে বড়োদেরও মানইজ্জত ঠিক থাকে না তা তোমার-আমার কতা কী। রামসেবক মাহাতোকে জানো তো?"

হরি নিরুৎসাহিত হয়ে বলে, "হ্যা, জানবো না কেন?"

"আমার যজমান। এখন তার সময় খুব ভালো যাচ্ছে। চাষবাস আলাদা, লেনদেন আলাদা। এত বাড়বাড়ন্ত চোখেই পড়ে না। ক্মাস হলো তার বৌ মরেচে। ছেলেপুলে নেই। যদি রুপিয়ার বে ওর সাথে দিতে রাজী থাকো তো আমি তাকে বলেকয়ে রাজী করাতে পারি। আমার কতা সে ফেলবে না। মেয়ে বড়ো হয়েছে। সময়ও ভালো নয়। কোথাও একটা কিছু কেলেঙ্কারি হয়ে গেলে মুখে চুণকালি পড়বে। এই সুযোগ। মেয়ের বেও হয়ে যাবে তোমার জমিও বেঁচে যাবে।"

রামসেবক হরির চেয়ে দুচার বছরের ছোট। এমন লোকের সঙ্গে রুপার বিয়ের প্রস্তাবই অপমানজনক। কোথায় ফুলের মতো ফুটফুটে রুপা আর

কোথায় ঐ বুড়ো ঘোগ! জীবনে হরি অনেক চোট সয়েছিল কিন্তু এটাই সবচেয়ে বেশি বাজলো। আজ তার এমন অবস্থা যে মেয়ে-বেচার প্রস্তাব করতেও কেউ ভয় পায় না আর এ প্রস্তাব নাকচ করার মতো শক্তিও তার নেই। তার মাথা নীচু হয়ে আসে।

দাতাদীন মিনিট খানেক পরে বলে, "তা কী বলো?"

হরি পরিষ্কার জবাব না দিয়ে বলে, "ভেবে বলবো।"

"এতে ভাবার কি আছে?"

"ধনিয়াকেও তো জিজ্ঞেস করতে হবে।"

"তুমি রাজী কি না বলো।"

"একটু ভাবতে দাও মহারাজ। আজ পর্যন্ত বংশে এমন কাজ হয়নি। তার ইজ্জতও তো রাখতে হবে।"

"পাঁচ ছদিনের মধ্যে ভেবে জবাব দিও। তুমি ভাবতেই রয়ে গেলে আর জমি দখল হয়ে গেল, তা যেন না হয়।"

দাতাদীন চলে গেলেন। হরিকে নিয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না, ভাবনা ধনিয়াকে নিয়ে। তার নাক বড়ো লম্বা, মরে গেলেও মানমর্যাদা ছাড়বে না। তবে হরি হ্যাঁ বললে সেও কেঁদে কেটে রাজী হয়ে যাবে। জমি গেলেও তো মান যাবে।

ধনিয়া এসে বলে, "পণ্ডিত এসেছিল কেন?"

"এমনি। দখলীর কতাবাত্তা হলো।"

"চোখের জল ফেলতে এসছিল বুজি? একশো টাকা ধার দিক না।"

"চাইবার মুখ ও তো নেই।"

"তাহলে এখেনে আসে কেন?"

"রুপিয়ার বের কতা কইতে।"

"কার সঙ্গে?"

"রামসেবককে জানিস তো, তার সঙ্গে।"

"আমি আবার তাকে কবে দেখলুম। অবিশ্যি নাম শুনেচি। সে তো বুড়ো।"

"বুড়ো নয়, তবে আধবুড়ো।"

"তুমি পণ্ডিতকে ঠুকতে পারলে না? আমাকে বললে আমি এমন জবাব দিতুম যে মনে থাকতো।"

"ঠুকিনি তবে না করে দিয়েচি। বলছিল, বে-টাও বিনা খরচে হয়ে যাবে, জমিটাও বাঁচবে।"

"পষ্ট কতায় বলো না কেন মেয়ে বেচতে বলছিল। কোত্থেকে বুড়োর এত সাহস হলো কে জানে?"

কিন্তু হরি যতই ভাবে ততই তার বিরূপতা কমতে থাকে। কুলমর্যাদার লজ্জা তারও কম ছিল না তবু অসাধ্য রোগ যাকে ধরেছে সে আবার খাদ্যাখাদ্য বিচার করে কি করবে? সে দাতাদীনকে মুখে যাই বলুক না কেন মনে মনে

নরম হয়ে গিয়েছিল। বয়সও এমন কিছু নয়। মরা বাঁচা ভাগ্যের ব্যাপার। বুড়ো বসে থাকে, জোয়ান চলে যায়। রূপার ভাগ্যে সুখ থাকলে সে যেখানে থাকবে সেখানেই সুখী হবে। দুঃখ থাকলে কোথাও সুখ পাবে না। আর মেয়ে বেচা কোন কাজের কথা নয়। হরি টাকাটা ধার হিসেবেই নেবে, হাতে টাকা এলেই চুকিয়ে দেবে। অবশ্য ক্ষমতায় কুলোলে সে কুলশীল দেখে রূপার বিয়ে জোয়ান ছেলের সঙ্গেই দিত। দহেজও দিত, বরযাত্রীদের খাওয়াতোও কিন্তু ভগবান যখন বিরূপ তখন 'কুশকন্যে' দান করা ছাড়া উপায় কি? লোকে হাসবে। যারা হাসে, সাহায্য করতে হাত বাড়ায় না তাদের কথা ভাববে না সে। মুস্কিল ধনিয়াকে নিয়ে। সে পুরনো লাজলজ্জা নিয়েই থাকবে। বুঝবে না এটা কুলপ্রতিষ্টার সময় নয়, প্রাণ বাঁচাবার সময়। অত লাজলজ্জার বালাই তো আসুক না পাঁচশো টাকা যোগাড় করে। কে দেবে!

দুদিন কেটে গেল। এ ব্যাপারে দাম্পত্য আলাপ এখনও হলো না তবে দুজনেই সাংকেতিক ভাষায় কথা বলে। ধনিয়া বলে, "বর-কন্যের জুড়ি মিললে তবেই না বে-র আনন্দ।"

হরি বলে, "বে আনন্দের নাম নয় রে পাগলী। একে তপস্যা বলে।"

"যাও. তপস্যা বলে?"

"হ্যাঁ, আমি বলছি! ভগমান মানুষকে যে দশায় রেখেচেন তাতে সুখী থাকাই তপস্যা ছাড়া আর কী?"

পরদিন ধনিয়া বৈবাহিক আনন্দের আর একটা দিক খুঁজে বার করে, "ঘরে শ্বশুর-শাশুড়ী, জা-ননদ না থাকলে ভালো লাগে নাকি? কটা দিন তো মেয়েরা বৌ হবার সুখ পাবে।"

হরি বলে, "সে সুখ নয়, দণ্ড।"

ধনিয়া রেগে ওঠে, "কি যে বলো তার কোন ঠিক নেই। একলা বৌ থাকবে কি করে। "না কোই আগে না কোই পিছে।"*

"তুই যখন এ বাড়িতে এসেছিলি তখন তো একটা নয় দু-দুটো দেওর ছিল, শ্বশুর ছিল, শ্বাশুড়ী ছিল। তুই কত সুখে ছিলি বল্।"

"সব বাড়িতেই অমন লোক থাকে নাকি?"

"না তো কী? আকাশ থেকে দেবীরা নেমে আসে? একলা বৌ, সবাই তাকে হুকুম করে। যার কতা না শোনে সেই শত্তুর হয়ে যায়। জানিস নে, "সবসে ভলা অকেলা।"**

কথা আর এগোয় না তবে ধনিয়ার পাল্লা হালকা হতে থাকে। চারদিনের দিন রামসেবক মাহাতো নিজেই এলো। বিশাল ঘোড়া চড়ে, সঙ্গে একটা নাপিত আর একটা খিতমদগার, যেন বড়ো জমিদার! বয়স চল্লিশের ওপর, কাঁচাপাকা কিন্তু তেজী চেহারা, জোয়ান শরীর। হরি তার পাশে একেবারে

*না কোই আগে না কোই পিছে=সামনেও কেউ নেই পেছনেও কেউ নেই।

**সবসে ভলা অকেলা=সবচেয়ে ভালো একলা থাকা।

বুড়ো। রামসেবক কোন মামলায় তদ্বির করতে যাচ্ছিল। এখানে দুপুরটা কাটাতে এসেছে। কী রোদ। আর লু বইছে তো! হরি মুদীবৌয়ের দোকান থেকে গমের আটা আর ঘি আনে। লুচি হলো। তিন অতিথি খায়। দাতাদীনও আশীর্বাদ করতে এলেন। কথাবার্তা হয়। দাতাদীন জিজ্ঞেস করলেন, "কিসের মোকদমা, মাহাতো?"

রামসেবক বাহাদুরি দেখিয়ে বক্তৃতা দেয়, "মোকদ্দমা তো একটা না একটা লেগেই থাকে মহারাজ। সংসারে গরু হয়ে থাকলে কাজ হয় না। যত নীচু হবে ততই লোকে তাকে দাবায়। থানা-পুলিশ, আইন-আদালত সবই আমাদের রক্ষে পাবার জন্যে তা না হলে কেউ বাঁচায় না। সব্বাই গরীবের গলা কাটে। বেইমানী করা পাপ কিন্তু হকের পাওনার জন্যে লড়াই না করা পাপ। তুমিই বলো, মানুষ আর কত নামতে পারে। এখেনে চাষীরা সব ভালোমানুষ তবু পাটোয়ারীকে দস্তরী না দিয়ে থাকা যায় না। জমিদারের গোমস্তা আর চাপরাশীদের পেট না ভরলে কাজ চলে না। দারোগা আর 'কানিসিটিবল্'* তো তাদের জামাই। যখন তারা গাঁয়ে আসে তাদের আদর সৎকার না হলে গাঁয়ের নামে 'রিপোর্ট' হয়ে যায়। কখনো কানুনগো আসে, কখনো তসীলদার, কখনো 'ডিপটি', কখনো জণ্ট, কখনো কালেক্টর, কখনো 'কমিসনর'। সব্বার কাছে চাষীদের হাতজোড় করে থাকতে হয়। ডিম-মুরগী-ঘি-দুধ যোগাতে হয়। একটা না একটা হাকিম রোজই বেড়ে চলে। এক ডাক্তার কুঁয়োয় ওষুধ দিতে আসে, আরেক ডাক্তার এসে গরু-ছাগল দেখে যায়। ছেলেদের পরীক্ষার জন্যে 'ইস্‌পিট্টর'** আছে, আরো কত 'আফসর' যে আছে বলার কতা নয়। জলের একজন, জঙ্গলের একজন, তাড়ি-মদের একজন, গ্রামোদ্ধারের একজন, চাষবাসের একজন। কত আর গুণবো? 'পাদড়ী'*** এলে তাকেও রসদ যোগাতে হয়, নয়তো নিন্দে করে। আর কি বলবো? এদের দে চাষীদের একটু উপকার হয় না। একবার জমিদার লাঙল পিছু দু আনা চাঁদা বসিয়েছিল এক বড়ো 'আফসর'কে ভোজ দেবে বলে। চাষীরা দিতে চায়নি বলে সারা গা তছনচ করে দিলে। হাকিমও জমিদারের পক্ষ নিলে। একবারও ভাবলে না চাষীদেরও বালবাচ্চা আছে, ইজ্জত-আবরু আছে, তারাও মানুষ। আরে এসবই তো আমাদের মাথা নীচু করে থাকার ফল। আমি করলুম কি, সারা গাঁয়ে ঢোল পিটিয়ে বলে দিলুম যে, কেউ এক পয়সা বেশি খাজনা দিও না। আমাদের যুক্তি দেখালে আমরা বেশি দিতে রাজী আছি নইলে নয়। গাঁয়ের লোকেরাও আমার কতা মেনে নিল। জমিদার দেখলে সারা গাঁ একদিকে তখন নাচার হয়ে ছেড়ে দিল। ক্ষেত বেদখল হলে জুতবে কে? এ যুগে কড়া না হলে কেউ শোনে না। না কেঁদে তো বাচ্চাও মায়ের কাছে দুধ পায় না।"

* কানিসিটিবল্=কনস্টেবল। ** ইস্‌পিট্টর=ইন্‌স্‌পেক্টর

*** পাদড়ী=পাদ্রী/মিশনারী

রামসেবক হরি ও ধনিয়ার ওপর প্রভাব বিস্তার করে তৃতীয় প্রহরে বিদায় নেয়। দাতাদীনের মন্ত্র কাজ করে। তিনি প্রশ্ন করলেন, "এবার কি বলো?"

হরি ধনিয়ার দিকে ইশারা করে বলে, "ওকে জিজ্ঞেস করো।"

"আমি তোমাদের দুজনই জিজ্ঞেস করছি।"

ধনিয়া বলে, "বয়েসটা বেশি বটে তবে তোমরা যা বলবে আমিও তাতেই রাজী। ভাগ্যে যা লেখা আছে তাই তো হবে। মানুষটা ভালোই।"

আর হরির তো কথাই নেই। দুর্বল যেমন শক্তিমানকে বিশ্বাস করে সে তেমনভাবেই রামসেবককে বিশ্বাস করেছে। এমন লোক তার হাত ধরলে সে সব বাধা পার হতে পারবে।

বিয়ের দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেল। গোবরকেও জানাতে হবে। লিখে তো দাও, আসা না আসা তার হাতে। পরে না কথা শোনাতে পারে 'আমায় ডেকেছো কোথায়' বলে। সোনাকেও আনতে হবে। ধনিয়া বলে, "গোবর তো এমন ছিল না। ঝুনিয়া আসতে দিলে তো। পরদেশে গে এত ভুলে গেল যে একটা চিঠিপত্তরও লেখে না। কে জানে কেমন আছে?" বলতে বলতে তার দুচোখ সজল হয়ে ওঠে।

গোবর চিঠি পেয়ে দেশে যাবার জন্যে তৈরি হয়। ঝুনিয়ার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু এসময় কিছু বলতেও পারে না। বোনের বিয়েতে ভাই না গেলে চলে? সোনার বিয়েতেও যাওয়া হয়নি। সেও লজ্জার কথা!

গোবর আদ্রকণ্ঠে বলে, "মা বাপের সঙ্গে ঝগড়া থাকা ভালো নয়। এখন আমাদের হাত পা হয়েচে, ইচ্ছে হলেই লড়াই-ঝগড়া করতে পারি কিন্তু জন্ম তো ওরাই দিয়েছে, পেলে পুষে বড়োও করেছে। এখন দুটো কথা যদি বলেই, আমাদের সহ্য করতে হবে। আমার তো আজকাল বারবার মা বাবার কতা মনে পড়ে। তখন যে আমার অমন রাগ হয়েছিল কেন কে জানে। তোর জন্যে মা-বাপকেও ছাড়তে হলো।"

ঝুনিয়া জ্বলে ওঠে, "আমার মাতায় দোষ চাপাবে না। তুমিই লড়তে গেছিলে? আমি তো মার কাছে যদ্দিন ছিলুম শ্বাসটুকুও নিইনি।"

"ঝগড়া তোর জন্যেই হলো।"

"আচ্ছা, তাই সই। আমিও তো তোমার জন্যে নিজের ঘরদোর ছেড়েচি।"

"তোর বাড়িতে তোকে কেউ দেখতে পারতো না। ভাই-ভাজরা জ্বালাতো। ভোলা তোকে পেলে জ্যান্ত চিবিয়ে খেত।"

"সেও তোমার জন্যেই।"

"এবার এমন করে থাকতে হবে যাতে ওরাও একটু সুখ পায়। ওদের অপছন্দের কাজ আর করবো না। বাবা এত ভালো, আমাকে কখনো বকেনি। মা কয়েকবার মেরেচে কিন্তু মারার পরেই কিছু না কিছু খেতে দিত। মারতো তবু যতক্ষণ না হাসচি ততক্ষণ শান্তি পেতো না।

দুজনে মালতীর কাছে ছুটি চায়। মালতী শুধু ছুটিই দিলেন না মেয়েকে দেবার জন্যে একটা চরখা আর একজোড়া কঙ্কণ দিলেন। তাঁরও আসবার

ইচ্ছে ছিল কিন্তু এমন একজন রোগীর চিকিৎসা চলছিল যাকে ছেড়ে বাইরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তবে বিয়ের দিন যাবেন কথা দিলেন এবং মঙ্গলের জন্যে অনেক খেলনা কিনে দিলেন। তিনি তাকে বারবার আদর করলেও মঙ্গল তাঁর মায়া কাটিয়ে দেশে যাবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলো। তার শৈশব কল্পনায় দেশের বাড়ি স্বর্গের চেয়েও মনোহর।

গোবর বাড়ি পেঁৗছে এত হতাশ হলো বলার কথা নয়। তার ইচ্ছে করছিল তখনি ফিরে যায়। বাড়ির একটা দিক প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। দরজায় একটি মাত্র মৃতপ্রায় বলদ বাঁধা। হরি আর ধনিয়া আনন্দে ফুলে উঠলো কিন্তু গোবর উদাস হয়েই রইল। এই বাড়িঘরকে কি বাঁচানো যাবে? সে গোলামী করে কিন্তু দুবেলা পেট ভরে খেতে তো পায়। সেখানে একজনই মালিক। আর এখানে সবাই তেজ দেখায়। গোলামী হলেও সেখানে সুখ আছে আর এখানে খেটে-খুটে ফসল ফলিয়ে অন্যের হাতে সর্বস্ব তুলে দিয়ে তুমি বসে বসে 'রাম রাম' করো। হরি বলেই পারে, গোবর একদিনও পারবে না।

আর এই দশা যে হরির শুধু একার তাতো নয়, গ্রামশুদ্ধ সকলের। এমন একটা লোকও নেই যার চোখে পড়ছে না। চলছে, ফিরছে, কাজ করছে নেহাৎ করতে হয় বলে। জীবনে না আছে কোন আশা না আছে কোন সুখ। যেন সবার জীবন স্রোত শুকিয়ে মরা খাত হয়ে গেছে।

জ্যৈষ্ঠ মাস, গোলায় শস্য মজুদ তবু কারুর মুখে হাসি নেই। অনেক কিছু তো গোলায় তুলেই গোমস্তার হাতে দিয়ে দিতে হয়েছে। যেটুকু আছে. তাও অন্যের। ভবিষ্যতের অন্ধকার ছায়া চোখের সামনে নাচছে। দরজার কাছে আবর্জনার রাশি, বিশ্রী গন্ধ তবু তা কারুর নাকেও লাগছে না, চোখেও পড়ছে না। তাদের জীবনের সমস্ত রস কে যেন নিংড়ে বের করে নিয়েছে।

শৈশবেও গোবর গ্রামের এই অবস্থাই দেখেছিল। কিন্তু আজ চার বছর পরে সে যেন নতুন জগৎ দেখতে পেল। ভদ্রলোকেদের সংস্পর্শে এসে তার বুদ্ধি স্বচ্ছ হয়েছে। কয়েকটা রাজনৈতিক বক্তৃতাও সে পেছনে দাঁড়িয়ে শুনেছে। এটুকু বুঝেছে নিজের ভাগ্য নিজেকেই গড়ে নিতে হবে নিজের বুদ্ধি আর সাহসের জোরেই। কোন দেবতার গুপ্ত শক্তি তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। এখন তার মনে গভীর সমবেদনা জাগে। পূর্বের একগুঁয়েমি ভাব এখন তার মধ্যে নেই। এখন সে নম্র, সুশীল। দুঃখ সবাইকে যে এক-সূত্রে বেঁধেছে ক্ষুদ্র স্বার্থ দিয়ে তাকে ভেঙে ফেলে লাভ কী? ঐ বন্ধনকেই সে একতার বন্ধন করে তুলতে চায়।

হরিকে এখন সে কোন কাজ করতে দেখলে নিজেই আগ বাড়িয়ে করে, যেন পুরণো ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। বলে, "বাবা, আর ভেবো না। সব ভার তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি মাসে মাসে টাকা পাঠাবো। এ্যাদ্দিন ধুঁকতে ধুঁকতে খেটেচো এবার একটু আরাম করো। আমি থাকতেও তোমাকে এত কষ্ট করতে হলো নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করচে। আর হরির প্রতিটি রোম থেকে যেন আশীর্বাদ বেরিয়ে এসে ছেলেকে অভিষিক্ত করে।

তার জীর্ণ দেহে দৈবী স্ফূর্তি আসে। সে এখন নিজের ধারকর্জের কথা বলে ছেলেকে বিব্রত করতে চায় না। এখন ও সুখে থাকুক। খেটে মরবার জন্যে তো হরিই আছে। এই তো তার জীবন! রাম নাম জপে তো সে দিন কাটাতে পারবে না তার লাঙল চাই, কোদাল চাই, না হলে সে শান্তি পাবে না।

গোবর বলে, "বলো তো আমি সবার কাছে কিস্তিতে ধারশোধের ব্যবস্থা করি। মাসে মাসে পাঠাবো। সব মিলে কত হবে?"

হরি মাথা নাড়ে, "না বাবা, তুমি কেন কষ্ট করবে তুমিই বা কী এমন পাও। আমি সব দেখবো। সবসময় কি একরকমই যাবে? রূপা চলে যাচ্ছে। ধারও চুকোতে হবে বৈকি। তুমি কোন চিন্তা কোরো না। খাওয়া-দাওয়ায় সংযম রেখো আগে শরীরটা ঠিক করে নাও পরে সব হবে। এখন আমি তোমাকে ক্ষেতে জুততে চাই না বাবা। ভালো মালিক পেয়েছো, তাঁর কিছুদিন সেবা করলে মানুষ হয়ে যাবে। উনি তো এখেনে এসেছিলেন। সাক্ষাৎ দেবী!"

"বে-র দিন নেমন্তন্ন করেছি।"

"এলে খুব খুশি হবো। এমন ভালোমানুষের কাছে থাকলে পয়সা কম হলেও ভালো, জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়।"

পণ্ডিত দাতাদীন এসে হরিকে ইশারায় ডেকে দূরে নিয়ে গিয়ে ট্যাঁক থেকে দুটো একশো টাকার নোট বার করে হরির হাতে দিয়ে বললেন, "তুমি আমার কতা শুনে খুব ভালো কাজ করেচো হরি। দুটো কাজই হয়ে গেল। কন্যেদায় মুক্ত হলে আবার বাপ-দাদার ভিটে-মাটিটাও বাঁচলো। আমি যতটুকু পেরেচি তোমার জন্যে করেচি। এখন তুমি জানো আর তোমার কাজ জানে।"

হরি কাঁপতে কাঁপতে মাথা নীচু করে টাকাটা নেয়। অপমানের বোঝা যেন তার মাথায় ভেঙে পড়ে। আজ তিরিশ বছর ধরে জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে আজ সে পরাস্ত হলো। তার মনে হলো তাকে যেন কেল্লা থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে। সবাই তার মুখে থুতু ফেলে যাচ্ছে। তার ইচ্ছে হলো সবাইকে ডেকে বলে, "ভাইসব আজ আমি দয়ার পাত্র। সুখ কাকে বলে জানি না। জীবনে সুখের মুখ কখনো দেখিনি তবু এই অধম পাপী শরীর এখনো যায়নি এখনও আমি বেঁচে আছি।" আজ তার সমস্ত বিশ্বাস যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

দাতাদীন বললেন, "আমি তাহলে যাচ্ছি। তুমি এখনি নোখেরামের কাছে যাও।"

হরি কাতর স্বরে বলে, "যাবো মহারাজ, আমার মানইজ্জত সব তোমার হাতে।"

৩৬

দুদিন ধরে গ্রামে খুব ধুমধাম হলো। গানবাজনা হলো, রূপা কেঁদেকেটে বিদায় নিল। কিন্তু হরিকে কেউ ঘর থেকে বেরোতে দেখলো না। এমন লুকিয়ে

বসেছিল যেন মুখে কালি লেগেছে। মালতী আসায় আরো হৈচৈ হলো। অন্য গ্রামের মেয়েরাও এসেছিল।

গোবর তার ভদ্রব্যবহারে গ্রামের সবাইকে আপন করে নিল। এমন কোন ঘর ছিল না যেখানে তার মিঠে ব্যবহারের প্রভাব পড়েনি। ভোলা তো তার পায়ে লুটিয়ে পড়লো। ভোলার বৌ তাকে পান খাইয়ে একটা টাকা দিয়ে বিদায় দিল। লক্ষ্ণৌয়ের ঠিকানাও নিল। কখনো সেখানে গেলে দেখা করে আসবে। নিজের টাকার প্রসঙ্গও তুললো না।

তৃতীয় দিন গোবরের যাবার সময় হরি ধনিয়ার কাছে সজল চোখে নিজের অপরাধ স্বীকার করে। কেঁদে গোবরকে বলে, "বাবা, আমি এই জমির মোহে পাপের গাঁঠরী মাতায় তুলে নিয়েচি। জানিনে ভগমান আমায় কি শাস্তি দেবেন।"

গোবর একটুও বিরক্ত না হয়ে শান্ত সুরে শুধু বলে, "এতে কোন অপরাধ নেই বাবা, রামসেবকের টাকাটা অবশ্য ফেরৎ দিতে হবে। তুমি কি করবে? আমি কোন কাজে লাগলুম না, তোমার ক্ষেতে ফসল নেই, ধার পাবে না, ঘরে একমাসের মতো খাবার নেই। এমন দশায় তুমি আর কিই বা করতে পারতে? জায়গাজমি না বাঁচালে থাকতে কোতায়? যখন মানুষের সাধ্যে কুলোয় না তখন ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দিতে হয়। কে জানে এমন কদ্দিন চলবে। যার পেটে রুটি নেই তার কাছে মানইজ্জতের বড়াই ঢং ছাড়া কিছু নয়। অন্যদের মতো তুমিও মন্দলোক হলে কি অন্যলোকের গলা টিপে তার জমা টাকা মেরে বড়-লোক হলে তুমিও ভালো লোক হতে। তুমি কখনো ধম্ম ছাড়োনি এতো তারই শাস্তি। তোমার জায়গায় আমি থাকলে জেলে কিংবা ফাঁসীতে যেতুম। এসব আমি বরদাস্ত করতে পারতুম না।"

ধনিয়া বৌকে তার সঙ্গে পাঠাতে রাজী হলো না। ঝুনিয়াও কিছুদিন থেকে যেতে চায়। ঠিক হলো গোবর একলাই যাবে। পরদিন সকালে গোবর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লক্ষ্ণৌ চলে যায়। হরি তাকে গ্রামের বাইরে বিদায় দিতে আসে। গোবরকে এত ভালো আগে কখনো লাগেনি। যখন গোবর তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে তখন হরি কেঁদে ফেলে, যেন ছেলের সঙ্গে তার আর দেখা হবে না। তার মন এখন মুক্ত আকাশের মতো উজ্জ্বল।

রূপা নিজের শ্বশুরবাড়িতে খুব খুশি। যে অবস্থায় তার শৈশব কেটেছে তাতে পয়সাই ছিল সবচেয়ে দামী জিনিষ। মনের কত সাধ মনেই মরে যেত। এখন সেসব সাধ পূর্ণ হচ্ছে। তাছাড়া রামসেবক প্রৌঢ় হলেও সুস্থ সবল জীবন্ত মানুষ। রূপার কাছে সে তার স্বামী, তা সে ছোঁড়া, বুড়ো বা আধ-বুড়ো যাই হোক না কেন তাতে তার নারী ভাবনায় কোন ভেদ আসেনি। আর এই সংস্কার স্বামীর রঙ-রূপ বা বয়সে আশ্রিত নয়, এর মূল ছিল গভীরে, জন্ম পরম্পরার গহনে, তাকে শুধু ভূমিকম্পই নাড়া দিতে পারে। তার যৌবন নিজেকে নিয়েই মত্ত ছিল। সে নিজেই সাজেগোজে আর খুশি হয়। রাম-সেবকের কাছে সে পুরোদস্তুর গিন্নী। তাকে সে নিজের ভরা যৌবন দেখিয়ে

লজ্জা দেয় না। কোনরকম অপূর্ণতা তার মনে স্থানই পায়নি। গ্রামের সীমা ছোঁয়া চাষের ক্ষেত, গোলাভরা ফসল, গোয়ালভরা গরু তার মনকে কানায় কানায় ভরে দিয়েছিল।

এখন তার ইচ্ছে বাপেরবাড়ির লোকেদের খুশি করা। সেই গরুর কথা তার এখনও মনে আছে। যে অতিথির মতো এসে সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গিয়েছিল। এখনও শ্বশুরবাড়ি আর নিজস্ব হয়ে ওঠেনি, বাপের বাড়ির জন্যেই প্রাণ কাঁদে। তাই এ বাড়িতে গোয়ালভরা গরু দেখে তার মন কেমন করে। তার বাবার এই সাধটি আজও অপূর্ণ রয়ে গেছে। সেবার গরু দেখে বাবাব কী উৎসাহ, যেন আকাশ থেকে দেবী এসেছেন। তারপর আর গরু না এলেও বাবার মনে গরুর লালসা এখনো জেগে আছে। এবার সে গেলে ঐ সাদা গরুটা নিশ্চয় নিয়ে যাবে। না, লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই তো হয়। রামসেবককে বলতেই সে সম্মত হলো। পরের দিনই রূপা একটা গয়লাকে দিয়ে গরু পাঠিয়ে দিল আর বলল, "বাবাকে বোলো. মঙ্গলের দুধ খাবার জন্যে পাঠালুম।"

হরিও গরুর খোঁজে আছে। যদিও এখনই গরু কেনার তাড়া ছিল না কিন্তু মঙ্গল রয়েছে, দুধ না পেলে থাকবে কি করে. টাকা পেলেই সে সবার আগে একটা গরু কিনবে। মঙ্গল এখন শুধু তার নাতি বা গোবরের ছেলে নয়. মালতী দেবীর চোখের মণি। তার আদরযত্ন ভালোভাবেই হওয়া উচিত।

কিন্তু টাকা আসবে কোথা থেকে? সংযোগবশতঃ সেদিন থেকেই এক ঠিকেদার রাস্তা তৈরির জন্যে গ্রামের কাঁকড়মাটি সংগ্রহ করতে এলো। হরি তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়ে আট আনা রোজ নিয়ে খোদাইয়ের কাজ শুরু করে। এই কাজটা দুমাস টিকলে তো গরু কেনার টাকা উঠে যাবে। সারাদিন রোদ আর লুয়ের মধ্যে কাজ করে সে যখন ঘরে ফেরে তখন যেন দেহে প্রাণ থাকে না তবু অদম্য উৎসাহ নিয়ে সে কাজ করে। রাতেও খেয়ে দেয়ে সুতো কাটে। বারোটা একটা পর্যন্ত কাজ করে। ধনিয়াও যেন পাগল হয়ে গেছে। সে হরীকে বাধা না দিয়ে নিজেও তার সঙ্গে বসে বসে সুতো কাটে। গরু তো কিনতে হবেই, রামসেবকের টাকাও দিতে হবে। গোবর বলে গেছে। এ নিয়ে তার ভারি চিন্তা।

রাত বারোটা বেজে গেছে। দুজনে বসে সুতো কাটছে। ধনিয়া বলে, "তোমার ঘুম আসছে তো শুয়ে পড়ো, ভোরে আবার কাজে যেতে হবে।"

হরি আকাশের দিকে চেয়ে বলে, "এবার যাবো। এই তো দশটা বাজলো। তুই যা, শুয়ে পড়গে।"

"আমি তো দুপুরে পড়েই থাকি।"

"আমিও ছোলা ভাজা চিবিয়ে গাছের নীচে শুয়ে পড়ি।"

"খুব লু লাগে বোধহয়।"

"লু লাগবে কি? ভালো ছায়া আছে।"

"আমার ভয় করে। তোমার না জ্বরজারি হয়।"

"বাঃ, জবুরে সেই পড়ে যার জবুরে পড়ার ফুরসৎ আছে। আমার তো ইচ্ছে এবার গোবর আসার আগে রামসেবকের আদ্দেক টাকা জমিয়ে ফেলবো। খানিকটা সেও আনবে। ব্যস এবছর এই ধার থেকে মুক্তি পেলে নতুন জীবন পাবো।"

"গোবরটার কতা এবার বড্ড মনে পড়চে। কত ভালো হয়ে গেচে।"

"যাবার সময় আমার পায়ে পড়ে পেন্নাম করে গেচে।"

"মঙ্গলটা ওখেন থেকে আসার সময় কেমন মোটাসোটা ছিল। এখেনে এসে রোগা হয়ে গেল।"

"ওখেনে দুধ, মাখন কি না পেত বল্। এখেনে রুটি জুটলেই অনেক। ঠিকেদারের কাছ থেকে টাকা পেলেই গরু কিনবো।"

"গরু তো কবেই আসতে পারতো কিন্তু তুমি যদি একটা কতা শোনো। নিজের ক্ষেতের সঙ্গে সঙ্গে পুনিয়ার ভারও মাথায় নিলে।"

"কি করবো ধম্ম বলেও তো কিছু আচে। হীরে বোকামী করে চলে গেল। তার ছেলেপুলেদেরও তো দেখতে হবে। আমি ছাড়া আর কে আচে বল্। আমি না দেখলে ওদের কি গতি হতো। সেটাও ভাব। এত করার পরেও তো মগরু শাহ ওর ওপর নালিশ ঠুকে দিল।"

"টাকা পুঁতে রাখলে নালিশ করবে না?"

"কি বাজে বকচিস। চাষবাস থেকে পেট চলে এই কত না, কার কি আচে যে পুঁতে রাখবে?"

"হীরে যেন সংসার থেকেই চলে গেল।"

"আমার মন বলে সে একদিন না একদিন আসবেই।"

দুজনেই শুতে যায়। হরি অন্ধকারে একবার মুখ তুলে দেখে হীরা যেন পায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে। বড়োবড়ো চুল, ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়, শুকনো মুখ, গায়ে রক্তমাংসের নাম নেই, লম্বাতেও যেন খাটো হয়ে গেছে। সে ছুটে এসে হরির পায়ে লুটিয়ে পড়ে।

হরি তাকে বুকে জড়িয়ে বলে, "তুমি তো একেবারে বদলে গেছো হীরে। কবে এলে? আজ তোমার কথা বারবার মনে পড়ছিল। ব্যামোস্যামো হয়েচে নাকি?" আজ তার চোখে হীরা সেই অপরাধী ভাই নয়, যার জন্যে তার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে বরং তার চোখে আজ হীরা যেন সেই মা-বাপমরা ছোট্ট ভাইটি। মধ্যের বিশ-পঁচিশটা বছর যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে।

হীরা কোন উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদে। হরি তার হাত ধরে বলে, "কেন কাঁদচো ভাই। ভুলচুক মানুষের হয়েই থাকে। কোতায় ছিলে এ্যাদ্দিন?"

হীরা কাতর স্বরে বলে, "কি বলবো দাদা, শুধু তোমাকে দেখবার জন্যেই বেঁচে আচি। মরণ শিয়রে এসে দাঁড়িয়েচে। মনে হতো সেই গরু আমার সামনে দাঁড়িয়ে আচে, সবসময় শুতে-জাগতে আমার চোখের পাতা এক করতে দেয়নি। আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলুম। আর পাঁচ বছর পাগলা গারদে

ছিলুম। ছমাস হলো ছাড়া পেয়েচি। ভিখ মেগে খাই। এখেনে আসতে সাহস হয়নি। কোন মুখে আসবো? শেষে মন মানলো না। তুমি ছেলে-পুলেদের......"

হরি বাধা দিয়ে বলে, "তুমি নাহক পালালে। আরে, দারোগাকে দশ-পাঁচ টাকা দিলেই তো মামলার দফারফা হয়ে যেত।"

"তোমার ঋণ আমি জেবনে শোধ করতে পারবো না দাদা।"

"আমি কি পর না শত্তুর রে ভাই।"

হরির মন প্রসন্ন। জীবনের সমস্ত সংকট, সমস্ত হতাশা যেন তার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। কে বলে সে জীবন সংগ্রামে হেরে গেছে। এই উল্লাস, এই আনন্দ কী পরাজয়ের লক্ষণ? এই হারের মধ্যেই তো তার জয়। তার ভাঙাচোরা অস্ত্রই তার বিজয় পতাকা। তার বুক ফুলে ওঠে, মুখ উজ্জ্বল হয়। হীরার কৃতজ্ঞতা তাকে সার্থক করে তুলেছে। তার গোলায় একশো দুশোমণ গম আর হাঁড়ি ভর্তি হাজার-পাচশো টাকা মাটিতে পোঁতা থাকলে সে এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হতে পারতো না।

হীরা তাকে ভালো করে দেখে বলে, "তুমিও তো খুব রোগা হয়ে গেছো দাদা।"

হরি হাসে, "আমার কি এখন মোটা হবার দিন রে ভাই। যার ধারধোরের চিন্তা নেই, মানইজ্জতের ভাবনা নেই সেই মোটা হয়। অমন মোটা হয়ে সুখ কি? সবাই মোটা হলে তবে তো সুখ। শোভার সঙ্গে দেখা হয়েচে?"

"ওর সঙ্গে আগেই দেখা হয়েচে। তুমি নিজের সংসার দেখলে আবার যে তোমার চরম সর্বনাশ করলো তার ঘরও সামলালে। আবার মানইজ্জতও বজায় রাখলে। সেতো নিজের জমিজমা সব বেচে দিয়েচে। ভগমান জানেন তার চলবে কি করে।"

সকালে হরি যখন কাজে বেরুলো তখন তার শরীরটা কেমন যেন ভারি বোধ হলো। রাতের অনিদ্রায় ক্লান্তি দূর হয়নি। কিন্তু তার চলাফেরায় ছিল দৃপ্ত পদক্ষেপ।

আজ সকাল দশটা থেকেই লু বইছে। দুপুরে আকাশটা অগ্নিবর্ষণ করতে থাকে। হরি কাঁকড়ের ঝুড়ি তুলে রাস্তায় এনে গাড়ি বোঝাই করছিল। দুপুরের ছুটির সময় সে অসুস্থ বোধ করে। এত ক্লান্ত সে কখনো হয়নি। তার পা যেন উঠছে না, গা তাতে পুড়ে যাচ্ছে। সে চানও করলো না, ছোলা ভাজাও খেলো না। শ্রান্ত হয়ে গামছা বিছিয়ে গাছের ছায়ার শুয়ে পড়লো। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। খালি পেটে জল খাওয়া ঠিক নয় বলে সে জোর করে শুয়ে থাকে। আর তো পারা যায় না। একজন মজুর বালতীতে জল ভরে ভাজা চিবোচ্ছে, হরি উঠে তার বালতি থেকে এক ঘটি জল ঢকঢক করে খেয়েই শুয়ে পড়ে কিন্তু আধঘন্টার মধ্যেই জল বমি হয়ে যায়। মুখে মৃত্যুর করাল ছায়া ভেসে ওঠে। সেই মজুরটি বলে, "কেমন লাগছে এখন, ও হরি ভাই।" হরির মাথা ঘুরছিল। বলে, "কিছু না ভালো আছি।"

পরক্ষণেই উঠে আবার বমি করে, তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। এত মাথা ঘুরছে কেন? চোখের সামনে গাঢ় অন্ধকার নেমে আসছে। তার চোখ বুঁজে আসে। ছায়াছবির মতো সারাজীবনের পুরনো স্মৃতি মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। কিন্তু তাতে কোন পরম্পরা নেই, স্বপ্নের মতো পরেরটা আগে আর আগেরটা পরে দেখতে পায়। সেইসব সুখের শৈশবস্মৃতি, মায়ের কোলে শুয়ে থাকতো, গুলি খেলতো, পট বদলায়, গোবর এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে, নববধূ ধনিয়া লাল চুনরীর ঘোমটা টেনে তাকে খেতে দিচ্ছে, একটা গরু এসে দাঁড়ায় ঠিক যেন কামধেনু, সে দুধ দুয়ে মঙ্গলকে খাওয়াচ্ছে হঠাৎ গরু এক স্বর্গের দেবী হয়ে গেল...

সেই মজুরটি আবার ডাকে, "দুপুর শেষ হয়ে গেল হরি, চলো বোঝা ওঠাও।" হরি সাড়া দেয় না তার মন নিরুদ্দেশের পথে রওনা হয়েছে। তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, লু লেগেছে। লোকটি হরির বাড়িতে ছুটে খবর দিতে যায়। এক ঘন্টার মধ্যেই ধনিয়া ছুটে আসে। তার পেছন পেছন ডুলি কাঁধে শোভা আর হীরা। ধনিয়া হরির গায়ে হাত দিতেই বুকটা ধ্বক করে ওঠে। কাঁপতে কাঁপতে বলে, "কেমন আচো তুমি?"

হরি অস্থির চোখে তাকায়, "তুমি এসেচো গোবর? আমি মঙ্গলের জন্যে গরু এনেচি, ওই দাঁড়িয়ে আছে। ওই যে। দ্যাখো।"

ধনিয়া মৃত্যুকে চেনে। তাকে ধীরে সুস্থে আসতে দেখেছে আবার ঝড়ের মতোও আসতে দেখেছে। তার চোখের সামনে শ্বশুর মরেছে, শ্বাশুড়ী মরেছে, নিজের দুই ছেলে মরেছে, গাঁয়ের পঞ্চাশটা লোক মরেছে। বুকে ধাক্কা লাগে, মুখ কালো হয়ে যায়। যার সাহায্যে বেঁচে আছে সেই বুঝি খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। কিন্তু এখন ধৈর্য হারালে চলবে না। তার আশংকা ভুল, হরির কিছু হয়নি শুধু লু লেগেছে। সে চোখের জল চেপে বলে, "আমার দিকে তাকাও। আমায় চিনতে পারচো না?"

হরির চেতনা ফিরে আসে। মৃত্যু তার শিয়রে। দুচোখ দিয়ে দুফোঁটা জল ঝরে পড়ে, "আমার সব বকাঝকা মাফ করে দে ধনিয়া আমি এবার চললুম। গরুর শখ আমার মনেই রয়ে গেল। এবার তো এ টাকা ক্রিয়াকর্ম্ম করতেই শেষ হয়ে যাবে। কাঁদিস নে ধনিয়া। আর কদ্দিন বাঁচাবি? সব দুদ্দশা তো মিটলো। এবার মরতে দে।"

তার চোখ আবার বুঁজে আসে। হীরা ও শোভা তাকে ডুলীতে তুলে গ্রামে ফিরে আসে। গ্রামে এ খবর হাওয়ার মতো ছড়িয়ে পড়ে। সবাই ছুটে আসে। হরি খাটিয়ায় শুয়ে, হয়তো সবই দেখছে, শুনছে কিন্তু তার বাকরোধ হয়ে গেছে। তার নিমীলিত চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে বলে বোঝা যাচ্ছিল মায়ার বাঁধন ছেঁড়া কত কঠিন। যে কাজ হলো না, যে সাধ মিটলো না তার দুঃখই তো মোহ! যে কাজ সারা হয়েছে যে সাধ মিটেছে তার জন্যে কোন দুঃখ থাকে না।

সব বুঝেও ধনিয়ার মন মানে না। কাঁদছে কিন্তু ছুটে ছুটে যা পারে

করছে। কখনো আম পুড়িয়ে পানা তৈরি করছে কখনো হরির গায়ে গমের চোকর মালিশ করছে।। কি করে পয়সা নেই, থাকলে ডাক্তার ডেকে আনতো। হীরা কে'দে বলে, "মন শক্ত করো বোঠান। গোদান করিয়ে দাও, দাদা যাচ্ছে।"

ধনিয়া তার দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকায়। আর সে কত মন শক্ত করবে। স্বামীর জন্যে যা কর্তব্য তাও কি তাকে শিখিয়ে দিতে হবে? যে সারাজীবনের সাথী তার নাম করে কাঁদাই কি তার ধর্ম!

আরো কয়েকজনের গলা শোনা যায়, "হ্যাঁ গোদান করিয়ে দাও। সময় হয়ে গেছে।"

ধনিয়া যন্ত্রের মতো ওঠে, সুতলী বেচে যে বিশ আনা পয়সা পেয়েছিল সেগুলো এনে স্বামীর হিমশীতল হাতে রেখে দাতাদীনকে বলে, "মহারাজ, ঘরে গরু নেই, বাছুর নেই, পয়সাও নেই। এই বিশ আনা পয়সা আছে, এই ওর গোদান।" বলতে বলতে আছাড় খেয়ে লুটিয়ে পড়ে।

সমাপ্ত